বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন

ড. মিতালী ভট্টাচার্য

বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন

ড. মিতালী ভট্টাচার্য

পারুল প্রকাশনী

আখাউড়া রোড আগরতলা - ৭৯৯০০১ ফোন : ২৩৮৬৯৪৭

Bangla Bananchintar Bibartan
A historical study on the evolution of thoughts
concerning Bengali orthography

প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০৭

ড. মিতালী ভট্টাচার্য

পারুল প্রকাশনীর পক্ষে ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন

মূল্য ১৫০ টাকা

উৎসর্গ

ঠাকুরদা ও ঠাকুমার

প্রিয় স্মৃতিতে—

Banan-Title/2nd

ভূমিকা

মুখের কথা মুখের বাইরে এলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, স্থায়ী হয় না। মুখের কথাকে স্থায়ী করার চেষ্টা থেকেই ধ্বনিকে রেখার আখরে বাঁধার ব্যবস্থা হল। সেখান থেকেই বর্ণ ও বর্ণমালার ব্যবস্থা। আর অস্থায়ী ধ্বনির স্থায়ী বর্ণন বা বর্ণায়ন থেকেই 'বানান' কথাটির উদ্ভব, পন্ডিতেরা এমন কথাই বলেন। কিন্তু ধ্বনির বর্ণন বা বর্ণায়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। এতে নানা দিক থেকে নানা সমস্যা আছে। প্রথমত, অনেক ভাষাতে মুখের ধ্বনির সঙ্গে তার বর্ণমালার পারস্পরিক সমরূপতা নেই। যেমন, বাংলা ভাষা ও তার বর্ণমালা। বাংলা ভাষায় এমন ধ্বনি আছে, যার উপযুক্ত বর্ণ তার বর্ণমালায় নেই, আবার তার বর্ণমালায় এমন বর্ণ আছে যা তার কোনো বাস্তব ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে না। দ্বিতীয়ত, যে ভাষার দীর্ঘদিনের লিখিত ইতিহাস আছে সেখানে সমস্যাটা আসে আর এক দিক থেকে। কারণ ভাষার ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যত তাড়াতাড়ি বদলায় সেই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে লিখে দেখাবার জন্য যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় তা এই ধ্বনিপরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। ফলে ধ্বনিবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাসের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হতে থাকে। তৃতীয়ত, আর একটা সমস্যা দেখা যায় ভাষার ভৌগোলিক ও সামাজিক আঞ্চলিকতা নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, এই ধরনের আঞ্চলিক ধ্বনির বৈচিত্র্য তো অনেক, তার মধ্যে কোনটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং তার সর্বজনগ্রাহ্য বর্ণায়নই-বা কেমন হবে? চতুর্থত, অন্য ভাষার শব্দকে যখন গ্রহীতা ভাষায় লিখে দেখাবার প্রয়োজন হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণায়নের ক্ষেত্রে দুই ভাষার ধ্বনি-বর্ণের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। তখন ঠিক বর্ণায়নটি কেমন হবে তা নিয়েও বানান-ভাবুকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও অনেক দিন ধরে লেখা হয়ে আসছে। তাই বর্ণায়নের প্রায় সব কয়টি সমস্যাই বাংলা ভাষার লিখিত অনুশীলনের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। সংক্ষেপে এটাই হল বাংলা ভাষার বানানসমস্যার স্বরূপ। বাংলা বানানসমস্যা নিয়ে অনেকেই অনেকদিন ধরে লিখে আসছেন। সেই লেখাগুলো এক জায়গায় ধরে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বানানের ব্যাপারে আমরা কতটা এগিয়েছি এবং কোথায় আমরা আটকে রয়েছি। তাই ভাষার লিখিত অনুশীলনের মানোন্নয়নের জন্য একটা কালানুক্রমিক মূল্যায়ন খুব জরুরি। **'বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন'** বইতে মিতালী এই জরুরি কাজটিই সম্পন্ন করেছে।

বলা বাহুল্য, এই কাজ আপাতদৃষ্টিতে বেশ নীরস ও দুঃসাধ্য, নিবিড় ভাষানুরাগ ও গভীর নিষ্ঠা না থাকলে এ কাজে লেগে থাকা কঠিন। মিতালীর কাজের মধ্যে এই ভাষানুরাগ ও নিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত তার এই কাজে কেউ ফাঁক আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু ফাঁকি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে কারণ এ কাজে তাকে মূল সংস্কৃত ও বাংলা পুথি, বিস্তর পুরনো বই, পত্রপত্রিকা এবং ভাষাদলিল ব্যবহার করতে দেখেছি। তার কিছু চিত্রিত নিদর্শন পাঠকেরা এই বইতে পাবেন। বাংলা ভাষার স্বার্থে আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নির্মল দাশ

নিবেদন

বাংলা বানান বর্তমানে একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। বানান যে কেবল ভাষাচর্চার অঙ্গ তা নয়, সমাজের সর্বস্তরেই আজ কোনো না কোনো সূত্রে বানানের প্রয়োজনীয়তা এসে যায় ; কিন্তু এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎকেন্দ্রিকতার অন্ত নেই। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই বানান-সমস্যা এবং সমাধানের সম্ভাব্য দিকগুলি নিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বহু আলাপ আলোচনা চলছে, যার মুদ্রিত রূপ আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও গ্রন্থাদিতে পাই। বিভিন্ন সময়ের এই চিন্তা-ভাবনার কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করে যে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা ধরা পড়েছে এখানে তাই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুধু যে বানান-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ চিন্তা-ভাবনাই এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে তা নয়, বানান নিয়ে যখন প্রত্যক্ষ চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়নি, অর্থাৎ পুথির যুগ বা মুদ্রণ যুগের প্রথম পর্যায়েও বাংলা বানানের রূপ কী ছিল তা নিয়েও এখানে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এর মধ্য দিয়ে সেই সময়কার লিপিকরদের বিশেষ প্রবণতা পরিস্ফুট হয়েছে।

এই গ্রন্থকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন যুগে বাংলা বানানের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। এই অধ্যায়কে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে পুথির যুগের বাংলা বানানের বিন্যাস দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমরা প্রায়ই পুথির বানানের বিশৃঙ্খলার অভিযোগ শুনে থাকি। আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি, এই বিশৃঙ্খলাগুলিরও একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। এখানে তিন শতকের বেশ কিছু নির্বাচিত পুথি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি কী ধরনের প্রবণতা বানান বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে লিপিকরদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন শতকে এই প্রবণতাগুলির হ্রাস বা বৃদ্ধির হারও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করেছি, মুদ্রণের আবির্ভাবও বাংলা পুথির বানানকে বিভ্রান্তিমুক্ত করতে পারে নি।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বকে আমি 'মুদ্রণ যুগ' আখ্যা দিয়েছি। এই পর্বে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, মুদ্রণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বাংলা বানান পুথির যুগের বিভ্রান্তি কাটিয়ে ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে চেষ্টা করেছে। এজন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মূল সংস্করণ ব্যবহার করেছি। তার কোনো কোনোটির ফোটোকপি গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলা বানান-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়কেও তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির বানান-বিধি (১ম সংস্করণ) প্রকাশের পূর্বের বানান-সংক্রান্ত চিন্তা বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৩৬-৩৭ পর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির প্রকাশিত বানান-বিধির তিনটি সংস্করণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী পর্বের বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বানান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, এই অংশে, বর্তমান বাংলাদেশে বানান-সংক্রান্ত যে ধরনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে বা হয়েছে তার গতি-প্রকৃতিও সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায় বা উপসংহারে, বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পেছনে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত কাজ করেছে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৯০ সাল থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে গবেষণাকার্য আমি শুরু করেছি। দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণার পর ১৯৯৬ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করি। তবে এই গ্রন্থ ঐ গবেষণাগ্রন্থের হুবহু প্রতিরূপ নয়। পরবর্তীকালে বেশ কিছু অংশ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংযোজিত হয়েছে। তবে অতি সম্প্রতি যেসব আলোচনা চলছে, এখানে তা অন্তর্ভুক্ত হল না। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করার আশা রাখি।

এই কাজ যাঁদের সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব হত না, তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রথমেই প্রণাম জানাই পিতৃপ্রতিম ড. নির্মল দাশকে। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে থাকার জন্যই এই গবেষণাকার্য শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি তাঁর প্রচেষ্টাতেই এই পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আনন্দ লাভ করছে। প্রণাম জানাই ড. রামেশ্বর শ ও ড. উদয় চক্রবর্তীকে, যাঁরা এই গবেষণাগ্রন্থকে ডিগ্রি দানের জন্য অনুমোদন করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য নিরন্তর অনুপ্রেণা দিয়েছেন ড. বিমল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন কলকাতা পুথিশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. তুষারকান্তি মহাপাত্র। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও চিঠিপত্রের সন্ধান দিয়ে উপকার করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী গ্রন্থাগারিক সুনীল দাস। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বিশেষভাবে স্মরণ করি ন্যাশানাল লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির কর্মীবৃন্দের সহযোগিতার কথা। পারুল প্রকাশনী এই ধরনের একটি অলাভজনক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুদক্ষ মুদ্রণশিল্পী শ্রীমতী অপর্ণা আচার্য্যের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

আজ বিশেষভাবে মনে হচ্ছে আমার মা শ্রীমতী স্বপ্না মুখোপাধ্যায় ও বাবা শ্রী নারায়ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। তাঁদের সততা, নীরব আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন আমাকে লড়াই করার মনোবল জুগিয়েছে। আমার ছোটো ভাই অজয় প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে আমার পাশে থেকেছে। আমার ভাশুর শ্রীরাম ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার শাশুড়ি-মা শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য আমার প্রতিটি লেখা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়েছেন। আমার স্বামী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবশেষে অপরাধ স্বীকার করি আমার ছোটো দুটি শিশু মধুরা ও রাঙ্গলের কাছে। কারণ তাদের প্রতি মূহূর্তে বঞ্চিত করে আমি আমার কাজের সময় বার করে নিয়েছি।

পরিশেষে, এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বানান সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেখানে অন্য রচনা থেকে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে মূল রচনার বানানই রক্ষিত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন দেওয়াও হয়নি। বিবৃতি অংশে আমি যতদূর সম্ভব বাংলা আকাদেমির বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। যদি অজ্ঞাতসারে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তা মার্জনীয়। আর একটি কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। আমার কাজের সীমাবদ্ধতা যদি অন্য গবেষককে নতুন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে, তাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মিতালী ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

বিভিন্ন যুগে বাংলা বানানের বিন্যাস

প্রথম পর্ব : পুথির যুগ ২-৫২

দ্বিতীয় পর্ব : মুদ্রণ যুগ ৫৩-৮০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

বানান-সংক্রান্ত আলোচনা : কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ

প্রথম পর্যায় : প্রাক ১৯৩৬ পর্ব ৮৪-১৪৩

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৩৬-১৯৩৭ পর্ব ১৪৩-১৬৪

তৃতীয় পর্যায় : ১৯৩৭ পরবর্তী পর্ব ১৬৫-২৪৬

ওপার বাংলার বানানচিন্তা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,

ঢাকা বাংলা একাডেমীর বানান নিয়মাবলির তুলনামূলক আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

পরিশেষে

বাংলা বানানচিন্তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত :

সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৪৭-২৫৪

পরিশিষ্ট ঃ

১. আকরপঞ্জি ২৫৫-২৬০

২. নির্ঘন্ট ২৬১-২৬৪

৩. চিত্রাবলি ১-২৪

গ্রন্থশেষের চিত্রসূচি

চিত্র ১ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের পুথির ১৬৮/খ সংখ্যক পৃষ্ঠা। পুথি সংখ্যা ১০৭৪। (দ্র. পৃ: ৬১)

চিত্র ২ : শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত (১৮০৩) মহাভারতের ৪-৫ পৃষ্ঠা। এখানে ১নং চিত্রে প্রদর্শিত পুথির রচনাংশের মুদ্রিত প্রতিরূপ পাওয়া যায়। (দ্র. পৃ. ৬১-৬২)

চিত্র ৩ : ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত কৃত্তিবাসি রামায়ণের ৪-৫ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬০)

চিত্র ৪ : রামরাম বসু-র 'লিপিমালা' গ্রন্থের (১৮০২) ১২-১৩ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬৩)

চিত্র ৫ : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' গ্রন্থের (১৮০৫) ৮-৯ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬৩)

চিত্র ৬ : শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত (১৮২৯) জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ৪-৫ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬৬)

চিত্র ৭ : 'দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ' (১৮৪৩) গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬৬)

চিত্র ৮ : ইং ১৮৩১ সালের ১৯ মে (বাংলা ১২৩৮ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৬৯-৭০)

চিত্র ৯ : বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের ৮-৯ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৭৩)

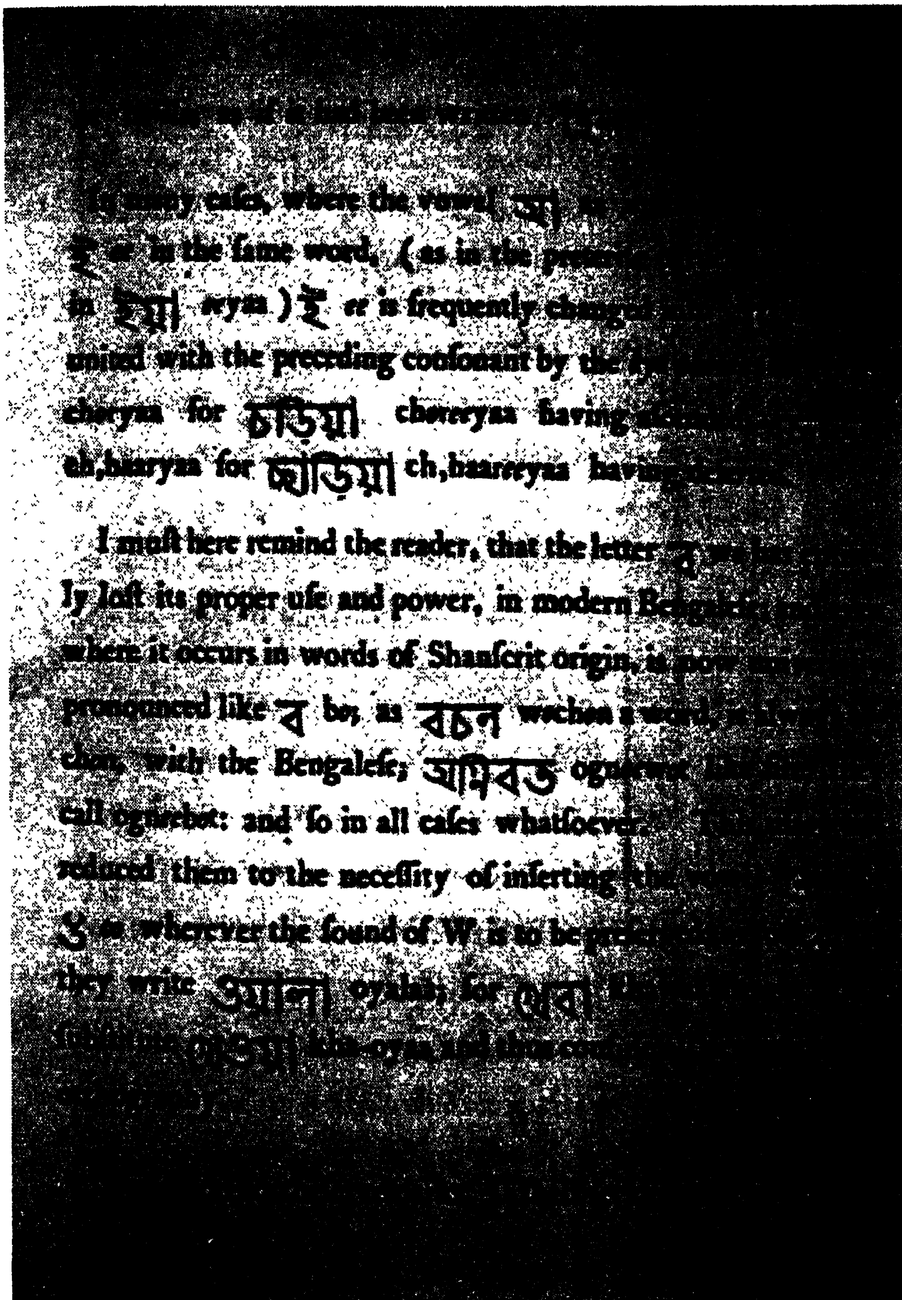
চিত্র ১০ : 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৭ম সংস্করণের ৬-৭ পৃষ্ঠা। দুই সংস্করণের তুলনা করলে বানানের পার্থক্য ধরা পড়ে। (দ্র. পৃ. ৭৫)

চিত্র ১১ : 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থের ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের ১০-১১ পৃষ্ঠা। (দ্র. পৃ. ৭৭)

চিত্র ১২ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির 'বাংলা বানানের নিয়মে' (দ্বিতীয় সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্মতি-সূচক স্বাক্ষর। (দ্র. পৃ. ৮৩)

চিত্র ১৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানকমিটির (১৯৭৯) নতুন প্রস্তাবের প্রতিলিপি (দ্র. পৃ. ১৯৬)

বইয়ের পিছনের মলাটে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের ১০ নং পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

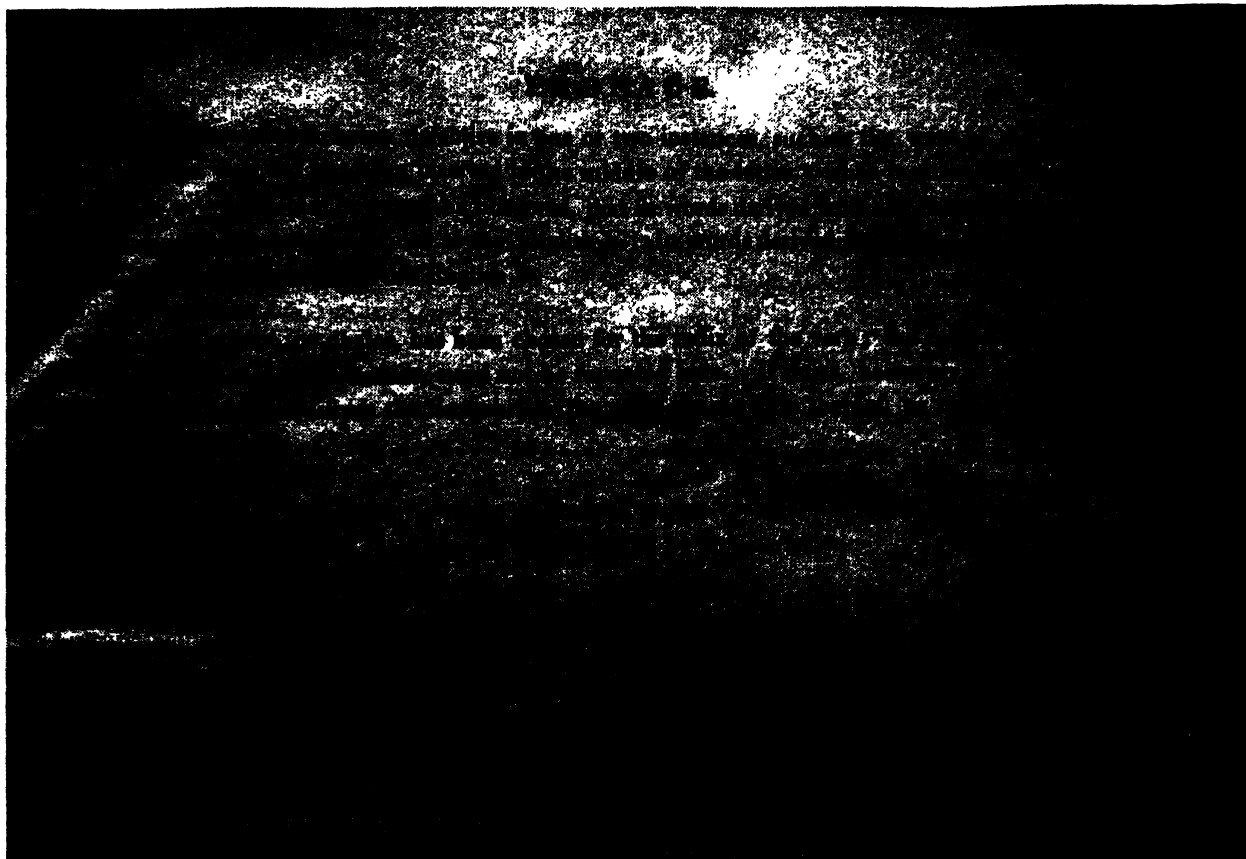


[illegible]

In many cases, where the vowel আ [illegible]
ই ee in the same word, (as in the present [illegible]
in ইয়া eeya) ই ee is frequently change[illegible]
united with the preceding consonant by the [illegible]
cheerya for চাড়িয়া chareeyaa having [illegible]
ch,hiarya for ছাড়িয়া ch,haareeyaa havin[illegible]

I must here remind the reader, that the letter ব [illegible]
ly lost its proper use and power, in modern Be[illegible]
where it occurs in words of Shanscrit origin, is [illegible]
pronounced like ব b, as বচন wochon [illegible]
chon, with the Bengalese; অগ্নিবত ogne[illegible]
call ognebot: and so in all cases whatsoever [illegible]
reduced them to the necessity of inserting [illegible]
ও o wherever the sound of W is to be [illegible]
they write ওয়ালা oyala for [illegible]
[illegible] ওয়া [illegible]

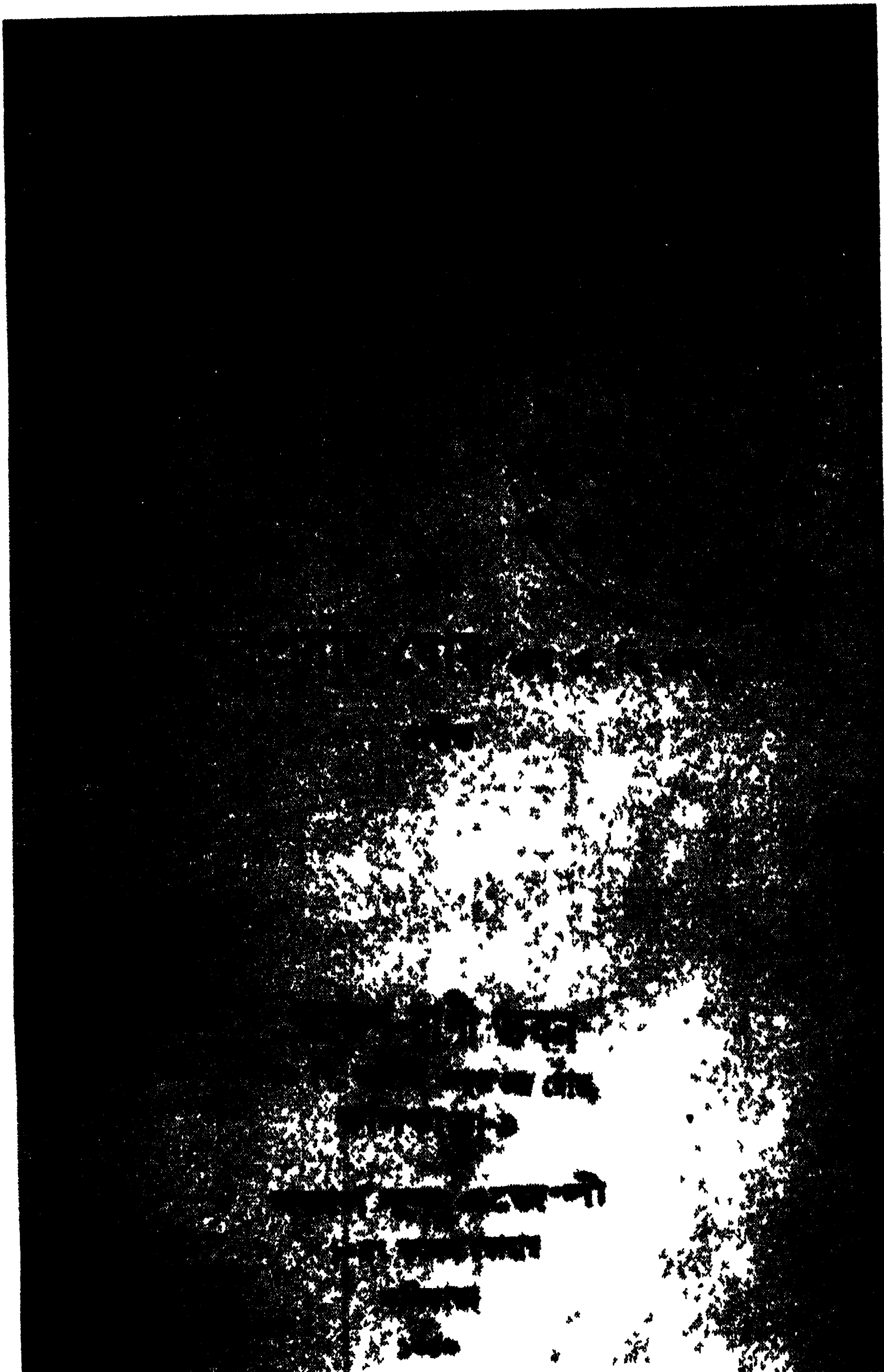
বানানসমস্যার ইঙ্গিত : হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ (১৭৭৮) [দ্র. পৃ. ৮১]



বানানসমস্যার ইঙ্গিত : কেরির A Dictionary of the Bengalee Language (1818) [দ্র. পৃ. ৮১]



উল্লিখিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র [দ্র. পৃ. ৯৩]



উল্লিখিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র [দ্র. পৃ. ১৮১]

বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন যুগে বাংলা বানানের বিন্যাস

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে বাংলা বানান সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই ধরনের আলোচনা থেকে আমরা আধুনিক বাংলা বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। কিন্তু আধুনিকপূর্ব যুগের বাংলা বানান সম্পর্কে সে ধরনের কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রত্যক্ষ উপাদান আমরা পাই না। তাই মধ্যযুগের বাংলা বানানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য কোনো পরোক্ষ উপাদানের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে এই পরোক্ষ উপাদান হচ্ছে আধুনিকপূর্ব যুগের বাংলা পুথির বানান।

তবে এই পরোক্ষ উপাদান ব্যবহারের প্রাথমিক অসুবিধা হল, পুরোনো বাংলা পুথির বানানে আপাতদৃষ্টিতে নানাবিধ অসংগতি লক্ষ করা যায়। তাই পুথির বানানে কোনো রকম শৃঙ্খলা নেই—এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু গভীরভাবে পুথির বানান পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট দেখা যায়, প্রথম দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশৃঙ্খলা মনে করি, সেই বিশৃঙ্খলারও নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, পুথির ক্ষেত্রে বানানের কোনো সাধারণীকৃত অব্যতিক্রমী নিয়ম আবিষ্কার করা দুরূহ। এখানে অধিকাংশ বাংলা পুথির বানানে যে ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়, তারই ভিত্তিতে কতগুলি সূত্র বা ধারা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হল।

এই অনুসন্ধানে মুদ্রিত পুথি বিশেষ সহায়ক হয়নি। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পাদকের অভ্যস্ত সংস্কার পুথির মূল বানানকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু হস্তলিখিত পুথিতে সংশ্লিষ্ট লিপিকর বা লিপিকরদের যুগের বানানের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত বিভিন্ন অঞ্চলের লিপিকরের হস্তলিখিত কিছু নির্বাচিত পুথির বানান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুথি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাবকালকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাব ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও আইন সংক্রান্ত বই ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা গ্রন্থাদি পুরোমাত্রায় ছাপা শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ চালু হবার পর থেকে অর্থাৎ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই কারণে বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাবকাল অনুষ্ঠানিকভাবে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হলেও, এই আলোচনায় বাংলা মুদ্রণযুগের প্রকৃত সূত্রপাত ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ধরা হয়েছে। এই আলোচনার প্রথম পর্বে একদিকে বাংলা মুদ্রণযুগের সূত্রপাতের পূর্ববর্তী দুই শত বছরের অর্থাৎ মোটামুটি ১০০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১২০০ বঙ্গাব্দ

পর্যন্ত সময়সীমার বাংলা পুথির বানানরীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে মুদ্রণযুগ শুরু হবার একশো বছর পর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে লিখিত পুথিতে মুদ্রণ-প্রযুক্তি পুথির বানানকে কতটা প্রভাবিত করেছে বা আদৌ করেছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য ১২০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখিত বিভিন্ন পুথি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রথম পর্বটির নামকরণ করা হল **'পুথির যুগ'**। দ্বিতীয় পর্বে মুদ্রণপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হবার পর বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদিতে বাংলা বানানে কী পরিবর্তন বা অবস্থান্তর ঘটেছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের নামকরণ করা হয়েছে **'মুদ্রণ যুগ'**।

প্রথম পর্ব ঃ পুথির যুগ

বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য পুথির যুগকে (অর্থাৎ ১০০১ বঙ্গাব্দ—১৩০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে) তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

১। প্রথম পর্যায়	➛	১০০১ বঙ্গাব্দ—১১০০ বঙ্গাব্দ।
২। দ্বিতীয় পর্যায়	➛	১১০১ বঙ্গাব্দ—১২০০ বঙ্গাব্দ।
৩। তৃতীয় পর্যায়	➛	১২০১ বঙ্গাব্দ—১৩০০ বঙ্গাব্দ।

১. প্রথম পর্যায় ঃ ১০০১—১১০০ বঙ্গাব্দ (১৫৯৪—১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

এই পর্যায়ে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত পুথিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১। 'গুরুদক্ষিণা', কবিভূষণ। *লিপিকর*—শ্রী সন্তোষ দাস। *অঞ্চল*—বাঁকুড়া। *সন*—১০০২ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—১২৯৫।

২। 'মহাভারত' (অশ্বমেধ পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকব*—সিদাম দাস পাল। *অঞ্চল*—সাকিম হাবিবপুস্কর্ণির হাটতলাই। *সন*—১০০৩ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৯৫।

৩। 'তত্ত্ববিলাস', বৃন্দাবন দাস। *লিপিকর*—শ্রী শিতলচরণ দাস। *অঞ্চল*— অনুল্লিখিত। *সন*—১০০৭ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৩২৫।

৪। 'মহাভারত' (আদিপর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—শ্রী গোবর্দ্ধন বিস্বাষ। *অঞ্চল*—বিষ্ণুপুর। *সন*—১০২৩ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—১০০৭২।

৫। 'মহাভারত' (বিরাট পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—পঞ্চানন দাস। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত। *সন*—১০৪৮ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৬৪২।

৬। 'মহাভারত' (ভীষ্ম পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—রঘুনাথ সাএর। *অঞ্চল*—পামারপাড়া। *সন*—১০৫৭ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৭৮।

৭। *'স্মরণদর্পণ' রামচন্দ্র দাস*। *লিপিকর—হরেকৃষ্ণ দাস বৈরাগী*। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত। *সন*—১০৭১ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৩৫।

৮। 'ধর্মমঙ্গল', গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। *লিপিকর*—শ্রী নারায়ণ দাস বৈষ্ণব। *অঞ্চল*—পরমানন্দপুর। *সন*—১০৭১ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৩৫।

৯। বৈষ্ণবামৃত, নরোত্তম দাস। *লিপিকর*—শ্রীকন্দর্প মল্ল। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত (তবে পুথির মালিকের নিবাস যখন গড়ভিলা মাধবপুর দেওয়া আছে তখন লিপিকর নিজ অঞ্চলের উল্লেখ না করলেও পুথি ঐ অঞ্চলের বলেই মনে হয়)। *সন*—১০৭৩ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫০৮।

১০। স্বরূপবর্ণন, কৃষ্ণ দাস। *লিপিকর*—অজ্ঞাত। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত। *সন*—১০৭৪ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—১৪৬৫।

১১। মহাভারত (শল্য পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—দর্পনারায়ণ দাস দে। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত। *সন*—১০৭৬ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৮৭।

১২। রাধারসকারিকা, নরোত্তম দাস। *লিপিকর*—রাধাকৃষ্ণ দাস। *অঞ্চল*—সাকিম কাশীনাথ গঞ্জ। *সন*—১০৭৭ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫১৫।

১৩। মহাভারত (কর্ণ পর্ব) কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—জগন্নাথ মজুমদার। *অঞ্চল*—অনুল্লিখিত। *সন*—১০৮০ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৮৬।

১৪। মনসামঙ্গল, লিপিকর ও অঞ্চল—অজ্ঞাত। *লিপিকাল*—১০৮১ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*- ৩১০০।

১৫। 'চৈতন্যভাগবত' (আদিখণ্ড), বৃন্দাবন দাস। *লিপিকর*—গুরুপ্রসাদ দাষ মিত্র। *অঞ্চল*—বিষ্ণুপুর। *সন*—১০৮৩ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—২০৫।

১৬। দাতাকর্ণ, দ্বিজ কবিচন্দ্র। *লিপিকর*—শ্রী গৌরচরণ দাস দত্ত। *অঞ্চল*—সাং জামশনা। *সন*—১০৮৪ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৩৮৫।

১৭। মহাভারত (সভাপর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—গুরুপ্রসাদ চৌধুরি। *অঞ্চল*—সাকিম নাড়িচা, পরগণে সিংহহজারি। *সন*—১০৮৪ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৭১।

১৮। মহাভারত (বিরাট পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—গোবিন্দরাম দাস বোষু। *অঞ্চল*—সাং ময়নাপুর গ্রাম। *সন*—১০৮৬ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৭৪।

১৯। অঙ্গদ রায়বার, দ্বিজ কবিচন্দ্র। *লিপিকর*—শ্রীলুইধর। *অঞ্চল*—শাঃ বাল্যাতোড়ী। *সন*—১০৮৮ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৩৮১।

২০। কপোত-কপোতীর পালা দ্বিজ কবিচন্দ্র। *লিপিকর*—শ্রী গোলকনাথ সেন। *অঞ্চল*—সাকিম লালবাজার। *সন*—১০৮৯ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৩৮০।

২১। অঙ্গদ রায়বার, দ্বিজ কবিচন্দ্র। *লিপিকর*—শ্রী কমলাকান্ত দে সর্ম্মা। *অঞ্চল*—সাং পলাশডাঙ্গা (এই পুথিতে লিপিকর ও পাঠককে একই ব্যক্তি বলে মনে হওয়ায় পাঠকের নাম ও নিবাসকেই লিপিকরের নাম ও নিবাস বলে ধরা হল।) *সন*—১১০০ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৩৮৮।

২২। মহাভারত (কর্ণ পর্ব), কাশীরাম দাস। *লিপিকর*—নিমানন্দ দাস বেজ। *অঞ্চল*—সাং বাঁকাদহ। *সন*—১১০০ বঙ্গাব্দ। *পুথি সংখ্যা*—৫৮৫।

১০০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১১০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার অন্তর্গত নির্দেশিত পুথিগুলি বিশ্লেষণ করে বানানসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলাগুলি নিম্নলিখিত ধারায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

(১.১) শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণের স্থানে ঐ স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্নযুক্ত য়-বর্ণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(১.১.১) ৫৯৫ সংখ্যক মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) পুথি ঃ য়শ্বমেধ, য়াসির্ব্বাদ, য়াজ্ঞা, য়ষ্টাদস, য়ন্তরিক্ষ, য়র্জ্জুন, য়ভিমুণ্য, য়বসেশ, য়ৌরস, য়ন্ধকার, য়রনি, য়াত্বা, য়নন্ত, য়ন্তর্জামি, য়াচম্বিত।

(১.১.২) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে দু-একস্থলে মাত্র য় বর্ণের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ য়েক, য়েকেশ্বর।

(১.১.৩) ২৪৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ য়ন্য।

(১.১.৪) ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে শব্দের আদিতে য়-এর প্রয়োগ পাই। যেমন ঃ য়োধিকার।

(১.১.৫) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে য়-এর প্রয়োগ পাচ্ছি। যেমন ঃ য়াছে।

(১.১.৬) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ য়ভিসেক, য়ামি, য়ানিঞা, য়ামী, য়ালিঙ্গন, য়ানন্দ, য়ধিষ্ঠান, য়বতার, য়াসি, য়ামার, য়বসেস, য়ঙ্গিকার, য়ভিমান, য়স্ত্র, য়াসির্ব্বাদ, য়ন্ধকার ইত্যাদি।

(১.১.৭) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে য়-বর্ণের প্রয়োগ দু-এক স্থলে পাই। যেমন ঃ য়সময়।

(১.১.৮) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে য়-বর্ণের ব্যবহার বহু দেখা যায়। যেমন ঃ য়ধিক, য়স্ত্র, য়াপনার, য়ানন্দীত, য়স্ব, য়নেক, য়নুরক্ত, য়ধিকার, য়ন্যায়, য়নাআসে, য়নল, য়তিত, য়দ্ভুত, য়ধিকারি, য়ামার, য়াসিবেক, য়াচরণ ইত্যাদি।

(১.১.৯) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ য়াদি, য়ামি, য়নচুর, য়নুগ্রহ, য়বধী, য়ন্যজন, য়েকেশ্বর, য়মর, য়পূর্ব্ব, য়স্ম ইত্যাদি।

(১.১.১০) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতেও একই প্রবণতা দেখি। যেমন ঃ যবধান, য়াপনার, য়াদেশে, য়ন্তর, য়স্থির, য়াকুল, য়াসিয়া, য়মৃত ইত্যাদি।

(১.১.১১) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে লিপিকর বহুক্ষেত্রেই শব্দের আদিতে য়-বর্ণ ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ য়াশিবেক, য়ঙ্গদ, য়াজ্ঞা, য়নন্ত, য়াচরণ, য়াকাসে, য়ার, য়রুণ, য়ন্তর, য়ন্য, য়ামার, য়াইল, য়তএব, য়গ্নি, য়ামি, য়বতার, য়ামাদের ইত্যাদি।

তবে এই সময়েরই কয়েকটি পুথিতে লক্ষ করা যাচ্ছে, শব্দের আদিতে সর্বত্রই স্বরবর্ণেরই প্রয়োগ হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্ন যুক্ত য় বর্ণের প্রয়োগ হচ্ছে না। এই রকম কয়েকটি পুথি সংখ্যা হল—১২৯৫, ৩২৫, ১০৭২, ৫৭৮, ৫৩৫, ৫৮৭, ৫১৫, ৩১০০, ৩৮৫, ৩৮১, ৫৮৫ ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, এই সময়ে বিভিন্ন লিপিকরের লিপি করা অধিকাংশ পুথিতেই (শব্দের আদিতে) স্বরবর্ণের স্থানে সেই স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্নযুক্ত 'য়'-বর্ণের ব্যবহার হচ্ছে। তবে স্বরবর্ণের স্থানে য় বর্ণের প্রয়োগ একেবারেই নেই, এরকম পুথিও রয়েছে—যদিও তা পূর্বের অনুপাতে কম। আবার কিছু ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের ও য়-বর্ণের প্রয়োগ একই পুথিতে পাশাপাশি দৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এ থেকে অনুমান কবা যেতে পারে, সেই সময় শব্দের আদিতে স্বরবর্ণ বা য়-বর্ণের প্রয়োগ

সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ছিল না। লিপিকরগণ যথেচ্ছভাবে স্বরবর্ণের স্থানে য়-বর্ণের ব্যবহার করেছেন।

(১.২) শব্দের মধ্যে বা অন্তে য়-বর্ণের স্থানে সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(১.২.১) অধ্যঅন, সমএ, মাএর, হএ, দিএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)'

(১.২.২) মহাসঅ, ভঅ, ভঅঙ্কর, নারাঅন, রিদঅ, নির্ত্তঅ,ধনঞ্জঅ, হৃদএ, বাউ, সংসঅ, জাঅ, কৃপাঅ, বিজঅ, জন্মেজঅ, জঅ, দআ, হঅ, নির্দ্দঅ, মাআ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)।

(১.২.৩) হএ, জানএ, করএ, পাএ, সমএ, অনাআসে, হিআয়, পিআসি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)।

(১.২.৪) অনাআসে, মউর, হৃদএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)।

(১ ২.৫) হইআ, মাউর, বাউ, সমএ, নারাঅন, রিদএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৮)।

(১.২.৬) মউর, জএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)।

(১.২.৭) ১০৭১ বঙ্গাব্দের ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা কয়েকটি স্থানে রয়েছে। যেমন ঃ বাউ, অনাআসে, মউর, কেউর, খাওাইবে ইত্যাদি।

(১.২.৮) ১০৭৩ বঙ্গাব্দে ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে দু-এক স্থলে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমনঃ ঃ গরিআন, হএ ইত্যাদি।

(১.২.৯) ঘচুঅে, হিআ, হঅ, পাঅ, পিঅে, রুঅ, বিসঅের, নিশ্চঅ, খাঅ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫১৫)।

(১.২ ১০) ১০৮০ বঙ্গাব্দের ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই আছএ, বরিসএ, চিন্তএ, কম্পএ ইত্যাদি।

(১.২.১১) ১০৮১ বঙ্গাব্দে ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে এ প্রবণতা সংখ্যায় কম। যেমন ঃ গোআলে, ছাওাল।

(১.২.১২) ১০৮৩ বঙ্গাব্দে ২০৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বাউ, হএন, পাঅ, নদিআয়, ভএ, অনাআষে, দিগ্বিজই, অধ্যঅন। তবে ব্যতিক্রমও বহু রয়েছে। যেমন ঃ মহাসয়, পড়ুয়া ইত্যাদি।

(১.২.১৩) জিতেন্দ্রিঅ, বাউ, মোউর, প্রিওজন, ঘুনিআছি, আউ, হএ, জমালএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭১)।

(১.২ ১৪) নিশ্চএ, বাউ, হএ, নাহএ, দেখিআছ, নিঅম, প্রওজন, পাএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৪)।

(১.২.১৫) ভঅ, প্রিএ, চাঅ, পৃঅ, নারাঅন, পাঅ, পরাঅন, প্রাঅ, উদঅ, ক্ষুদাঅ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮০)।

(১.২.১৬) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ দিআছে য়াজ্ঞাঅ, গাঅ ইত্যাদি।

(১.২.১৭) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৫৮৫ সংখাক পুথিতে মাত্র দু-এক স্থলে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ বাউ।

তবে এমন পুথিও রয়েছে যেখানে য়-বর্ণের পরিবর্তে সেই স্থানে য়-বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার হচ্ছে না। এমন কয়েকটি পুথি সংখ্যা হল ঃ ৬৪২ (১০৪৮ বঙ্গাব্দ), ১৪৬৫ (১০৭৪ বঙ্গাব্দ), ৫৮৭ (১০৭৬ বঙ্গাব্দ), ৩৮৫ (১০৮৪ বঙ্গাব্দ), ৩৮১ (১০৮৮ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করা হলে লিপিকরদের মধ্যে শব্দে য়-এর স্থানে সেই ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণ প্রয়োগের প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। তবে উদাহরণগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আর একটি বিষয়ও লক্ষ করা যায় যে, শব্দান্তে য় বর্ণের স্থলে বিভিন্ন লিপিকর পৃথক পৃথক স্বরবর্ণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে 'মহাসঅ, 'ভঅ', 'হঅ', 'রদঅ' ইত্যাদি বানান পাচ্ছি। আবার, ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে 'হএ', 'সমএ', 'পাএ' ইত্যাদি বানান পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ শব্দান্তে য়-বর্ণের স্থানে সেই য়-ধ্বনি বোঝাতে কোথাও অ, কোনো ক্ষেত্রে 'এ' লেখা হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, শব্দান্তে জায়মান য়-ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণীকরণ সম্পর্কে লিপিকরদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ (model) ছিল না। তার ফলেই এই বিশৃঙ্খলা।

(১.৩) পুথির বানানে ই-ঈ বা তাদের কারচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম প্রাধান্য পায় নি। সর্বত্রই লিপিকরণের স্বেচ্ছাচারিতাই স্পষ্ট ধরা পড়ে।

(১.৩.১) সিমা, জিবন, পাপি, পৃথিবি, চক্রবর্ত্তি, রজনি, আমী ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১.৩.২) বিস্টি/বিষ্টী, সমর্প্পিয়া/সমর্প্পীআ, বিক্ষ/বীক্ষ, য়ানন্দিত/আনন্দীত, প্রিথিবি, য়ধিকারি, ভাগিরথি, তির্থ, প্রভাবতি, প্রিতি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.৩.৩) পূর্ন্নীত/পুর্ন্নিত, জিব/জীব. পীরিতি/পিরিতি, শরীর/সরির, ভীতরে/ভিতরে, ভাশিল/ভাষীল, সমর্প্পীয়া/সমর্পিয়া, ইসত/ঈসত, ইশ্বর/ঈশ্বর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)

(১.৩.৪) পুনরূপি/পুনরূপী, আনন্দীত/আনন্দিত, শৃষ্টী/শৃষ্টি, লক্ষ্মি /লক্ষ্মী, সন্যাসি/সন্যাসী, পিপিলিকা, ভাগীরথি, জননি, বৈরি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)।

(১.৩.৫) নিমেষ/নীমেষ, জিব/জীব, বৃষ্টী/বিস্টি, জুধিষ্ঠীর/যুধিষ্ঠির, রিতী, অতী, জননি, কীসের, পারি, অগ্রী, লক্ষ্মি, আসীস, গৃহিনি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.৩.৬) ১০৫৭ বঙ্গাব্দের ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে ই-কারের প্রাধান্য রয়েছে। তবে ঈ-কারেরও প্রয়োগও রয়েছে। যেমন ঃ পরিক্ষিত, পৃথিবি, পঞ্চমি, দিপ্ত, সিগ্র, বংসি, সরির, বিপরিত, তিতিয়, বিজ্ঞ, পাঞ্চালি, ভিস্ম, শ্রীকিষ্ণ/সিকিষ্ণ, শ্রীখন্ডি/সিখন্ডি, দিনবন্ধু ইত্যাদি।

(১.৩.৭) লাগীয়া, প্রথিবী, লক্ষ্মি, কান্ডারি, অসিম, সুসিতল ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)।

(১.৩.৮) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে লিপিকর ই-কারের ব্যবহারই বেশী করেছেন। যেমন ঃ জোগিনি, পার্ব্বতি, দ্বিপ, দিপ্ত, চন্ডি, জুবতি, গুনি, স্ববির, পৃথিবি, সসি, সাসুড়ি, বিপরিত, রূপসি, প্রদিপ, উপবিত ইত্যাদি।

(১.৩.৯) ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে ই-কারের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ বিস্বাস, বিসেস, সুর্দ্ধি, য়োধিকার ইত্যাদি।

(১.৩.১০) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে ই-কার, ঈ-কারের যথেচ্ছ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ লক্ষ্মি, গৃহিনি, স্বরস্বতি, জিবন, ঠাকুরানি, রুক্ষিনি, সসি, পন্ডীত, আমী, আছী, আসীয়া, জন্মীলা, কাসিস্বর, জগদিস, সৌরসেনি ইত্যাদি।

(১.৩.১১) ১০৭৬ বঙ্গাব্দের ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে ই-কার, ঈ-কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসৃত হয়নি। যেমন ঃ যুধিষ্ঠির/জুধিষ্ঠীর, উলসিত/উলসীত, কাটিল/কাটীল, চিন্তীত, পৃথিবি, ঘাটী, দক্ষীণ, বৃষ্টী, অগ্রী, আজী ইত্যাদি।

(১.৩.১২) ৫১৫ সংখ্যক পুথিতে ই-কারের প্রাধান্য বেশী হলেও একই বানানে ই-কার, ঈ-কারও রয়েছে। যেমন ঃ গোস্বামি, গোপি, ঐশি, কিসোর, গম্ভির, নবিন, পিরিতি, লক্ষ্মি, নন্দিনি, মহিসি/মোহিসী ইত্যাদি।

(১.৩.১৩) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে একই অসংগতি ধরা পড়ে। যেমন ঃ আমি/য়ামী, সরির/সরীর, প্রবেসিল/প্রবেশীল, লাগীল, কীঙ্কীনি, বিভিসন, কুপীল, গীয়া, আসীয়া, হাসিয়া ইত্যাদি।

(১.৩.১৪) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে ই-কারের প্রাধান্য বেশী। তবে কোথাও কোথাও ঈ-কারের প্রয়োগও রয়েছে। যেমন ঃ শিতা, শশি, দোশি, পঞ্চমি, জননি, জিবন, গিত, বিধুমুখি, যুন্দরি, বিপরিত, পন্ডীত, শৃষ্টী ইত্যাদি।

(১.৩.১৫) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে ই-কার, ঈ-কার প্রয়োগে বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে। যেমন ঃ কির্ত্তণ/কীর্ত্তণ, সচী/সচি, ক্রিড়া/ক্রীড়া, লক্ষ্মি/লক্ষ্মী, হরসিত/হরসীত, তীর্থ/তির্থ, প্রিথিবি/প্রিথিবী, দিষ্টী/দৃষ্টি, শ্রীবাস/স্রিবাষ ইত্যাদি।

(১.৩.১৬) গোসাঞী, পিড়িত, লক্ষি, বানি, গম্ভির, ধির ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৫)

(১.৩.১৭) যুধিষ্ঠির/যুধীষ্ঠির, সক্তি/সক্তী, বিস্টি/বিস্টী, প্রিথিবি/প্রীথিবি, ত্রিতীয়, আমী/আমি, দাসি/দাশী, স্বরির/ রীর, হাশীয়া/হাসিয়া, সিক্ষা/সীখ্যা, জোগি ইত্যাদি।

(১.৩.১৮) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে ই-কার, ঈ-কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম অনুসৃত হয়নি। যেমন ঃ প্রিথিবি, পাপি, জননি, গাভি, নারি, সিঘ্র, দ্রোপদি, চক্রবর্ত্তি, উপনিত, সিতা, পরিক্ষা, পত্নি, জননি, গান্ধারি, ভিস্ম, সাদ্রিসী/সাদৃসি, জুধিষ্ঠির/জুধিষ্ঠীর ইত্যাদি।

(১.৩.১৯) ৩৮১ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ নাঞি, বির, ধাঞী, শুনীব, বিভিষন, জিবন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮১)

(১.৩.২০) প্রীঅ, প্রিআ, তির্থ, গৃহিনি, অতিত, সিঘ্রগতি, সিঘা ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮০)

(১.৩.২১) সুগ্রীব/সুগ্রিব, য়ামি/য়ামী, নাঞি/নাঞী, ত্রিতিয়, বসীল, সিতা, পাপি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৮)

(১.৩.২২) চিন্তিয়া/চিন্তীয়া, বৃষ্টি/বৃষ্টী, নারায়ণী/নারায়নি, জিনিঞা/জিনীঞা, জিনীতে, সিসীর, পৃথিবি, চন্ডি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৫)।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, সেযুগে লিপিকরণগণ ই, ঈ বা ই-কার, ঈ-কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরকম বাঁধাধরা বিধি অনুসরণ করতেন না। তাছাড়া, একজন লিপিকর যখন পুথিতে একটি বানান পাশাপাশি দুরকম কার-চিহ্ন দ্বারাই

লিখেছেন, তখন বোঝা যায়, বানানে একরূপতা রক্ষার দিকেও তাঁরা সতর্ক ছিলেন না। ফলে লিপিকরগণের যথেচ্ছাচার পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

(১.৪) উ, ঊ বা উ-কার, ঊ-কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরকম নিয়ম অনুসৃত না হওয়ায় পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

(১.৪.১) ঊচিত, ঊত্তরিলা, উগ্রষেন, ঊঠিয়া, উর্দ্ধার, ঊত্তর, গুরূ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১.৪.২) ভূবন, পুরূস, মধুষুদন, পুর্ন্য, মুহুর্ত্ত, য়দ্ভুত উপর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.৪.৩) গুরূ, সদ্‌গুরূ, পুজা/পূজা, পুর্ন্নিত/পূর্ন্নীত, রূপ/রুপ, পুরুষ/পুরূষ, করূনা ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)

(১.৪.৪) ঊপদেশ, ঊর্দ্ধার, ঊপর, ঊপাড়িতে, ঊদয়, ঊত্তরিল, ঊৎপত্তি, উৎপাত, উর্দ্ধর্ত্ত, ঊচিত, মুর্খ, গুরু, করূণ, পুরূষ, অদ্ভুত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)

(১.৪.৫) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতেও এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ পুনরুপি/পূনরূপি, গুরূ/গূরূ, সূনিয়া/সুনিয়া, মুর্ত্তি/মুর্ত্তি, ষুর্য্য/সূর্য্য, পুরূশ/পূরূষ, অশূর/বৃর্ত্তাষুর, পোশূ, রূধীর, মরূত, পূরিল, বুঝিয়া, দারূন, অরূন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.৪.৬) পুরূষ, নিদারূন, কুরূ, মধুষুদন, অদ্ভুত, মুর্ছিত, অরূন, পুরূসার্থ, রূখিলা, ভূমি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৫৭)

(১.৪.৭) গুরু, অমুল্য, মুর্খ্য, জুগল, রূপ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)

(১.৪.৮) পুর্ব্ব, পূর্ব্বাপর, মূর্ত্তি/মুর্ত্তি, সূন্দর/সুন্দর, হনুমান/হনূমান, সুনিলে/সূনিএ্যা, পূত্র, পূষ্প, সূস্ক, ত্রিসূল, মূগু, অনূতাপ, সূধি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৩৫)

(১.৪.৯) রূক্মিনি, গোরূঢ়, পূর্ব্ব, অপুর্ব্ব ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১৪৬৫)

(১.৪.১০) উৎপত্তি/ঊৎপত্তি, মূর্ত্তি/মুর্ত্তি, উর্ত্তর/ঊত্তর, ঊলসীত/ঊল্বসীত, ঊল্মুক, ঊপর, ঊঠে, ঊচিত, সুর্য্য, পূত্র, পুরুষ, অষুর, সুরাসুর, বুধির ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৭)

(১.৪.১১) পুরন, করূনা, স্ফুর্ত্তি, গুরূ। (পুথি সংখ্যা ৫১৫)

(১.৪.১২) ঊঠএ, ঊপর, উপায়, ঊর্দ্ধ, ঊর্ব্বসি, উদ্যান, ঊপহাস, ঊড়াইয়া, উল্মুক, ঊল্কাপাত, ঊঠেন, বাঊ, উর্দ্ধারিল, পুর্ন, চুর্ন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৬)

(১.৪.১৩) ঊর্ত্তর, ঊশা, ঊৎসব, ঊঠাইয়া, ঊঠ্যাহিল, ঊপায়, উপজিল, ভুবন, পুরূষ, ষুমেরূ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩১০০)

(১.৪.১৪) ঊর্ত্তম, উদার, বাউ, উর্দ্ধার, উর্থান, গুরূ, উরূ, করূনা, ধূসর, ইস্বরপুরি, প্রভূ, মুরারি, মুর্ত্তিমতি, ভূষিত/ভুসিত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২০৫)

(১.৪.১৫) ঊর্জ্জব, ঊত্তর, উদয়, ঊপার্জ্যন, ঊর্দ্ধারিল, ঊপাচার, ঊচিত, ঊদক, ঊর্ত্তম, উল্যাস, উপহাস, অদ্ভুত, পূত্র, পুরি, পূস্ক, ষুর্য্য, পূন্যবান, রূদ্র, অপূর্ব্ব/অপুর্ব্ব ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭১)

(১.৪.১৬) পূত্র/পুত্র, উদর/ঊদর, পুজিত, ভূবন, অরূন, শূল, তরূ, ঊদয়। (পুথি সংখ্যা ৩৮৫)

(১.৪.১৭) মুৰ্চ্ছিত, পুৰ্ন্য, পূৰ্ব্ব, সুৰ্জ্জ্য, উৰ্ত্তর, অপূৰ্ব্ব তবু, কবুক, পূৰ্ন্ন, উঠিয়া ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৪)

(১.৪.১৮) উদয়, উঠ্যা, উত্তরিল, উপাড়িল, সকরূন অরূন, চুর্ন্ন, দারুন, শুমেরু ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮১)

(১.৪.১৯) পুরূস, পুজএ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮০)

(১.৪.২০) সুপ্পনখা, চুর্ন্ন, বধু, কবুক, মবূক, গুরু, দুই ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৮)

(১.৪.২১) ক্রুদ্ধ, কূদ্ধ, উপদেশ, উৰ্ত্তম, উত্তর, উলুক, পূর্ণিমা, মুহূৰ্ত্ত, পরিপুন্ন, কুরু, গুরু, পুরূস, বরূন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৫)

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, সেই সময় লিপিকরগণ উ, ঊ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা নিয়ম অনুসরণ করতেন না। তাছাড়া একই বানানে যখন পাশাপাশি উ, ঊ-উভয় বর্ণ বা কার চিহ্নের প্রয়োগ হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায় বানানে একরূপতা রক্ষার দিকেও লিপিকরগণ সচেতন ছিলেন না। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ের পুথির বানানগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, শব্দের আদিতে উ-ধ্বনি বোঝাতে লিপিকররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঊ-বর্ণটি ব্যবহার করেছেন। শব্দের আদিতে উ-বর্ণের ব্যবহার যে নেই তা নয়, তবে তা ঊ-বর্ণের অনুপাতে সংখ্যায় অনেক কম। সুতরাং শব্দের আদিতে উ-ধ্বনি বোঝাতে ঊ-বর্ণের ব্যবহারকে লিপিকরগণের সাধারণ প্রবণতা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(১.৫) পুথিতে (ঋ) রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই বিশৃঙ্খলা কোথাও প্রথাসিদ্ধ ঋ-কারের ব্যবহারে, কোথাও বা তার বিকল্প সন্ধানে। যেমন ঃ

(১.৫.১) পৃথিবি, হৃদয়, ক্রপাময় ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১.৫.২) প্রিথিবি/পৃথিবি, ক্রপা/ক্রিপা, পিতৃ/পিৃত্রিমাতৃ, প্রিভিতি, ব্রকদর/বৃকদর, ত্রিভুবন/তৃভুবন/ধ্রিতরাষ্ট/ধৃতরাষ্ট্র, প্রিতিজ্ঞা ভাতৃ, পুত্র্র, বিচিত্র, পত্র, রাত্র, পাত্র ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.৫.৩) ব্রেথা, সুদ্র, প্রতিব্রতা, প্রকাশ, ব্রাহ্মা ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)

(১.৫.৪) ক্রপা কৃপা/ক্রিপা, বৃক্ষ/বিক্ষ, পৃথিবি/প্রিথিবি, প্রভিতি, পৃও, অপৃয়, ক্রিতাঞ্জলি, ত্রিষ, বৃত্যান্ত, হৃদয়ে, গৃহিনি, পিতৃ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)

(১.৫.৫) পৃথিবি, পৃয়তর, পৃতিকার, পৃতিজ্ঞা/প্রিতিগ্যা, পৃয়, পৃতি, বৃষ্টী, সৃগাল, পৃয়োজন, নৃভিতে, ভাতৃ, ভাত্রি, হৃষ্টমন, গৃহিনি, তৃভুবন, ত্রিতিয়, ত্রিয়োদস, পীতৃ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.৫.৬) প্রথিবী, হৃদয়, ত্রৈলোক্য, প্রকাস ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)

(১.৫.৭) শৃগাল/শ্রীগাল, ক্রিপা/কৃপা, গৃহস্থ, পৃয়, পৃথিবি, দৃষ্টী, ত্রিসিত, ভ্রাতৃবধু, ত্রিসুল, নিভৃত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৩৫)

(১.৫.৮) বৃর্দ্ধি, সহস্র। (পুথি সংখ্যা ৫০৮)

(১.৫.৯) বিষ্ণুপৃয়া, পৃয়া, বৃহস্পতি, চক্রবর্ত্তি, কোবিচন্দ্র, সাস্ত্র, প্রাণ, শ্রীদাম ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১৪৬৫)

(১.৫.১০) প্রথিবী/পৃথিবী, মাদৃ, মাদ্রি, ধ্রষ্টদ্যুম্ন/ধ্রষ্টদ্রম্ন, ব্রকোদর, ধ্রতরাষ্ট্র, ক্রপ, ত্রিষ, হৃদয়, বৃতান্ত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৭)

(১.৫.১১) সাস্ত্র, প্রমাণ, প্রবর্ত্ত, প্রিতি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫১৫)

(১.৫.১২) শ্রীজিলে, শৃজেন, ব্রকোদর, ধ্রষ্টদুম্ন, কৃপ, ক্রতব্রর্ক্ষা, তাদৃসি, গৃষ্য, প্রীত্রি, প্রসংসা, প্রভিতি, ত্রিস, শৃষ্টী ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৬)

(১.৫.১৩) ক্রৃপা/কৃপা, প্রথিবি, হৃদয় ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩১০০)

(১.৫.১৪) গ্রিহযগৃহস্ত, প্রকিতি, পৃথিবিযপ্রিথিবি, হৃদয়, প্রিতি, শ্রীবাস, দৃষ্টিপাত, ক্রিড়া, বৃিক্ষ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২০৫)

(১.৫.১৫) বৃৰ্দ্ধ, ব্রাক্ষা, ব্রৰ্ক্ষো, পুত্র ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৫)

(১.৫.১৬) প্রিয়/পৃয়, পৃতৃ/প্রিত্রি/পিৃতৃি, প্রিথিবি/পৃথিবি, তৃয়োদসি/ত্রিয়দস, হ্রিদয়, বৃিক্ষ, বৃর্দ্ধ, দ্রব্য, হ্রিষ্ট, ধ্রতরাষ্ট, শহস্র ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫১৭)

(১.৫.১৭) ভাতৃ/ভাত্রি/ভ্রাতৃ, সাদ্রিসী/সাদৃসি, ক্রিপ/কৃপ, প্রিথিবী, বৃক্ষ, বৃদ্ধ, ত্রিষ্ণা, নৃভিতে, য়নুগ্রহ, সিঘ্র, প্রিত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৪)

(১.৫.১৮) পৃয়/প্রীঅ/প্রিঅ, ক্রিতাঞ্জলি। (পুথি সংখ্যা ৩৮০)

(১.৫.১৯) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে দু-এক স্থলে এই অসংগতি দেখা যায়। যেমন ঃ ত্রিতিয়।

(১.৫.২০) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে দু-একটি ক্ষেত্রে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ ধ্রষ্টদুম্ন, মাদৃ ইত্যাদি।

এই বিশৃঙ্খলা প্রায় নেই বললেই চলে এমন দু-একটি পুথিও রয়েছে। যেমন ঃ ৫৭৮ সংখ্যক পুথি, ৩৮১ সংখ্যক পুথি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া এই শতাব্দীর প্রায় সকল পুথিতেই (ঋ) রি-ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলার কারণ হল, পুথির বানানে এই (ঋ) রি-ধ্বনি বিভিন্নভাবে বোঝানো হচ্ছে। (১) কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঋ'-কার দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ দৃষ্টী, বৃষ্টি, পৃথিবী ইত্যাদি। (২) কোথাও ই বা ঈ-কার যুক্ত র-ফলা দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ পৃথিবী বানানটি পুথিতে লেখা হচ্ছে প্রিথিবী (পুথি সংখ্যা ২০৫)। (৩) আবাব কোথাও 'রি' ধ্বনি অ-কার যুক্ত র-ফলা দিয়েও লেখা হচ্ছে। যেমনঃ ধৃষ্টদুম্ন (পুথি সংখ্যা ৫৮৫), ব্রকোদর (পুথি সংখ্যা ৫৮৬)। যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী অ-কার যুক্ত র-ফলার প্রয়োগ হচ্ছে সেক্ষেত্রে সাধারণত কোনো বিকৃতি হচ্ছে না। যেমন ঃ প্রভিতি, প্রত্যয় (পুথি সংখ্যা ১০৭২)। (৪) কিন্তু এরকম ক্ষেত্রেও

কোথাও কোথাও অসংগতি দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ অ-কার যুক্ত র-ফলাও ঋ-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে। যেমন ঃ প্রতিজ্ঞা বানানটি ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই প্রিতিগ্যা পৃতিজ্ঞা। সম্ভবত এক্ষেত্রেও অ-কার যুক্ত র-ফলাটি লিপিকরের বিকৃত উচ্চারণে রি-ধ্বনিতে পরিণত হয়ে তাঁকে ঋ-কার ব্যবহারে অনুপ্রেরিত করেছে। (৫) ই-যুক্ত র-ফলাও কোথাও কোথাও ঋ-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে। যেমন) প্রীতি বানানটি লেখা হচ্ছে পৃতি।

সুতরাং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই (ঋ) রি-ধ্বনি বোঝাতেই বিভিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বল্পশিক্ষিত লিপিকরগণের কার-চিহ্নের যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে নিদিষ্ট জ্ঞানের অভাব এবং বানানোর একরূপতা রক্ষা সম্পর্কে দায়হীনতা মূলত এই অসংগতি সৃষ্টির কারণ বলে মনে হয়।

(১.৬) এই শতাব্দীর পুথিতে য-বর্ণ বোঝাতে লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গীয় জ ব্যবহার করেছেন

(১.৬.১) জসোদা, জসোমতি, জেদিন, জমুনা, জত. জতেক, জখন, জোগ, জে, জাহারে, জেমত, জাই, জেবা, জাইব ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১ ৬ ২) জয়, জোবন. পর্জ্জেটন, দৈবজোগে, জুর্দ্ধ, জুক্তি, জজ্ঞ, অপজশ, জাই, জদি, জোড়, জত, জোদ্ধা, জন্ত্রনা, জার, জুধিষ্ঠীব, জাইব, জমালয় ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.৬ ৩) জাব জাহাব, জত, জায়, জেসব, জন্তু, জুগ, জাত্রা, জয়া, জস, জাইতে. জন্ত্র, জেজন, জাতে, জোগ, জম জেল ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)

(১ ৬ ৪) জাহাব, জাব, জে, জেই, জতেক. জত, জম, জেন, জদি, জত্ন, জাই, জায়, জোজন, জুন. জুগল, জেইরূপ, জুধিষ্ঠীর, জোবন, জন্ত্র জম ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ১০৭২)

(১ ৬.৫) জাহার, জার, জাবে. জে, জেই, জত, জথা, জুধিষ্ঠীর. জুড়ি, জেমতি, জেন. জথচিত, জুদ্ধ, জোগেশ্বর, জাইতে, জোড়. জতন, জম, জথাস্থানে ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.৬.৬) জত, জস, জম. জেন, জথা, জেই, জায়. জাহা. জাবে, জাহার, জোগায়, জখন, আশ্চজ্জ, বিজ্জবন্ত, জুধিষ্ঠীর, ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৮)

(১.৬ ৭) জে, জত. জএ, জদি. জায়, জেন, জুগ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)

(১.৬.৮) জে, জত, জদি, জায়, জেন, জার, জোগ, জুদ্ধ, জাই, জোদ্ধা, জোগ্য, জুবক, জুবতি, জথার্থ, জেজন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৩৫)

(১.৬.৯) জাহার, জার, জম, জস ইত্যাদ। (পুথি সংখ্যা ৫০৮)

(১.৬ ১০) জে, জেই, জস, জত, জায় জার, জাহার ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ১৪৬৫)

(১.৬.১১) জার. জেন, জদি. জত, জায়, জস, জম, জোদ্ধা, জুদ্ধ, জতেক, জেমত, জুধিষ্ঠীর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৭)

(১.৬.১২) জার, জাই, জেই, জদি, কার্জ্য, অকার্জ্য, জাহার ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ৫১৫)

(১.৬.১৩) জুদ্ধ, সুজ্য, জথা, জস, জম, জেন, জেই, জর্গ্য, জোর্দ্ধা, জোড়, জার, জাতে, জোগ, জৌবন, জায়, জদি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৬)

(১.৬.১৪) জার, জেবা, জেন, জুক্তি, জারে, জত, জোগি, জোগ, জৌবন, ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ১১০০)

(১.৬.১৫) ১০৮৩ বঙ্গাব্দে ২০৫ সংখ্যক পুথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্গীয় জ-এর ব্যবহার হয়েছে। যেমন ঃ

জে, জেই, জেন, জার, জত, জস, জম, জদি, জোগি, জ্বগ, জায়, জতু, জাই, জাহা, জুক্তি জেখানে, জদ্যপি, জৌতুক, জসোদা, জেমন, জোগেশ্বর ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ২০৫)

(১.৬.১৬) জে, জায়, জার, জস, জাই, জত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৫৮)

(১.৬.১৭) জে, জার, জুদ্ধ, জম, জথা, জেন, জত, জুগ, জোগে, জোগ, রাজ্জ, সুজ্জ, জত, জায়, জ্বরা, জেবা, জদি, জবন, জতেক, জাইব জোজন, ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ৫৭১)

(১.৬.১৮) জত, ধর্জ্য, জারে, জুর্দ্ধ, জদি, সুর্জ্য, জম, জেই, ভার্জ্যা, জায়, জাইতে, জেমতে, জখন, জাহার, জদ্যপী, জেজন, জেরূপ, জথায় ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৪)

(১.৬.১৯) জে, জদি, জেন, জারা, জাই, জত, আর, জম, জেবা, জুর্দ্ধ, জশ, জবে, জখন, জোগান, অজুধ্যা, জতেক, জয়জুক্ত ইতাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮১)

(১.৬.২০) জে, জম, জার, জাত, জেই, জেন, জুক্তি, জদি, জাহার, জাইতে ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮০)

(১.৬.২১) জদি, জাই, জায়, জুর্দ্ধ, জুক্তি, জম, জত, জশ, জত, জার, জেন, কাজ্য, জাবেক, জদ্যপি, জুবতি, জেখানে ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৮)

(১.৬.২২) জুদ্ধ, জুক্তি, জেই, জনে, জার, জত, জত্ন, জষ, জোড়, জোদ্ধা, জেমন, জতেক, জাহার, জুধিষ্ঠীর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৫)

প্রাচীন পুথিতে জ-ধ্বনি বোঝাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গীয় জ-এর প্রয়োগ হলেও, য-এর ব্যবহারও কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বানানে জ ও য উভয়েরই প্রয়োগ রয়েছে। তবে কোথাও কোথাও য-এর ব্যবহার হলেও তা বর্গীয় জ-এর অনুপাতে অনেক কম। য-এর ব্যবহার রয়েছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই—ভট্টাচার্য।

৩২৫-সংখ্যক পুথিতে কয়েকটি স্থানে য-এর প্রয়োগ হচ্ছে। যেমন ঃ যসোমতি, যম, যুগ, কার্য, অন্তর্যামী।

১০৭২ সংখ্যক পুথিতে পাই হোতাচার্য, ধৈর্য, রার্য্য (রাজ্য) ইত্যাদি।

৬৪২ সংখ্যক পুথিতে একই বানানে জ, য উভয়ই রয়েছে। যেমন ঃ জুধিষ্ঠির/যুধিষ্ঠির, সূজ্য/সূর্য, রাজ্য/রার্য্য, আশ্চর্য, পর্যন্ত ইত্যাদি।

৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে পাই জাহার/যাহার, জুর্দ্ধ/যুর্দ্ধ, যস/জস, বির্যবন্ত/বিজ্জবন্ত, রায্য ইত্যাদি।

২৪৮৯ সংখ্যক পুথিতে দু-একটি ক্ষেত্রে য রয়েছে। যেমন ঃ ঐশ্বর্য্য, আশ্চর্য্য ইত্যাদি।

৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে পাই রার্য্য, সূর্য্য, আশ্চর্য্য, যুর্দ্ধ, যুক্তি, ধৈর্য ইত্যাদি।

৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে পাই দ্রোণাচার্য, যদি, সূর্য, য্যুধিষ্ঠির।

৫১৫ সংখ্যক পুথিতে পাই কার্য্য/কার্জ্য, অকার্য্য, অকার্জ্য ইত্যাদি।

৩১০০ সংখ্যক পুথিতে পাই যোজন।

২০৫ সংখ্যক পুথিতে পাই একই বানানে জ, য উভয়ই রয়েছে। যেমন ঃ যে/জে, জার/যাব, জেন/যেন, যস/জস, জুর্দ্ধ/যুর্দ্ধ, লজ্জা/লর্য্যা, সাযুর্য্য/সাজ্জ্যু, কার্য্য, আশ্চর্য্য ইত্যাদি।

৫৭১ সংখ্যক পুথিতে পাই জদি/যদি, যে/জে, শূয্য/সুজ্য, ভার্য্যা, যুধীষ্ঠির/জুধিষ্ঠীব, মর্য্যাদা ইত্যাদি।

৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে খুব কম স্থানে হলেও য রয়েছে।

৩৮১ সংখ্যক পুথিতে পাই রার্য্য, কার্য্য ইত্যাদি।

৩৮০ সংখ্যক পুথিতেও দু-এক স্থলে য রয়েছে. যেমন ঃ ভার্য্যা/ভাজ্যা।

৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে দু-এক স্থানে য লক্ষ করা যায়।

উপবেব উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, লিপিকরগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে য ব্যবহাব করেছেন ঠিকই, কিন্তু য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো অনমনীয় নিয়ম অনুসৃত হয়নি। কাবণ বহু ক্ষেত্রেই একই শব্দেব বানানে জ, য—উভয়েরই নির্বিচার প্রয়োগ বয়েছে। তবে য-এর প্রযোগ পুথিতে থাকলেও প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জ-ধ্বনি বোঝাতে জ-এর ব্যবহারই লক্ষ কবা যায়। তাই জ-এর ব্যবহারকে লিপিকরগণের সাধারণ প্রবণতা বলে ধরে নেওয়া যায়।

(১.৭) এই শতাব্দীর বিভিন্ন পুথিতে 'ন' ও 'ণ'-এর মধ্যে স্পষ্ট লিপিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দন্ত্য 'ন' ও মূর্ধন্য 'ণ' উভয়ই 'ন' এর মতো করেই লেখা হয়েছে। এই কারণেই সর্বক্ষেত্রে ণত্ব-বিধি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ফলে এই লিপিগত অস্পষ্টতা পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

তবে কোনো কোনো লিপিকবেব পুথিতে স্পষ্ট 'ণ'-এব ব্যবহারও দেখা যায়। যেমনঃ

(১৭১) ৩২৫-সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ব্রাহ্মণ, অরুণ. কিরণ. শ্রবণ. বর্ণ, চবণ. দারুণ, পূবাণ. অধাযণ ইত্যাদি।

(১৭২) ১০৭২ -সংখ্যাক পুথিতে 'ণ'-এর ব্যবহাব দু-এক স্থলে বয়েছে। যেমন ঃ স্মবণ, কব্দণ ইত্যাদি।

(১৭৩) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ চূর্ণ, বর্ণ, চবণ. নিরিক্ষণ, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

এই শতাব্দীতে ব্যবহৃত বাইশটি পুথির মধ্যে তিনটি পুথিতে মূর্ধন্য 'ণ'-এর স্পষ্ট ব্যবহার রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সংখ্যায় কম হলেও ঐ শতাব্দীতে মূর্ধন্য 'ণ'-এর আধুনিক কালসুলভ স্বতন্ত্র হরফ প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্র 'ণ' হরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র ণত্ববিধান মানা হয়নি। তাছাড়া যে সকল পুথিতে স্পষ্ট ণ-এর ব্যবহার রয়েছে সে সকল পুথিতেও 'ণ'-এর ক্ষেত্রগুলিতে 'ণ'-এর তুলনায় 'ন' এর প্রয়োগই বেশি। তাই লিপিকরদের মধ্যে নির্বিচার ন-বর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা অধিক—একথা বলা যেতে পারে।

(১.৮) শিসধ্বনি (sibilant) বোঝাতে পুথির বানানে 'শ', 'ষ', 'স'-এই তিনটি বর্ণের নির্বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'ষ'-বর্ণের স্থাপনেও ষত্ববিধান অনুসৃত হয় নি।

(১.৮.১) গনেস, সিষু, সিস্য, সংসয়, সর্ব্বনাষ, বিস্বাস, বিশেষ, বিদেষ, ষেই, নিসি, উগ্রষেণ, ষুখ, ষুনি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১.৮.২) ১০০৩ বঙ্গাব্দের ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে এই যথেচ্ছাচার লক্ষ কবা যায়। যেমনঃ ষুনি/সুনি, বিস্টি/বিষ্টী, রাক্ষস/রাক্ষশ, বিসেস/বিসেশ, অবস্য/অবষ্য, ষুবুর্দ্ধি/সুবুর্দ্ধি, য়বসেস/য়বসেশ, উপহাশ/উপহাস, সিসু ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.৮.৩) দাসী/দাশী, শুখ/সুখ, ব্যাস/ব্যাশ, সন্তোষ/সন্তোশ/সন্তোস, ভাসিল/ভাশিল/ভাষীল, মনুস্য/মুষ্য, পুরুস/পুরুশ, তপস্যা/তপশ্যা ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩২৫)

(১.৮.৪) সেস/সেষ, শেষ, সুদ্র/শুদ্র, সুক্ল/শুক্ল, ব্যাস/ব্যাস, অংস/অংশ, বংস/বংশ, প্রকাস/প্রকাশ, তপস্যা/তপশ্যা, উপহাষ/উপহাস, চতুর্দ্ধষ ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)

(১.৮.৫) বিশেশ/বিশেস/বিশেষ/বিসেস, দ্বাদস/ দ্বাদশ, সূর্য্য/শূর্য্য/ষূর্য্য, নিশ্বাষ/নিশ্বাস/নিস্বাস, শরির/সরির, সদৃস/সদৃশ/শদৃস, দাসি/দাশি ইত্যাদি।

(পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.৮.৬) শমরে/সমরে, সাম/ষ্যাম, সিস্য/সিষ্য, শ্রীখন্ডি/সিখন্ডি, পসংসা, পষু/ষুন্দর, ষুমতি, সুক্ষ, ষুদবসন, সংসয় ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৮)

(১.৮.৭) সাস্ত্র, দাষ, সুনিঞা, অভিলাস, সংসার, সিরোমনি, সিসির, দার্স্য, সুসিতল, নিসি, বিষাখা, সোভা, ইসত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)

(১.৮.৮) ১০৭১ বঙ্গাব্দের ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'স'-এর ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ সর্গ, সন্ধান, ভূসন, সোবামাত্র, প্রসংসিল, প্রবেসিল, সতদল, সাঁখা, সূনি, সূবর্ণ, স্বরির, দোস, সান্তি, দেসে, ছর্ত্তিস, সপত, সূত্র, বিসাদ, সিরধার্য, সুর্দ্ধ, স্বেত, গৌড়েস্বর ইত্যাদি।

তবে এই পুথিতেই একই বনানে 'শ', 'ষ', 'স'-ত্রিবিধ বর্ণের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ দেস/দেশ, সাঁখা, ষাঁখা, সূনি/ষুনে, বাতাস/বাতাষ, ছর্ত্তিস/ছর্ত্তিষ, জষমন্ত/জসমন্ত ইত্যাদি।

(১.৮.৯) ১০৭৩ বঙ্গাব্দের ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বিস্বাস, বিসেস, অবসেস, সহস্র ইত্যাদি।

(১.৮.১০) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সুমধুরা/ষুমধুরা, শেই, মহেস, অবশেশ, সুদর্সন, সাস্ত্র, সসি, সদাসিব ইত্যাদি।

(১৮.১১) ৫৮৭-সংখ্যক পুথিতে 'শ', 'ষ', 'স'-তিনটি বর্ণের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ করি। যেমন ঃ ষুনিঞা/সুনিঞা, হরিশ/হরিস, ভিষ্ম, ইস্বর/একেশ্বর, দেবাষুর, বষুমতি, বংস, অভিসেক, সুষোভন, শুলপানি, সপ্তদয়, দুস্বাসন ইত্যাদি।

(১.৮.১২) ৫১৫-সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ নিশ্চঅ/নিস্চয়, শুনিঞা, শুজন, সুর্দ্ধ, মহিসি, বিসঅ, কিসোর ইত্যাদি।

(১.৮ ১৩) ৫৮৬-সংখ্যক পুথিতে একই অসংগতি রয়েছ। যেমন ঃ সুনিঞা, ষুন, ভূসিত, ষুমতি,সিবির, পষুপতি, নিশ্চয়, রোস, বাষুদেব, আদেশীল, প্রসংসা, য়বসেস, গৃষ্য, অবষ্য, আস্বাস, দুঃস্বাসন, মহেস্বর ইত্যাদি।

(১.৮ ১৪) ৩১০০-সংখ্যক পুথিতে লিপিকরেব নির্বিচাব প্রয়োগ প্রবণতা প্রকট হয়েছে। যেমন ঃ সংশার/শংশার ; শিশু/শিষু ; শুনহ, ষুনিঞা ; শিষ্য, উশা, হংশ, বিশেষ, শকল, দিবশে, মহেশ, মনশা, বাশর, দাশ, শহিত, মাশ, শভা ইত্যাদি।

(১.৮.১৫) ২০৫-সংখ্যক পুথিতে একই বানানে 'শ', 'ষ', 'স' তিনটি বর্ণেবই প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ পাষণ্ড/পাষন্ডী, সহস্র/সহশ্র, বিষ্টী/বিস্টী, অধিবাষ/অধিবাস, হরিদাস/হবিদাষ, সস্টি/সষ্টী, সেস/সেষ/ষেষে, শ্রীবাস/স্রিবাষ ইত্যাদি।

(১.৮ ১৬) ১০৮৪ বঙ্গাব্দের ৫৭১ সংখ্যক পুথিতেও এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ যুধিষ্ঠির/জুধিষ্টির, বিস্টি/বিষ্টী, সমুদ্র/ষমুদ্র, সুনিঞা/ষুনিঞা/শুনিয়া, সুজ্য/শুজ্য/ষুয্য, সংশার/সংসার, বাজসুই/বাজষুই , ষুর/অসুর ইত্যাদি।

(১ ৮ ১৭) ১০৮৪ বঙ্গাব্দেব ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ শুন/সুন, সোমাচার/শোমাচার, মহাসয/মহাশয, সিষু, শংসাব, বৃসকেতু, আসিস, সোক, ভবিস্যত ইত্যাদি।

(১.৮ ১৮) ১০৮৬ বঙ্গাব্দেব ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ পুস্প/পুষ্প, ষুর্য্য/সুর্জ্জ, সদৃষ/সাদৃসি, বিসেস,'বিসেষ, অবষ্য/অবস্য, বিশ্বাস/বিস্বাষ, সাস্ত্র, দেস, সংসয়, সিক্ষা, নিস্বাষ, ষুদিষ্ঞা ইত্যাদি।

(১ ৮ ১৯) ১০৮৮ বঙ্গাব্দের ৩৮১ সংখ্যক পুথিতে 'শ'-এর ব্যবহারই বেশী। তবে 'ষ', 'স'-এর ব্যবহারও কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ শমান, শঙ্কট, শুগ্রিব, শাগর, আশিয়া, শেবক, হাশিলা, শাহশ, শব, শময়, বিশম, শুগন্ধি, শকুন, শকল শমুদ্র, শাবধান, শেশে, শেনাপতি ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও পাই ঃ মনুস্য, পস্চাত, স্বাহায, ষুমেরু ইত্যাদি।

(১.৮.২০) ৩৮০ সংখ্যক সংখ্যক পুথিতেও একই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ শতি, সতি, ঘনস্যাম, সিকাব, বিশেষ, সোক, মনুস্য, স্যামল, পোশমাশ, সিকার, শেই, অশম্ভব, সুসোভন ইত্যাদি।

(১.৮ ২১) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ষুগ্রীব/সুগ্রিব, য়াকাস/য়াকাশ, শিতা/সিতা, বিভিশন/বিভিসন, শুমেব্দ, সুপ্পনখা, শর্ব্বাঙ্গে, বিশারদ, শেই, য়াশি, সত্তি শাসন ইত্যাদি।

(১.৮.২২) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতেও শিস্ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ দুস্বাষন/দুস্বাসন, সুর্য্য/শুর্য্য, শংসার, প্রসংসি, শিংহ, অবসিস্ট, শুভদ্রা, দিবশে, শহিত, অবষ্য, অবশেষ ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, সেই সময় লিপিকরগণ শিস্‌ধ্বনি বোঝাতে 'শ', 'ষ', 'স'-এই তিনটি বর্ণই ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করেছেন। তবে কোনো লিপিকরের পুথিতে বিশেষ একটি বর্ণের প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই বানানে শিস্‌ধ্বনিজ্ঞাপক তিনটি বর্ণেরই নির্বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে বানান-বিশৃঙ্খলায় আর একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে।

(১.৯) বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর প্রায় সকল পুথিতেই রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলগতভাবে বানানে দ্বিত্ব অপেক্ষিত না হলেও নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই অর্থাৎ রেফ্ আছে বলেই দ্বিত্বের ব্যবহার হয়েছে। যেমন ঃ

(১.৯.১) ১০০২ বঙ্গাব্দের ১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ আবর্ত্তন, চক্রবর্ত্তি, ভটাচার্য্য, জর্জ্জর, মার্জ্জিত, আসির্ব্বাদ ইত্যাদি।

(১.৯.২) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ দর্প্প, য়াসির্ব্বাদ, পর্জ্জ্যটন, দুর্জ্জন, সর্গ্গ, য়র্জ্জুন, বার্ত্তা, পুর্ব্বে, য়পুর্ব্ব, সর্ব্ব, বর্ব্বর, সর্ত্ত, নির্ব্বন, ধনুর্ব্বান, নির্দ্দ্যা, সমর্প্পীয়া ইত্যাদি। উপরের উাহরণগুলির মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে রেফ-এর পর দ্বিত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন ঃ দর্প্প, সর্গ্গ, দুর্জ্জন, পর্জ্জটন, সমর্প্পীয়া।

(১.৯.৩) ১০০৭ বঙ্গাব্দের ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে কোথাও কোথাও এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কর্ম্ম, পূর্ব্ব, শর্ব্ব, বর্ণ, কার্য্য, নির্ন্নয়, সর্ব্বথা, দুর্দ্দশা, অর্চ্চনা, পূর্ন্নীত, ভটাচার্য, অবতীর্ন্ন ইত্যাদি। বর্ন্ন, নির্ন্নয়, পূর্ন্নীত, অবতীর্ন্ন-এই ক্ষেত্রগুলিতে রেফ্-এর পর দ্বিত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ বলে মনে হয়।

(১.৯.৪) ১০৭২৫ সংখ্যক পুথিতে একই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ মুর্ত্তি, সির্ন্ন, বর্ন্ন, গর্ত্ত, কর্ম্ম, স্বর্ন্ন, চর্চ্চিত, কৈবর্ত্ত, অথর্ব্ব, নির্ম্মাণ, গন্ধর্ব্ব, দুর্গ্গতি, সুবর্ন্ন, উর্ব্বসি, পুনর্ব্বর, চতুর্দ্দিকে, আসির্ব্বদ ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে কযেকটি ক্ষেত্রে রেফ্ আছে বলে দ্বিত্ব হয়েছে। যেমনঃ সির্ন্ন, বর্ন্ন, স্বর্ন্ন, সুবর্ন্ন, দুর্গ্গতি।

(১.৯ ৫) ১০৪৮ বঙ্গাব্দের ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ধর্ম্ম, পূর্ব্ব, কর্ত্তা, কর্ম্ম, মূর্ত্তি, বর্ন্ন, গর্ব্ব, সির্ন্ন, অথর্ব্ব, কর্ত্তব্য, চর্চ্চিত, সর্ব্বথা, মুর্চ্ছিত, বিদর্ব্ব, নির্জ্জন, গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বরি, সুশর্ম্মা, অথর্ব্ব ইত্যাদি। রেফ্-এর পর দ্বিত্বেব যান্ত্রিক প্রয়োগ হয়েছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ঃ বর্ন্ন, সির্ন্ন, বিদর্ব্ব, বর্জ্জাঘাত।

(১.৯.৬) ১০৫৭ বঙ্গাব্দেব ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ পর্ব্ব, শর্ব্বত্র, নির্ব্বান, গর্জ্জন, জর্জ্জর, জনার্দ্দন, বির্য্যবন্ত ইত্যাদি। উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে 'বির্য্যবন্ত' বানানে বেফ্-এর পব দ্বিত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ হযেছে।

(১.৯.৭) ১০৬৬ বঙ্গাব্দেব ২৪৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সর্ব্ব, মর্ত্ত, চর্ম্ম, পুর্ন্ন, বর্ন্ন, কির্ত্তন, সর্ব্বথা, দুর্ল্লভ, নির্ম্মান, নির্ন্নয, অর্চ্চন ইত্যাদি। বর্ন্ন, পুন্ন, দুর্ল্লভ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রেফ্ আছে বলেই যান্ত্রিকভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়েছে।

(১.৯.৮) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ ধর্ম্ম, সর্গ্গ, পুর্ন্ন, পুর্ব্ব, কর্ণ্ণ, কর্ত্তা, দুর্গ্গা, বর্গ্গ, বর্ণ্ণ, অর্প্পন, পার্ব্বতি, গর্জ্জন, নির্ম্মল, পর্ব্বত, দুর্গ্গতি, মার্জ্জনা, অনর্থ, সর্ব্বত্র, সুবর্ণ্ণ, মার্ক্কন্ডেয়, দুর্জ্জোধন, দেবার্চ্চন ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রেফ্-এর পর যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে। যেমন ঃ সর্গ্গ, পুর্ন্ন, দুর্গ্গা, কর্ণ্ণ, বর্গ্গ, বর্ণ্ণ, সর্প্প, দুর্গ্গতি, অনর্থ, সুবর্ণ্ণ, মার্ক্কন্ডেয়।

(১.৯.৯) ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বর্ণ্ণিতে, সর্ব্বথা ইত্যাদি। 'বর্ণ্ণিতে' বানানেও যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে।

(১.৯.১০) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ অবতির্ণ্ণ, চক্রবর্ত্তি, অপুর্ব্ব, বর্ণ্ণন, পুর্ব্ব ইত্যাদি। বর্ণ্ণন, অবতির্ণ্ণ ইত্যাদি বানানেও যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে বলেই মনে হয়।

(১.৯.১১) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ পর্ব্ব, সর্ব্ব, ধর্ম্ম, মুর্ত্তি, বর্ম্ম, পুর্ব্ব, অর্জ্জুন, জর্জ্জর, সর্ব্বাঙ্গে, পর্ব্বত, নির্ম্মাণ, ধনুর্ব্বান, দুর্জ্জোধন ইত্যাদি।

(১.৯.১২) ৫১৫ সংখ্যক পুথিতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ ধর্ম্ম, সর্ব্ব, কর্ম্ম, কার্য্য, স্ফুর্ত্তি, নির্ব্বিকার, প্রবর্ত্তক ইত্যাদি।

(১.৯.১৩) ১০৮০ বঙ্গাব্দের ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই প্রবণতা রয়েছে যেমন ঃ কর্ণ্ণ, চুর্ণ, বিবর্ণ্ণ, পুর্ন্ন, সুবর্ণ্ণ, জর্জ্জর, দুর্ব্বার, আকর্ণ্ণ, পুর্ণ্ণিত, নির্ব্বান, বিশ্বকর্ম্মা, ধনুর্ব্বন, য়াসির্ব্বাদ, পুনর্ব্বার ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে রেফ্ আছে বলেই দ্বিত্ব হয়েছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ঃ কর্ণ্ণ, চুর্ণ্ণ, পুর্ন্ন, সুবর্ণ্ণ, বিবর্ণ্ণ, আকর্ণ্ণ, পুর্ণ্ণিত।

(১.৯.১৪) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে শর্ব্ব, কর্ম্ম, শর্ব্বথা, কার্ত্তিক, ষুবর্ণ্ণ, জর্জ্জর, পর্ব্বত, কির্ত্তিবাস ইত্যাদি। 'ষুবর্ণ্ণ' বানানে যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে।

(১.৯.১৫) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রেফের পর দ্বিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ ধর্ম্ম, মর্ত্ত, গর্ব্ব, পুর্ব্ব, কার্য্য, দর্ব্বা, বর্ণ্ণ, সর্ন্ন, বের্থ, কির্ত্তন, পূর্ণ্ণিত, চক্রবর্ত্তি, পুনর্ব্বর, পরিপুর্ণ্ণ, মুর্ত্তিমতি, অহোর্ন্নিসি ইত্যাদি। রেফের পর যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ঃ বর্ণ্ণ, সর্ন্ন, বের্থ, পূর্ণ্ণিত, কর্ণ্ণধার, পরিপুর্ণ্ণ, অহোর্ন্নিসি, অবতির্ণ্ণ, বর্ণ্ণিবেন।

(১.৯.১৬) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ পুর্ন্ন, বর্ণ্ণ, ধর্ম্ম, ষুর্য্য, দুর্জ্জন, অপুর্ব্ব, সর্ব্বস্ব, বৈদুর্য্য, উর্ব্বসি, চতুর্দ্দস, দুর্জ্জোধন, সমর্প্পন, সর্ব্বনাস, অহোর্ন্নিসি, উপার্জ্জন, চতুর্ব্বেদ, পুনর্ব্বার ইত্যাদি। পুর্ন্ন, বর্ণ্ণ, দুর্জ্জন, সমর্প্পন, অহোর্ন্নিসি—এই ক্ষেত্রগুলিতে সম্ভবত রেফের পর যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে।

(১.৯.১৭) ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ কর্ণ্ণ, কর্ম্ম, মুর্ত্তি, সর্ব্বনাস ইত্যাদি।

(১.৯.১৮) ১০৮৬ বঙ্গাব্দের ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ কার্য, সর্ন্ন, সর্গ্গ, কর্ণ্ণ, সর্ব্বথা, তর্প্পন, দুর্গ্গতি, গন্ধর্ব্ব, কর্ত্তব্য, নির্জ্জন, দুর্জ্জোধন, পুনর্ব্বর ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে। যেমনঃ সর্ন্ন, কর্ণ্ণ, সর্গ্গ, তর্প্পন, দুর্গ্গতি।

(১.৯.১৯) ১০৮৮ বঙ্গাব্দের পুথিতে ৩৮১ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ কৰ্ম্ম, কার্য, শর্প্প, উৰ্ব্বশি, জৰ্জ্জর, উর্ব্বসি, পুর্ন্নিমা, পুরশার্ত্ত ইত্যাদি। শর্প্প, পুরশার্ত্ত বানানেও যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়েছে।

(১.৯.২০) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতে পাই—ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, ক্ষুধার্ত্ত, পুনৰ্ব্বর ইত্যাদি।

(১.৯.২১) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৩৮০ সংখ্যক পুথিতে রেফের পর দ্বিত্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ঃ উৰ্ব্বশি, পৰ্ব্বত, শৰ্ব্বাঙ্গ, পুনৰ্ব্বার ইত্যাদি।

(১.৯.২২) ১১০০ বঙ্গাব্দের ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে একই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ গৰ্ব্ব, বর্ন্ন, বিবর্ন্ন, গন্ধৰ্ব্ব, সুবর্ন্ন, অৰ্জ্জুন, পুর্ন্নিমা, জৰ্জ্জর, গৰ্জ্জিয়া, বর্ন্নিবার, দ্রোনাচাৰ্য্য, বির্য্যবন্ত ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রেফের পর যান্ত্রিকভাবে দ্বিত্ব হয়েছে। যেমন ঃ বর্ন্ন, বিবর্ন্ন, সুবর্ন্ন, পুর্ন্নিমা, বর্ন্নিবার, বির্য্যবন্ত।

সুতরাং ১০০১-১১০০ বঙ্গাব্দের সকল পুথিতেই রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব কম বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, অর্থাৎ রেফের পর একক ব্যঞ্জনের ব্যবহারও রয়েছে তবে তা অনুপাতে পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। সেহেতু রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব প্রয়োগকে সে যুগে লিপিকরগণের এক বিশেষ প্রবণতা বলে ধরে নিতে পারা যায়।

(১.১০) এই সময়সীমার প্রায় সকল পুথিতেই ব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ (́) আকৃতির চিহ্ন যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

(১.১০.১) বৃৰ্ত্তি, বুৰ্দ্ধি, সিৰ্দ্ধি, উৰ্দ্ধার ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১২৯৫)

(১.১০.২) মৰ্দ্ধে, পৰ্ত্র, পুৰ্ত্র, ব্ৰৰ্ক্ষ, চিৰ্ত্র, সিৰ্ঘ্র, খৰ্ড়্গ, জুৰ্দ্ধ, ইৰ্চ্ছা, মিৰ্থ্যা, সাৰ্ম্য, ধৰ্ব্বজ, প্রসিৰ্দ্ধ সৰ্ন্ধান, মৰ্দ্ধম, উৰ্ল্কাপাত, জগৰ্ন্নাথ, কাৰ্ত্ত্যায়নি, জৰ্ন্মেজয়, পৰ্জ্জোটন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৯৫)

(১.১০.৩) ১০২৩ বঙ্গাব্দের ১০৭২ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ বুৰ্দ্ধি, মৰ্ধ্যে. জৰ্ন্ম, বৃৰ্দ্ধ, মিৰ্ম্মা, অৰ্ণ্যে, ভৰ্স্ম, গৰ্ত্ত, দৰ্ত্ত, ইৰ্চ্ছা, বাৰ্ঘ্র, উৰ্দ্ধার, উৰ্ন্মত্ত, বিসৰ্ন্ন, উৰ্চ্ছৰ্ন্ন, প্ৰৰ্ত্যয়, গৰ্ত্তবতি, অন্তৰ্ধ্যান ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ১০৭২)

(১.১০.৪) জুৰ্দ্ধ, মৰ্দ্ধে, ধৰ্ব্বজ, বৃৰ্দ্ধ, লৰ্জ্জা, দক্ষ, জোৰ্দ্ধ, সৰ্জ্জা, ধৰ্ব্বনি, শ্রাৰ্দ্ধ, বুৰ্দ্ধ, ব্ৰাৰ্ক্ষণ, শৰ্ত্তুর, লৰ্জ্জিত, উৰ্দ্ধার, অস্মৰ্থামা, জগৰ্ন্নাথ, তিলোৰ্ত্তমা, সৰ্ব্যসাচি, বৃহৰ্ন্নলা ইত্যাদি।(পুথি সংখ্যা ৬৪২)

(১.১০.৫) জুৰ্দ্ধ, জোৰ্দ্ধা, মৰ্দ্ধে, বিৰ্দ্ধ, উৰ্দ্ধারিলে ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৮)

(১.১০.৬) ভিৰ্ন্ন, অৰ্ন্য, ইৰ্চ্ছা, সিৰ্দ্ধ, বৃৰ্ক্ষ, সিৰ্দ্ধি, দাৰ্স্য, কুৰ্ক্কুর, উৰ্ত্তর, বিৰ্চ্ছেদ, আৰ্চ্ছাদন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২৪৮৯)

(১.১০.৭) দিৰ্ব্য, রিৰ্দ্ধ, সিৰ্দ্ধ, জুৰ্দ্ধ, কৰ্ল্প, মিৰ্থ্যা, জোৰ্দ্ধা, ভিৰ্ন্ন, মৰ্দ্ধে, মৰ্ধ্যে, বৃৰ্দ্ধ, সুৰ্দ্ধ, সিৰ্দ্ধি, উৰ্ত্তর, উৰ্দ্ধার, বাজৰ্ত্ত, নিৰ্ভৃত, ব্ৰাৰ্ক্ষন, উত্তরিল, আৰ্চ্ছাদিল, প্ৰৰ্ত্যত্তর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৩৫)

(১.১০.৮) ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বুৰ্দ্ধি, উৰ্দ্ধার ইত্যাদি।

(১.১০.৯) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ দর্ত্ত, উর্দ্ধার ইত্যাদি।

(১.১০.১০) ভার্গ্য, বার্ক্য, জুর্দ্ধ, ধর্ব্বজ, মর্ত্ত, তর্ত্ত, লর্জ্জা, সর্ত্তর, মর্জ্জায়, মহর্ত্ত, প্রত্যুত্তর, আচ্ছাদিল ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৭)

(১.১০.১১) সির্দ্ধ, গর্দ্ধ, শুর্দ্ধ, অর্ন্ন, মর্দ্ধর্ম, বির্চ্ছেদ, উর্ত্তম, নরোর্ত্তম ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫১৫)

(১.১০.১২) গর্ত্ত, জুর্দ্ধ, ব্রর্ক্ষ, সির্দ্ধ, সির্দ্ধা, জর্ন্ম, বৃর্দ্ধ, জর্ণা, মর্দ্ধে, জোর্দ্ধা, প্রসর্ন্ন, জর্ম্মিলে, উর্দ্ধারিল, ধনুর্দ্ধর ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৮৬)

(১.১০.১৩) ভর্স্ম, বুর্দ্ধি, ব্রর্ক্ষা, দর্ত্ত, বৃর্দ্ধ, লর্জ্জা, চির্ত্ত, চির্হ্ন, সির্দ্ধ, উর্ত্তর, ব্রার্ক্ষন, অরর্দ্ধন, জয়র্দ্ধনি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩১০০)

(১.১০.১৪) মর্ত্ত, বির্দ্ধ, ধর্ন্য, দির্ব্য, সুর্দ্ধ, বৌর্দ্ধ, জ্যোর্তি, সির্দ্ধি, সার্ঙ্গ, ভূর্ত্ত, যুর্দ্ধ, গর্ন্ধ, পর্দ্য, বৃর্ত্তি, মর্দ্ধে, ধর্বনি, লর্ক্ষি, উৎপর্ত্তি, উর্দ্ধার, নিমির্ত্ত, অবির্চ্ছর্ন্ন, উর্চ্চারন, প্রিয়র্তমে, হরির্দ্ধনি, সির্দ্ধেস্বারি ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ২০৫)

(১.১০.১৫) চির্ত্তে, পর্ব্ব, জুর্দ্ধ, পুর্ন্ন, জর্ন্ম, বির্দ্ধ, বৃর্দ্ধ, বুর্দ্ধি, জুর্দ্ধ্য, পর্দ্য, তর্ত্ত, পুর্ন্য, ভার্য্যা, য়র্দ্ধ, রার্য্য, সর্ত্তর, উর্দ্ধার, সর্ব্বস্ব, উর্ন্মত্ত, সুগর্ন্ধি, বার্দ্ধিয়া, দুর্স্বাষন ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭১)

(১.১০.১৬) বৃর্দ্ধ, দর্ত্ত, অর্ন্ন, ব্রর্ক্ষো, ব্রার্ক্ষনের, ধর্ন্যবান ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮৫)

(১.১০.১৭) মির্ত্তু, পুর্না, চির্ত্র, সর্ত্য, গর্দ্ধ, দুর্স্থ, বার্দ্য, মার্ল্য, বার্ক্য, চির্ত্ত, অর্গ্নি, বৃর্দ্ধ, অর্ন্য, ধর্বনি, মুর্দ্ধ, রর্ম্য, ভার্গ্য, বার্দ্য, ভর্গ্নি, বুর্দ্ধ, রার্জ্য, পর্ত্যয়, অর্দ্ধকার, উর্দ্ধারিল, বির্দ্যমান, তরার্ন্বিত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৫৭৪)

(১.১০.১৮) বুর্দ্ধি, বার্ক্যে, ইর্চ্ছা, বির্দ্য, পুর্ষ্প, আর্স্যে, মোর্দ্ধে, মর্ত্ত্যে, লর্জ্জা, বৃর্ক্ষ্য, জুর্দ্ধ, চির্ত্ত, জর্জ্জর, উর্দ্ধারি, আইর্শ্যে, রার্ক্ষাশ, ছর্ত্তিশ, ব্রার্ক্ষণ, লর্ক্ষ্যন, বৃপর্স্পতি, বির্দ্যমান, উর্ত্তরিল, বিস্বর্শ্রবা, বর্জ্জাঘাত ইত্যাদি। (পুথি সংখ্যা ৩৮১)

(১.১০.১৯) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ ইর্চ্ছা, চির্ত্ত, উর্ত্তর, ক্ষুধার্ত্ত, উর্চ্চস্বরে ইত্যাদি।

(১.১০.২০) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা অনেক কম। কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ঃ বির্দ্ধ, জুর্দ্ধ, সর্দ্ধান ইত্যাদি।

(১.১০.২১) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা থাকলেও কম। যেমন ঃ ক্রুর্দ্ধ, জুর্দ্ধ, দর্ত্ত, সৈর্ন্য, সর্দ্ধান, লর্জ্জিত, সুর্দ্ধমতি ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিপিকরগণ যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে এই ধরনের রেফ্ আকৃতির চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, অর্থাৎ এই সময়ের একই পুথিতে আমরা রেফ্ আকৃতির চিহ্নবিহীন যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহারও পাচ্ছি। যেমন ঃ

(১.১০.২২) ১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বিস্বাস, অনন্ত, বিস্মিত ইত্যাদি।

(১.১০.২৩) ১০০৭ বঙ্গাব্দের ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্-আকৃতির চিহ্ন কোনো ক্ষেত্রেই প্রায় লক্ষ করা যায় না।

(১.১০.২৪) ১০৭২ সংখ্যক পুথিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেফ্ চিহ্নবিহীন যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন ঃ ধুজ্জটী, বিত্তান্ত, বিস্বেস্বর, অস্বমেধ ইত্যাদি।

(১.১০.২৫) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সাস্ত্র, বৈসম্পায়ন, নিস্কন্টক, দুস্বাসন, সপ্তদশ ইত্যাদি।

(১.১০.২৬) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতেও রেফ্‌বিহীন যুক্তব্যঞ্জন রয়েছে। দপ্প, বনন, নির্ব্বান, অধম্ম, জজ্জর, দুজ্জধন, অন্তধ্যান ইত্যাদি।

(১.১০.২৭) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সাস্ত্র, জুদ্ধ, বৃত্তান্ত, দুজ্জোধন, দস্রাসন ইত্যাদি।

(১.১০.২৮) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন ঃ নবদ্বিপ, বিস্বরূপ, মহেশ্বর, সরস্বতি ইত্যাদি।

(১.১০.২৯) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ভার্য্যা, শুয্য, বুদ্ধি, পজ্জন্ত, সম্বাসিয়া ইত্যাদি।

বিভিন্ন পুথিতে এই ধরনের স্বল্প কতকগুলি ব্যতিক্রম ছাড়া এই শতকের প্রায় সকল পুথিতেই যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গেই রেফ্ চিহ্নের প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে।

আমরা জানি রেফ্ চিহ্নটি সাধারণভাবে ব্যঞ্জন পূর্ববর্তী অব্যবহিত র ধ্বনির নির্দেশক। কিন্তু ১.১০.১ থেকে ১.১০.২১ সংখ্যক উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী এ ধরনের রেফ্ চিহ্ন দ্বারা পুথির বানানে র-ধ্বনি নির্দেশিত হয় না। তখনই রেফ্ এর ভিন্নতর প্রয়োগ দেখে প্রশ্ন ওঠে, এ ধরনের রেফ্ চিহ্ন দ্বারা লিপিকরগণ কী বোঝাচ্ছেন? আর এই ধরনের রেফ্ চিহ্ন প্রয়োগের আধিক্য এত যে এগুলিকে লিপিকরদের নিছক অসতর্কতার ফল বলেও মনে করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া 'প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে রেফ্-এর ব্যবহার' প্রবন্ধে পাণ্ডুলিপিতে রেফ্-এর বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১]

শাহজাহান মিয়ার প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, ড. আহমদ শরীফ এ ধরনের রেফ চিহ্নকে এক প্রকার ক্যালিগ্রাফি অর্থাৎ হস্তলিপি-পদ্ধতি বলে মনে করেন। ড. এনামুল হকও এই রেফ্ চিহ্ন সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু এই চিহ্নগুলিকে শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফি বলে ধরে নেওয়া সংগত মনে হয় না। কারণ এটা যদি ক্যালিগ্রাফি হত তবে তা বাংলা হরফে লেখা সমসাময়িক সংস্কৃত পুথিতেও দেখা যেত। কিন্তু এই সময়ের বেশ কিছু বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত পুথি অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, সেখানে রেফ্-এর এই ভিন্নতর প্রয়োগ হচ্ছে না।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া পুথিতে এ ধরনের রেফ্ চিহ্নের প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে এগুলিকে কোনো ক্ষেত্রেই র-জ্ঞাপক যথার্থ রেফ্ মনে করতে চান না। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—

"স্বয়ংসিদ্ধ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি তো বটেই, এ ছাড়া ছন্দগত কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পর্যায়ে উন্নীত অথবা সৌ[illegible]গুণান্বিত-দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন, দ্বিত্ব-পরিচয়বাহী মৌলিক ব্যঞ্জন, সমস্থানজাত ও ভিন্নস্থানজাত যুক্তাক্ষরগুলি যখন উচ্চারণে প্রবল দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনায় অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠতো, তখন ধ্বনিমুগ্ধ লিপিকর এসব ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা

উপলব্ধি করতো এবং সেই ধ্বনিগুলিকে নির্দেশ করতে গিয়েই এ প্রকার রেফ্ চিহ্নের ব্যবহার করতো। (পৃষ্ঠা-৭৭)

তবে রেফ্ চিহ্ন কোথাও র-নির্দেশক নয়—শাহজাহান মিয়ার এই মত আমরা পুরোপুরি মানতে পারি না। কারণ বাংলা পুথি পাঠ করলেই বোঝা যায়, লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত ছিলেন। তার উপর পুথি লিপি করাকে তাঁরা অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে অল্প সময়ে অধিক পুথি লিপি করার তাগিদে তাঁরা অনেক সময় শুনে শুনে পুথি লিপি করতেন। তাই পুথির বানানে উচ্চারণের প্রভাব একটি বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান লিখেছেন, কিন্তু শিক্ষার অভাবে উচ্চারণ বিকৃত হওয়ায বানানেও প্রায়ই অসংগতি থেকে গিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত রেফ্বিহীন শব্দও বিকৃত উচ্চারণের প্রভাবে পড়ে রেফ্যুক্ত হতেই পারে। জগর্ন্নাথ, অর্শ্বমেধ, আর্চ্ছাদিল, তিলর্ত্তমা, হরিধর্বনি, কার্ত্তায়নি, আর্চ্ছাদন, বির্ত্তান্ত, উর্চ্চারিল, রাজর্ত্ত ইত্যাদি বানানের রেফ্ চিহ্নকে আমাদেব অভ্যস্ত সংস্কার র-নির্দেশক বলে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু স্বল্পশিক্ষিত লিপিকরদেব বিকৃত উচ্চারণে এই রেফ্ চিহ্ন র নির্দেশক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে সংরক্ষিত পুরোনো বাংলা দলিল পত্রাদির বানান অনুসন্ধান করেও দেখা গেছে সেখানে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, মফস্বল, স্বইচ্ছাতে, সার্টিফিকেট, পুষ্করিণী ইত্যাদি বানান লিপিকরদের বিকৃত উচ্চারণের প্রভাবে পড়ে পরিবর্তিত হয়ে ফেবওারি ফিববওারি, মাশ্চ, আপরল, সেতাম্বর, দীজাম্বর, মহস্বল, সইৎশাতে, সাট্রিফিকট, পুস্কর্নি হয়েছে।[২] উচ্চাবণের প্রভাবে পড়ে বানান যেখানে এতদূর বিকৃত হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে বিকৃত উচ্চাবণেব ফলে রেফ্-বিহীন শব্দ রেফ্যুক্ত হওয়া আশ্চর্য নয়।

তবে সর্বক্ষেত্রেই এই রেফ্ চিহ্ন র-নির্দেশক নয়। কারণ এমন কিছু রেফ্যুক্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেক্ষেত্রে উচ্চাবণের প্রভাবেও রেফ্ আসতে পারে না। তাছাড়া শব্দের আদিতে রেফ আসতে পারে না, কিন্তু শব্দের আদ্যক্ষরে রেফ্ যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন ঃ

শব্দের আদিতে রেফ্ এসেছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ঃ

(ক) র্ধ্বনি, র্স্মরণ, র্প্রবেসিতে, র্ত্রাস ইত্যাদি।	(পুথি সংখ্যা ৫৮২)
(খ) র্ধ্বনি, র্ধ্বজ ইত্যাদি।	(পুথি সংখ্যা ৫৯৫)
(গ) র্জ্যোতি।	(পুথি সংখ্যা ২০৫)

বিকৃত উচ্চারণেও রেফের আগম অসম্ভব এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ঃ ধনর্ঞ্জয়, নির্দ্রা, পরার্ক্রম, খর্ড়গ, প্রিয়র্ত্তম, লর্ক্ষিদেবি, সুগর্ন্ধি, বৈরার্গ্য ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলিতে যে রেফ্-যুক্ত শব্দ পাচ্ছি সেই শব্দের বানানে রেফ্ চিহ্নটি যে র-নির্দেশক নয় তা বোঝাই যায়। শাহজাহান মিয়া এই চিহ্নগুলিকে প্রস্বর নির্দেশক বলে মনে করেছেন। তবে এগুলি প্রস্বর নির্দেশক কিনা তাতে সংশয় রয়েছে। কারণ এই চিহ্নগুলি বাংলায় প্রস্বর স্থাপনের নিয়মকে সর্বত্র অনুসরণ করে না। এক্ষেত্রে লিপিকরগণ যুক্ত ব্যঞ্জন বোঝাতে এই রেফ্ চিহ্ন ব্যবহাব করতেন বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মোহম্মদ আবদুল কাইউমের অভিমতটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[৩] তিনি মনে করেন, এ ধরনের রেফ্চিহ্ন যুক্ত বর্ণ (তাঁর ভাষায় যুক্তাক্ষর) নির্দেশের জন্যই সংশ্লিষ্ট পুথিসমূহে ব্যবহৃত হয়েছিল।

সুতরাং এই বিশ্লেষণ থেকে আমাদের মনে হয়, বাংলা পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরগণ রেফ্-এর জন্য চিহ্নটি দ্বিবিধ কারণে ব্যবহার করেছেন। যেক্ষেত্রে উচ্চারণের প্রভাবে র-ধ্বনি আসতে পারে সেক্ষেত্রে এই চিহ্নটি র নির্দেশ করছে। কিন্তু শব্দের আদ্যক্ষরে বা উচ্চারণের প্রভাবেও যেক্ষেত্রে র-ধ্বনির আগম অসম্ভব সেক্ষেত্রে, ড. আবদুল কাইউমের মত সমর্থন করে, এই চিহ্নটিকে যুক্তব্যঞ্জন-নির্দেশক এক প্রকার মাত্রাচিহ্ন বলেই মনে করা যেতে পারে।

(১.১১) যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলির যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন :

(১.১১.১) ১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : বিক্ষাত।

(১.১১.২) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে এই অসংগতি রয়েছে বহুক্ষেত্রে। যেমন : সর্ন্ন্য, উর্চ্চা, মুর্ধ, মর্দ্ধে, দৃতিয়, বিক্ষাত, কার্ত্ত্যায়নি, স্বরোবর ইত্যাদি।

(১.১১.৩) ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : সরণ, গুপ্ত, সাক্ষ্যাত, মুগ্ধ, ব্যাখ্যান, বিহভোল, প্রত্বিব্রতা ইত্যাদি।

(১.১১.৪) ১০৭২ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। সন্ধ্যা/সন্ধা, তিপ্ত/তৃপ্ত/তৃপ্ত, লক্ষ্মি/লক্ষি, ব্যর্থ/বের্থ, বিস্বয়/বিস্ময়, বৃত্যান্ত/বিত্তান্ত, সন্ধ্যান, উর্চ্চশ্রবা/উর্চ্চ্যশ্রবা ইত্যাদি।

(১.১১.৫) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে একই অসংগতি রয়েছে : সিক্ষা/সিক্ষ্যা, দ্বিজ/দিজ, সংক্ষ/সংখ, বিগ্য, গ্যাতি, দির্ব্ব/দির্ব্য/দির্ব্ব্য, অস্ম/অস্ব/অশ্ব, দ্বাদস/দাদশ, অগ্যাত/অজ্ঞাত. বিত্যান্ত/বির্ত্তান্ত, সান্তনু, সতিত্য, জিজ্ঞাশে/জিগ্যাসিল ইত্যাদি।

(১.১১.৬) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে পাই : সাম/ষ্যাম, কিষ্ণ/কৃষ্ণ, সৈন/সৈন্য, /সন্য, মিত্র্য/মিত্র, মর্দ্ধে, সনমুখে/সম্মুখে, উদ্‌গার/উদ্‌গাব, পারবতে, যুদরসন, সাহাজ্জ, কল্লান, পুর্ব্বকথা ইত্যাদি।

(১.১১.৭) ২৪৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাই : মুখ্য/মুর্খ্য, চতুর্দ্ধস ইত্যাদি।

(১.১১.৮) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : পূর্ন্ন/পুর্ন্ন, মিথা/মির্থ্যা/মিথ্যা/মির্থা, মর্দ্ধে/মধ্যে/মর্দ্ধ্যে, সান্তনা, উপাক্ষান, বন্দ্যাবন/বৃন্দাবন ইত্যাদি।

(১.১১.৯) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : য়াক্ষান, বৃহষ্পতি ইত্যাদি।

(১.১১.১০) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে পাই : মিথা, বিক্ষাত. অর্জুন/অর্জ্জুন, ধ্রতরাষ্ট/ধ্রষ্টদ্যম্ন/ধ্রষ্টদ্রম্ন ইত্যাদি।

(১.১১.১১) ৫১৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : মর্দ্ধে/মর্দ্ধাম ইত্যাদি।

(১.১১.১২) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে এই অসংগতি রয়েছে : সুজ্য, বিক্ষাত, ধনুর্দ্ধর ইত্যাদি।

(১.১১.১৩) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে দু-এক স্থলে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন : জয়র্দ্ধনি।

(১.১১.১৪) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন : দিব্য/দির্ব্ব, মর্দ্ধে/মধ্যে, মিথা/মির্থা, দুঃখ দুস্থ, শ্রাদ্ধ/সার্দ্ধ/প্রার্দ্ধ, তৃষ্ণ্যা, ব্যাখ্যা/ব্যাক্ষা, আখ্যান/আক্ষান, উদ্যোগ/উর্য্যোগ ইত্যাদি।

(১.১১.১৫) ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : অক্ষাতি, ক্ষুধা ইত্যাদি।

(১.১১.১৬) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে পাই : রক্ষ্যা, দিক্ষ্যা, বিক্ষাত, প্রত্তক্ষে. মর্য্যাদা, বিত্তান্ত, পর্যন্ত, পজ্জন্ত, গোবর্দ্ধন, আকাংক্ষ্যা, উপার্জ্জ্যন, পূর্ব্ববান, পূর্ন্যবান ইত্যাদি।

(১.১১.১৭) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ রার্ক্ষ্যশ/রাক্ষ্যশ, ক্ষেতি/ক্ষ্যাতি, রোক্ষা/রোক্ষ্যক, বৃর্ক্ষ্য, চির্ত্ত্য, অর্ক্ষ্যয়, তর্ক্ষ্যক ইত্যাদি।

(১.১১.১৮) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ জগন্যাথ/জগন্নাথ, ভায্যা/ভাজ্যা, প্রতিব্রতা ইত্যাদি।

(১.১১.১৯) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ য়হল্লা, দুর্গ্যতি ইত্যাদি।

(১.১১.২০) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা কোথাও কোথাও রয়েছে। যেমন ঃ কৃদ্ধ/কুর্দ্দ, জলন্ত, বিক্ষাত ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, লিপিকরগণ যুক্তব্যঞ্জন গঠনকালে বর্ণ সন্নিবেশের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শুদ্ধতা বক্ষা করেছেন। অর্থাৎ সঠিক বর্ণ সন্নিবেশ করেছেন। আবার কোথাও কোথাও বা যদৃচ্ছাক্রমে অনুপযুক্ত বর্ণও যুক্ত করেছেন। ফলে বানানে একরূপতা রক্ষিত হয়নি। আসলে যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান বর্ণগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ।

(১.১২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুথির বানানে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন ঃ

(১.১২.১) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সংঙ্খেপ, সংঙঘ, সংঙ্কা, টংঙ্কার ইত্যাদি।

(১.১২.২) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ঝংঙ্কারিয়া, সংঙ্খা, সংঙ্খ, সংন্ততি ইত্যাদি।

(১.১২.৩) ২৪৮ সংখ্যক পুথিতে দু-এক স্থলে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ অসংঙ্খ।

(১.১২.৪) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সংঙ্কা, সংঙ্খ ইত্যাদি।

(১.১২.৫) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ সংঙ্খ, অহংঙ্কার, বংঙ্গ, সংঙ্কোচ, অসংঙ্খ, সংঙ্গে ইত্যাদি।

(১.১২.৬) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ অসংঙ্খ।

(১.১২.৭) ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সংঙঘ।

(১.১২.৮) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সংঙ্খ।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, নাসিক্য ব্যঞ্জন সহযোগে যুক্তব্যঞ্জন গঠনের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অভাব এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ। তবে এই প্রবণতা খুব ব্যাপক নয়।

(১.১৩) কোনো কোনো পুথিতে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ প্রয়োগ করায় বানান-বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আর একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে।

অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ

(১.১৩.১) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাথে।

(১.১৩.২) ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ বেঢিয়া, অস্থ ইত্যাদি

(১.১৩.৩) ১০৭২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাথ, ভারথ, তৈলক্ষ্য, কথোক্ষণ, কথোদিন, অভিসেখ, মহাভারথ ইত্যাদি।

(১.১৩.৪) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ কথোক্ষন।

(১.১৩.৫) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতেও 'কথোক্ষন' বানানটি পাচ্ছি।

(১.১৩.৬) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাথ, অঝুত ইত্যাদি।

(১.১৩.৭) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাথ, হাথি, সমাঝ ইত্যাদি।

(১.১৩.৮) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই 'হাথ' বানানটি।

(১.১৩.৯) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাথে, শভাই, শভার ইত্যাদি।

(১.১৩.১০) ২০৫ সংখ্যক পুথিতেও এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ঃ হাথে, পয়ে, সমাঝ, কথোক্ষন, কথোদিন, ইথিমধ্যে ইত্যাদি।

(১.১৩.১১) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ সমাঝ, শভে ইত্যাদি।

(১.১৩.১২) ৫৭৪ সংখাক পুথিতে পাই ঃ জাথে, কথোক্ষন ইত্যাদি।

(১.১৩.১৪) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে পাই 'সভে' বানানটি।

(১.১৩.১৫) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ হাথে, ভয়ার্থ, কখক্ষণ, মহাভারথ।

মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ ঃ

(১.১৩.১৬) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : সম্বাসনা, উপস্তিত ইত্যাদি।

(১.১৩.১৭) ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে রয়েছে 'গৃহস্ত'।

(১.১৩.১৮) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই : বিদর্ব্ব, অপরাদ ইত্যাদি।

(১.১৩.১৯) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে পাই : শীগ্র, নিদাগ ইত্যাদি।

(১.১৩.২০) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : 'গৃহস্ত'।

(১.১৩.২১) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ যুধিষ্টির, সিগ্রগতি ইত্যাদি।

(১.১৩.২২) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই 'সিগ্র'।

(১.১৩.২৩) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে পাই 'আযাড়'।

(১.১৩.২৪) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে পাই 'সম্বাসিয়া'।

(১.১৩.২৫) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতেও এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ সিগ্র, ইন্দ্রপোস্ত ইত্যাদি।

(১.১৩.২৬) ৩৮১ সংখ্যক পুথিতে পাই 'পুরুশাও'।

(১.১৩.২৭) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে পাই 'মেগনাদ'।

(১.১৩.২৮) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই 'আসাড়'।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ বেশ কিছু পুথিতে রয়েছে। তবে তা

সংখ্যায় খুবই কম।। এ থেকে অনুমান করা যায়, উচ্চারণগত শিথিলতার কারণেই বিশেষ কয়েকটি শব্দের বানানে এই ধরনের ভ্রান্তি ঘটছে।

(১.১৪) শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে লিপিকরদের সঠিক ধারণার অভাব পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন ঃ

(১.১৪.১) ১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই : নৃর্ত্তকি, জমনার, অধ্যাপন, যুকোমাব ইত্যাদি।

(১.১৪.২) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ বেস্ত, বেগ্র, শ্চান, বেথিত, দুতিয়, প্রভিতি, প্রিতিজ্ঞা, গঙ্গাস্চান ইত্যাদি।

(১.১৪.৩) ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে পাই জোথা, ব্রেহ্ম, নির্পেক্ষ, বিহভোল ইত্যাদি।

(১.১৪.৪) ১০৭২ সংখ্যক পুথিতে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ ধুজর্ঝটী, তৈলক্ষ্য, তৈলক্য, সৈন্ন্য/সন্ন ইত্যাদি।

(১.১৪.৫) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই শোত্রু/ শত্রু, জোগ্য/জগ্য, শৈন্য, মিত্তু, প্রিতিগ্যা, পৃতিকার, চতুস্মাশ ইত্যাদি।

(১.১৪.৬) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ দিঢ়, নিপ, বেথিত, দুজ্জয়, পচণ্ড, নিপতি, পতাপ, তিতিয়, পতিজ্ঞা, দোপদি, দুজ্জধন, তিভুবন, পিতামোহ, আরহন/আরোহন, বিকদর ইত্যাদি।

(১.১৪.৭) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ তোমি/তুমি, সপত, গিধিনি, সিঞ্চেবে, বর্ল্লব, পৌরস, ভক্তবর্চ্ছলা, অন্তধ্যান ইত্যাদি।

(১.১৪.৮) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই কোবিচন্দ্র।

(১.১৪.৯) ৫৮৭ সংখ্যক পুথিতে পাই আওভান, পুষণ্ণ, কিংসোক ইত্যাদি।

(১.১৪.১০) ৫১২ সংখ্যক পুথিতে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ মোহিসী/মহিসি, দিস্টি ইত্যাদি।

(১.১৪.১১) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে পাই চেখা, বেগ্র, কোপী, পৌরস, প্রভিতি গিধিনি ইত্যাদি।

(১.১৪.১২) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতে পাই অনিরুদ্র, যুবন্ন, নিত্য ইত্যাদি।

(১.১৪.১৩) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ নির্ত্ত, তর্ত্ত, বের্থ, তপ্রকিতি, বেবহার, অন্যোসন, চণ্ডিমণ্ডব, পর্ষবত্তি, অর্গগন্য, পরসুরাম, পকসরাম ইত্যাদি।

(১.১৪.১৪) ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই সোমান, বেগ্রতা, সোমাচার, অন্তধ্যান ইত্যাদি।

(১.১৪.১৫) ৭৫১ সংখ্যক পুথিতে পাই নিত্য (এখানে শব্দটি নৃত্য), ছিস্টি, কোপীত, পয্যন্ত, সাবিত্তি, প্রভিাণ্ড, রাজসই ইত্যাদি।

(১.১৪.১৬) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই কির্ছা, বেস্ত, আবের্থ, অবুস্য, নৃভিতে, পর্ত্যয়, কুনক্রমে ইত্যাদি।

(১.১৪.১৭) ৩৮১ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ পোশু, মোর্দ্ধে, পৌরশ, গোরুড, শোহিত, শুমুদ্র, যেজুধ্যা, পুনুর্ব্বার, পুরশাত্ত, পুরুশরাম ইত্যাদি।

(১.১৪.১৮) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতে পাই মাজ্জনা, সুবন্য, সমুদ্র, উপগার ইত্যাদি।

(১.১৪.১৯) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে পাই মদ্ধ, কাজ্য, শুমুদ্র, পৌরস, জোবন, পোলস্ত, ধনুব্বান, সুপ্পনখা ইত্যাদি।

(১.১৪.২০) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই অসংগতি রয়েছে। যেমন সন্ন্য, সুমুদ্র, দ্রোপদী, পরিপুন্ন ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায়, উচ্চারণ সম্পর্কে লিপিকরদের ধারণার স্পষ্টতা বা বিভিন্নতা থেকেই বানানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত, এই বিশৃঙ্খলা কোথাও লিপিকরের ব্যক্তিগত উচ্চারণ থেকে সৃষ্ট, কোথাও বা আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত।

(১.১৫) অসমাপিকা ক্রিয়ার (এমন কি একই ক্রিয়ারূপের) বানানের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন ঃ

(১.১৫.১) ১২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই হৈয়া, দেখিয়া, বসিয়া, উঠিয়া , ছাড়িআ ; ষুনিএগ, জন্মিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.২) ৫৯৫ সংখ্যক পুথিতেও এই বিভিন্নতা চোখে পড়ে। যেমন ঃ দেখিয়া, করিয়া জুড়িআ, ধরিআ, সাজিআ, আসিআ, পাইআ, গিআ, লইআ, দেখিআ, বুঝিআ, সমর্প্পীআ ; হয়্যা, নয়্যা, পায়্যা, দণ্ডায়্যা, চাহিয়্যা, পালাইয়্যা, ইত্যাদি।

(১.১৫.৩) ৩২৫ সংখ্যক পুথিতে পাই শর্মর্পিয়া, ছাড়িয়া, পঢিয়া, গুজিয়া, বেঢ়িয়া ; হএগ, পাএগ, জাএগ, হইএগ, ভ্রমিএগ, জন্মিএগ, সুনিএগ, আনিএগ, জানিএগ, ধরিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.৪) ১০৭২ সংখ্যক পুথিতেও বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন করিয়া, চিন্তিয়া, জুড়িযা, বুঝিয়া, কাটায়া, আস্বাসিয়া ; হএগ, জানিএগ, সুনিএগ, হাসিএগ, টানিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.৫) ৬৪২ সংখ্যক পুথিতে পাই ধরিয়া, হইয়া, জানিয়া, সুনিযা, বুঝিয়া, জুড়িয়া, কাটিয়া, চিন্তিয়া, ফুটায়া, চড়াইয়া, বিচারিয়া, আস্বাসিয়া ; নিরখিয়া। হয়্যা, লয়্যা, পায়্যা ; সুনিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.৬) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতে পাই দেখিয়া ; হইআ, দেখিআ ইত্যাদি।

(১.১৫.৭) ২৪৮১ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা পাই লাগীয়া, আসিযা ; চায়্যা, ধায়্যা; সুনিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.৮) ৫৩৫ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ পুজিয়া, হইয়া, বুঝিয়া, কান্দিয়া, জালিয়া, ছড়াইযা , ধ্যয্যা, হৈয়্যা, ধর্য্যা, লয়্যা, ডুব্যা, দিয়্যা, হাসিয়্যা, বসিয়্যা; সুনিএগ, আনিএগ, গুনিএগ, জিনিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.৯) ৫০৮ সংখ্যক পুথিতে পাই পরিআ, ধরিআ; হৈএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.১০) ১৪৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাই আসীয়া, করিয়া, বির্বরিয়া ইত্যাদি।

(১.১৫.১১) ৫৭৮ সংখ্যক পুথিতেও এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ঃ হাসিয়া, জানিযা, করিয়া, হৈয়া, লৈয়া; করিআ, জানিয়া; সুনিএগ ইত্যাদি।

(১.১৫.১২) ৫১৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ; দিয়া করিআ, হইআ, নিস্তারিআ ; হয়্যা; হআ্যা পাআ্যা লৈএগ্র, জানিএগ্র শুনিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৩) ৫৮৬ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ পীয়া, করিয়া, সাজিয়া, কাটায়া, আসীয়া, উঠিয়া, উড়াইয়া ; হয়্যা, লয়্যা পায়্যা, ধায়্যা, লোটায়্যা ; সুনিএগ্র, গুনিএগ্র, জানিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৪) ৩১০০ সংখ্যক পুথিতেও এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ঃ দেখিয়া, শেবিয়া, উঠাইযা, জিআইয়া ; দিয়া, দেখিয়া, হইয়া, ধরিয়া ; ডুব্যা, ধায়্যা, ছাড়্যা, দেখ্যা, টান্যা, হয়্যা, চায়্যা, আন্যা, বশায়্যা ; ষুনিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৫) ২০৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ; জানিয়া, হাসিয়া, দেখিয়া, সুইয়া, স্পর্সিয়া, আস্বাসিয়া ; লয়্যা, হয়্যা ; হইএগ্র, করিএগ্র, জানিএগ্র, সুনিএগ্র, জিনিএগ্র, চিনিএগ্র, আনিএগ্র, ভ্রমিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৬) ৩৮৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ হাসিয়া, শুনিয়া, দেখিয়া ; পায়্যা, হয়্যা, কর্যা, ডাক্যা ইত্যাদি।

(১.১৫.১৭) ৫৭১ সংখ্যক পুথিতে বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে। যেমন ঃ আনিয়া, সুনিয়া, মারিযা, সুনিয়া, য়াসিয়া, হাসিয়া, লুটীয়া, চাহিযা ; হয়্যা, পায়্যা, লোটায়্যা পাখালিয়্যা, পালাইয়্যা ; জিনিএগ্র, জানিএগ্র, সুনিএগ্র, প্রণমিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৮) ৫৭৪ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ ছাড়িয়া, ধরিয়া, উড়িয়া, বেড়িয়া, বান্ধিয়া, আস্বাসিয়া ; হইআ, করিআ : ঘরিএগ্র, হরিএগ্র, জিনিএগ্র, রান্ধিএগ্র, কুপিএগ্র, চাহিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.১৯) ৩৮১ সংখ্যক পুথিতেও এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ শুন্যা, কর্যা, আন্যা, ডাক্যা, মাগ্যা, তর্যা, আশ্যা, লাগ্যা, দান্ডায়্যা ; শুনিএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.২০) ৩৮০ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ খাইযা , করিআ, বসিআ, কুড়াইআ, ফিরিআ, যাসিআ, দিআ, হইআ, চড়িআ, লাগিআ ; বস্যা ইত্যাদি।

(১.১৫.২১) ৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন ঃ বসিয়া ; ঘুরিআ, দিআ, গিআ, বান্ধিয়া ; ধর্যা, বস্যা, য়ান্যা ; গিএগ্র, হএগ্র, লএগ্র, ভাঙিএগ্র, বাজাইএগ্র ইত্যাদি।

(১.১৫.২২) ৫৮৫ সংখ্যক পুথিতেও এই অসংগতি ধরা পড়ে। যেমন ঃ কান্দিয়া, চিন্তিযা, ধরিযা, ভরিয়া, লইয়া, টানিয়া, বান্ধিয়া, দিয়া, হৈযা ; হয়্যা, পায়্যা ; লএগ্র, জিনিএগ্র ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে অসমাপিকা ক্রিয়ার চার রকম রূপভেদ পাওয়া যায়। যেমন ঃ হইয়া, হইআ, হয়্যা, হইএগ্র। এই ধরনের রূপভেদের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। যেক্ষেত্রে ইয়া বা ইআ প্রত্যয় যুক্ত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সম্ভবত পূর্ব প্রচলিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। ইএগ্র প্রত্যয়যুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আঞ্চলিকতার প্রভাবে স্বতোনাসিক্যীভবন ঘটেছে। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির মধ্যবর্তী একটি স্তর লক্ষ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে লিপিকরের সমকালীন উচ্চারণরীতির প্রভাব পড়েছে বলেই মনে হয়।

উপরে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রে আমরা বাংলা একাদশ শতাব্দীর বানান বিশৃঙ্খলার কতকগুলি ধারা পেলাম। এই ধারাগুলি পরবর্তী শতকে কতটা অনুসৃত হয়েছে বা কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা দ্বাদশ শতাব্দীর কিছু নির্বাচিত পুথির বানান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১১০১ বঙ্গাব্দ—১২০০ বঙ্গাব্দ

(১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ — ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

এই সময়সীমার বানান বিশৃঙ্খলার ধারাগুলি বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে নিম্নলিতি পুথিগুলি ঃ

১। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। গুনরাজ খাঁ। লিপিকর - শ্রীলালমোহন দাস মিত্র। অঞ্চল - বিষ্ণুপুর। সন ১১০৬ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ১২২৮।

২। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর - শ্রীমণীরাম দেবশম্মণ। অঞ্চল - হাতিসালা, সন - ১১০৬ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২।

৩। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লিপিকর - শ্রী স্বরূপ দাস। অঞ্চল - বাঁকুড়া। সন ১১০৮ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ১৩১৬।

৪। বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন। লিপিকর ঃ শ্রীমণীরাম দেবশম্মন। অঞ্চল - প্রগনে রুকুনপুর। সন ১১০৯ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৪৬৩।

৫। তত্ত্ববিলাস। বৃন্দাবন দাস। লিপিকর - শ্রী গদাধর আকুলি। অঞ্চল - সাং. ভুস্তড়া। সন ১১২৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৩১৮।

৬। গোবিন্দমঙ্গল (দৌপদীর বস্ত্রহরণ)। দ্বিজ কবিচন্দ্র। লিপিকর - শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার। অঞ্চল - অজ্ঞাত (লিপিকর নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করেন নি। তবে এই পুথির মালিকের অঞ্চল জানিয়েছেন পাত্রসায়ের। এ থেকে মনে হয় এই পুথির লিপিকরের অঞ্চলও বাঁকুড়া হওয়াই সম্ভব)। সন ১১৩০ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৩৮৭।

৭। রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর - অজ্ঞাত। লিপিকাল - অজ্ঞাত। সন ১১৪২ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৫৩।

৮। চৈতন্যভাগবত (অন্ত্য খণ্ড)। বৃন্দাবন দাস। লিপিকর - বাবুরাম দাসশর্ম্মণঃ। অঞ্চল - ইন্দ্রপ্রস্থ। সন - ১১৪৩ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২১৭।

৯। মহাভারত (সৌপ্তিক পর্ব্ব)। কাশীরাম দাস। লিপিকর - শ্রীরামহরি দত্ত। অঞ্চল - সাকিম - ঝজকাডাঙ্গা, পরগনে - সাহাবাদ। সন ১১৬৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা -৫৯১।

১০। জগন্নাথ বিজয়। মুকুন্দভারতী। লিপিকর - শ্রীচন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরি। অঞ্চল - শাং দরিআর। সন - ১১৭৩ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২৮৩।

১১। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী (১০ম স্কন্ধ) রঘুনাথ ভগবতাচার্য্য। লিপিকর - শ্রীওলারাম দাস। অঞ্চল - পরগণে-কাটারম। সন -১১৭৩ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২৬৯।

১২। রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর - শ্রী কুড়ারাম দাস চন্দ। অঞ্চল - সা হাজীপুর। সন - ১১৭৩ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৫৪।

১৩। রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড) কৃত্তিবাস। লিপিকর - অজ্ঞাত, অঞ্চল - অজ্ঞাত। সন - ১১৭৭ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৫৫।

১৪। রসকদম্ব (বিদগ্ধমাধব)। যদুনন্দন দাস। লিপিকর - শ্রী গৌরহরি দাস ঘোষ। অঞ্চল - সাং উদয়গঞ্জ। সন - ১১৮২ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২৯৯।

১৫। রসতত্ত্বকল্প। রাধামোহন দাস। লিপিকর - শ্রীচৈতন্যচরণ দাস। অঞ্চল - সাকীম - রামজীবনপুর, পরগনে - ষরকোনা। সন - ১১৮৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৩৩৯।

১৬। চণ্ডীকাব্য। মুকুন্দরাম। লিপিকর - শ্রীখোসল দেবশর্ম্মন। অঞ্চল - সাকিম পরগনে - গনকর দক্ষীনপাড়া। সন - ১১৮৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৫১৯।

১৭। গোবিন্দচরিত (গোবিন্দ লীলামৃত)। যদুনাথ দাস। লিপিকর - শ্রীহরিহর দাস ঘোষ। অঞ্চল - অজ্ঞাত। সন - ১১৯১ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২৯৫।

১৮। মহাভারত (সভাপর্ব)। সঞ্জয়। লিপিকর - গঙ্গাপ্রসাদ দেব। অঞ্চল - সাং. পং মাহামুদ আবাদ। সন - ১১৯২ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ১৬৪।

১৯। রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর - শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণ। অঞ্চল - মোকাম কৃষ্ণপুর, পরগনে - ইসলামপুর। সন - ১১৯৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ১১৪৪।

২০। অঙ্গদেব রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র। লিপিকর - শ্রী সিবনাথ চক্রবর্তি শর্ম্মণ। অঞ্চল - সাকিম - কৃষ্ণপুর, পরগনে জুঝারসিংহপুর। সন - ১১৯৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৪৪৬।

২১। প্রার্থনা। নরোত্তম দাস ঠাকুর। লিপিকর - শ্রীযুকদেব দাস। অঞ্চল - সাং হুগলি। সন - ১১৯৮ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ৪৯৬।

২২। চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লিপিকর - গোপীদাস। অঞ্চল - অজ্ঞাত। সন - ১১৯৯ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা ২৪৩।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন লিপিকরের লিপি করা উপরিবর্ণিত পুথিগুলি পর্যবেক্ষণ করলে পূর্ববর্তী শতকের বিশৃঙ্খলার ধারাগুলি বর্তমান শতকেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। তবে কোনো কোনো ধারার অনুপাত আলোচ্য শতকেও অপরিবর্তিত আছে। আবার কোনো কোনো ধারার অনুপাত হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসকল ধারার অনুপাত অপরিবর্তিত আছে, সেই সকল ধারা এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করে উল্লেখ করা হল মাত্র। যেমন ঃ

(২.১) শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'য়'-বর্ণের স্থানে, সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্ববর্ণের ব্যবহার এই শতকেও প্রায় সকল পুথিতে লক্ষ করা যায়।

(২.২) ই - ঈ বা তাদের কার চিহ্ন প্রযোগের ক্ষেত্রে লিপিকরের স্বেচ্ছাচারিতা এই শতকেও একই রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

(২.৩) উ - ঊ বা তাদের কার চিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেচ্ছতা এখানেও লক্ষণীয়।

(২.৪) শিস্ - ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম এই শতকের পুথিতেও লক্ষ করা যায় না। একই বানানে 'শ', 'ষ', 'স'-এর নির্বিচার প্রয়োগ এখানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

(২.৫) রেফ্-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত এই শতকেও সমানভাবে লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এখানেও অনেক ক্ষেত্রে মূলগতভাবে বানানে দ্বিত্ব না হলেও নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ রেফ্ আছে বলেই দ্বিত্বের ব্যবহার হয়েছে।

(২.৬) যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলির যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে এই শতকের পুথির বানানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

(২.৭) শব্দে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার এই শতকের অধিকাংশ পুথিতেই লক্ষ করা যায়।

(২.৮) শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব পূর্ববর্তী শতকের ন্যায় এই শতকের বানানেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

(২.৯) অসমাপিকা ক্রিয়ার (এমন কি একই ক্রিয়ারূপের) বানানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা এই শতকের পুথিতেও দেখা যায়।

এবারে, পূর্ববর্তী শতকের যে সকল ধারার আনুপাতিক পরিবর্তন এই শতকে লক্ষ করা যায়, সেই ধারাগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যেমন ঃ

(২.১০) শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণের স্থানে ঐ স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার চিহ্নের সহযোগে য়-বর্ণের ব্যবহার পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় এই শতকের পুথিতে অনেক কম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(২.১০.১) ১১০৬ বঙ্গাব্দের ১২২৮-সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা একেবারেই লক্ষ করা যায় না।

(২.১০.২) ১১০৬ একই বঙ্গাব্দের ২-সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ য়ন্ন, য়তি, য়র্ঘ্য, রংশ, য়মৃত, য়গস্ত, য়জোধ্যা, য়নুপায়, য়ংশুমান ইত্যাদি। তবে এর অনুপাতে ব্যতিক্রমই বেশি। যেমন ঃ অর্ঘ্য, অগস্ত্য, অজোধ্যা, অসুর, অমৃত, অবস্য, আস্বাষ, আশীঞা, আনিঞা, অদ্ভুত, অন্তর্যামি, আদেশীল, আশিবেন, আনন্দীত, অধিকারী, অনুসারে ইত্যাদি।

(২.১০.৩) ১৩১৬ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা দু-এক স্থলে মাত্র লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ য়ানিস, য়াচার্য্য ইত্যাদি।

তবে এর অনুপাতে বাতিক্রমী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ আদিতে স্বরবর্ণের প্রয়োগই বেশি। যেমন ঃ আদী, অন্ত্য, অশ্রু, অখিল, আশ্চর্য্য, আচার্য্য, আস্বাদন, আনন্দীত, আগমণ, অনুক্ষণ, আসির্ব্বাদ ইত্যাদি।

(২.১০.৪) ৪৬৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা দু-একটি ক্ষেত্রে মাত্র লক্ষ করা যায়। ব্যতিক্রমই বেশি।

(২.১০.৫) ৩৮৭ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা দু-একটি স্থলে রয়েছে। যেমন ঃ য়পমান। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের প্রয়োগই রয়েছে। যেমন ঃ আর, আপন, আশ্চর্য্য, অসেষ, অসূচি, অমূর্ল্য, অবসেষ, অপমান ইত্যাদি।

(২.১০.৬) ৫৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা কোথাও লক্ষ করা যায় না।

(২.১০.৭) ২১৭ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা প্রায় চোখেই পড়ে না।

(২.১০.৮) ২৮৩ সংখ্যক পুথিতে শব্দের আ দিতে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই স্বরবর্ণের যথোচিত প্রয়োগ লক্ষ করি।

(২.১০.৯) ২৬৯ সংখ্যক পুথিতে শব্দের আদিতে স্ববর্ণের প্রয়োগই রয়েছে।

(২.১০.১০) ৫৪ সংখ্যক পুথিতেও শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

(২.১০.১১) ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ৫৫-সংখ্যক পুথিতে শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে য় - বর্ণের প্রয়োগ কোনো স্থানেই লক্ষ করা যায় না।

(২.১০.১২) ২৯৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা নেই বললেই চলে।

(২.১০.১৩) ৩৩৯ সংখ্যক পুথিতে কোথাও কোথাও এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ য়েই, য়েক, য়েইত, য়েকে, য়েইসব, য়াচরণ ইত্যাদি।

এই অনুপাতে ব্যতিক্রম বেশি। যেমন ঃ এত, অংস, অদ্বৈত, আচার্য্য, ঈশ্বর, উল্লাস, অজোগ্য, অষুচি, আক্ষ্যান, অভিলাস, অন্তধ্যান, আস্বাদন, অধিশ্বর ইত্যাদি।

(২.১০.১৪) ৫১৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় না।

(২.১০.১৫) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে সর্বক্ষেত্রেই প্রায় শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের যথোচিত ব্যবহার রয়েছে।

(২.১০.১৬) ১৬৪ সংখ্যক পুথিতে কোথাও এই প্রবণতা দেখি না। সর্বত্র শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের যথোচিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(২.১০.১৭) ১১৪ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা দেখা যায় না।

(২.১০.১৮) ৪৯৬ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা প্রায় নেই বললেই চলে।

(২.১০.১৯) ২৪৩ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় না।

তবে এই শতাব্দীর কয়েকটি পুথিতে শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে সেই বর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার চিহ্ন যুক্ত য়-বর্ণের আধিক্য রয়েছে। তবে এই সকল ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে।

(২.১০.২০) ৩১৮ সংখ্যক পুথিতে পাই : য়তি, য়ন্য, য়ন্ধ, য়ন্ত, য়াচার, য়ধিক, য়গম, য়ন্তর, য়র্জুন, য়নিত্য, য়াপন, য়গোচর, য়না[illegible]স, য়নুমান, য়াপনার, য়বতার, য়ষ্টাদশ, য়বিরত, ইত্যাদি।

এর মধ্যে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ঃ আপন, আনন্দ, অবিরত, অবতির্ন্য ইত্যাদি।

(২.১০.২১) ৫৯১ সংখ্যক পুথিতে বহুক্ষেত্রে শব্দের আদিতে য়-বর্ণ রয়েছে। যেমন ঃ য়গ্রেতে, য়বধি, য়ামি, য়র্দ্ধ, য়াজি, য়নিল, য়াছিল, য়চল, য়ন্যায়, য়গ্রজ, য়ঙ্গেতে, য়ধম, য়স্ত্র, য়তিসয়, য়স্মথামা, য়নুক্ষণ, য়চেতন, য়ন্যাসন ইত্যাদি।

তবে এক্ষেত্রেও বহু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন ঃ আমি, আজি, আকাস, আশ্চর্য্য ইত্যাদি।

(২.১০.২২) ৪৪৬ সংখ্যক পুথিতে বহুক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ য়ার, য়ামি, য়স্ব, য়াজ্ঞা, য়ান্যা, য়ামার, য়র্জ্জুন, য়রূন, য়সোক, য়হংকার, য়ানন্দিত, য়নুসৃতা ইত্যাদি।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল, শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে সেই বর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্ন যুক্ত য় বর্ণের ব্যবহার পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে এই শতকে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই শতকের আলোচ্যমান ২২টি পুথির মধ্যে মাত্র ৩টি পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও অনেক।

(২.১১) (ঋ) রি- ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা রকম বিশৃঙ্খলা এই শতকের পুথিতে অনেক কম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(২.১১.১) ১২২৮ সংখ্যক পুথিতে (ঋ) রি ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ পৃয়া, ত্রিসা, ত্রিতিয়, প্রিথিবি ইত্যাদি।

এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। অর্থাৎ রি ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেমন ঃ সৃষ্টি, প্রাণ, তৃসা, ক্রিড়া, বৃষ্টি, দৃঢ়, বৃষ, দৃড়, স্ত্রী, পৃথিবি, তৃতিয়, শৃজিলি, ত্রিভুবন, বৃকাসুব ইত্যাদি।

(২.১১.২) ২ সংখ্যাক পুথিতে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা দু-একটি স্থানে দেখা যায। যেমন ঃ পৃথিবি, শ্রীষ্ট ইত্যাদি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (ঋ) রি ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগ দেখি। যেমন শৃঙ্গ, বৃদ্ধ, বৃষ্টি, দৃষ্টী, প্রিত, পীতৃ, পৃথিবী, গ্রিব, নৃপতী, বিস্বশ্রবা ইত্যাদি।

(২.১১.৩) ১০১৬ সংখ্যক পুথিতে এই বিভ্রান্তি দু-একটি ক্ষেত্রে বযেছে। যেমন ঃ ত্রিতীয়, *প্রিথিবি ইত্যাদি। এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বেশী।* যেমন ঃ ক্রিড়া, সীঘ্র, সৃষ্টি, *নৃসিংহ, পৃথিবী, অস্পৃস্য, মৃত্তিকা, প্রবিষ্ট, ক্রন্দন, প্রসান্ত ইত্যাদি।*

(২.১১.৪) ৪৬৩ সংখ্যক পুথিতে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে না। লিপিকর সচেতনতার সঙ্গে রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগ করেছে। যেমন ঃ সুগ্রীব, বিষ্ণুপ্রীয়া ইত্যাদি।

(২.১১.৫) ৩১৮ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা দু-একটি ক্ষেত্রে মাত্র দেখা যায়। যেমন ঃ কৃয়া। এছাড়া প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগ দেখা যায়।

(২.১১.৬) ৩৮৭ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা কয়েকটি ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ ত্রিষা, স্রিগাল, ধ্রতরাষ্ট ইত্যাদি। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন ঃ কৃষ্ণ, নৃপ, প্রতিফল ইত্যাদি।

(২.১১.৭) ৫৩ সংখ্যক পুথিতে মাত্র দু-একটি স্থানে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন পৃত। এছাড়া সর্বত্রই প্রায় যথোচিত প্রয়োগই রয়েছে।

(২.১১.৮) ২১৭ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা দু-একটি ক্ষেত্রে থাকলেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন ঃ দৃব্য, ঘ্রত, গ্রীহিনি ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম ঃ মৃদঙ্গ, বৃত্ত, বৃদ্ধ, দৃষ্টি, দৃঢ়, নৃত্য, নিবৃত্তি, নিভৃতে, পৃথিবী, ত্রিসুল, প্রবিষ্ট, প্রবেশ ইত্যাদি।

(২.১১.৯) ৫৯১ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা মাত্র দু-এক স্থলে রয়েছে। যেমন ঃ প্রিথিবী, দ্রষ্টদুম্ন ইত্যাদি। এর অনুপাতে যথোচিত প্রযোগ বেশি লক্ষ করা যায়।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ দ্রব্য, কৃপা, পিতৃ, দৃষ্টী, প্রিথিবি, প্রতিজ্ঞা, য়গ্রজ, শ্রীফল, স্ত্রিধর্ম. সদৃসি, মৃত্তিকা, শৃজিল, প্রয়োজন ইত্যাদি।

(২.১১.১০) ২৮৩ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ পৃিয়, পিত্রি, শ্রিষ্টি, বৃিতান্ত, প্রিথিবি, শ্রিজন ইত্যাদি।

তবে এর পাশাপাশি বহু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ সৃষ্টি, শৃষ্ট, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, মৃদঙ্গ, স্রিহরি, পৃথিবী, প্রিয়োজন ইত্যাদি।

(২.১১.১১) ২৬৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা কয়েকটি স্থানে রয়েছে। যেমন ঃ ক্রেপা, দ্রিপ্তি, মৃিত্তিকা, ম্রদঙ্গ, প্রিথিবি ইত্যাদি। আবার পাশাপাশি ব্যতিক্রমও বহু রয়েছে।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : সদৃস, শৃষ্টি, নৃত্ত, দৃড়, জোগিন্দ্র, প্রনিধান ইত্যাদি।

(২.১১.১২) ৫৪ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা থাকলেও তা খুব কম, ব্যতিক্রম বেশী লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ পৃয়া, পৃত পৃদিপ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম বৃষ্টী, দ্রব্য, সৃগ্রিব, প্রসন্ন, পৃথিবি, প্রবেস, চন্দ্রমুখি, ত্রিভুবন ইত্যাদি।

(২.১১ ১৩) ৫৫ সংখ্যক পুথিতে অল্প কয়েকটি স্থলে এই বিশৃঙ্খলা বযেছে। তুলনায় যথোচিত প্রযোগই বেশি। যেমন ঃ পৃতী, ত্রিপ্তি, ষৃগৃিব, প্রিথিবি ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত . পৃথিবি, ষুগ্রিব, সৃষ্টি, ত্রিস, ভ্রষ্ট, বৃক্ষ, ত্রিভুবন, সৃজিলা, ইন্দ্রানি ইত্যাদি।

(২ ১১ ১৪) ২৯৯ সংখ্যক পুথিতে কোনো ক্ষেত্রেই প্রায এই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে না।

(২ ১১ ১৫) ৩৩৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেলেও এর অনুপাতে (ঋ) রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগই বেশি। যেমন ঃ প্রিথিবি, পৃকৃতি, গ্রিহ, প্রিত্রি, গ্রিহস্ত, শ্রীজিল ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পৃথিবী, প্রকৃতি, গৃহিনী, মাতৃ, শৃজিলে, প্রিও, শৃষ্টী ইত্যাদি।

(২ ১১ ১৬) ৫১৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা নেই বললেই চলে।

(২.১১ ১৭) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা থাকলেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও বহু রয়েছে। যেমন ঃ দৃাক্ষা (দ্রাক্ষা). দৃব্য, সৃদাম, প্রিথিবি, প্রাক্রৃত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত . সাস্ত্র, কৃষ্ণ, কৃপা, দৃশ্য, বৃক্ষ, গহ, দৃষ্টি, নৃত্য, ভৃতা, দ্রব্য, বৃদ্ধা, ঘৃত, মৃত্তিকা, ইন্দ্রিয, প্রকাসিতে প্রবিষ্ট, সম্প্রতি. ব্রজেশ্বরী ইত্যাদি।

(২.১১ ১৮) ১৬৪ সংখ্যক পুথিতে দু-একটি ক্ষেত্রে মাত্র এই বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন ঃ পৃয়। এছাড়া সর্বত্রই প্রায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগ বযেছে। যেমন ঃ দৃঢ. ত্রিস, মৃগ, পৃষ্ট, ইন্দ্র, ধৃতবাষ্ট্র, বৃষ্টি, হৃিদএ, নৃপতি ইত্যাদি।

(২ ১১ ১৯) ১১৪ সংখ্যক পুথিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে। যেমন ত্রিন, কৃড়া, গৃষ্ম, প্রিথিবি. পৃিজিলে, ত্রিতিয় ইতাদি।

এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন ঃ মৃত্যু. নৃত্ত, শৃঙ্গ, বৃদ্ধ, দৃঢ়, বৃশ, পৃথিবি, শৃজন. অমৃত, নৃপতী. আকৃতী. ত্রিভুবন, ত্রিপুরারী, বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

(২.১১.২০) ৪৪৬ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা দু-একটি ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন : সুগৃব। অন্যত্র প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যথোচিত প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ সুগ্রিব, ক্রীড়া, পৃষ্ঠ, প্রসাদ, বৃহস্পতি, য়নুসৃতা ইত্যাদি।

(২.১১.২১) ৪৯৬ সংখ্যক পুথিতে এই বিশৃঙ্খলার অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই অধিক। যেমন ঃ ক্রপা, পৃীতি, ভৃমী (ভ্রমি) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : কৃপা, প্রীয়, নিভৃত, ভ্রমিতে, শ্রীজিব, ত্রিভঙ্গ, শ্রীনিবাষ ইত্যাদি।

(২.১১.২২) ২৪৩ সংখ্যক পুথিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা রয়েছে তবে ব্যতিক্রমই বেশি। যেমন ঃ পৃত, ত্রীণ, গৃহীত, ত্রিতীয় ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : কৃষ্ণ, বৃত্তি, দৃঢ়, স্মৃতি, নৃসিংহ, কৃতার্থ, বৃত্তান্ত, নিভৃত, এতাদৃশ, স্পৃহয়তি, বৃন্দাবন, প্রশীদ্ধ, প্রতীতি, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলিতে লক্ষ করা যায়, (ঋ) রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় এই শতাব্দীতে লিপিকরগণ অনেক বেশি সতর্ক। কোথাও কোথাও এই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়লেও তা পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় অনেক কম। বস্তুত এই বিশৃঙ্খলার তুলনায় এই শতাব্দীর পুথিগুলিতে রি-ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণের যথোচিত প্রয়োগের অনুপাতই বেশি। তাই একথা বলা যায়, (ঋ) রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণের প্রয়োগগত বিশৃঙ্খলা এই শতাব্দীতে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(২.১২) 'জ' - 'য' ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শতকে আমরা লক্ষ করেছি, লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জ' ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া এই সময়কার পুথিতে 'য' বর্ণটি এলেও তার প্রয়োগ খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু আলোচ্যমান শতকে (১১০১-১২০০ বঙ্গাব্দ) 'জ' বর্ণের আধিক্য থাকলেও, প্রায় সকল পুথিতে পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে 'য' বর্ণটির প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান। যদিও 'য' বর্ণ-এর প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে যথাযথ নয়, তবু 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য'-বর্ণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(২.১২.১) ১২২৮ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণ এবং 'য' বর্ণের প্রয়োগের অনুপাত প্রায় সমান।

যেমন ঃ 'জ' বর্ণের প্রয়োগিক ক্ষেত্র : জে, জাহার, জার, জদি, জত, জথা, জাহ, জস, জুক্ত, জেন, জম, জোগ, জুদ্ধ, জোদ্ধা, জাইবে, জতেক, জুবতি, অজোগ্য, অর্ন্তজামি ইত্যাদি।

'য' বর্ণের প্রয়োগিক ক্ষেত্র : যোগ, বির্য্য, যুদ্ধ, সূর্য্য, শুর্য্য, কার্য্য, যোগ্য, যুবতি, যসোমতি, সর্য্যা ইত্যাদি।

(২.১২.২) ২ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণেরই আধিক্য। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে 'য' বর্ণের প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে। যেমন ঃ সুর্য্য, কার্য্য, রায্য, অন্তর্যামি ইত্যাদি।

(২.১২.৩) ১৩১৬ সংখ্যক পুথিতে 'জ' ও 'য' বর্ণের প্রয়োগের অনুপাত প্রায় সমান। যেমন ঃ

'জ' বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র : জায়, জল, জীব, জুড়ি, জাই, জার, জবন, জগাই, জীবন, জতেক, জাইব, জাত্রা, জগতদ্‌গুরু, জদ্যপি ইত্যাদি।

'য' ব্যবহারের ক্ষেত্র : যে, যেই, যাহা, যাত্রা, যদি, যুক্ত, যুগ, যাতি, যেষ্ঠ, সূর্য্য, ধৈর্য্য, কার্য্য, পর্য্যন্ত, যাচার্য্য, যৌবন, মাধুর্য্য, যমুনা, ঐশ্বর্য্য, যেষ্টমাস, পর্য্যোটন ইত্যাদি।

(২.১২.৪) ৪৬৩ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণেরই আধিক্য। তবে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ 'য' বর্ণের প্রয়োগও কোথাও কোথাও রয়েছে। যেমন ঃ

'জ' বর্ণের প্রয়োগিক ক্ষেত্র : জার জে, জারে, জাতে জদি, জোড়, জননী, জিনিএগ, জতন, জগন্নাথ, জাহার ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : যে, যাহা,. যতেক, শুর্য ইত্যাদি।

(২.১২.৫) ৩১৮ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণেব আধিক্য থাকলেও 'য' বর্ণের প্রয়োগও রয়েছে যেমন ঃ

'জ' বর্ণেব প্রয়োগিক ক্ষেত্র · জার. জম. জেবা, জদি, জির, জেন, জুগ, জাএগ, সুর্জ্য, জাইতে. জাহাতে, মাধুর্জ্য ইত্যাদি।

'য' বর্ণটির ব্যবহার করা হযেছে এমন ক্ষেত্র : যুগ, কার্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ইত্যাদি।

(২.১২.৬) ৩৮৭ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য' বর্ণের প্রয়োগও রয়েছে। যেমন ঃ জায়. জাতে, জুবা. জাহা. জত. জোগ. জথা. জাহার ইত্যাদি।বার্য্য. আশ্চর্য্য, দুর্যোধন ইত্যাদি।

(২.১২.৭) ৫৩ সংখ্যক পুথিতে 'য' বর্ণেব প্রয়োগ প্রায় লক্ষই করা যায় না। সর্বক্ষেত্রেই প্রায 'জ' বর্ণের ব্যবহাব বয়েছে। যেমন ঃ জে, জাব. সুর্জ, জুর্দ্ধ, জোর্দ্ধা, জত, জারে, জেবা, জদি. জুক্তি. জম. জাহার. জৌবন. জোজন জাইব, জখন, জেমন, অজোধ্যা ইত্যাদি।

(২.১২.৮) ২১৭ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের ন্যায় 'য' বর্ণেরও বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায। যেমন ঃ জে জাত্র জায. জদি, জাবে. জেন, জত্ন, জাই, জুর্দ্ধ. জম, জাইব. জদ্যপী, জাবেন. জাহারে. জেরূপ, জতে জোজনা ইত্যাদি।

'য' বর্ণের প্রয়োগ রয়েছে এমন ক্ষেত্র : যে. যত, যার, যোগ, যুদ্ধ, যেন, যাহা, সূর্য্য, যদ্যপি. যখন, আচার্য্য, যশোদা, যতেক, ঐশ্বর্য্য. যুগল, সৌন্দর্য্য, যাবত, প্রযত্ন, প্রর্যেটন ইত্যাদি।

(২.১২.৯) ৫৯১ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণেরই প্রাধান্য। তবে কোথাও কোথাও 'য' বর্ণটিও রযেছে। যেমন ঃ জার, জুক্তি, জদি, জম, জাই, জত, জেন. জাহা, জাহাতে, জাইবে, জেইজন, জুধিষ্ঠীর ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : যুর্দ্ধ. আশ্চর্য্য, দুযেযাধন ইত্যাদি।

(২.১২.১০) ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের প্রয়োগই বেশি. তবে 'য' বর্ণটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন ঃ জেন, জোগ, জত, জায়, জুগ, জুদ্ধ, জর্গ্য, জশ, জদি, জথা, জক্ষ, জেই, জাহার, জতেক, জখন, জাইব ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : সূর্য্য, রার্য্য, কৌমার্য্য ইত্যাদি।

(২.১২.১১) ২৬৯ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণ এবং 'য' বর্ণের প্রায় সমান ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

'জ' বর্ণের ব্যবহার রয়েছে এমন ক্ষেত্র ঃ জেন, জদি, জায়, জন, জোগ, জায়া, জেবা, জথা, জতেক, জাহার, জখন, জাহাকে, অন্তর্জ্জামি, নিয়োজিত ইত্যাদি।

'য' বর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে এমন ক্ষেত্র : যে, বির্য্য, সূর্য্য, ভার্য্যা, যোগ, যুবতি, যশোদা, অযুত, যতেক, পর্য্যন্ত, পর্য্যোটন, পদযুগে ইত্যাদি।

(২.১২.১২) ৫৪ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণ এবং 'য' বর্ণের প্রয়োগের আনুপাতিক হার প্রায় সমান। যেমন ঃ জে, জত, জথা, জেই, জাই, জাহা, জাবে, জাহার, জেদিন, জাউক, জোজন, জেসব, জাবত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত : যত, যদী, যুগ, যুক্তি, সুর্য্য, যোড়, যম, যুদ্ধ, যৌবন, যুঝিতে পর্য্যন্ত, যমক, যুড়িয়া, যোজন, যোগাবার ইত্যাদি।

(২.১২.১৩) ৫৫ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের আধিক্য রয়েছে। 'য' বর্ণ মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। যেমন ঃ জম, জার, জত, কার্জ্য, জদি, যুর্যা, জায়, জাহ, জম, জখন, জাইতে, জোজন, জতেক, অজোধ্যা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : কার্য্য।

(২.১২.১৪) ২৯৯ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের তুলনায় 'য' বর্ণের প্রয়োগই বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ 'জ' বর্ণের ব্যবহার হয়েছে এমন ক্ষেত্র : জাতে, জত্ন, জাও, জতন, জাইতে ইত্যাদি।

'য' বর্ণের প্রয়োগ হয়েছে এমন ক্ষেত্র : যার, যদি, যুগ, কার্য্য, যাতে, যুক্ত, যাহা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, যাহাতে, যথেষ্ট, যমুনা যুগল, সুযুক্তা, যোগেন্দ্র, যসোমতি, যোগমায়া ইত্যাদি।

(২.১২.১৫) ৩৩৯ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের প্রাধান্য থাকলেও, 'য' বর্ণের প্রয়োগও অনেকক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

'জ' বর্ণের প্রয়োগ হয়েছে এমন ক্ষেত্র : জে, জত, জাহা, জুগ, জুক্ত, জর্গ্য, জাহার, জখন, জাইয়া, জসোদা, জোগমায়া ইত্যাদি।

'য' বর্ণের প্রয়োগ হয়েছে এমন ক্ষেত্র : যাচ্ছি, পর্যন্ত, আচার্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, পরিচর্য্যা ইত্যাদি।

(২.১২.১৬) ৫১৯ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণেরই আধিক্য লক্ষ করা যায়, তবে দু-একটি ক্ষেত্রে 'য' রয়েছে।

(২.১২.১৭) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য' বর্ণের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

'জ' বর্ণের প্রয়োগ : জে, জাহা, জার, জত্ন, জেই, জাতে, জোগ্য, জথা, জতন, জমুনা, জাহার, জুগল, জেখানে ইত্যাদি।

'য' বর্ণের প্রয়োগ : যে, যেই, যুদ্ধ, যুগিত, সূর্য্য, ভার্য্যা, মাধুর্য্য, সয্যা, সৌন্দর্য্য, যদ্যপী, আচার্য্য, যমুনা, বিপর্য্যয় ইত্যাদি।

(২.১২.১৮) ১৬৮ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের ব্যবহারই বেশি। 'য' বর্ণের প্রয়োগ প্রায় লক্ষই করা যায় না।

(২.১২.১৯) ১১৭ সংখ্যক পুথিতে 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য' বর্ণের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ যক্ষ, রার্য্য, সূর্য্য, কার্য্য সর্য্যা ইত্যাদি।

(২.১২.২০) ৪৪৬ সংখ্যক পুথিতে অল্প সংখ্যক হলেও 'য' প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ যুদ্ধ, কার্য্য, সূর্য্য, যেমন, যাহার ইত্যাদি।

(২.১২.২১) ৪৯৬ সংখ্যক পুথিতে লিপিকর 'জ' বর্ণটি বেশি ব্যবহার করেছেন। 'য' বর্ণের প্রয়োগ প্রায় লক্ষই করা যায় না।

(২.১২.২২) ২৪৩ সংখ্যক পুথিতে 'য' বর্ণের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ যেন, যোগ্য, যেই, যেসব, অযোধ্যা, যুবতী, যৌবন, মাধুর্য্য, পর্যন্ত, মর্য্যাদা, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি।

উল্লিখিত ২২টি পুথির মধ্যে ৩টি পুথি ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য' বর্ণের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জ' বর্ণ ও 'য' বর্ণের প্রয়োগের আনুপাতিক হার প্রায় সমান। কোনো পুথিতে আবার 'য' বর্ণের আধিক্যও দেখা যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, এই শতকে 'য' বর্ণের প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান।

(২.১৩) পূর্ববর্তী শতকের পুথিগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, দন্ত্য 'ন' ও মূর্ধন্য 'ণ' লেখার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো লিপিগত পার্থক্য রক্ষা করা হয় নি। খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 'ণ' হরফের ব্যবহার দেখা গেলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই উভয় বর্ণের স্থানে 'ন' হরফটি লেখা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য শতাব্দীতে দন্ত্য 'ন' হরফের পাশাপাশি মূর্ধন্য 'ণ' হরফের স্বতন্ত্র প্রয়োগের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন ঃ

(২.১৩.১) গণ, প্রাণ, চরণ, নয়াণ, স্মরণ, প্রণাম, সুভক্ষণ, নারায়ণ, কাত্যায়ণি ইত্যাদি। (১২২৮ সংখ্যক পুথি)

(২.১৩.২) ১৩১৬ সংখ্যক পুথিতে বহুক্ষেত্রে 'ণ' বর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ বাণী, গুণ, চেতন, ভক্ষণ, আক্ষাণ, শ্রবণ, কীর্ত্তণ, স্মরণ, দর্শণ, চরণ, সংকীর্ত্তণ, রসায়ণ, সনাতন, পরিক্ষণ, প্রাণনাথ, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৩) ৪৬৩ সংখ্যক পুথিতে 'ণ' বর্ণের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ চরণ, ব্রাহ্মণ, স্মরণ, মদণ, স্থাপণ, রসায়ণ, সঙকীর্ত্তণ, প্রবণ, আগমণ, সনাতণ, পরিক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৪) ২১৭ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে 'ণ' বর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ঃ ধ্বণী, ত্রাণ, প্রাণ, চরণ, শরণ, পাষাণ, করুণা, অরণ্যে, কথোক্ষণ, চূড়ামণি, বিভীষণ, সর্ব্বক্ষণ, উচ্চারণ, আকাশবাণী, ততক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৫) ২৮৩ সংখ্যক পুথিতে দু-একটি স্থলে 'ণ' বর্ণের ব্যবহার হয়েছে। যেমন ঃ নির্ম্মাণ।

(২.১৩.৬) ২৬৯ সংখ্যক পুথিতেও দু-একটি ক্ষেত্রে 'ণ' বর্ণের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ঃ ভক্ষণ, নিরক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৭) ২২৯ সংখ্যক পুথিতে ন-এর আধিক্য থাকলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ণ' বর্ণের ব্যবহার পাচ্ছি। যেমন ঃ নয়ণ, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৮) ৫৯৯ সংখ্যক পুথিতে 'ণ' বর্ণের প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ঃ বরুণ, ত্রীবেণী, প্রাণমিএগ, প্রদক্ষীণ, শুভক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.৯) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে 'ণ' বর্ণের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করি। যেমন ঃ ভোজণ, সয়ণ, সনাতণ, মদণ, তরুণ, মোহণ, জতণ, চুম্বণ, করুণা, গোচারণ, জ্ঞানার্জণ ইত্যাদি।

(২.১৩.১০) ১৪৬ সংখ্যক পুথিতে 'ম' বর্ণের আধিক্য থাকলেও অনেক স্থানেই 'ণ' বর্ণ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ দ্রোণ, পাণি, প্রণতি, দক্ষিণা, বিচক্ষণ, রক্তবর্ণ, প্রণমিয়া ইত্যাদি।

(২.১৩.১১) ১১৪ সংখ্যক পুথিতে লিপিকর অনেক ক্ষেত্রেই 'ণ' বর্ণটি প্রয়োগ করেছেন। যেমন ঃ দক্ষিণা, অরুণ, বারণ, দারুণ, মরণ, শ্রবণ, বরুণ, নারায়ণ, ত্রিভূবণ, বিভীষণ ইত্যাদি।

(২.১৩.১২) জণ, ক্ষণ, গুণী, পুরাণ, বন্দণ, বর্ণন, কীর্ত্তণ, লক্ষণ, রচনা, বর্জ্জণ, দর্শণ, ব্রাহ্মণী, দরসণ, গুণীঞা, সনাতণ, শিকাণন্দ, প্রবর্ত্তণ, যদুনন্দণ ইত্যাদি। (২৪৩ পুথি)

উপরের উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে উপস্থাপিত ২২টি পুথির মধ্যে ১২ টি পুথিতেই 'ণ' বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার রয়েছে। এই ব্যবহার সর্বত্র যথাযথ না হলেও, 'ণ' বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার যে পূর্ববর্তী শতকের চেয়ে ক্রমবর্ধমান তা বেশ স্পষ্ট।

(২.১৪) একই শব্দের বানানে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রয়োগের প্রবণতা এই শতকে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যেমন ঃ

(২.১৪.১) ২ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ সংঙ্ঘ, শংঙ্গে ইত্যাদি।

(২.১৪.২) ২৮৩ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ লংঙ্গিতে।

(২.১৪.৩) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে পাই ঃ লংঙিঘয়া।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ২২ টি পুথির মধ্যে মাত্র তিনটি পুথিতে এই ধরনের অসংগতি রয়েছে। তাও খুবই কম ক্ষেত্রে। এ থেকে এই ধরনেব প্রবণতা যে কমে আসছে তা বোঝা যায়।

(২.১৫) যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ আকৃতির চিহ্ন (´) যুক্ত করার প্রবণতা এই শতাব্দীতে অনেক কম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(২.১৫.১) ১২২৮ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্-এর ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ রেফবিহীন যুক্ত ব্যঞ্জনও রয়েছে। উর্দ্ধারি, উর্দ্ধারিল, গর্ত্ত, জুর্দ্ধ, উর্দ্ধব, বুর্দ্ধি, কর্ল্লোল, জগর্ন্নাথ, সির্দ্ধি, জোর্দ্ধা, দ্রর্ব্য, মির্থ্যা, লর্জ্জিত, বর্জ্র, মর্ধ্যে, চতর্দ্দিগে ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ প্রাণ, মোক্ষ, সিক্ষা, যুদ্ধ, মিথ্যা, বিস্বয়, শ্বরির, রাক্ষসি, উদ্ধব, মহেস্বর, সরস্বতি, রাজেস্বর, সম্ভাষন, লক্ষ্মি ইত্যাদি।

(২.১৫.২) ২ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ চিহ্ন অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই রয়েছে। যেমন ঃ মির্ত্তু, বৃর্দ্ধ, শ্রার্দ্ধ, বির্দ্যমান ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ জোদ্ধা, সহস্র, রাক্ষশ, জেষ্ঠ, য়জোধ্যা, ইস্বর, শরস্বতী, বিশস্বাদ, তপস্বিনী, অস্বমেধ, বিস্বশ্রবা, আনন্দীত ইত্যাদি।

(২.১৫.৩) ১৩১৬ সংখ্যক পুথিতে বহু স্থানে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ রয়েছে। যেমন ঃ তর্ত্ত, সির্দ্ধ, লর্জ্জা, ম্লের্চ্ছ, বুর্দ্ধি, শ্রর্দ্ধ, ইর্চ্ছা, উর্চ্চ, সির্দ্ধান্ত, জগর্ন্নাথ, উর্দ্ধর, উর্ত্তম, বির্চ্ছেদ ইত্যাদি।

(২.১৫.৪) ৪৬৩ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত করার প্রবণতা প্রায় লক্ষই করা যায় না।

(২.১৫.৫) ৩১৮ সংখ্যক পুথিতে লিপিকর বহু স্থানে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত করেছেন। আবার পাশাপাশি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও বহু রয়েছে। যেমন ঃ সূর্জ্য, ধর্ন্না, নির্ত্য, সির্দ্ধ, নির্ম্মিত্ত, সর্জ্জন, যর্ন্যথা, ব্রর্হ্মান্ড, চৈতর্ন্য, অবতির্ন্য, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ পুষ্প, সাস্ত্র, মুক্তি, কান্ড, গৃহস্ত, য়ানন্দ, য়নন্ত, নিস্তার, বিচ্ছেদ, য়ন্তর, নিস্‌চয়, নিস্বাস, উদ্দেশে, নিস্ফল, বিস্বম্ভর ইত্যাদি।

(২.১৫.৬) ৩৮৭ সংখ্যক পুথিতেও রেফের ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ঃ মর্দ্ধে, হর্ল্য, বুর্দ্ধি, ভার্গ্য, পার্ল্য, ব্রার্হ্মণ, সর্ব্বস্য, বির্দ্দমান ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ স্বামি, ভিস্ব, সাস্ত্র, মুক্তি, কৃষ্ণ, পাপিষ্ট, সুন্দরি, জুধিষ্ঠির, বৈসম্পায়ন ইত্যাদি।

(২.১৫.৭) ৫৩ সংখ্যক পুথিতে রেফ্ যুক্তব্যঞ্জন বর্ণের পাশাপাশি সমান সংখ্যায় রেফ্ বিহীন যুক্তব্যঞ্জনও রয়েছে। যেমন ঃ চির্ত্ত, মির্থ্যা, উর্দ্ধার, উর্ত্তর, বির্চ্ছেদ, লর্ক্ষণ, সর্ত্তর ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ অদ্ভুত, রাক্ষস, চন্দি, যুন্দরি, সন্দেশ, বিক্রম, নিস্তার, অবিশ্রাম ইত্যাদি।

(২.১৫.৮) ২১৭ সংখ্যক পুথিতে খুব কম স্থানে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ লর্জ্জা, জুর্দ্ধ, উর্দ্ধর, উর্দ্ধারিনু, চতুর্দ্দিগে ইত্যাদি।

এই বিশৃঙ্খলার অনুপাতে ব্যতিক্রমী বানান বহু রয়েছে। যেমন ঃ চিত্ত, অরণ্য, প্রবিষ্ট, যদ্যপি, শঙ্কর, জাহ্নবী, সন্তোষ, কান্দিয়া, ততক্ষণ, প্রদক্ষিণ, শান্তিপুর, অনুক্ষণ, জমিয়াছে, অধিশ্বর ইত্যাদি।

(২.১৫.৯) ৫৯১ সংখ্যক পুথিতেও এই বিশৃঙ্খলা কম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ জুর্দ্ধ, তর্ত্ত, বুর্দ্ধি, প্রসর্ন্ন সর্ত্তর, উত্তরিল ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী বানান এই অনুপাতে অনেক বেশি। যেমন ঃ মুক্তি, মুষ্ঠি, বজ্র, প্রচন্ড, প্রতিজ্ঞা, চিন্তিয়া য়ন্যায, মৃত্তিকা, যগ্রজ, কম্পিত, নিষ্ঠু-, হুহুঙ্কার, জুধিষ্ঠীর, য়নুক্ষণ ইত্যাদি।

(২.১৫.১০) ২৮৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা থাকলেও, তা অনেক কম। যেমন ঃ ভার্গ, রার্য্য, বির্ক্ষ, জর্গৎ, বির্ত্তান্ত, উর্দ্ধারি, সর্ন্নিধানে ইত্যাদি। এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন ঃ কৃষ্ণ, বৃক্ষ, ক্লেশ, ধ্যান, তুষ্ঠ, পাদ্য, লক্ষি, জোগ্য, স্থির.তপস্যা, সাক্ষাত, স্থাপন, কিঙ্কিনি, শত্তর, রাজেশ্বর ইত্যাদি।

(২.১৫.১১) ২৬৯ সংখ্যক পুথিতেও খুব কম স্থানে এই প্রবণতা দেখি। যেমন ঃ নৃর্ত্য, ব্রর্হ্ম, জর্ন্ত, কির্ন্তু, প্রসর্ন্ন, জর্ম্মিলা, সর্ন্নিধান ইত্যাদি।

এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের আধিক্য রয়েছে। যেমন ঃ গর্ত্ত, সিস্ট, মুক্তি, তত্ত, সিদ্ধি, ভক্ষন, দ্বাদশ, চৈস্য, জগন্নাথ, রামকৃষ্ণ, অলক্ষিতে, তিরস্কার ইত্যাদি।

(২.১৫.১২) ৫৪ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফের ব্যবহার কয়েকটি ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ দ্রর্ব, যুর্দ্ধ, লর্জ্জা, রার্য্য, পর্ত্তন, উর্দ্দেসে, উর্জ্জল ইত্যাদি।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। যেমন ঃ পুষ্প, ভিন্ন, শ্বেত, সন্ধ্য, প্রসন্ন, লক্ষ্মন, রাক্ষষ, সম্মতি, বিস্বয়, পাপীষ্ঠ, সঙ্কট, সম্বোধিয়া, লঙ্কেশ্বর, পরিশ্রম, সুভক্ষন, সরস্বতি ইত্যাদি।

(২.১৫.১৩) ৫৫ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা অনেক কম। যেমন ঃ জুদ্ধ, সর্জ্যা, বির্ত্তান্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন ঃ বুদ্ধি, বিস্ময়, অজধ্যা, সাক্ষাত, রাক্ষসি, ইস্বরি, উদ্ধারি, আন্তরিক্ষ ইত্যাদি।

(২.১৫.১৪) ২৯৯ সংখ্যক পুথিতেও এই বিশৃঙ্খলা কমে আসতেই দেখা যায়। যেমন ঃ বির্দ্ধ, চির্ত্ত, অর্ন্য, লর্জ্জা, মির্থা, সির্দ্ধ, বুর্দ্ধি, উর্ন্নত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই অনুপাতে বেশি। যেমন ঃ লজ্জা, সত্য, সঙ্কা, মিথ্যা, বল্লভ, সাক্ষাত, যথেষ্ট, বিচ্ছেদ, উদ্যম, কল্লোল, পুষ্পিত, অত্যন্ত, অবস্য, সুন্দরী, বিদ্যমান, লোকাত্তর ইত্যাদি।

(২.১৫.১৫) ৩৩৯ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন ঃ নরোর্ত্তম, গর্ত্তবতি, নির্ত্ত, সির্দ্ধ, বির্চ্ছেদ, জোর্গ্য, সির্দ্ধান্ত ইত্যাদি।

এই অনুপাতে ব্যতিক্রমী বানানই বেশি। যেমন ঃ মিথা, জুক্ত, সিদ্ধী, জোগ্য, বৃক্ষ, ইশ্বর, উত্তম, বিচ্ছেদ, সংক্ষেপ, সিদ্ধান্ত, আক্ষ্যান, নিশ্চিন্ত, বিস্বাষ, আস্বাদন, কথক্ষন ইত্যাদি।

(২.১৫.১৬) ৫১৯ সংখ্যক পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত করার প্রবণতা প্রায় কোথাও লক্ষ করা যায় না।

(২.১৫.১৭) ২৯৫ সংখ্যক পুথিতে বহু ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। তবে সমান সংখ্যক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ঃ উর্ক্তি, তুর্চ্ছ, যুর্দ্ধ, গর্দ্ধ, বুর্দ্ধি, লর্জ্জা, বুর্দ্ধ, কৈবর্ত্ত, বর্দ্ধন, উর্ন্নত, সর্দ্ধান, উচ্চারি, আর্চ্ছাদন, অর্দ্ধকার ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ঃ সাস্ত্র, সুস্ক, সূক্ষ্ম, পুষ্প, স্নীগ্ধ, কম্প, পুচ্ছ, নন্দন, উন্মুখ, প্রবিষ্ট, সংক্ষেপু, সম্প্রতি, সুমিষ্ট, সন্তোষ, প্রফুল্ল, ব্রজেস্বরী, আস্বাদন ইত্যাদি।

(২.১৫.১৮) ১৬৪ সংখ্যক পুথিতে খুব কম স্থানেই যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন ঃ চির্ত্ত, বির্দ্যমান, সমুর্চ্চয় ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই এই পুথিতে বেশি।

(২.১৫.১৯) ১১৪ সংখ্যক পুথিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র এই প্রবণতা দেখা যায়। যেমন ঃ মৃর্ত্তু, জুর্দ্ধ, বৃর্ত্তান্ত, পুর্স্পক ইত্যাদি।

এই রকম কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই রেফ্-বিহীন যুক্তব্যঞ্জনই রয়েছে।

(২.১৫.২০) ৪৪৬ সংখ্যক পুথিতেও এই প্রবণতা দু-এক স্থানে মাত্র রয়েছে। যেমন ঃ নিত্য, উর্চ্চ ইত্যাদি। এছাড়া সর্বত্রই রেফ্-বিহীন যুক্তব্যঞ্জনই রয়েছে।

(২.১৫.২১) ৪৯৬ সংখ্যক এই বিশৃঙ্খলা ক্রমশ কমে আসতে দেখা যায়। যেমন ঃ নির্ত্য, তুর্চ্ছ, যুর্দ্ধ, পর্দ্য, সির্দ্ধি, মহর্ত, উর্দ্ধাষ ইত্যাদি।

এই অনুপাতে রেফ্-বিহীন যুক্তব্যঞ্জনেরই প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। যেমন ঃ ক্লেষ, নিকুঞ্জ, বশিষ্ঠ, স্বরন, ষুগন্ধি, অনুক্ষণ, সম্ভাসন, নবদ্বিপ, আনন্দীত, প্রাণেশ্বরি ইত্যাদি।

(২.১৫.২২) ২৪৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রবণতা অনেক কম। যেমন ঃ লর্জ্জ, সুর্দ্ধ, উর্ম্মর্ত্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, এখানে আলোচিত ২২ টি পুথির মধ্যে ১৬ টি পুথিতে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ আকৃতির চিহ্ন যুক্ত করার প্রবণতা পূর্ব্ববর্ত্তী শতকের অনুপাতে অনেক কমে এসেছে। আর অবশিষ্ট ৬ টি পুথিতে এই প্রবণতা থাকলেও সেখানে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ রেফ্ বিহীন যুক্তব্যঞ্জনের অনুপাতই বেশি। সুতরাং বলা যায়, এই শতকে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ যুক্ত করার প্রবণতা পূর্ব্ববর্ত্তী শতকের তুলনায় ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শতাব্দীর বানান বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর বানান-বিশৃঙ্খলার ধারাগুলি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও কম-বেশি অনুসৃত হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে মুদ্রণ প্রযুক্তিব ব্যবহার চালু হবার পর পুথির বানান কোন্ খাতে চলেছে, তা আমরা তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব।

৩ তৃতীয় পর্যায় ঃ ১২০১বঙ্গাব্দ—১৩০০ বঙ্গাব্দ

(১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ—১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলা পুথির লিখনরীতি এতদূর ঐতিহ্যানুগত ছিল যে, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মুদ্রণ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হলেও বাংলা পুথিব বানানের ধারায় তার কোনো প্রভাব পড়েনি। ১২০১—১৩০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে লিখিত বিভিন্ন বাংলা পুথির বানান বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। এই শতাব্দীর বানানরীতি বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পুথিগুলিব সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঃ

১। চৈতন্যমঙ্গল। লোচনদাস, লিপিকর শ্রীমরুলিদাষ। অঞ্চল—অজ্ঞাত (লিপিকর নিজের অঞ্চলের উল্লেখ না করলেও এই গ্রন্থের মালিক গোবর্দ্ধন জুগীর অঞ্চল উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীরামপুব। এ থেকে মনে হয় লিপিকরের অঞ্চলও আশেপাশেই হবে।) সন—১২০৩ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২২০।

২। চৈতন্যমঙ্গল (মধ্য খন্ড)। লোচনদাস। লিপিকর—অজ্ঞাত, অঞ্চল—অজ্ঞাত। সন—১২০৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২২৮।

৩। রামায়ণ (উত্তরাকান্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর—শ্রীমানিক্য দাস। অঞ্চল—প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর, মোকাম—ছান্দিয়া। সন—১২০৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—১১৭।

৪। মহাভারত (আদিপর্ব)। কাশীরাম দাস। লিপিকর—রামচরণ দেবশর্ম্মণঃ, অঞ্চল—সাঃ শ্যামপুর। সন—১২১২ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৬১২।

৫। প্রসাদচরিত্র। দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। লিপিকর—শ্রী জগন্নাথ মিত্র। অঞ্চল—খুনডাঙ্গা গ্রাম। সন—১২১৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৩৯১।

৬। যোগাদ্যার বন্দনা। কৃত্তিবাস। লিপিকর—অজ্ঞাত, অঞ্চল—বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রাম। সন—১২১৮ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—১৬০।

৭। কৃষ্ণমঙ্গল (নন্দবিদায়)। দ্বিজ মাধব। লিপিকর—শ্রী বাবুরাম দাস বৈরাগ্য। অঞ্চল—সাং-বালিয়া। সন—১২২৬ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২৮১।

৮। মনসামঙ্গল। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ । লিপিকর—শ্রী জগতচন্দ্র সিংহ। অঞ্চল—সাং পাউখড়া, জাগুনী। সন—১২২৯ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৫৩০।

৯। শতস্কন্ধ রাবণবধ (অদ্ভুত রামায়ণ)। কৃত্তিবাস। লিপিকর—শ্রী মুহননাত। অঞ্চল—প্রগনে জফরগড়, মৌজে—তেঘরিআ। সন—১২৩০ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—১৫২।

১০। মহাভারত (আদি পর্ব্ব)। কাশীরাম দাস। লিপিকর—শ্রী পেলারাম দত্ত। অঞ্চল—সাং ষ্যামসুন্দরপুর, পরগনে—বরদা। সন—১২৩৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৬১৩।

১১। গুরুদক্ষিণা। শঙ্কর কবি। লিপিকর—অজ্ঞাত, অঞ্চল—সাং রাধানগর। সন—১২৩৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৩৯৮।

১২। চৈতন্যমঙ্গল (প্রকাশ খন্ড)। জয়ানন্দ। লিপিকর—শ্রীকাসিনাথ গুপ্ত। অঞ্চল—সাং সাহাপুর, পরগনে—সাতসৈকা। সন—১২৩৬ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২০৩।

১৩। ভাগবতসার (কৃষ্ণমঙ্গল)। দ্বিজ মাধব। লিপিকর—শ্রী ভগবানচন্দ্র কর। অঞ্চল—সাং সান্তিপুর, রামনগর। সন—১২৩৭ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২৭৭।

১৪। গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস। লিপিকর—শ্রী নফরচন্দ্র ঘোষ। অঞ্চল—সাং মুক্তাতোড়ী পরগনে—সাহারজোড়া। সন —১২৩৯ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২৯৬।

১৫। রামায়ণ (নরমেধ যজ্ঞ)। কৃত্তিবাস। লিপিকর—শ্রী হর্শগোপাল নিওগী। অঞ্চল—বেল্যাতোড়।। সন—১২৪২ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—১৫৯।

১৬। রামায়ণ (অরণ্যকান্ড)। রচয়িতার নাম নেই। লিপিকর—শ্রী যুগলকিশোর দাশ। অঞ্চল—সাকিম রৌহা পরগনে—ভাত্তাল। সন—১২৪৫ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৫৪৯।

১৭। রাধিকামঙ্গল। দ্বিজ কবিচন্দ্র। লিপিকর—শ্রী মোদুযুদন ঠাকুর। অঞ্চল—সাকিম রাধানগর। সন—১২৪৯ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৩৮৯।

১৮। নিমাই সন্ন্যাস। রঘুনাথ দাস। লিপিকর—শ্রীযুত যুগোলকিশোর বাত্র চৌধুরি। অঞ্চল—সাকীন রৌহা, পরগনে—ভাত্তাল। সন—১২৫৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—২৬৮।

১৯। রামায়ণ (উত্তরাকান্ড)। কৃত্তিবাস। লিপিকর—শ্রী প্রেমচাঁদ। অঞ্চল—পরগনে সমরসাহি। সন—১২৫৭ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—১২৭।

২০। উদ্ধব সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র। লিপিকর—শ্রী লোকনাথ পাল। অঞ্চল—সাং বাদগাছা, মোং মাছখান্ডা, পরগনে—খন্ডঘোষ। সন—১২৫৮ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৩৯৯।

২১। মহাভারত (বিরাট পর্ব)। সারণ। লিপিকর—শ্রী মহাভারথ দত্ত। অঞ্চল—সাঃ সাএর বাখড়া গ্রাম। সন—১২৬৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৬০৮।

২২। মহাভারত (বিরাট পর্ব)। সারণ। লিপিকর—শ্রী কৃষ্ণসুন্দর বিশ্বাষ। অঞ্চল—সাং মালীআড়া। সন—১২৬৮ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৬০৯।

২৩। গোপিকার বস্ত্রহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র। লিপিকর—শ্রী নফরচন্দ্র দাস মিত্র। অঞ্চল—অজ্ঞাত। সন—১২৭৪ বঙ্গাব্দ। পুথি সংখ্যা—৪৫৫।

উল্লিখিত পুথিগুলির বানানরীতি বিশ্লেষণ করে লক্ষ করা গেছে, এই শতাব্দীর পুথিগুলিতে বানান-বিশৃঙ্খলার পূর্বতন ধারাগুলিই কম-বেশি অনুসৃত হয়েছে। তবে এই শতাব্দীতে এর কয়েকটি ধারার আনুপাতিক পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(৩.১) শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে ঐ স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্নের সহযোগে য় বর্ণের ব্যবহার এই শতকে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(৩.২) জ-ধ্বনি বোঝাতে জ বর্ণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে য-বর্ণের অপেক্ষাকৃত বহুল প্রয়োগ লক্ষ করি।

(৩.৩) ন-ধ্বনি বোঝাতে ণ-বর্ণের আধুনিককালসুলভ স্বতন্ত্র হরফ প্রয়োগের প্রবণতা পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩.৪) যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ্ আকৃতির চিহ্ন যুক্ত করা প্রবণতা এই শতকে পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(৩.৫) পুথিতে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার এই শতাব্দীতে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তবে এই ধরনের স্বল্প কয়েকটি পরিবর্তন ছাড়া এই শতাব্দীতে বানান-বিভ্রান্তির অপর ধারাগুলি প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। যেমন ঃ

(৩.৬) (ঋ) রি-ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এই শতকের পুথিতেও রয়েছে।

(৩.৭) ই, ঈ বা তাদের কার চিহ্ন ব্যবহারে লিপিকরের স্বাধীন ইচ্ছা এই শতাব্দীতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

(৩.৮) উ, ঊ বা তাদের কার-চিহ্নের নির্বিচার প্রযোগ এই শতকের পুথিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একটি বড়ো কারণ।

(৩.৯) শব্দের মধ্যে বা অন্তে য়-বর্ণের স্থানে, সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার এই শতাব্দীর পুথিতেও প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।

(৩.১০) শিস্-ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণের নির্বিচার প্রয়োগ এই শতাব্দীর বিভিন্ন পুথিতে সমানভাবে লক্ষ করা যায়।

(৩.১১) অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের বা মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার এই শতকেও রয়েছে।

(৩.১২) রেফের পর ব্যঞ্জন দ্বিত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ এই শতকেও রয়েছে।

(৩.১৩) যুক্ত ব্যঞ্জনে যোজ্যমান বর্ণগুলির যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে ধারণার অভাব এই শতাব্দীর পুথিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

(৩.১৪) প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এই শতাব্দীতেও বানান-বিভ্রান্তির এক বড়ো কারণ।

(৩.১৫) একই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বানানে একাধিক রূপ এখানেও রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মুদ্রণপ্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হলেও বাংলা পুথিতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পুথির তুলনা করলে এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে মহাভারতের আদিপর্ব (চতুর্থ বই) ছাপা হয়েছে। এরপর ১২৩৪ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে) লিপিকরা একই বিষয়ের পুথিতে বানানের ক্ষেত্রে পূর্বানুসৃত অনিয়মই থেকে গেছে। মুদ্রিত গ্রন্থের বানান এক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে নি। এখানে মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুথির নির্দিষ্ট অংশ তুলে দেওয়া হল ঃ

শ্রীরামপুরে ছাপা মহাভারতের কিছু অংশ ঃ

আদিপর্ব্ব ঃ

তবে পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলে
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
শুনিয়া উঠিলা তবে কুরুবংশ পতি
ধনুর নিকট গেল ভীষ্ম মহামতি।
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বামজানু
বলে ধরি নোয়াইল মহাবল ধনু। [দ্রষ্টব্য : চিত্র ২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত ১২৩৪ বঙ্গাব্দে লিপি করা মহাভাবত (আদিপর্ব) পুথির অংশ ঃ

তবে পূনঃর্পূন ধ্রষ্টদ্যম্ন মহাবলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষেত্রিয় সকলে ॥
সুনিঞা উঠিল তবে কুরূবংস পতি।
ধনুক নিকটে গেলা ভিস্ম মহামতি ॥
তুলিল ধনুক বির দিযা বাম জানু।
হুলে ধরি নুউাইল মহাবল ধনু ॥

দলিল-পত্রাদির বানান

(৪) লিপিকরগণের প্রমাদে এই ধরণের বানান বিশৃঙ্খলা শুধু যে একাধিকবার লিপি করা কাব্যাদির পুথিতেই লক্ষ করা যাচ্ছে তা নয়, অধুনা 'বাংলাদেশে' সংগৃহীত বিভিন্ন শতকের পুরোনো দলিল-পত্রাদি অনুসন্ধান করেও একই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে।[৪] এই অনুসন্ধানে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে লিপি করা কিছু দলিল।

১। মনুষ্যবিক্রয়ের দলিল। (পত্রসংখ্যা—১১৯)। সাকিল—কাশীপুর, শ্রীহট্ট। লিপিকাল—-৪৩৭ পরগনাতি সন (১৬৩৮ খ্রিঃ)।

২। ভূমি উৎসর্গপত্র। (পত্রসংখ্যা—৮৬)। লিপিকাল—৪৫৫ পরগনাতি সন (১৬৬৫ খ্রিঃ)।

৩। স্মারকপত্র। (পত্রসংখ্যা—৮৫)। গ্রাম—বাড়রা। লিপিকাল—১০৭৪ সন (১৬৬৭ খ্রিঃ)।

৪। পত্র (ব্যক্তিগত)। (পত্রসংখ্যা—৫৯)। লিপিকাল—১০৮৪ সাল (১৬৭৭ খ্রিঃ)।

৫। পাট্টাকবুলিয়তপত্র (পত্রসংখ্যা—৫৮)। তপে—ইছাপুর, পরগনে—সাহউজিয়াল। লিপিকাল—১০৯৫ সাল (১৬৮৮ খ্রিঃ)।

৬। স্মারকপত্র (পত্রসংখ্যা—৮৩)। লিপিকাল—১১০৬ সন (১৬৯৯ খ্রিঃ)।

৭। অচলপত্র। (পত্রসংখ্যা—১০১)। পরগনে—মকিমাবাদ। লিপিকাল—১১২৩ সন (১৭১৬ খ্রিঃ)।

৮। ভূমি উৎসর্গপত্র। (পত্রসংখ্যা—৬৯)। পরগনে মকিমাবাদ। লিপিকাল—১১৫৭ সন (১৭৫০ খ্রিঃ)।

৯। ভূমি উৎসর্গপত্র। (পত্রসংখ্যা—৭০)। পরগনে মকিমাবাদ। লিপিকাল—১১৮৬ সন (১৭৭৪ খ্রিঃ)।

১০। স্মাবকপত্র। (পত্রসংখ্যা—৯৫)। মাতুয়ালী—কাহেতপাড়া। লিপিকাল—১১৯০ সন (১৭৮৩ খ্রিঃ)।

১১। কর্জপত্র। (পত্রসংখ্যা—১১২)। লিপিকাল—১১৯৪ সন (১৭৮৭ খ্রিঃ)।

১২। একরারপত্র। (পত্রসংখ্যা—১০৪)। লিপিকাল—১২০২ সন (১৭৯৫ খ্রিঃ)।

১৩। কবুলিয়তপত্র। (পত্রসংখ্যা—১০৭)। মোগলটুলি ঢাকা। লিপিকাল—১২০৮ সন (১৮০১ খ্রিঃ)।

১৪। কর্জপত্র। (পত্রসংখ্যা—১০৫)। সাকিন-বাগমাড়া। লিপিকাল—১২১২ সন (১৮০৫ খ্রিঃ)।

১৫। কবুলিয়তপত্র। (পত্রসংখ্যা—৮২)। কেশবপুব পরগনে-সেলবর্ষ। লিপিকাল—১২২৩ সন (১৮১৬ খ্রিঃ)।

১৬। বাস্তুভূমিবিক্রয়পত্র। (পত্রসংখ্যা—১৩)। সাকিন-বাড়ড়া, পরগনে-মকিমাবাদ। লিপিকাল—১২২৯ সন (১৮২২ খ্রিঃ)।

১৭। বাস্তুভূমিবিক্রযপত্র। (পত্রসংখ্যা—১৪)। সাকিন-বাড়ড়া, পরগনে-মকিমাবাদ। লিপিকাল—১২৩৮ সন (১৮৩১ খ্রিঃ)।

১৮। ভূমি বিক্রয়পত্র। (পত্রসংখ্যা—৯০)। সাকিল-বাড়ড়া, পরগনে-মকিমাবাদ। লিপিকাল—১২৮০ সন (১৮৩৩ খ্রিঃ)।

১৯। চুক্তিপত্র। (পত্রসংখ্যা—১১)। সাকিন-শিমুলিয়া, থানে জাফরগঞ্জ। লিপিকাল—১২৫০ সন (১৮৪৩ খ্রিঃ)।

২০। হেবানামা (পত্রসংখ্যা—৫০)। জিলে ঢাকা। লিপিকাল—১২৫০ সন (১৮৪৪ খ্রিঃ)।

২১। আদালতেব রায়নামা (পত্রসংখ্যা—২)। মোকাম-নেছড়াগঞ্জ, জিলে-ঢাকা। লিপিকাল—১২৫৭ সন (১৮৫০ খ্রিঃ)।

২২। পাট্টাপত্র (পত্রসংখ্যা—১৩)। পবগনে সুজাবাদ। লিপিকাল—১২৬৪ সন (১৮৫৭ খ্রিঃ)।

২৩। আদালতের রায়নামা (পত্রসংখ্যা—৫)। সাকিন ষাইটঘর, জিলে-ঢাকা। লিপিকাল—১২৬৯ সন (১৮৬২ খ্রিঃ)।

২৪। আদালতের রায়নামা (পত্রসংখ্যা—৭)। নেছডাগঞ্জ, ঢাকা। লিপিকাল—১২৭৩ সন (১৮৬৬ খ্রিঃ)।

২৫। আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী (পত্রসংখ্যা—২৮)। সাকিন—শিমুলিয়া, থানে—জাফরগঞ্জ। লিপিকাল—১২৭৭ সন (১৮৭১ খ্রিঃ)।

২৬। ভূমি বিক্রয়কবালাপত্র (পত্রসংখ্যা—১০৮)। পরগনে—গোবিন্দপুর। জেলা—বাজশাহী। লিপিকাল—আ১২৮১ সন (আ ১৮৭৫ খ্রিঃ)।

২৭। কর্জপত্র (পত্রসংখ্যা—২৬)। সাকিন—শিমুলিয়া, থানে—জাফরগঞ্জ। লিপিকাল—১২৮৯ সন (১৮৮২ খ্রিঃ)।

বিভিন্ন সময়েব বিভিন্ন লিপিকবেব লেখা উল্লিখিত দলিলপত্রাদিতে বানান-বিশৃঙ্খলাব বিভিন্ন ধাবা চোখে পড়ে। যেমন ঃ

(৪.১) ই, ঈ বা হ-কার, ঈ-কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম প্রাধান্য পায় নি। তবে ই-কাবের তুলনায় ঈ-কারের প্রয়োগই বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

(৪ ১ ১) পৃষ্ঠী, জমী, বিক্রীতেতি, লিখিতেছী ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা ১১৯)

(৪ ১ ২) জমীদাবি, জমা, কাং, বাকী, হাসীল, মাফিক ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা ৫৮)

(৪ ১ ৩) জমী/জমি, ভূমী, দক্ষিন/দক্ষীণ, সিমানা/সীমানা, অধিকাবি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৬৯)

(৪.১ ৪) জমী, তুমী, আমী, কীসমত ইত্যাদি।(পত্রসংখ্যা—৭০)

(৪ ১ ৫) ইতী, জমীন, লছমী, ব্রাহ্মণী, ভাগীনা, কাসীবাসীনী ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৯৫)

(৪ ১.৬) পূজীনীয়, লিপী, পৃথী, জদি ইত্যাদি।(পত্রসংখ্যা—১১২)

(৪ ১ ৭) লিখীতং, ফকীব, জদি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৫)

(৪.১.৮) জমী, আমী, কীশম্মত ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮২)

(৪ ১ ৯) কীসমত, জমী, পৌত্রাদী, শীমানা, লিখীযা, দীযা, ইতী, আশ্বীন, বৃমী, শামীল, বুজীয়া ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১৪)

(৪ ১.১০) শিবপ্রসাদ, শীবপ্রসাদ, আমী, তুমী, জদী, ইতী, লাগীবেক, উপস্তীত, লিখীতেছী, লিখীত, জমিদারি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা— ১১)

(৪ ১.১১) জামীন, শীমুলীয়া, ডিক্রী, উকীল, লিখীত ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১)

(৪.১.১২) শীবপ্রসাদ, কালীশঙ্কব, অন্তঃপাতী, নালীশ, মাশীক, গীয়াছে, শীমুলীয়া, মুনশী ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৫)

(৪.১.১৩) কালীপ্রসাদ, শীমুলীয়া, লিখীতং, জমী, দীলাম, আমী, কাটীয়া, জমীদারি, কীম্বা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০)

(৪.১.১৪) তারিনি, অধিন, নিলাম, কালীকীশোর, শীবপ্রসাদ, দায়ীক, এপ্রীল, জারী, উপস্থীত ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭)

(৪.১.১৫) চিনী, দেশী, আমী, শাক্ষী, লিখীয়াছীল, হইয়াছীল, প্রামাণীক ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২০)

(৪.১.১৬) কীস্তীবন্দী, য়ামী, কীম্বা, লিখীয়া, য়ানীয়া, বাকী, বেয়াল্লীষ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৮)

(৪.১.১৭) শীমুলীয়া, দলীল, সুন্দরী, মাসীক, দিলাম ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২৬)

(৪.২) শব্দের মধ্যে বা অন্তে য় বর্ণের স্থানে, সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(৪.২.১) নিঅম, ছঅ, করিআ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮৩)

(৪.২.২) দাএ। (পত্রসংখ্যা—৬৯)

(৪.২.৩) দুএর (পত্রসংখ্যা—১০৪)

(৪.২.৪) মহাশএ, মাআরাম ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৭)

(৪.২.৫) ওআদা, কবিআ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৫)

(৪.২.৬) মহাশএ। (পত্রসংখ্যা—৮২)

(৪.২.৭) বিনিওগ। (পত্রসংখ্যা— ১৩)

(৪.২.৮) বিনিওগ, ওযারিষআন, মএ। (পত্রসংখ্যা—১৪)

(৪.২.৯) বিনিওগ, ওারিষআনের, কত্তালা। (পত্রসংখ্যা—৯৯)

(৪.২.১০) শও়া, জনওবি, দেওাব ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১)

(৪.২.১১) দেওানি, ফেরওারি, বাত্র, বিদাএ দেওা, হওাতে, জানওারি, হাতালা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৫০)

(৪.২.১২) দেওাতে, রাএ, জানওারি, পএলা, ফএছলা, আদাএ, প্রার্থনানুজাই, পাতা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২)

(৪.২.১৩) মোওাজী, ওারিশআন, বাগওান ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০)

(৪.২.১৪) পাওাব, উভএর, কাওালার, হাওলা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৫)

(৪.২.১৫) বাএ, পাত্তার, দেওা, ফেব্রওারি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭)

(৪.২.১৬) বএষ, হাওলা, জানওারি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২০)

(৪.২.১৭) ওারিসান, দাওা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৮)

(৪.২.১৮) উত্তাকছ, দেওা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২৬)

(৪.৩) যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলির যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে এক্ষেত্রেও বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ

(৪.৩.১) কস্মিনকালে, নির্ব্বন্ধে, শর্ম্মা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮৬)

(৪.৩.২) বল্লভ, রাজস্তর্গত, সম্মন্ধি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮৫)

(৪.৩.৩) আত্মারাম, .ক্রেপরাম ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যাঃ৮৩)

(৪.৩.৪) গোপিবল্লভ, স্বর্ব্বনন্দ, রাজবল্লভ, বেবস্থা, শর্ক্ষন ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০১)

(৪.৩.৫) সাতায়ন্ব, সৰ্ক্ষা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৬৯)

(৪.৩.৬) তালুকু, মহশ্বল, বামস্বরণ, সত্যত্যাগ, সরগার্থে ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭০)

(৪.৩.৭) অম্ব, লছমী, তর্ক্কালঙ্কার/তর্কালঙ্কার। (পত্রসংখ্যা—৯৫)

(৪.৩.৮) শর্ক্ষণ, উদবিগ্ন, সরদার ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১২)

(৪.৩.৯) বাঞ্ছারাম, জগন্বাথ, সৰ্ক্ষা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৪)

(৪.৩.১০) শৰ্ক্ষা, কার্জ্জ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৭)

(৪.৩.১১) মদ্ধে (পত্রসংখ্যা—৮২)

(৪.৩.১২) সইচ্ছা, রাজস্য, সর্ক্ষা, শত্যাধিকারী, শাত্যত্যাগ ইত্যাদি।(পত্রসংখ্যা—১৩)

(৪.৩.১৩) অম্ব, মুল্য, সত্যাদীকারি, কন্ব, সৰ্ক্ষা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১৪)

(৪.৩.১৪) কস্মিনকালে, উয্যাপীত, উপস্তীত, শর্ক্ষন ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১)

(৪.৩.১৫) অম্ব, বল্লভ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০)

(৪.৩.১৬) কোমপানী, বর্ষ্বনার, মুনশোফ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৫)

(৪.৩.১৭) শরুপ/শ্বরুপ, শ্বত্ব, বিত্য, সুদ্দ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭)

(৪.৩.১৮) সরূপ/শ্বরূপ, বৎস্বর, লক্ষী, শ্বত্ব ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২০)

(৪.৩.১৯) বেয়াল্লীষ, সরস্বতি-স্বরস্বতি, সাত্তাধিকার ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৮)

(৪.৪) শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এখানেও বানান বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ।

(৪.৪.১) তেরিখ, ইছিলাম, খাঁ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১৯)

(৪.৪.২) অরঙ্গজেব, সম্মন্ধি, তেরিখ, সাহেস্ত খাঁ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮৫)

(৪.৪.৩) চৌধরি, করিছিলাম ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮৩)

(৪.৪.৪) বেবস্থা, সর্ক্ষা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০১)

(৪.৪.৫) পুস্কারনি, সর্ক্ষা, সাতায়ন্ব ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৬৯)

(৪.৪.৬) সর্লা, মহশ্বল্ম, চহদ্দি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭০)

(৪.৪.৭) পওএবধু, ব্রাম্মনী, পেঠাব, লছমী ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৯৫)

(৪.৪.৮) গৌউর্রকিশোর, কজ্জপত্র, চক্রবর্ত্তি, শর্ম্মন, তঙ্কে ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১২)

(৪.৪.৯) চাইর, শোদ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৪)

(৪.৪.১০) ডাকা, দর্পনারান, আদিকারি, তেরিখ, আগ্রান, মোহাশএ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৭)

(৪.৪.১১) সুকুর বাড়, আগ্রান, বেপার, তেরিখ, কজ্জ ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৫)

(৪.৪.১২) মদ্ধে, তপঃসীল, পৈষ, শাইৎশাতে ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৮২)

(৪.৪.১৩) বুজিয়া, করুণামঞ্জি, সইচ্ছা, সর্ব্বা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১৩)

(৪.৪.১৪) বুজীয়া, চক্রবত্তী, সত্যাদীকারি, সেতাম্বর ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১৪)

(৪.৪.১৫) জানওারি, ডিগড়ী, উপস্তীত, কস্মিনকালে, বেতীত ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১১)

(৪.৪.১৬) ইষ্টাম্প, জানওারি, ফএছলা, মোকদ্দমা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২)

(৪.৪.১৭) মৈদ্দগত, কালেটরি, বেতীত, শইৎষ্যা ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০)

(৪.৪.১৮) এস্তাহার, শম্মুখে, কাতীক, ফয়ছলা, জোবানবন্দী, আপরিল ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৫)

(৪.৪.১৯) অর্দ্দেক, সুদ্দ, ফেব্রওারির, মোকদ্দমা, এস্তাহার, সাটফিকট, পুস্কন্নি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—৭)

(৪.৪.২০) জানওারি, ইষ্টাম্প, দীজামুর ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২০)

(৪.৪.২১) মৈধ্যে, ডিগীরি ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—১০৮)

(৪.৪.২২) পরিবত্তন চক্রবত্তী ইত্যাদি। (পত্রসংখ্যা—২৬)

উপরিউক্ত ধারাগুলি ছাড়া উ-ঊ, জ-য়, ন-ণ, শ-ষ-স প্রভৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লিপিকরগণ কোনো নিয়ম অনুসরণ করেন নি। লিপিকরগণের যথেচ্ছতাই সর্বত্র লক্ষ করা যায়।

পুথিতে সংস্কৃত অংশের বানান

(৫) বর্ণবিন্যাসে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা শুধু যে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, বাংলা পুথিতে উদ্ধৃত সংস্কৃত রচনাংশের বানানেও এই স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ স্পষ্ট। যেমনঃ

(৫.১) ১০৭৭ বঙ্গাব্দে লিপিকরা 'রাধারসকারিকা'-র পুথিতে (পুথি সংখ্যা—৫১৫) লিপিকর গুরুবন্দনায় লিখেছেন ঃ

"........ তিমিরানধস্য গ্যানঞ্জন সলাকয়া চক্ষুরূনমিলিতং জেন শ্রী গুরূরে নমঃ" ইত্যাদি।

(৫.২) ১১০৯ বঙ্গাব্দে লিপিকরা 'বৈষ্ণববন্দনা' পুথিতে (পুথি সংখ্যা—৪৫৩) উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশেও বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যেমন ঃ ভারথী, শ্বরূপ, শদাসীব, সরশ্বতি, পুরূষোত্তম, মধুশুদন, ভগবানচার্য্য, স্ত্রিরূপিনং, লক্ষ্মি, নিত্যানন্দশ্বরূপশ্য, বসুধা, বিষ্ণুপৃয়া, শাক্ষাৎ, শনাতন, দ্বিযোত্তম, শংকরো, ষুদর্ষণ ইত্যাদি।

(৫.৩) ১১৬৪ বঙ্গাব্দে লিপিকরা মহাভারত (সৌপ্তিক পর্ব) পুথিতে (পুথি সংখ্যা—৫৯১) সংস্কৃত অংশে লিপিকর লিখেছেন ঃ সাশ্বতং পদং।

(৫.৪) ১১৭৩ বঙ্গাব্দের লিপিকরা ৫৪ সংখ্যক পুথিতে সংস্কৃত অংশে লিপিকর যথেচ্ছ বানান লিখেছেন ঃ

"জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোঁসা।
ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥"

(৫.৫) ১১৯৪ বঙ্গাব্দে লিপিকরা ১১৪ সংখ্যক পুথিতেও সংস্কৃত অংশের বানানে বিশৃঙ্খলা রয়েছে ঃ

"উত্তরাকান্ড লিখ্যতে। রাম লক্ষণ পূব্রজং
রঘুবংসী সীতাপতী শুন্দর কান্ডস্থং....."

উল্লিখিত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল বাংলা পুথিতে সংস্কৃত অংশের বানানেও লিপিকরগণ যথেচ্ছ বানান প্রয়োগ করেছেন। সেক্ষেত্রে দেবভাষার স্বাতন্ত্র্যও তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। কিন্তু একই সময়ে বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত ভাষার পুথিতে বানান-বিশৃঙ্খলা অনেক কম দৃষ্ট হয়। সেখানে বানান অনেক বেশি বিধিসম্মত। তার মধ্যেও যেসব অসংগতি দেখা যায় তার অনেকটাই নাগরী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণকরণ নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি সংস্কৃত পুথির কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

. (৫.৬) ১২৩৫ বঙ্গাব্দে লিপিকরা বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ (অরণ্যকান্ড) পুথিতে পাই ঃ

"ওঁ নমো রামচন্দ্রায় ॥ জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যা
নন্দিবর্দ্ধনোরামঃ। দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুন্ডরীকাক্ষঃ।
প্রতিপ্রয়াতে ভরতে বসন্‌রামস্তপোবনে। উদ্বেগং
লক্ষয়ামাস তত্রস্থানাং তপস্বিনাং। যে তত্র চিত্রকূটস্য
পুরস্তাত্তাপসাশ্রমা ঃ। (পুথি সংখ্যা—১৪৩৪ (ক), পৃষ্ঠা—১খ)

(৫.৭) লিপিকর ঠাকুরচন্দ দেবশর্ম্মা 'লক্ষ্মীচরিত্রং' পুথিতে (১২৪৬ বঙ্গাব্দ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ বানান প্রয়োগ করেছেন ঃ

"ওঁ মহালক্ষ্মীনমঃ। লক্ষ্মীচরিত্রং। মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি
কেশবঃ। কেনোপায়েন দেবি ত্বংপুংসাং ভবতি নিশ্চলা।
শ্রী লক্ষ্মীরুবাচ শুক্লা পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র শোভনা।
.. যশোপভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ। স্বল্পংপ্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী তস্মিন্
সদাহং পুরুষে বসামি।" (পুথি সংখ্যা—সং ১১৭৭, পৃষ্ঠা—১ক)

উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করলেই লক্ষ করা যায়, বাংলা পুথির বানানে যে ধরনের বিশৃঙ্খলা রয়েছে, সংস্কৃত পুথির বানানে তা ততটা নেই। আসলে সংস্কৃত প্রথম থেকেই ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ সুসংগঠিত একটি লেখ্য ভাষা। তার বানান ও বর্ণ বিন্যাসের নিয়মাবলিও তাই প্রথম থেকেই একটি অনমনীয় মান্যতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃতে প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য বানানবিধি নির্ধারক কিছু ছোটো পুথি পাওয়া যাচ্ছে। এই পুথিগুলিতে সমজাতীয় বর্ণগুলির উচ্চারণ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, পুরুষোত্তম দেব (দ্বাদশ শতাব্দী) রচিত 'জ'-কার ভেদ', 'শ-কার ভেদ', 'ষ-কার ভেদ' 'স-কার ভেদ' ইত্যাদি।

'জ-কার ভেদ' পুথিতে শ্রী পুরুষোত্তম দেব জ-বর্ণের ব্যবহার দেখিয়েছেন ঃ

"......... বর্জ্জনং গর্জ্জনং চৈব উপার্জ্জনং বিসর্জ্জনং। রজকো রজনী বাজী রাজা রাজং পরাজয়ঃ। কূজনং ব্যজনঞ্চেব তথৈবোদ্বেজকঃ পুনঃ। .... ইতি শ্রী পুরুষোত্তম দেবকৃতো জ-কারভেদঃ সমাপ্ত।

"শ-কার ভেদ' অংশে শ-এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে ঃ

" ..... শকুনি শকুন্তি পিশাচ শপথ কৃশানু নিশীথ কিশোর শিতি শব কাশ্যপ কর্কশ ...... সংশয়ঃ সদৃশশ্চৈব সকাশঃ স্পর্শ এব চ। ইতি শ্রী পুরুষোত্তমদেব-কৃতঃ শ-কার ভেদ সমাপ্ত।"

"ষ-কার ভেদ' অংশে ষ বর্ণের ব্যবহার দেখানো হয়েছে ঃ

"পুষ্প ভূষণ বিষাণ ঘোষণং পুষ্কর কারীষ দুষ্করং অম্বরীষ পুরুষোত্তমদেব কৃত ষ-কার ভেদ সমাপ্ত।"

'স-কার ভেদ' পুথিতে স বর্ণের প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলি দেখানো হয়েছে।

এছাড়া 'ণ-কার প্রদীপ' নামক একটি সংস্কৃত পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় পাওয়া গেছে। এই পুথিতে কোথায় ণ বর্ণের ব্যবহার হয় গ্রন্থকার তার দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে এই রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়। বিরিঞ্চি-বাগীশ-কবীন্দ্রমুখ্যা বাগম্বুরাশিং যদনুগ্রহেন। সুদুস্তরং গোষ্পদবত্তরন্তি বাগ্দেবতাং তাং প্রণমামি নিত্যং। মূর্দ্ধন্য বর্গান্ত্যযুতাশ্চ শব্দস্বভাবসিদ্ধাঃকবিভির্উক্তাঃ। বালাববোধে চ সতাং মুদে চ প্রদীপবত্তানিহদর্শয়ামি। .... "

ভবত সেন বিরচিত 'সুখলেখনম্' গ্রন্থে ণত্ব-বিধি, ষত্ব-বিধি, একতালব্য দ্বিতালব-তালব্য মূর্ধন্যাদি বিধিসমূহ, শব্দের বর্ণ বিন্যাস সংক্রান্ত বিবিধ নিয়ম নিবদ্ধ রয়েছে।[৫]

(৬) সংস্কৃত পুথিতে যেখানে বিশৃঙ্খলা এত কম, সেখানে একই সময়ের বাংলা পুথিতে এত বহুল পরিমাণে বিশৃঙ্খলা রয়েছে কেন?—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। বাংলা পুথিতে বিশৃঙ্খলার কারণ হিসাবে অনুমান করা যায় :

প্রথমত, সংস্কৃতে বর্ণবিন্যাসের নিয়মাবলি যেমন একটি মান্যতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, বাংলা ভাষার ব্যাপারে সে কথা বলা যায় না। মধ্যযুগে লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার হলেও বাঙালি শিক্ষিত সমাজে বাংলা ভাষার কোনো মান্য অবস্থান ছিল না বলে বাংলা বানানেরও কোনো মান্য কাঠামো যে সময়ে গড়ে ওঠে নি। তাই বাংলা বানানে শিথিলতাব অবকাশ অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া সংস্কৃত পুথির ব্যবহার বিদ্বজ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সংস্কৃত পুথি লিপি করার ক্ষেত্রে সতর্কতার শর্ত অবশ্য পালনীয় ছিল। সেক্ষেত্রে বানান-বিশৃঙ্খলা কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে মূলত স্বল্পসাক্ষর আখরিয়া বা লিপিকরেরাই বাংলা পুথি লিপি করায় বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনাও বেড়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, লিপিকবগণ অনেকে পুথি লিপি করাকে নিছক অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করায়, অল্প সময়ে অধিক পুথি লিপি করার দিকেই তাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তাই একই পুথিতে একই লিপিকরের হাতে পাশাপাশি 'শিতা', 'সিতা', 'শীতা' ইত্যাদি বানান পাওয়া যায়, যাতে দ্রুততাজনিত অসতর্কতা ও দায়সারা মনোভাব তথা মনোযোগের অভাবই প্রকট হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, লিপিকরগণ প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। তাই পুথি লিপি করাঁর ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিকতার প্রভাব বানানকেও খুব বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। ফলে বানানে একরূপতা রক্ষিত হয়নি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থত, দ্রুত পুথি লিপি করার জন্য লিপিকরগণ অনেক সময় শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে পুথি নকল করতেন। তার ফলে যার পাঠ অনুসরণ করে পুথি লিপি করা হত, তার অশুদ্ধ উচ্চারণ বানান বিশৃঙ্খলার একটি কারণ। অবশ্য এক্ষেত্রে যিনি পাঠ করছেন তার অজ্ঞতাই শুধু দায়ী নয়। লিপিকরের অজ্ঞতাও সমান দায়ী। কারণ যিনি পাঠ করছেন তাঁর অশুদ্ধ উচ্চারণ শুদ্ধ করে লেখার মতো জ্ঞান লিপিকরদের ছিল না।

পঞ্চমত, কোনো কোনো পুথিতে একাধিক হস্তলিপি লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে সময়াভাবে একই পুথি একাধিক ব্যক্তি লিপি করেছেন বলেই মনে হয়। সেই কারণে একই পুথিতে একটি বানান ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরের হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। ফলে, একরূপতার অভাবে বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠত, পুথিতে বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে (যেমন, ন-ণ, ন-ল, ব-র) বিশেষত যুক্তবর্ণের মধ্যে লিপিগত সাদৃশ্য এত বেশি ছিল যে অনেকক্ষেত্রেই লিপিকরগণ যে পুথি থেকে লিপি করেছেন তার সঠিক পাঠ বুঝতে না পারায় এক বর্ণের স্থানে ভিন্ন বর্ণ ব্যবহাব করেছেন। ফলে বানানে অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে।

তিন শতাব্দীর পুথির বানানরীতি বিশ্লেষণ করলে বাংলা লিপিপদ্ধতিতে এক ধরনের গতানুগতিকতার আভাস স্পষ্ট হয়। আসলে বাংলা পুথির লিখন বা অনুশীলন সামগ্রিকভাবে একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ফলে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অচল, অনড় গতানুগতিকতা পুথির লিপিকরদেরও প্রভাবিত করেছে। এই সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য-নির্ভরতা এতখানি রূঢ়মূল ছিল যে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত আধুনিক মুদ্রণপ্রযুক্তি তার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কাবণ ব্রিটিশের আগমনেব ফলে কোনো কোনো ব্যাপারে আধুনিকতার সূত্রপাত হলেও বাঙালি জীবনের বৃহত্তর অংশে সামন্ত যুগের অবসান হয়নি। এই কারণে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে একই বিষয়ের (যেমন : চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল) ছাপা বইয়ের চেয়ে হাতে লেখা পুথির ঔপচাবিক মর্যাদা বেশি ছিল। এই কারণে বাংলা বানানে বিশৃঙ্খলার পরম্পরাগত ধারাগুলির কোনো গুরুতর পরিবর্তন হয়নি। তাই বাংলা বানানের ক্রমবিবর্তন পুথির ধারাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়নি। পরবর্তী শতকগুলিতে বানানের অগ্রগতি ঘটেছে মুদ্রণকে অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ মুদ্রণ যুগ

বাংলা বানানের অগ্রগতি ঘটেছে মুদ্রণকে অবলম্বন করে। কারণ মুদ্রিত গ্রন্থাদির বানানে মানায়নের প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য পর্বে আমাদের পর্যবেক্ষণের মূল বিষয় মুদ্রণের প্রভাবে বাংলা বানানে কী ধরনের অবস্থান্তর ঘটেছে। এই আলোচনার পটভূমিকা হিসাবে প্রথমে মুদ্রণের আবির্ভাব, অগ্রগতি এবং বাংলা বানানের সঙ্গে মুদ্রণের সম্পর্কের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

বাংলাদেশে ছাপাখানা এল ভারতবর্ষে ছাপাখানা পদার্পণের প্রায় দুই শতক পর। হুগলিতে মিঃ এনড্রুসের ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের-এ 'গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। বইটি ইংরেজিতে লেখা হলেও এর মধ্যে রামায়ণ মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রথম বাংলাদেশে বাংলা হরফের সঙ্গে মুদ্রণ প্রযুক্তিব সংযোগ সাধিত হল। তবে বিদেশে এব আগেই ১৬৬৭-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাপা আটটি বই পাওযা যাচ্ছে। সেখানে বাংলা হরফের সঙ্গে মুদ্রণের পরিচয় ঘটেছে।[৬] তবে হুগলিতে ছাপা হরফের সঙ্গে এগুলির প্রধান পার্থক্য হল, বিদেশে ছাপা বইগুলিতে ব্যবহৃত বাংলা লিপিগুলি সবই হাতে লিখে প্লেটে কেটে ছাপা হয়েছে। ফলে লিপিকরের হস্তলিপি আলাদা হওয়ায় মুদ্রিত প্লেটে লিপির চেহারাও পৃথক হয়ে গেছে। তাই কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ কবা যায় নি। কিন্তু হুগলির ক্ষেত্রে উইলকিনস্ পঞ্চানন কর্মকাবের সহায়তায় বাংলা হরফ কেটে, পৃথকভাবে ঢালাই করে মুভেবল বাংলা ছাপার হবফের সাট তৈরি করেন। ফলে ব্যক্তিবিশেষেব হস্তলিপির ছাপ থাকলেও যান্ত্রিক কারণে একধবনের একরূপতা বক্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে মুদ্রণ-প্রযুক্তি হুগলির ছাপাখানার মুদ্রণনীতি অনুসরণ করেই অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে।

হেস্টিংসের প্রেরণায় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। তবে এর মধ্যে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হয়েছে বাংলা বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও কাব্যাংশের উদ্ধৃতি। এর জন্য চালর্স উইলকিনস পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা হরফ তৈরি করেন। এইভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজনে হেস্টিংসের উদ্যোগে বাংলাদেশে বাংলা মুদ্রণের সূচনা হয়।[৭] হ্যালহেডের-'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকাতেও এর উল্লেখ রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মুদ্রিত হল সরকারি আইনের অনুবাদ, ব্যাকরণ, অভিধান গ্রন্থাদি। এই বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক প্রয়াসগুলিই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি লাভ করেছিল।

তবে মূলত প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলাদেশে মুদ্রণের সূত্রপাত হলেও, অন্যবিধ প্রেরণাও মুদ্রণ যন্ত্রেব প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে। এর মধ্যে একটা হল খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের প্রয়াস। এই উপলক্ষে বাইবেলের অনুবাদ, খ্রিস্টধর্ম প্রচারমূলক গ্রন্থাদি জনসাধারণের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিতরণের ক্ষেত্রে মুদ্রণ বড় ভূমিকা নেয়। সুতরাং, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তাগিদে প্রধানত বৈদেশিক স্বার্থেই মুদ্রণের সূত্রপাত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশেও মুদ্রণশিল্পকে বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ; তবে তা ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কারণ বাংলাদেশে বিদেশিদের শাসনকালে মুদ্রণশিল্পের পত্তন হয়েছিল। তাই দেশীয় জনসাধারণ ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে মুদ্রণের বিরোধিতা করেন। তাঁরা ধর্মসাহিত্য মুদ্রণকে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করতেন। তাছাড়া বৈদেশিক শাসনের মতো বিদেশিদের মুদ্রিত গ্রন্থকেও তাঁরা দুরভিসন্ধিমূলক বলেই মনে করতেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে১৯ ডিসেম্বরের 'বঙ্গদূত' পত্রিকা জানাচ্ছে ঃ

"পূর্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন, যেহেতু সাধারণের সাধারণবোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমাদিগের ধর্ম্ম ছাপায় ......।"[৮]

শ্রীপান্থ তাঁর গ্রন্থে[৯] জানিয়েছেন, সমাজের সংস্কার কাটাবার জন্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ছেপেছিলেন 'বিশুদ্ধ হিন্দুমতে'। ছাপার কালি তৈরি হয়েছিল গঙ্গাজল যোগে, কম্পোজিটররা ছিলেন ব্রাহ্মণ। গ্রন্থের আকৃতিও ছিল পুথির মতো।

কিন্তু এত প্রতিরোধ সত্ত্বেও মুদ্রণের অগ্রগতি রোধ করা যায় নি। মুদ্রণ যখন দেশীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, তখনই ধীরে ধীরে প্রতিরোধ কমে এসেছে। দেশীয় প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিক্ষাবিস্তারে মুদ্রণের উদ্যোগের কথা। বাজকার্যে সুবিধার জন্য ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের যেমন বাংলা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি রাজভাষা শেখার জন্য স্বদেশি মানুষদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'কালকাটা গেজেট'-এ ইংরেজি শিক্ষার জন্য স্বদেশি মানুষদের আবেদন লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১০] এই সময মুদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থ এই অভাব পূরণ করে। যেমন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এ. আপজন কলকাতার ক্রনিক্যাল প্রেস থেকে ছাপান 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'। ১৭৯৭ সনে একই উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয় জন মিলাবের 'The Turor' বা 'সিক্ষ্যাগুরু'। তাছাড়া পূর্বে পাঠ্যপুস্তক সুলভ না হওয়ায়. মৌখিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হত এবং পাণ্ডুলিপি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পড়ানো হত। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করে।

নানাভাবে মুদ্রণশিল্প যখন দেশের মানুষের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখনই প্রতিরোধ কমে আসে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারির 'সমাচার দর্পণে'র বিবৃতি থেকে জানা যায় ঃ[১১]

"যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইযাছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।"

তবে পুথির যুগের অবসান ঘটিয়ে এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জনেব জন্য মুদ্রণের পৃষ্ঠ পোষকদের নানা বিযযে সতর্কতা অবলম্বন করতে হযেছিল। এর মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থের পবিপাট্য, অলংকরণ, অক্ষর বিন্যাসের শুদ্ধতা ও সুদৃশ্যতা—এক কথায় সামগ্রিক সৌষম্য ও সজ্জাব দিকের লক্ষ রাখতে হয়েছে। এবই সূত্র ধবে মুদ্রণের সঙ্গে মান্যীকরণের প্রশ্নটি জড়িয়ে গিয়েছে।

মান্যীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্যই হল সর্বজনগ্রাহ্য সমতা বা একরূপতা সৃষ্টি। অক্ষরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সুদৃশ্যতা ও শুদ্ধতাব ব্যাপারে একরূপতা বা সমতা রক্ষা করতে গিয়ে মুদ্রণ শেষ পর্যন্ত বানানের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন আদর্শ বা মডেল স্থাপনে সহায়তা করেছে। মুদ্রণ যুগের প্রথম দিকে পুথির বানানের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে মুদ্রিত গ্রন্থের বানানের শুদ্ধতার দিকে যে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়, তার অনেক সমকালীন সাক্ষ্য আছে। ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ঃ

"বর্ণ শুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙলা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্তি থাকিবেক মূল্য ৪ টাকা...... ।"

সমাচার দর্পণের বিজ্ঞাপন (৩০ মে, ১৮২৯) রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ[১২] "কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকাল পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিকের ভ্রম প্রযুক্ত অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্ত ইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিত দ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে ....।"

এই সকল বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মুদ্রিত গ্রন্থের মান পুথির তুলনায় উন্নত করতে গিয়ে মুদ্রাকরেরা অন্যান্য পারিপাট্যের মধ্যে বানান-বিশুদ্ধতার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। এই কাজে বিশেষভাবে সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের সাহায্য নেওয়া হত। সুতরাং বলা যায় ইংরেজি বানানেব মানায়নে ইংল্যান্ডে ক্যাকস্টন যেমন বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বাংলা বানানের মানায়নের ক্ষেত্রেও মুদ্রণের প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এবার বিভিন্ন সময়ের মুদ্রিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকার বানান বিশ্লেষণ করে আমরা দেখব, মুদ্রণের প্রভাবে বাংলা বানানে কী ধরনের অবস্থান্তর ঘটেছে।

মুদ্রণের প্রভাবে বাংলা বানানে কী ধরনের অবস্থান্তর হয়েছিল তা আলোচনার প্রারম্ভে এই পর্যবেক্ষণ-কার্যে সুবিধার জন্য বাংলা মুদ্রণযুগকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

প্রথম পযায় —১৭৭৮ খ্রিঃ — ১৭৯৯ খ্রিঃ।

দ্বিতীয় পর্যায় —১৮০০ খ্রিঃ — ১৯৩৪ খ্রিঃ।

তৃতীয় পর্যায় —১৯৩৫ খ্রিঃ —আধুনিক কাল।

বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে ভিত্তি করে এই পর্যায়বিভাজন করা হয়েছে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মুদ্রণের যে প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হয়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রকাশনের মধ্য দিয়ে সেই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে লাইনোটাইপের মতো আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ বাংলা মুদ্রণে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে।

প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ বাংলাদেশে মুদ্রণের সূচনা পর্বের যে বিচ্ছিন্ন প্রকাশনগুলি পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় হল মুদ্রিত গ্রন্থাদির বানান পুথির তুলনায় সংগঠিত হলেও পুরোপুরি পুথির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে উদ্বৃত্ত বাংলা শব্দ বা বাক্যাংশের বানান বিশ্লেষণ করলে বহু ক্ষেত্রেই পুথির বিশৃঙ্খলার ছাপ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

ই - ঈ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা ঃ

" এ নাথ তুমি মোরে করিলা পরাধিন (পৃ: ৫৭)

"আসাড়ে নবিন মেঘ গভির গর্জন।"

"রাত্রে রজনীতে"/"যাওরে রজনি তুমি মরিয়া" (পৃ: ৬৩)

উ - ঊ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলাও বহুস্থানে দেখা যাচ্ছে। যেমন ঃ

"সিংহনাদ শব্দ করিয়া বানরগূলা আইসে" (পৃ: ৭৪)

একই পৃষ্ঠায় রয়েছে 'গরুগুলা', 'অস্ত্রগুলা'।

"সৈন বলে রাজা তুমি ভুবনে বিখ্যাত' (পৃ: ৭৯)

"এই রুপে বামাগণ কহে পরষ্পর।" (পৃ: ৯৭)

"আমি দেখিলা অপরুপ রুপের বাজার" (পৃ: ১১১)

একই অনিয়ম 'জ' - 'য' বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

"Of Pronoun" অর্থাৎ সর্বনাম প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে ৯২ পৃষ্ঠায় যে, যাহা, যাহাতে, যাহাদের, যাহার, যাহায় ইত্যাদি বানান পাওয়া যাচ্ছে। আবার ৯৮ পৃষ্ঠায় 'জেন', 'জে', 'জখন' ইত্যাদি বানানও পাচ্ছি। তাছাড়াও বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে জ এবং য বর্ণের অনিয়মিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ "দিয়াছে যে কড়ি যারে দিগুন সুনায় তারে" (পৃ: ৯২)। আবার,

"আমি জে হই সে হই আমি জে হই সে হই।
জিনিয়াছি পনে বিদ্যা ছাড়ি জাব নাই।।" (পৃ· ১১২)

এই রকম বিশৃঙ্খলা ন-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায। অবশ্য এখানেও আমরা লক্ষ করি 'ন'-এর প্রয়োগই বেশি। যেমন ঃ 'দিগুন', 'যোদ্ধাগন', 'ক্ষণ', 'প্রাণ', 'দ্রোন', 'মরন' ইত্যাদি।

শিসধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শ, ষ এবং স-এর অনিয়মিত ব্যবহার পুথির মতো এখানেও অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওযা হল ঃ

'রায় বলে বাসা দিলে হইলাম প্রত্যাসী।' (পৃ: ৮৫)

"সকল পাসন্ডদিগের পাপ ক্ষয় হইল।
নিতাই চৈতন্য আসি দরসন দিল।।" (পৃ: ৭৪)

'অগ্নিবর্ন সব দেখি সঘনে আকাষ।
দিবসেতে ধুমকেতু করয়ে প্রকাষ।।" (পৃ: ১০৮)

এছাড়া, 'বিক্ষাত', 'সান্ত্না', 'জর্জ্বর' ইত্যাদি বানানে **যুক্তব্যঞ্জন গঠনে শিথিলতার আভাস মেলে।**

সুতরাং, বোঝাই যায়, হ্যালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণে বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে পুথির বানানই অনুসরণ করেছিলেন। এই বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে ওঠার কোনো প্রচেষ্টা তাঁর গ্রন্থে আমরা দেখি না।

বানান সংক্রান্ত এই ধরনের বিশৃঙ্খলা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আপজনের অভিধানেও আমবা লক্ষ করি। উদারহণস্বরূপ আপজনের অভিধান গ্রন্থের বিভিন্ন বানান এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

ই - ঈ- সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা :

ইশ্বর (পৃ: ৪২৭). গ্রিশ্ব (পৃ: ৫৯), পাপি (পৃ: ১৯৫) পাপিষ্ট মানুষ (পৃ: ১৯৫), পাপীষ্ট মানুষ (পৃ: ১৯৫), সিত (পৃ: ৩৪৬), সিতল (পৃ: ৩৪৬) ইত্যাদি।

উ - ঊ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা :

ঊদ্দিস (পৃ: ৪২৯), ঊদয় (পৃ: ৪২৯), ঊত্তম (পৃ: ৪২৯), ঊত্তর (পৃ: ৪২৯), ঊল্লাষ (পৃ: ৪৩১), ঊপাএ (পৃ: ৪৩২), ঊনসত্তোর (পৃ: ৪০২), ঊপবাষ (পৃ: ৪৩৩), ঊপগার (পৃ: ৪৩৩), ঊপহায (পৃ: ৪৩৩), ঊপএ (পৃ: ৪৩৩), ঊপদেশ (পৃ: ৪৩৩) ইত্যাদি।

'জ - য' সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা :

জে (পৃ: ৯৬), জে জন (পৃ: ৯৬), জেবা (পৃ: ৯৬), জার (পৃ: ৯৬), জেমন (পৃ: ৯৬), জোগাজোগ (পৃ: ১০৬), জৌবন (পৃ: ১০৭), জুবা (পৃ: ১০৭), জুবতি (পৃ: ১০৭), জুগ (পৃ· ১০৮), জথার্থ (পৃ: ১০৫), নিজুক্ত (পৃ: ১৮২)।

ন - ণ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা :

কল্পনা (পৃ: ২২), বনিক (পৃ: ৫৭), পযুগন (পৃ: ২১১), মন্ত্রনা (পৃ: ৩০৩), ঘ্রনা (পৃ: ৬৭) ইত্যাদি।

শিস-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা :

মেষ (পৃ: ৩৪৫), সিস্টাচার (পৃ: ৩৪৫), সিতল (পৃ: ৩৪৬), সিত (পৃ: ৩৪৬), সোক (পৃ: ৩৬৫), সুন্দর (পৃ: ৩৭৩), যুপরিষ (পৃ: ৩৭৯), ষুখি (পৃ: ৩৭৩), আকাষের তারা (পৃ: ৪১২) ইত্যাদি।

বানানে 'ঋ'-ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণের স্থানে বিভিন্ন কার চিহ্ন যুক্ত র-ফলার প্রয়োগ পুথির মতো এখানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন ঃ

দ্রিষ্টি (পৃ: ৩৬০), শ্রিষ্টি (পৃ: ৩৬৯), শ্রীষ্টি (পৃ: ৩৬৯), গ্রহিনি (পৃ: ৫৯), গ্রহ (গৃহ) (পৃ: ৫৯), ঘ্রত (পৃ: ৬৭), ঘৃনা (পৃ: ৬৭) ইত্যাদি।

উচ্চারণ-বিভ্রান্তির কারণেও বানানে বহুস্থানে অসংগতি লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

পুস্যু পুত্র (পৃ: ২২২), চিখিচ্ছক (পৃ: ৭৫), জগর্ন্নাথ (পৃ: ১০১), তির্পান্ন (পৃ: ১৩৫), মকরদ্দমা (পৃ: ২৯৯), ব্যাগ্লিশ (পৃ: ২৪৯), মর্দ্ধিখানে (পৃ: ২৯৮), সজীনাঁ গাছ (পৃ: ২৪৬), আলিস্য (পৃ: ৪১৬), উপগার (পৃ: ৪৩৩) ইত্যাদি।

বানানের ক্ষেত্রে এই ধরনের বহুবিধ অনিয়ম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে পুথির বানান খুব বেশি প্রভাব ফেলেছে। শুধুমাত্র আপজনের অভিধানেই নয়, ক্রনিকাল প্রেস থেকে

প্রকাশিত, 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' নামক এক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে মুদ্রিত বাংলা বিজ্ঞপ্তিতেও একই রকম বানান-বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকও ছিলেন এ. আপজন। এই পত্রিকার মঙ্গলবার, ২০শে মার্চ, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের (ভল্যুম ৭,৩২২ নং) সংখ্যাতে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বাংলা বিজ্ঞাপনেও বানানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞাপনটি এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

"ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারণ এক বহি অতি শীঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা সিখিবেক এবং বঙ্গালি লোকে ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের কেফাএত কারণ এই বহি তৈয়ার করা জাইতেছে জে্ লোকে চাহে তাহারা আবজান সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র।"

এই অংশেও বানানে ই - ঈ, জ - য, স - শ - ষ সংক্রান্ত এবং উচ্চারণ-বিভ্রান্তির কারণজনিত বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলারের 'The Tutor' বা 'সিক্ষ্যাগুরু' গ্রন্থে বহু স্থানে পুথির মতো বানান-বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। যেমন, মিলার ভূমিকায় 'বাঙ্গালিদিগেরকে' বলেছেন ঃ

'আমার মনস্ত ছিলো সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে দেখিলাম জে অতি অল্পলোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।'

শুধু ভূমিকাতেই নয়, গ্রন্থের মধ্যে বাংলা অংশেও এই ধরনের বানান-বিশৃঙ্খলা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'জমি খরিদের' 'জবাব সাওয়াল' থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

'দেওয়ানিজ একখানা জমি তল্লাস করো আমি চাহি বাগান করিতে (।)
কতো বিঘার দরকার আছে তুমি চাহ খরিদ করিতে কিম্বা তোমার মনস্ত ভাড়া করিতে (?)
আমি চাহি কুড়ি বিঘা জমি (,) জমি খরিদ করিতে পাওয়া যায় বড়ো ভালো (,)
আর তাহা না হয় ভাড়া করিতে হইবেক (।)
আমি কি তল্লাস করিব এক জায়গা গঙ্গার ধারে (?)
আর কতো দুর এখান হইতে (?)
জদি গঙ্গার ধারে পাওয়া যায় আমি বড়ো খুষি হইব (,)
কিন্তু পাঁচ ক্রোষ হইতে দুর না হয় (।)

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করলে বানানের ক্ষেত্রে পুথিব প্রভাব যে তখনো রয়ে গেছে তা স্পষ্ট হয়।

১৭৮৫ সনে জোনাথন ডানকান অনূদিত 'রেগুলেশনস ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানী আদালত' ছাপা হয় কলকাতার 'অ্যাট দি অনারেবল কোম্পানি'স প্রেস'-এ। এই আইনের বইটি আপজনের অভিধান প্রকাশের আগেই মুদ্রিত হয়। তবু এই গ্রন্থে বানান অনেক বেশি সংগঠিত। আপজনের অভিধানের মতো বানান-বিশৃঙ্খলা এখানে লক্ষ কবা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ডানকান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

৮১ একাশীতি ধারা ঃ

সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন সাক্ষী আজ্ঞা মতে সাক্ষাৎ না আইসে অথবা সাক্ষাৎ আসিয়া সুকৃতি না করে কিম্বা সাক্ষি পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা আপন অভিপ্রায় মতে অথবা কিছু গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষি দেয় কিম্বা কহেরির মধ্যে আদালতের অসম্মান করে তবে তাহার সমুচিত জন্যে পূর্ব্বে মপস্বল আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের যে মত অধিকার লেখা গিয়াছে সদল দেওয়ানি আদালত হইতে ও সেই মত সমুচিত হবেক ..... ”

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত এইচ. পি. ফরস্টার অনূদিত 'কর্ণওয়ালিস কোড'-এর বানান বিশ্লেষণ করলে অসংগতি যে একেবারেই ধরা পড়ে না তা নয়, তবে পুথির বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে ওঠার সচেতন প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

৩ তৃতীয় এইজে। যে ভূমি অংশীদিগের সহিত সাধারণ থাকে কিম্বা উত্তরকালে সাধারণ হয় সে ভূমি যদি সরকারের খাসতহসিলে অথবা ইজারদারের ইজারারহে তবে এমতে সেভূমি তাহার অংশীদিগের সহিত অংস হইলে সেসকল অংশীর গতিক ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোক দিগের গতিকের নয় হইবেক ... '

১৭৮৫ সনে ইংবেজি সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ একটি বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটিব কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

এই খবব দিতেছি ১১ আপরিল সোমবার নূতন গড়ে কম্পানির গেবিসন ইষ্টোরের মধ্যে চাল্ ও ধান্য নিলামে বিক্রী হইবেক নগদ টাকা দাখিল করিলে জিনিস ওজন দেয়া জাবেক যে কেহ খরিদ করিবেক বিক্রীর তারিখ অবধি এক মাযের মধ্যে জিনিষ খালাষ কবিয়া লইবেক এক মাহার মধ্যে টাকা দাখিল করিয়া জিনিষ খালাষ না করে পুনরায নিলামে সেই জিনিস বিক্রী হইবেক ...।”

এক্ষেত্রে 'জ' ধ্বনি বা শিস্ ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণ প্রযোগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসংগতি থাকলেও বানান বেশ সংগঠিত।

এই পর্বের যে বিচ্ছিন্ন প্রকাশনগুলিব বানান এখানে বিশ্লেষণ করা হল, তা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয। একদিকে কিছু কিছু গ্রন্থাদিতে পুথিব প্রভাব খুব বেশি থেকে গেছে, অন্যদিকে একই সময়ে মুদ্রিত অন্যান্য রচনার বানানের ক্ষেত্রে অনিযম থাকলেও তুলনায় তা অনেক। একই সময এই দ্বিবিধ প্রবণতার কারণ হিসাবে মুদ্রাকরদের দায়ী করা যায়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ক্রনিকাল প্রেস থেকে মুদ্রিত 'ক্যালকাটা ক্রনিকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যে ধরনের বানান বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়, একই প্রেস থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'ইঙ্গরাজি বাঙ্গালি বোকেবিলরি' গ্রন্থেও বানানেব ক্ষেত্রে সেই ধবনের বিশৃঙ্খলাই লক্ষ কবা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই মুদ্রাকব ছিলেন এ আপজন। বোঝাই যায়, তিনি বানানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। কিন্তু একই সময়ে কোম্পানির প্রেস থেকে যে সকল আইনের গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে বানানে অসংগতি থাকলেও তার অনুপাত অনেক কম। আসলে হয়ত প্রশাসনের প্রয়োজনেই সবকারি প্রেসের মুদ্রাকরেরা বানান সম্পর্কে অনেকটা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এই সতর্ক সচেতনতাই পরবর্তীকালে গ্রন্থাদির বানান সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

মুদ্রণ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দ্রুত ছাপার প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় মুদ্রাকরেরা বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মুদ্রণের প্রভাবে বাংলা বানান কতখানি সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, পুথির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় মুদ্রিত গ্রন্থাদির বানান কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে রামায়ণ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের সঙ্গে একই বিষয়ের হস্তলিখিত পুথির তুলনা করা যেতে পারে।

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত রামায়ণ মহাকাব্যের অযোধ্যা কাণ্ডের নির্বাচিত অংশ ঃ

গন্ধ পুষ্পে ভূষিত রাজা সুগন্ধি কস্তুরী
ত্রিভুবন জিনিয়া তার রূপের মাধুরি।
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শুভ্র মাতার কেশ।
শুভ্র আসন শুভ্র বসন রাজার শুভ্র বেশ।
রাজকার্য্য করেন রাজা বসিয়া সিংহাসনে
সর্ব্ব দেশের রাজা আইল রাজসম্ভাষণে।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত নানা রত্নধন
বীরভাগ আইল যত যত রাজাগণ।
দশরথের তরে বলে যত নরপতি
সূর্য্যবংশে রাজা তুমি হইয়াছ মহামতি। (পৃ: ৪) [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৩]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত শ্রীজয়হরি দেবসর্ম্মার ১৭৬৮ খ্রিঃ (১১৭৫ বঙ্গাব্দে) লিপি করা কৃত্তিবাসের রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের নির্বাচিত অংশ :

শ্রী শ্রী রাম
দ্বিতিয়কান্ডে অজোধ্যা সুন সর্ব্বজন।
কেকই দুরন্ত বাক্যে রাম জান বন।।
অজোধ্যা নগরে দশরথ মহারাজা।
দেবলোকে নরলোকে করে জার পূজা।।
সুক্লবস্ত্র পরে রাজা সুক্ল উত্তরি।
চন্দনে ভূসিত রাজা সুক্ল বস্ত্র ধারি।।
বুড়া বয়েষ দশরথের পাকা মাথার কেস।
সুক্ল মালা পরে রাজা সুক্ল সকল বেস।।
রাজকার্য্য কবে রাজা বসিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল রাজ সম্ভাসনে।।

(পৃ: ১খ, পুথি সংখ্যা ক. বি. ৩২)।

অযোধ্যা কাণ্ডের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত নির্দিষ্ট অংশ অবিকল সদৃশ না হলেও উভয় অংশের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মুদ্রণের প্রভাবে বানান কতটা সংগঠিত হয়েছে। হস্তলিখিত পুথিতে আমরা নিম্নলিখিত বানানগুলি পাচ্ছি ঃ

অজোধ্যা, জান, জার, জৌতুক, সুন, আভরন, রাজাগন, দশরথ/দসরথ, সুক্র, ভূসিত, বয়েস, কেস, বেস, সম্ভাসনে, সবে, চতুদিগের, ইত্যাদি।

কিন্তু মুদ্রিত অংশের বানান বিশ্লেষণ করলে উল্লিখিত বানানগুলির বিশুদ্ধ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ অযোধ্যা, যার, শুনিয়া, রাজাগণ, দশরথ, শুভ্র, ভূষিত, কেশ, বেশ, সম্ভাষণে ইত্যাদি।

শুধু রামায়ণ নয়, মুদ্রণের প্রভাবে বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ সচেতনতা মহাভারতের হস্তলিখিত পুথির সঙ্গে একই অংশের মুদ্রিত পুথির তুলনা করলেও চোখে পড়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে (১১০৮ বঙ্গাব্দ) শ্রী পঞ্চানন সরকারের লিপি করা কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্বের নির্বাচিত অংশ ঃ

তবে পুনঃ২ ধ্রষ্টদ্যম্ন মহাবলে।
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষেত্রিয় সকলে।।
সুনিয়া উঠিল তবে কুরুবংসপতি।
ধনুর নিকটে গেলা ভিস্ম মহামতি।।
তুলিয়া ধনুক ভিস্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নোঙাইল মহাবল ধনু।।
ঝাকারিয়া ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ্ণ পুরিযা বির দিলেক টঙ্কার।।
মহাসব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
ডাকিয়া বলিল তবে গঙ্গার নন্দন।।

(পৃ: ১৬৮ খ, পুথি সংখ্যা ১০৭৪) [দ্রষ্টব্য : চিত্র ১]

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত আদিপর্ব (চতুর্থ বহি) ছাপা হয়। হস্তলিখিত পুথির সঙ্গে বিষয়গত সাদৃশ্যযুক্ত ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের নির্দিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

তবে পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলে
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
শুনিয়া উঠিলা তবে কুরুবংশ পতি।
ধনুর নিকট গেল ভীষ্ম মহামতি।
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বামজানু
হুলে ধরি নোয়াইল মহাবল ধনু।
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টংকার।

মহাশব্দে মোহিত হইলা সর্বজন।

ডাকিয়া বলিলা তবে গঙ্গার নন্দন। (পৃ: ৩-৪) [দ্রষ্টব্য : চিত্র ২]

রামায়ণের মতো মহাভারতের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুথির তুলনা করলেও বানানের একরূপতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে মুদ্রণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহাভারতের হস্তলিখিত পুথিতে আমরা নিম্নলিখিত বানানগুলি পাচ্ছি ঃ

ধ্রষ্টদ্যম্ন, ক্ষেত্রিয়, সুনিয়া, কুরুবংস, ভিস্ম, নোঙাইল, আকর্ন্ন, পুরিয়া, টঙ্কার, মহাসব্দে, ষুনহ ইত্যাদি।

মহাভারতের মুদ্রিত অংশে উপরিউক্ত বানানগুলির সংশোধিত রূপ লক্ষিত হয়। যেমন ঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্ষত্রিয়, শুনিয়া, কুরুবংশ, ভীষ্ম, নোয়াইল, আকর্ণ, পূরিয়া, টঙ্কার, মহাশব্দে, শুনহ, ইত্যাদি।

সুতরাং রামায়ণ মহাভারত উভয় ক্ষেত্রেই হস্তলিখিত অংশে ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, ন-ণ, শ-ষ-স ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সব প্রয়োগগত বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যাচ্ছে, অথবা বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে লিপিকরের নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যজনিত যে বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে, মুদ্রিত অংশে সেই ধবনের অনিয়ম লক্ষ করা যায় না। বরং মুদ্রিত অংশের বানান পর্যবেক্ষণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে সচেতনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই অংশে একেবারেই যে ভ্রান্তি নেই তা নয়। যেমন, শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত রামায়ণে (অযোধ্যাকান্ডে) পাই,

মাতা (মাথা) (পৃঃ ৪), ধর্ম্ম্য, প্রত্যুষ (পৃঃ ৯), বিপরিত (পৃঃ ১০), জৌতুক (পৃঃ ৬), চৌদ্দ (পৃঃ ২৭), উজ্জল (পৃঃ ২৯), স্বাক্ষী (পৃঃ ৩৩), গর্ব্ভবতী (পৃঃ ৪১), বিসাদ (পৃঃ ৪৩), পাসান (পৃঃ ৭২) ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে মহাভারতের মুদ্রিত গ্রন্থের (আদি পর্ব তৃতীয় বহি) কোথাও কোথাও বানানের ক্ষেত্রে অনিয়ম লক্ষিত হয়। যেমন ঃ

অন্যেষণ (পৃঃ ৩), ধ্রতরাষ্ট (পৃঃ ১৯০), ব্রকোদর বৃকোদর (পৃঃ ১৯৩), মাংশ (পৃঃ ১৯৩), দুরন্ত (পৃঃ ২০০), নির্দ্দয় (পৃঃ ২০০), জৌবন (পৃঃ ২০২), শঙ্কট (পৃঃ ২১১), গর্ব্ভবতী (পৃঃ ২১২), বিক্ষাত (পৃঃ ২৫২), হিংশা (পৃঃ ২৭১) ইত্যাদি।

এই ধরনের নিয়মহীনতা প্রথম মুদ্রিত রামায়ণ মহাভারতে কোথাও কোথাও লক্ষ করা যাচ্ছে। আসলে পুথির যুগ থেকে মুদ্রণ যুগে উত্তরণের পর্বে এই ধরনের কিছু কিছু অসংগতি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবু মুদ্রিত গ্রন্থের বানান পর্যবেক্ষণ করলে ক্রমশ পুথির যুগের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে একটা আদর্শ স্থাপনের যে চেষ্টা চলছে তা বোঝা যায়। এই আদর্শ অবশ্যই সংস্কৃতানুসারী। মুদ্রণ যুগের ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে রামায়ণের বিজ্ঞাপনের কথা। সেখানেও দেখি পন্ডিতদের দ্বারা বানান শুদ্ধ করে রামায়ণ ছাপা হবে এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থাদির বানান পর্যবেক্ষণ কবলে বানানের ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থাদির সংস্কৃত-অনুসারী রূপটি আরও স্পষ্ট হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের জন্য লেখা কিছু পাঠ্যপুস্তকের বানান বিশ্লেষণ করলে, পুথির বিশৃঙ্খলা থেকে উত্তরণের স্পষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

লিপিমালা (১৮০২ খ্রিঃ) থেকে উদ্ধৃত অংশ ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রথম ধারা

১। প্রথম লিপি রাজা অন্য রাজাকে লেখেন—

"পরম দেবতা ভগবানের গুণানুবাদ করণের পর যিনি পৃথিবীকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন মানব করণক আর আর পশু পক্ষী মীন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই মানবের নিমিত্তক তন্মধ্যে রাজাগণকে ঐশ্বর্যবন্ত করিয়া উদ্ভব করিয়াছেন আর আর সমস্তের রক্ষার্থে। ইহাতে ইহারদের উচিত সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের স্তাবক থাকিয়া তাহার অনুজ্ঞা পালন করেন এবং দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ও ভিন্ন বর্ণ সমস্তকে আপন পরিবারের ন্যায় প্রতিপালন করেন। ...." [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৪]

তোতা ইতিহাস (১৮০৫ খ্রিঃ) থেকে উদ্ধৃত অংশ ঃ

ময়মুনের জন্ম ও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ।

"পূর্ব্বকালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ সুল্তান নামে একজন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তব সৈন্যসামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভাবের সহিত তাহার দ্বাবে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বর পূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বাবা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রেব ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাঁহাকে দিলেন। ...."

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫ খ্রিঃ) থেকে উদ্ধৃত অংশ ঃ [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৫]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রবায়স্য চরিত্রং।

বঙ্গভূমিতে হাবিলি পরগণায় কাঁকাদ গ্রামে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল পরগণা ও তাহার জমিদারি কিছু কাল পরে রাজকরের কারণ ঢাকার শুভার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিলেন .....

উপরে উদ্ধৃত তিনটি পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত অংশের বানান বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মুদ্রণের প্রভাবে বানানের একরূপতা অনেকটাই বক্ষিত হয়েছে। পুথিতে ই-ঈ, উ-ঊ, 'জ' ধ্বনি, 'ন' ধ্বনি, শিস-ধ্বনি, অসমাপিকা ক্রিয়া ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়, মুদ্রিত গ্রন্থে তা নেই বললেই চলে। তবে বানান বিশৃঙ্খলা যে একেবারেই নেই তা নয়। লিপিমালা গ্রন্থের ভূমিকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চারণভিত্তিক বানান লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ উদ্দিশ্যে, হেন্দুস্থান।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ধারাতে পাচ্ছি ঃ করেন/কবেণ, পারেণ, শীকার।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ধারাতে পাচ্ছি ঃ ভগিরথ/ভগীরথ, কর্ম্মানুযায়ি, আল্হাদিত/আহ্লাদিত, কএক, বৈরি, শংসয়, দৈবানুগ্রহীতের, করেণ, শেষদসা, মছলমান, লালিস, ফর্দ্ধ, মারিপীট, পৌছাইয়া, নাদি ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের বানান পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায়, বিশেষত ইন্ ভাগান্ত শব্দ ঈ-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে। কিন্তু বিভক্তি যুক্ত হলে ই-কার হয়ে যাচ্ছে। যেমন ঃ পক্ষী কিন্তু পক্ষিকে, জ্ঞানী/জ্ঞানিরা।

এই প্রবণতার ব্যতিক্রমও রয়েছে। তবে এই প্রবণতার সূত্রপাত এখানে রয়েছে।

"তোতা ইতিহাস" গ্রন্থের বানান সংস্কৃতানুসারী। তবে এই গ্রন্থে কোথাও কোথাও বানান ভুল রয়েছে। যেমন ঃ সুল্তান, হাজীর, প্রচুর, পারস্ব, পসন্দেতে, কএক, সামিগ্রী, চতুবিং শতি/চতুর্ব্বিংশতি ইত্যাদি।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং" গ্রন্থেও পুথির বানানের নিয়মহীনতা নেই বললেই চলে। তবে কোথাও কোথাও বানান ভুল রয়ে গেছে। যেমন ঃ শুভা (সুবা), সমাদ্দার, গর্ত্তিণী, গর্ত্ত, পুনরায়, বিসারদ, রাজধানি, সসজ্য, অভরণ, সুরসদাবাদে, আলাবৃদ্ধি খাঁ, স্রাজের দৌলা, মহাসঙ্কান্নিত, জবন, হঠাৎ, সামিগ্রী/সামগ্রি, অভ্যাষ ইত্যাদি।

তিনটি পাঠ্যপুস্তকের বানান বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাচ্ছে, মুদ্রণ যুগের সূত্রপাতের মুহূর্তেই বানানের ক্ষেত্রে মান্যতা এসেছে। তবে যে ভুলগুলি থেকে যাচ্ছে সেগুলি মূলত উচ্চারণ-বিভ্রান্তি ও সহলিপি (allograph)-এর প্রয়োগ-বিভ্রান্তির কারণেই হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুথির যুগের ব্যাপক বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে একটি নতুন যুগে উত্তরণের পর্বে বানানের মানায়িত রূপের পাশাপাশি এরকম কিছু ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। গ্রন্থগুলির পরবর্তী সংস্করণের বানান বিশ্লেষণ করলে এই ভুলগুলি সংশোধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত "তোতা ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণের কয়েকটি বানান উদ্ধৃত হল ঃ সুল্তান আমদ, ময়মুন, সম্বুল, কাবল, দূর, পুত্র্র, মোগোল, হাজীর ইত্যাদি।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে উপরি-উদ্ধৃত বানানগুলির সংশোধিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ঃ সুলতান আমদ্, ময়মুন্ মোগোল্, সম্বুল্, কাবল্, দূর্, পুত্র, হাজির ইত্যাদি।

সংশোধিত বানানগুলি দেখলেই বোঝা যায়, পরবর্তী সংস্করণে বানান যে কেবল শুদ্ধ করা হচ্ছে তা নয়, যাতে কোনোভাবেই উচ্চাবণ-বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেই কারণে হসন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণগত পরিবর্তন আলোচনা করলে বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণে পাচ্ছি ঃ ক্ষিদ্যমানা, জমিদারি, সুভা, পুনুরায়, রাজধানিতে ইত্যাদি।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রিত গ্রন্থে বানানগুলির পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছি। যেমন ঃ ক্ষিদ্যমানা, জমিদারী, সুবা, পুনরায়, রাজধানীতে ইত্যাদি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাচ্ছি ঃ খিদ্যমানা, জমিদারী, সুবা, পুনরায়, রাজধানীতে ইত্যাদি।

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অর্থাৎ মুদ্রণযুগের উষালগ্নেই মুদ্রিত গ্রন্থের বানান অনেকটাই সংগঠিত হতে দেখা যায়। তবু এরই মাঝে যে ভুলগুলি রয়ে যাচ্ছে সেগুলি থেকে উত্তরণের প্রয়াসও পরবর্তী সংস্করণে রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আমাদের আলোচ্য বিষয় পরবর্তী তিন দশকের বানানের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের বানানের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য ওই সময়কার বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হল। যেমন ঃ সুকুমার সাহিত্য ঃ কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩ খ্রিঃ)।

পাঠ্য পুস্তক ঃ পুরুষপরীক্ষা (১৮১৫ খ্রিঃ) ; জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায (১৮১৯ খ্রিঃ) ; হিতোপদেশ (১৮২১ খ্রিঃ) ; সদ্‌গণ ও বীর্য্যের ইতিহাস (১৮২৯ খ্রিঃ) ; ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১ খ্রিঃ) ; প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩ খ্রিঃ)।

আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ ঃ দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ (১৮৪৩ খ্রিঃ)।

প্রচার-পুস্তিকা ঃ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯ খ্রিঃ); পাষন্ডপীড়ন (১৮২২ খ্রিঃ) ; পথ্যপ্রদান (১৮২৩ খ্রিঃ)।

সাময়িক পত্রিকা ঃ দিগ্‌দর্শন (১৮১৮ খ্রিঃ, ১৮১৯ খ্রিঃ, ১৮২০ খ্রিঃ) ; সমাচার দর্পণ ঃ (১৮১৮ খ্রিঃ, ১৮১৯ খ্রিঃ, ১৮২০ খ্রিঃ ১৮২১ খ্রিঃ) ; সংবাদ প্রভাকর (১৮৪০ খ্রিঃ) ; তত্ত্ববোধিনী ঃ (১৮৪৩ খ্রিঃ, ১৮৪৪ খ্রিঃ, ১৮৪৫ খ্রিঃ, ১৮৪৬ খ্রিঃ)।

পৃথক উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখা উল্লিখিত গ্রন্থাদি ও পত্রিকার বানান বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, সব ধরনের গ্রন্থাদিতেই বানানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট একটি মান্যরূপ অনুসৃত হয়েছে। প্রথম দশকের গ্রন্থাদির বানানে উচ্চারণের প্রভাবে বা অন্যান্য কারণে যে ধরনের বিশৃঙ্খলা অল্পবিস্তর দেখা গেছে, এই সময়কার মুদ্রিত গ্রন্থে তা নেই বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত কয়েকটি গ্রন্থাদির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের (১৮২৩ খ্রিঃ) নির্বাচিত অংশ ঃ

ভূমিকা।

"পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোকসকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাককৌশলাদি অবগত হয়েন ততপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকের দিগের নিকট গমনাগমন করেন ...."

পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত হয় (১৮১৫ খ্রিঃ) শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্তৃক বাংলা ভাষাতে লিখিত বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা'।

'পুরুষপরীক্ষার' নির্বাচিত অংশ ঃ

"অমরবৃন্দ কর্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাহাকে স্তব করেন এবং দেবতারদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যানপ্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশ যে পরমদেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি।" ......

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত **'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়' গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ ঃ**

ঈশ্বর সকল বস্তু এমন স্থাপন করিয়াছেন যে সকল বস্তু মহত্ব ক্ষুদ্রাত্বানুসারে পরস্পর আকর্ষণ করে তাহাতে সকল বড় বস্তু চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র বস্তুকে আপনারদের অভিমুখে আকর্ষণ করে ...."

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের নির্দিষ্ট অংশ ঃ

"ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি একসময় কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন ...."

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' গ্রন্থের অংশ ঃ

"খ্রীষ্টীয়ান শকের পূর্ব্বে আরিষ্টৈডিস নামক একজন আথেন্স নগরে বাস করিতেন তিনি সকল কর্ম্মে এইমত যাথার্থিক ছিলেন যে তিনি যাথার্থেব্য উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং স্বনগরবাসিরা তাঁহার অতিবশতাপন্ন হইল। ...." [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৬]

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'শ্রীযুক্ত জান মার্সম্যান সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত' **'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থের অংশ ঃ**

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্থাপন বিষয়ে এবং সমুদ্র পরিভ্রমণ বিষয়ে প্রথমোদ্যোগের বিবরণ। "দুই শত বৎসর গত হইল কতক ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরা ভারতবর্ষস্থ অধিপতিরদের স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায় করণানুমতি প্রার্থনা করিল।"

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থের নির্দিষ্ট অংশ ঃ**

"শ্রীল শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূপালতনয় শ্রীল শ্রীবৈজপালাভিধান ধরণীপাল ছিলেন। তিনি একদা সর্ব্ববিষয়ভাজন সভাজনমধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ....."

আইনসংক্রান্ত গ্রন্থাদির মধ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত **'দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ' গ্রন্থের অংশবিশেষ ঃ** [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৭]

"যে সকল আইনের দ্বারা মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ি সরাসরী নালিশ কি দাওয়া শুনিতে এবং তাহা কালেক্টর সাহেবকে নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ হইল।" ......

সেই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারপুস্তিকা ও বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য **'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এর অংশ ঃ**

"প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন, আমি বিধায়ক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া তোমার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের যে উত্তর দিয়াছি, তাহা তুমি বিশেষরূপে দেখিয়া থাকিবে তাহার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি ...."

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষন্ডপীড়ন' (১৮২২)-এর নির্দিষ্ট অংশ ঃ

"ধর্ম্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের প্রকাশিত প্রশ্ন চতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়া পন্ডিতাভিমানী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, স্বানুচরজীবগণ মনোরঞ্জনার্থ স্বীয়বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ অগত্যা আত্মদোষ স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ দোষকের উত্তর দ্বারা নির্দ্দোষে দোষপ্রক্ষেপপূর্ব্বক তদ্দোষ নিরাকরণার্থ অপূর্ব্ববুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছেন ...."

বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদির পাশাপাশি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয়। **১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যার 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ**

"আমেরিকার দর্শন বিষয়।

পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর।. . ."

এসবের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, একই সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি, এমন কি পত্রিকাতেও মোটামুটি একই বানান অনুসরণ করা হয়েছে। এই সংস্কৃতানুসারী একরূপতা রক্ষার ক্ষেত্রে মুদ্রণের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। কারণ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি সংবাদপত্রে অনুসৃত নির্দিষ্ট বানানরীতি ছাপার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে বানানে সমতা বিধান করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে অভিধানের উপর। সেই সময় সচেতনভাবে লেখার মধ্যে তৎসম শব্দ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় তৎসম শব্দের বানানে কঠোরভাবে সংস্কৃতানুসারী নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রবণতা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরীয় সাধু রীতিতে আরও সংগঠিত হয়েছে।

অভিধান ও ব্যাকরণ

এই সময় বহু ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থাদি পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য যাবনিক ভাষার পরিবর্তে সাধু ভাষার বানান ও ব্যবহার সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করানো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান' গ্রন্থটি। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, স্বদেশবাসীরা দলিল পত্রাদি লেখার সময় সাধু ভাষার অভাব বোধ করেন। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি সংস্কৃত থেকে আগত প্রচলিত সকল বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে তাদের মূল ও প্রতিশব্দ সহ এই অভিধান সঙ্কলন করেছেন। এই অভিধানের সাহায্যে শব্দের শুদ্ধ বানান ও তার অর্থজ্ঞান সহজতর হবে। এই ভূমিকা থেকেই বোঝা যায়, সেইসময় তৎসম শব্দের শুদ্ধ বানান সম্পর্কে অবহিত করানোতে সমকালীন অভিধান গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের "বঙ্গাভিধান" প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ ১২৪৬ বঙ্গাব্দে) শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে শ্রী হলধর ন্যায়রত্নেরও "বঙ্গাভিধান" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হচ্ছে ঃ

".... এই বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ এই বঙ্গভূমির তাবৎ বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু ঐ সকল শব্দ শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গাভিধান নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। ...."

লক্ষণীয়, এই অভিধানে শব্দের অর্থ নির্দেশ করা নেই, শুধু অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত-মূলক শব্দ সাজানো আছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে শুদ্ধ বানান সম্পর্কে অবহিত করানোই এই অভিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল।

এছাড়া ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৪৫ বঙ্গাব্দে) শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত হয় শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত "পারসীক অভিধান"। একই সময় সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হয় শ্রীযুক্ত নীলকমল মুস্তোফীর "পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান"। অভিধান দুটিরই উদ্দেশ্য 'যাবনিক ভাষা' সরিয়ে সেখানে গৌড়ীয় সাধু ভাষাব প্রতিষ্ঠা।

শুধু অভিধান নয়, এই সময়ে বহু ব্যাকরণ গ্রন্থাদিও রচিত হয়েছে, যা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ঘনিষ্ঠ করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা বানানকে সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করে তুলতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রজকিশোর গুপ্তের "বঙ্গভাষা ব্যাকরণ" (১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে), ভগবচ্চন্দ্র রচিত "বঙ্গসাধুভাষায় ব্যাকরণ সার সংগ্রহ (প্রথম সংস্করণ ১৮৪০, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন—

"অপর ভাষা পরিহার পূর্ব্বক সংস্কৃতানুযায়ি বঙ্গসাধুভাষা ব্যবহারার্থে এই ব্যাকরণ সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল।" (ভূমিকা ২য় সং)

অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থাদি ছাড়াও সেই সময় বহু ছাত্রপাঠ্য বানান গ্রন্থ (spelling Book) বচিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (২য় খন্ড) গ্রন্থে উল্লিখিত লঙ সাহেবের বাংলা গ্রন্থতালিকায় বাংলা স্পেলিং বুকের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকা অনুসারে ১৮১৬ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে ৩৬ টি বানান বই (spelling Book) প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বানান-সংক্রান্ত এই ধরনের বইয়ের সংখ্যাধিক্য থেকে বোঝা যায় যে বাংলা বানানকে বিধিবদ্ধ করাব জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেশ সংগঠিত হয়ে উঠছিল।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সেই সময় শুদ্ধ বানান শেখানোর দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেই সময় সংস্কৃতঘনিষ্ঠ বাংলা লেখার প্রবণতাও গড়ে উঠেছিল।

তবে এই সংস্কৃতানুসরণ তৎসম শব্দের বানানে সমতা আনলেও, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানের মানায়িত রূপ তখনও লক্ষ করা যায় না। যদিও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে কম, তবু সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসংগতি ধরা পড়ে। যেমন ঃ

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত **"জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়" বইতে পাই ঃ**

পোনর (পৃঃ ৪), পোনের (পৃঃ ১৭), চৌরাশী, আটহত্তর, সাতান্ন, বামান্ন (পৃঃ ৭), অষ্টাশী (পৃঃ ১০), পাঁচহত্তর, একইশ হাজার (পৃঃ ১৬), পঁচিশ (পৃঃ ৭), পচিশ (পৃঃ ৮), ইত্যাদি।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে **"হিতোপদেশ" গ্রন্থে পাচ্ছি 'কাণ'।**

১৮১৮ এপ্রিল সংখ্যার দিগ্দর্শনে পাচ্ছি 'সূতা'।

কিন্তু ১৮১৮, ১৩ই জুন সংখ্যার সমাচার দর্পণে 'সোনা' বানানটি পাওয়া যাচ্ছে। ১৮১৮ এপ্রিল সংখ্যার দিগ্দর্শনে পাচ্ছি 'কিছূকাল'।

"সমাচার দর্পণে"-ও তদ্ভব শব্দের বানানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসংগতি দেখা যায়। যেমন ঃ চৌরাশী (২০ শে জুন, ১৮১৮), ছচল্লিশ (৯ ই জানুয়ারি, ১৮১৯), ছচল্লিশ, আটাইশ (১৫ এপ্রিল, ১৮১৯)।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে জুনের **"সংবাদ প্রভাকর"** পত্রিকায় লক্ষ করা যায় একানব্বই, বিরেনবুই ইত্যাদি বানান।

সুতরাং সংখ্যাবাচক শব্দেব ক্ষেত্রেই অসংগতি বেশি লক্ষ করা যায়।

একই বানান একই সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম পাওয়া যাচ্ছে। উনবিংশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও পত্রিকার বানান বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, বিদেশি শব্দের বানানে তখন কোনো মান্য আদর্শ ছিল না। উদাহবণস্বরূপ বিভিন্ন গ্রন্থও পত্রিকার কিছু বানান এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

বিদেশি শব্দেব বানান ঃ **'জ্যোতিস এবং গোলাধ্যায়'** (১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে সূচিপত্রে পাই ঃ

ইংগ্লন্ড, আমেবিকীযেবা, বলোচস্থান, কাবোল নবজীলান্ড, স্বিৎজর্লন্ডের পোর্ত্তুগীশ নবহলণ্ড, নেদর্লণ্ড, আবমাণি, গ্রীনলন্ড যিশবএল ইত্যাদি।

'সদ্‌গণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ) পাই ঃ

মোকদ্দমা (পৃঃ ৭), বেলগ্রেদ (পৃঃ ১৫), জবীমানা (পৃঃ ২০), জেনরল (পৃঃ ৪৭), ইংগ্লন্ড (পৃঃ ৫৩), জর্ম্মণি (পৃঃ ৬১) ইত্যাদি।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দেব) গ্রন্থে একই অসংগতি রয়েছে। যেমন ঃ দিসেম্বব, জানুআবি মুবশেদাবাদ, গোলেন্দাজ, ক্লাইব (পৃষ্ঠা ১৪৮), মন্দ্রাজ, ক্লাইব (পৃঃ১৪১)।

'দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ' (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দেব) গ্রন্থে পাই ঃ

সবকুলেব, অর্ডব, মোকদ্দমা, কালেকটর-রেজিষ্টরী, কমিস্যনর, মাজিষ্ট্রেট, গোমশতা, ফযসলা ইত্যাদি।

শুধু গ্রন্থাদি নয়, বিভিন্ন পত্রিকাতেও এই বিশৃঙ্খলা খুব বেশি লক্ষ কবা যায়। যেমন ঃ **দিগ্দর্শন** পত্রিকা ঃ এপ্রিল ১৮১৮।

আসিযা, আমেবিকা, কোম্পাস (পৃঃ ৩), পোর্ত্তুগীশ কলম্বস (পৃঃ ৭), অক্তুবর (পৃঃ ১৫), বিসুবিয়াস (পৃ° ৩৩)।

মে, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ নবেম্বর (পৃঃ ৬১), জরমণি (পৃঃ ৬৩)।

জুন, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ পিরামিদ, য়িহুদী (পৃঃ ৭৩), ত্রোয় (ট্রয) (পৃঃ ৯৭) ইত্যাদি।

সমসাময়িক পত্রিকা **'সমাচার দর্পণ'**-এ একই অনিয়ম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ ডিষকৌন্ট, গবর্ণব জেনেরাল, বাহাদুর/বাহাদূর, ষ্টম্প, হসপিতাল, কোম্পানি/কোম্পানী (৫ই জুন, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)।

সেকৃটারি, দিজম্বর, কাপতান, ডাকতব, হসপিতল, কালেক্তর (১৩ই জুন, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)।

মকদ্দমা, কালেক্তর, পরমিট, মোক্তিয়ার ইত্যাদি (২৭শে জুন, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)।

দিজেম্বর (ডিসেম্বর), সেপ্তেম্বর, অক্তুবর, সাকৃটারি, বাহাদূর ইত্যাদি (৫ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)।

সাক্‌টরি, ষ্টেম্প, সুপরেনটেন্ড/সুপরেনটেন্ডেন্ট (৯ই জানুয়ারি, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ)।

সেতম্বর, ডিষকৌন্ট, তপসীল, ষ্টম্প, কনত্রাকটর, সোসয়িটী ইত্যাদি (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ)।

ডিসকৌন্ট, রিবিনিউ, আকটোবর ইত্যাদি (২রা অক্‌টোবর, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ)।

দিসেম্বর, পোষ্ট আপিশ, জানেরেল, ফেব্রুআরী ইত্যাদি (১৮ই ডিসেম্বর, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ)।

এফ্রিল, সেক্‌টারি, আলেকান্দ্র, পুলিস, জর্ম্মণি, পেশোর ইত্যাদি (১৫ই এপ্রিল, ১৮২০)

রেজেষ্টর, চাল্‌র্স, নালিষ, এডমনস্তন, সেপ্তেম্বর, লেপ্তনেন্ত ইত্যাদি (২৮শে অকটোবর, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ)।

জনেরল, ত্রেজুরি, জরনল, পুলিষ, আপীস, এডমনস্টন, কাপ্তান, দেন্মার্ক ইত্যাদি। (৭ই এপ্রিল, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ)।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাতেও একই অনিয়ম রয়েছে। যেমন ঃ ৫ ই ডিসেম্বর, ১৮৪০ ঃ পবলিক, গবর্ণর, জেনেরেল, আকটোবর, নবেম্বব, উইলিএম, গবরনর, মাজিষ্ট্রেট, কালেকটবী, মফঃসল, সুপরিন্টেন্ডেন্টের ইত্যাদি।

একই সময় প্রকাশিত '**তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**'তেও বিদেশি শব্দের বানানে অরাজকতা রয়েছে। যেমন ঃ

মোসলমান, ডিরেক্টর্স, মুরশিদাবাদ (১লা বৈশাখ, ১৭৬৭ শক)।

খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি (১লা শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক)।

বিদেশি শব্দের বানানে এই বিশৃঙ্খলা পরবর্তীকালের পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদিতেও ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। [দ্র : চিত্র ৮] বাহুল্যবোধে অধিক উদাহরণ দেওয়া হল না। তবে তদ্ভব ও বিদেশি উভয় ক্ষেত্রেই বানান-বিভ্রান্তির একটি বড়ো কারণ শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে সংশয়। এছাড়া সহলিপি (allograph)-এর যাথার্থ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিও বানানে বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে। পরবর্তী ধাপে তৎসম শব্দের বানান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তৎসম শব্দের বানান

তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃতানুসারী হওয়ায় সেই সময় বিভ্রান্তি অনেক কম ছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে কোথাও হ্রস্ব ই, কোথাও ঈ-র প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও পত্রিকায় ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করলে একটি সূত্র ধরা পড়ে ঃ

ইন্-ভাগান্ত শব্দ সাধারণত যেখানে বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ঈ-কার হয়েছে। কিন্তু ইন্-ভাগান্ত শব্দ বিভক্তিযুক্ত হলে সংস্কৃত নিয়মানুসারে তাতে ই-কার যুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ স্বামী কিন্তু স্বামিকে, পক্ষী কিন্তু পক্ষিব। এই সংস্কৃতানুসরণ এতই

কঠোর ছিল যে, ইন্-ভাগান্ত শব্দ বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যের বিশেষণ হলে সেখানেও সেই বিশেষণে ই-কার যুক্ত হতে দেখা যায়।

তবে এই প্রবণতা যে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত ছিল তা নয়। বিভিন্ন সময়ের গ্রন্থাদি ও পত্রিকা থেকে পাওয়া উদাহরণের ভিত্তিতে ইন্-ভাগান্ত তৎসম শব্দের রূপের পরিবর্তন আলোচনা করা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই প্রবণতা বাড়ছে। যেমন ঃ 'পুরুষপরীক্ষা'য় (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের) কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। মন্ত্রিকে, আগামি রজনীতে ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে ব্যতিক্রম খুব বেশি। যেমন ঃ ধনোপার্জ্জনকাবী .... ব্যক্তির, মন্ত্রি, হে দ্বারী ইত্যাদি।

বোঝাই যায়, ইন্-ভাগান্ত শব্দের মানায়িত রূপ তখনো স্থির হয়নি। সমকালীন পত্রিকাতেও এই প্রবণতা রয়েছে। পাশাপাশি ব্যতিক্রমও রয়েছে। তবে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের তুলনায় সেখানে এই প্রবণতাই বেশি। যেমন ঃ **'দিগ্দর্শন', ১৮১৮** :

মন্ত্রিরা', 'অগ্রগামি সমাজেব লোকেরা', 'গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে', 'ইউরোপের সীমাবর্ত্তি মহারাজ্যের', 'স্বামিকে', 'সাহসিরদের', 'কীর্ত্তিশালি লোকেরদিগকে', 'বিভাগকারি সমুদ্রের' ইত্যাদি।

এই অংশে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ঃ সাহসি ব্যক্তি, সাহসী একজনকে. অপরাধি লোক, কলিকাতার নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত ইত্যাদি।

'দিগ্দর্শন' ঃ ১৮১৯।

চমৎকারি মাহাত্ম্য, বেষ্টনকারি হিন্দু সৈন্যরদের, মন্ত্রির, প্রতিকূলকারিকে, পুত্র বধকারির, দিল্লীর নিকটবর্ত্তি ...... নগরের', তন্নগরবাসিরা ইত্যাদি।

'দিগ্দর্শন' ঃ ১৮২০।

অতি দূরবর্ত্তি রাজধানীর, কুমন্ত্রণাকারী একজন।

একই সময়ে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতেও বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য এবং বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যের বিশেষণ ইন্-ভাগান্ত শব্দ হলে তাতে ই-কার যুক্ত হচ্ছে। যেমন ঃ **'সমাচার দর্পণ' ঃ ১৮১৮।**

রোগি স্ত্রীলোকের, আগামি শনিবারের ব্যাপারিরদিগকে. ব্যাপারিরা, ব্যাপারিকে, পক্ষির বাচ্চারা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমও দু-এক ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ রোগীর চিকিৎসা, পশ্চাদ্বর্ত্তি দ্বার ইত্যাদি।

'সমাচার দর্পণ' ঃ ১৮১৯।

ব্যাপারিরদিগকে, বিরুদ্ধাচারিরদের, নিকটবর্ত্তি নদী হইতে, উভয়বর্ত্তি দেশের ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে এই বিশেষ প্রবণতা সব ধরনের গ্রন্থাদিতেই ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে কিছু কিছু বানান এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

'হিতোপদেশ' (১৮২১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

'ধর্ম্মশালি সংসারে, কুলাচারাবলম্বী এক পুত্র, 'উদ্যোগি পুরুষসিংহকে', 'ধনলোভিরা, শুকপক্ষির, উদ্যোগি মনুষ্যকে ইত্যাদি।

এই অংশে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যের বিশেষণ ইন্-ভাগান্ত : 'বিপথগামী আপন পুত্রেরদিগের'।

প্রচারপুস্তিকা জাতীয় রচনার মধ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষন্ডপীড়ন'-এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রবণতা রয়েছে। যেমন ঃ

'ধর্ম্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের', ধর্ম্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষির', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানি পন্ডিতাভিমানি ব্যক্তিবিশেষরা', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানির', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী', অভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী', ভাক্তকর্ম্মী', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিকে, অভিমানি তৎসংসর্গি ...... ধ্বনিলোকেরা'।

'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট অংশে যেখানে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে ঐ প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেখানে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দু-একটি ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন ঃ ভাক্তকর্ম্মীর।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'পথ্যপ্রদান' পুস্তিকার নির্দিষ্ট অংশে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখি ঃ

'ভাক্তজ্ঞানি ও ভাক্তকর্ম্মিপদের', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী', 'কর্ম্মিদের', 'তত্ত্বজ্ঞানীসকলকে', 'কর্ম্মিসকলকে', 'ভাক্তকর্ম্মী', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী', 'অভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী', 'জ্ঞানির', 'ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিশব্দের', 'কর্ম্মির', 'ভাক্তকর্ম্মি পদের'।

'পথ্যপ্রদান' পুস্তিকার ঐ অংশে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন ঃ ধর্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষি, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দের।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে একটি নির্দিষ্ট অংশে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখি ঃ

'পল্লিগ্রামনিবাসী ও নগরবাসী লোকসকল, এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের', 'নগরবাসী বহুজন', 'পল্লিগ্রামনিবাসী.......মানুষ, 'দোষদর্শী মূর্খরূপ কুম্ভীর ও নিন্দকরূপীসর্প', 'সাগরবাসী হইয়াছেন। 'নগরবাসী মহাশয়', পল্লিগ্রামনিবাসী লোকেরা, পল্লিগ্রামনিবাসিরা।

এই অংশে একটিমাত্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যথা ঃ পল্লিগ্রামনিবাসি ব্যক্তি। ইন্-ভাগান্ত শব্দ যদি বিভক্তিহীন বিশেষ্যের বিশেষণ হয় তবে তা ঈ-কার দিয়ে লেখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ই-কার যুক্ত হয়েছে।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'সদ্‌গণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ এই গ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট অংশের ইন্-ভাগান্ত শব্দের বানান তুলে দেওয়া হল ঃ

স্বনগরবাসিরা, বিবাদির, ... নিকটবর্ত্তি এক গ্রামে দুঃখির, প্রতিবাসী, সাক্ষিরদেরে, অপরাধী, অপরাধীকে, অপরাধির, অপরাধি ব্যক্তির, সহকারি সৈন্যরদিগকে, মতাবলম্বিরা, শ্যেন পক্ষী, পক্ষিকে, পক্ষির, অবস্থিতিকারী ..... চাকর সহকারি জর্ম্মণি সৈন্যরদের', 'নির্দোষি ব্যক্তির', 'নির্দোষী' ইত্যাদি।

ত্রিশের দশকের বিভিন্ন গ্রন্থে এই প্রবণতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ' প্রবোধচন্দ্রিকা'-র (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে কিছু ইন্-ভাগান্ত শব্দের বানান দেখানো হল ঃ অচিরস্থায়ী, দূরদর্শিদের, চেতরূপী পরমেশ্বর, শাস্ত্ররূপি শানে, চিন্মাত্ররূপী পরমেশ্বর।

এই অংশে একটি মাত্র ব্যতিক্রম রয়েছে। যথা ঃ অন্ডজ পক্ষি। এখানে 'পক্ষি' ইন্-ভাগান্ত হলেও ই-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে।

চল্লিশের দশকে বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও পত্রিকায় ইন্ ভাগান্ত *শব্দের বানানে কোথাও কোথাও* এই প্রবণতা রয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর ব্যতিক্রমও রয়েছে। এ থেকে বোঝাই যায়, ইন্ ভাগান্ত শব্দের মানায়ন সমপর্কে তখন দোলচলতা ছিল। তবে এই সময় বিদ্যাসাগরের মতো একজন বড়ো লেখক আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রবণতাটি খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে (সংবৎ ১৯০৬) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের **'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের** যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায় ঃ

'সন্ন্যাসির বেশে', 'প্রতাপশালী ..... নরপতি', 'তপস্বী', 'তপস্বির', 'যোগির', ধূমপায়ি তপস্বির শ্মশানবর্ত্তি শিরীষবৃক্ষে 'সন্ন্যাসির কথা', 'যোগিলে', 'যোগী হত্যাকারী, 'সাক্ষী সহগামী', 'ঐশ্বর্য্যশালী এক শ্রেষ্ঠী' 'শ্রেষ্ঠীর পুত্র, 'স্বামির সন্নিধানে', 'চন্দ্রপুর নিবাসি হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা' 'অস্ত্রধারি পুরুষেরা' শ্রেষ্ঠিকন্যাকে এতাদৃশী দুর্দশা, 'বটবৃক্ষবাসী এক পিশাচ', 'প্রতিবাদির বাক্য' ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য : চিত্র ৯]

সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনায় এই ধরনের প্রবণতা কোথাও কোথাও রয়েছে। যেমন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে (সম্বৎ ১৯১১) শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মার **'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে পাই ঃ**

বিক্রয়ির, কুলপালকের প্রতিবাসী, প্রতিবাসী কুলকামিনীগণ, গোধূমশালি গৃহির গৃহে, গৃহিগণ, অপ্রবাসিরা, প্রবাসিরা, নবদ্বীপ নিবাসি পন্ডিতেরা সংসারিরা, কন্যাবিক্রয়ির প্রাণিগণ ইত্যাদি।

এই অংশে কিছু কিছু ইন্ ভাগান্ত বিশেষণ পদ রয়েছে যার বিশেষ্য বিভক্তিহীন হলেও বিশেষণটি ই-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে। যেমন ঃ

ভূম্যধিকারি শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র .. মহাশয়। গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয়, কুন্ডীনিবাসি ... কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহোদয়।

অক্ষয় কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণেও (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) ইন্ ভাগান্ত শব্দের বানানে ই-অথবা ঈ প্রয়োগের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম পাওয়া যায় না। ইন্ ভাগান্ত শব্দ বিভক্তিযুক্ত হলে, কোথাও কোথাও তা ই-কাব যুক্ত করে লেখা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈ-কার প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন ঃ

আততায়ির, তদনুযায়ি কার্য্য, গৃহস্বামির, যশোলোভির, ধর্ম ব্যবসায়ি পন্ডিতেরা, যথোপযোগি আশ্রয়, তত্ত্বানুসন্ধায়ি পন্ডিতদিগের নিকটবর্ত্তি সমুদায়, দ্রব্য ইত্যাদি দৃষ্টান্তের পাশাপাশি নিম্নলিখিত উদাহরণও প্রচুর রয়েছে ঃ

জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র, ধর্ম্ম ব্যবসায়ী পন্ডিত, তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম, বিদ্যার্থী ব্যক্তি অপরাধী পিতামাতাকে, হিতকারী বন্ধু, যশোলোভী ব্যক্তি, শুভঙ্করী বৃত্তির, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি দিগের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য, তদুপযোগী সম্বন্ধ ইত্যাদি।

উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, একই ইন্-ভাগান্ত শব্দ কোথাও ই, কোথাও ঈ দিযে লেখা হচ্ছে। শুধ গ্রন্থাদি নয়, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতেও

ইন্ ভাগান্ত শব্দের বানানের মানায়নকে কেন্দ্র করে এই অস্থিরতা ধরা পড়ে। প্রমাণস্বরূপ ঐ দুই দশকের পত্রিকা থেকে কিছু কিছু ইন্-ভাগান্ত শব্দের বানান এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ ১ লা পৌষ ১৭৬৫ শক অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ ঃ পরোপকারি বৃক্ষদিগের, প্রথমাধিকারির বোধের, মিথ্যাবাদির, আগামী দিবসে ইত্যাদি।

পাশাপাশি ব্যতিক্রমও রয়েছে ঃ তদনুযায়ি দৃষ্টান্ত, স্থায়ি, অদূরদর্শী মিথ্যাবাদী সকল লোকের ইত্যাদি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১লা অগ্রহায়ণ ও ১লা চৈত্র, ১৭৬৬ শক (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

জ্ঞানাভিলাষি হিন্দুর, উর্দ্ধগামি রসধারাকে প্রাণিদিগের, কর্ম্মার্থি ব্যক্তিদিগকে, জ্ঞানার্থিদিগকে, সংসারির, অনিষ্টকারি নানাবিধ দ্রব্যের, শিল্পকারিরা ইত্যাদি।

এই অংশে বহু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ উদযোগি, সহযোগি, উর্দ্ধগামি, অধোগামি, সাক্ষি, মহোদ্যোগি, কর্ম্মার্থি ব্যক্তিসকল, খ্রীষ্টান মতাবলম্বি, পক্ষি ইত্যাদি।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, ১লা অগ্রহায়ণ ১৭৬৮ শক (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

তদুপযোগি কর্ম্মকান্ডেব, দুর্ব্বলাধিকারি শক্তি উপাসকদিগের, রাজকর্ম্মচারিরা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম বহু রয়েছে। যেমন ঃ ভারতবর্ষবাসি, কর্ম্মচাবি, বিবোধি ইত্যাদি।

পঞ্চাশের দশকের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে ইন্‌ভাগান্ত শব্দ ঈ-কাব দিয়ে লেখাব প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' : চৈত্র, ১৭৭৭ শক (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) :

সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, লোভীদিগের, উপকাবী ব্যক্তিব, পাপকারী ব্যক্তিরা, উদ্বাহোপজীবী নিষ্ঠুরকে, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে ইত্যাদি।

তবে সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায যেমন 'বিবিধার্থ সঙ্গহ'-এ ইন্‌ভাগান্ত শব্দের বানানে একরূপতা খুব বেশি লক্ষ করা যায না। যেমন ঃ

বিবিধার্থ সংগ্রহ' কার্ত্তিক, ১৭৭৩ শক, (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

পক্ষী, পক্ষির জাতি, পক্ষির পাখা, ধনি ব্যক্তিরা, উপদেশাকাঙ্ক্ষির, পল্লী-গ্রামনিবাসি জনের, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্পবাটিকার, যশোভিলাষী, নগরবাসী নানকপন্থীদিগের, বেদান্তবাদিদের উপদ্বীপবাসি ব্যক্তিরা, প্রদেশবাসী ইত্যাদি।

'বিবিধার্থ' সংগ্রহ', শ্রাবণ ১৭৭৪ শক (১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

লোম আহরণকারি চিলিদেশীয় মনুষ্যেরা, নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া, প্রান্তবাসী লোকদিগের, ভ্রমণকারি মহাশয়দিগের, পক্ষিরা, পক্ষিদিগের, উত্তরাধিকারি, ভূম্যধিকারী অশ্বারোহির ইত্যাদি।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ', বৈশাখ, ১৭৭৯ শক (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

বিদ্যানুরাগি নিরীহ ব্যক্তিবাই, তন্নিবাসি লোকেবা, পারদর্শী মহাশয়ের সকল শ্রেণিস্থ, পক্ষী, পক্ষির স্বামির ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বিভক্তিযুক্ত হলে, অথবা বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যের বিশেষণ হলে তা ই-কার দিয়ে লেখার যে প্রবণতাটি প্রথমদিকের গন্থাদি বা পত্রিকায লক্ষ কবা যায. তা চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকের গ্রন্থাদি বা পত্রিকায় তত

বিভক্তিযুক্ত ইন্ ভাগান্ত শব্দ ঈ-কার যুক্ত করে লেখার প্রবণতাও বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, ইন্ ভাগান্ত শব্দের বানান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আদর্শ তখনো গড়ে না উঠলেও, সরলীকৃত একরূপীকরণের প্রবণতা দানা বাঁধছিল। তবে ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থাদির বানান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এই একরূপীকরণের প্রবণতাটি ক্রমশ স্থিরীকৃত হয়ে উঠেছে। [দ্রষ্টব্য : চিত্র ১০] যেমন ঃ

'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ), ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ (অষ্টম মুদ্রণ) ঃ

ধনী. পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য লোকদিগেব, দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ, আততায়ীদিগকে, পূর্ব্ব প্রদেশবাসীরা, পশ্চিম প্রদেশবাসীদিগেব ইত্যাদি।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (প্রথম ভাগ), ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ ঃ দূবদেশবাসী লোকেবা, তন্নিকটবর্ত্তী ধান্য ও শস্য ক্ষেত্রের, বৃক্ষবাসী পক্ষিগণেব, প্রতিবাসীদিগের, গ্রামান্তরবাসী পথিকদিগের, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের ইত্যাদি।

ষাটের দশকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন প্রভাবশালী লেখককে পাচ্ছি। এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখায় ইন ভাগান্ত শব্দের বানান বিভক্তিযুক্ত হোক বা না হোক, ঈ কার যুক্ত কবে লেখা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন সময়ের গ্রন্থাদির থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে)

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) ঃ যাত্রীর, নৌকারোহীদিগের, আরোহীরা, নিকটবর্ত্তী, আবোহীদিগেব, তীববর্ত্তী, সহযাত্রীরা, আতোপকারীকে, যাত্রীদিগের, পর্ব্বততলচারী, সমীপবর্ত্তী, সম্মুখবর্তী, জটাধাবী ইত্যাদি। (১-১৩ পৃঃ)

চন্দ্রশেখর (১২৮২ সল অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

নৌকাবোহী. প্রহবীব, কর্ম্মচাবীকে, রাজকর্ম্মচারীর প্রতিবাসীবা, স্বামীব, পক্ষীদিগকে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচীকে, নিবীক্ষণকারী, অত্যাচারীকারীদিগের ইত্যাদি।

রজনী (১২৮৪ সাল অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

স্বামীকে, দুষ্কৃতকারী ইত্যাদি।

কৃষ্ণচরিত্র (প্রথম ভাগ), ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ পরবর্তী লেখকেরা, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের, বিরোধী অনুবর্ত্তী, বশবর্ত্তী, শরীরধারী ঈশ্বব ইত্যাদি।

শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেব লেখাতেই নয়, সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনাতেও ইন্ ভাগান্ত শব্দের ঈ-কারান্ত বানান লক্ষ করা যায়। প্রমাণস্বরূপ কিছু কিছু গ্রন্থের বানান এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

'তীরবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যে', 'যথসন্নিধানবাসী আত্মীয়গণের', 'প্রান্তরের সমীপবর্ত্তী প্রসাদের', 'রঙ্গ দর্শী' লোক, 'নীলাংশুকবিলম্বী হীরকমণির' নগরনিবাসী ..... পুরুষ' 'ময়ুরাঙ্গীবাসী সমস্ত জনগণ' পর্য্যন্তবর্ত্তী গ্রামসকল' ইত্যাদি। (পৃঃ ,২০-৪৪)

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজসংস্করণ' (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

ধনী, পারদর্শী মনুষ্য, অর্থকরী রাজভাষা', ধনী সন্তানদিগের, সম্প্রদায়ীদিগের শাস্ত্রাধ্যায়ী,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

'বহুদর্শী ইংরাজের', 'বহুদর্শী ব্যক্তি দিগের', 'বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের', 'উপযোগী', ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

যুক্তিবাদী, স্বামীর, ধর্ম্মার্থীদিগের, পরলোকবাসী আত্মার হিতৈষীর, চিরস্থায়ী ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, মোটামুটি ষাটের দশক থেকেই ইন্ ভাগান্ত শব্দের বানানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ চালু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেই সময়ের গ্রন্থাদিতে এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গেলেও ষাটের দশকের কিছু কিছু পত্রিকাতে ইন্‌ভাগান্ত শব্দের বানানে একরূপতা লক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'সোমপ্রকাশ'-এ পাচ্ছি ঃ কর্ম্মচারিরা, মন্ত্রির, বাদীর, কর্ম্মচারি, কর্ম্মচারিকে, বিদ্রোহীদিগের, বিদ্রোহীদিগকে, প্রহরিদিগের, শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের ইত্যাদি।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি পাই ঃ

বিদ্রোহিদিগের, বিদ্রোহিদিগকে, গ্রামবাসিদিগের অধিবাসীর, সাক্ষীর, শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধিকারিরা, কর্ম্মচারিদিগের, অপরাধিদিগের ইত্যাদি।

আসলে গ্রন্থে লেখকের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে কোনো রীতি দ্রুত প্রবর্তিত বা পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু পত্রিকায় অনেক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত থাকায় কোনো প্রচলিত রীতি দ্রুত পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে গ্রন্থাদিতে একরূপতা লক্ষ করা গেলেও তখনও কিছু কিছু পত্রিকাতে ইন্‌ভাগান্ত শব্দের মানায়িত রূপ পাওয়া যায় না। অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে পত্রপত্রিকাতেও এই সংকট অনেকটা কাটিয়ে উঠতে দেখা যায়। পরবর্তী প্রসঙ্গে আমরা তা আলোচনা করব। তবে ইন্-ভাগান্ত শব্দের এই মানায়নেব ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গভীর প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু বড়ো লেখক ছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। .... নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।" তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় 'বঙ্গদর্শনে'র মতো একটি জনপ্রিয় পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। বহু লেখক এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ফলে লেখকসমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর প্রভাব অনুমান করা নিতান্ত অমূলক নয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের রচনাতেও এই প্রভাব আমরা লক্ষ করি। বিদ্যাসাগরের প্রথম দিকের রচনায় (যেমন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি') ইন্ ভাগান্ত শব্দ সংক্রান্ত পূর্বোক্ত নিয়মটি কঠোরভাবে অনুসৃত হতে দেখি। কিন্তু ষাটের দশকের পর থেকে তাঁর লেখার যে সংস্করণগুলি পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে ইন্ ভাগান্ত শব্দ বিভক্তিযুক্ত হোক বা না হোক সর্বক্ষেত্রেই ঈ-কার প্রয়োগের প্রবণতাই লক্ষ করা যায়। এই সময়কার কিছু কিছু গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

'ভ্রান্তিবিলাস', ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ঃ

জয়স্থলবাসী লোকদিগের, জয়স্থলবাসীদিগের হেমকূটবাসী লোকদিগের, বশবর্ত্তী শ্রেষ্ঠীর হেমকূটবাসীদিগের, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য : চিত্র ১১]

'কথামালা', ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ (অষ্টাবিংশ সংস্করণ) ঃ

পক্ষীরা, পক্ষীর, নিকটবর্ত্তী, মিথ্যাবাদীরা, প্রতিবেশীর, প্রতিবেশীকে, প্রতিবেশীদিগের ইত্যাদি।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

স্বামীর, লোকহিতৈষী ভগবান পরাশব, ব্রহ্মচারীদিগেব, নিষেধবাদীরা, প্রতিবাদীমহাশয়েরা, যথেচ্ছাচারী চিবরোগী অথবা বেশধারী এরূপ ব্যক্তির ইত্যাদি।

'সীতার বনবাস' (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

ক্ষত্রিয়কুলবস্তকাবী ভগবান, উপযোগী, প্রতীহারীকে, সাক্ষী, তপোবনবাসীদিগকে, ধৈর্য্যশালী পুরুষ ইত্যাদি।

সত্তর ও আশিব দশকের বিভিন্ন পত্রিকার বানান বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় ইন্ ভাগান্ত শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈ-কাব দিয়েই লেখা হচ্ছে। তবে এই প্রবণতা সমকালীন গ্রন্থাদিতে যেমন পাচ্ছি সেই বকম সর্বব্যাপক না হলেও পত্রিকাতেও যে এই প্রবণতা বাড়ছে তা বোঝা যায়। যেমন ঃ

'সমাচারচন্দ্রিকা', ৮ই মে, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ ঃ

যুদ্ধোপযোগী, অশ্বাবোহী, গোলাধাযী, অধিবাসী, বঙ্গবাসীদিগকে, প্রতিবেশীগণকে গৌরবাকাঙ্ক্ষীর ইত্যাদি।

'সমাচারচন্দ্রিকা', ১০ই জানুয়ারি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ

বহুদর্শী, নির্দ্দোষী, কর্ম্মচারিগণ প্রতিবাদীগণ ই ত্যাদি।

'তত্ত্ববোধিনী', ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ

যাত্রীদিগকে, মর্ত্ত্যলোকবাসী, রোগীর, পাপীকে, বিদ্রোহি প্রজাকে ইত্যাদি।

'সোমপ্রকাশ' ১লা নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ ঃ

চক্রবর্ত্তীর যথেচ্ছাচারী বাজগণ, শ্রেণীব বিহারবাসীদিগের, বিহাববাসী, কোন প্রজাকে, কর্ম্মচারীরা, কর্ম্মচারীকে, কর্ম্মচারিদিগের, বিহারবাসিদিগের অধ্যযনার্থী ছাত্রদিগেব, অনুসন্ধানকারী বিহারবাসী কোন প্রজাকে ইত্যাদি।

'সংবাদ প্রভাকর', ২৮ এপ্রিল, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ ঃ

কর্ম্মচাবী প্রতিবাদীগণের আগামী রোগীগণ, দীঘপ্রবাসী খ্যাতনামা বাঙালী, রোগীদিগের উপকারী ইত্যাদি।

'সংবাদ প্রভাকর, ৩০ এপ্রিল, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ ঃ

প্রতিবাদী করুণাকান্ত ভট্টাচার্য্যের, অপরাধীর বাটীতে, অপরাধী মৃত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী রোগীদিগের ইত্যাদি।

ইন্ ভাগান্ত শব্দের এই মান্যায়িত রূপ আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে।

বাংলা মুদ্রণের তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় লাইনোটাইপ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা মুদ্রণের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এই নতুন টাইপ পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখর বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, সুশীল ভট্টাচার্য প্রমুখ। সুরেশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বাংলা মুদ্রণকে আধুনিক স্তরে উন্নীত করতে গেলে বর্ণমালার সংস্কার করা প্রয়োজন। তাই তিনি বর্ণমালা সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। অক্ষর সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে মূল নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল ঃ

"১। ... ছাপার টাইপের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া আবশ্যক।

২। প্রচলিত বহু অক্ষরের বিশেষত যুক্তাক্ষরের রূপান্তর আবশ্যক, যাহাতে অক্ষর সর্বাপেক্ষা সুবোধ্য হয়, অক্ষরের প্রত্যেক অংশ বুঝিতে পারা যায় এবং টাইপ যোজনা সহজ হয়।

৩। প্রথম উদ্যমেই সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়, জনসাধারণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে বদলাইতে হইবে।

৪। টাইপ এমন হইবে যে পাশাপাশি সাজাইলেই চলিবে। এক টাইপের শাখা অন্য টাইপের মাথায় বা নিচে বসিবে না।

৫। সংস্কারের ফলে নূতন অক্ষরের রূপ কিছু অদ্ভুত মনে হইবে, কিন্তু শীঘ্রই অভ্যাস হইয়া যাইবে। কতকগুলি অক্ষর দেখিতে ভালো লাগিবে না। কিন্তু মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য এই ত্রুটি আপাতত সহ্য করিতে হইবে।

৬। নবকল্পিত অক্ষরের দোষগুণ ধরা পড়িবে এবং তদনুযায়ী ক্রমশ সংশোধনের ফলে অক্ষরের উপযোগিতা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইবে।"

(দেশ, শারদীয়া ১৯৩৫, সুবর্ণজয়ন্তী ক্রোড়পত্রে পুনর্মুদ্রিত)

তবে লাইনোটাইপে বাংলার যে লিপিচিত্র চালু হয় তা সম্পূর্ণ অভিনব প্রচেষ্টা নয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণ ও ফরস্টারের ভোকাবুলারিতে যে হরফ ব্যবহৃত হয়েছে তারই ছাপ লাইনোতে রয়েছে। প্রসূন দত্ত, দীপঙ্কর সেন প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে তাঁদের প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে সুরেশচন্দ্র প্রমুখের হাতে এই কাজ আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তবানুগ হয়েছে। লাইনোটাইপ বাংলা বানানকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আনন্দবাজার পত্রিকা'র মারফৎ বাঙ্গলা ছাপার কাজে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা বানানে এক অতি আবশ্যক নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—বাঙ্গলা লিনোটাইপ। ইহার প্রসাদে বাঙ্গলার অনেকগুলি সংযুক্তবর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসের প্রকৃতির কোন বিপর্যয় বা হানি হয় নাই, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই নবীনতা সহজবোধ্যতা আনিয়া দিয়াছে।"

এসব সত্ত্বেও হরফে বহুক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য রয়েছে। বিশেষ করে একই সঙ্গে একাধিক হরফের ব্যবহার লাইনো টাইপের একটি বড়ো সমস্যা। যেমন ঃ

ক্ত, ক্ত ; রু, রু ; ন্তু, ন্তু ; হৃ হৃ ; প্র প ্র ; ন্ড নড ; ন্ন ন্ন ; হ্ম, হম, হ্ম।

তাছাড়া বাংলা মুদ্রণের সকল ক্ষেত্রেই যদি লাইনোর ব্যবহার চালু হয়ে যেত, তবে বাংলা হরফের একরূপতা রক্ষিত হত। কিন্তু তার পরিবর্তে হাতে বসানো টাইপ, লাইনো

ফেস ও লাইনো ইত্যাদি মিলে বাংলা হরফ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু তাঁর "শিশু শিক্ষা ও লিপিসংস্কারের সমস্যা' প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

লাইনো টাইপ ছাড়া পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত মনোটাইপ বা লাইনো ফেস টাইপে যে যুক্তব্যঞ্জন ছাপা হচ্ছে সেখানেও পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। ইনটার-টাইপ যন্ত্রে বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের চেহারা আরো বদলে যাচ্ছে। সেখানে প্র ছাপা হচ্ছে প্।

ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান বর্ণমালা শিক্ষা। সেক্ষেত্রে বাংলা হরফকে এইভাবে বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত করার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং লেটার প্রেস, লাইনো-টাইপ, মনোটাইপ, ইনটার টাইপ কিংবা ফটোসেটাব—যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক বাংলা হরফের আকৃতি যাতে একরূপ থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বর্ণরূপের বিচিত্রতা হ্রাস পেলে বানান শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। মুহম্মদ শাহজাহান মিয়াব 'প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে রেফ্-এর ব্যবহার' প্রবন্ধটি ঢাকা বাংলা একাডেমী পত্রিকার ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। ডকটর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া তাঁর 'পুরোনো বাংলা দলিল পত্র' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৯১ খ্রিঃ) ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিপি করা সর্বমোট একশো উনিশটি চিঠি ও দলিলপত্রের পাঠ মুদ্রিত করেছেন। এগুলি সবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত।

৩। আব্দুল কাইউমের অভিমতটির সূত্রও শাহজাহান মিয়ার 'প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে রেফ্-এর ব্যবহার প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। কিন্তু অভিমতটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য এখানে দেওয়া নেই।

৪। ২ নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫। ভরত সেনের 'সুখলেখনম' সংস্কৃত বানানের উপব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থেকে অধ্যাপক রামধন শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৬। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থে ঃ

যখন ছাপাখানা এলো। শ্রী পান্থ। কলিকাতা। জুলাই, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৭৭৮ সালের আগে বিদেশে বাংলা লিপির কিছু মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যে আটখানি গ্রন্থে শ্রীপান্থ-র বিবরণ অনুসারে তাদের বিস্তারিত পরিচয় নীচে দেওয়া হল ঃ

(ক) 'চায়না ইলাস্ট্রেটা'। লেখক আতানাসিউস্ কির্থের। গ্রন্থটি ১৬৬৭ সনে আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত হয়।

(খ) ১৬৯২ সনে প্যারিসে ছাপা বইটির লেখক কয়েকজন জেসুইট যাজক। বইটির বিষয় ঃ ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জলবায়ু, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। লাতিনে ছাপা ১১৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে বাংলাদেশের জনসাধারণের লিপির নমুনা।

(গ) 'আউরঙ্গজেব'। এটি ছাপা হয় লাইপজিগ-এ ১৭২৫ সনে। ৮৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা ছাড়াও মুদ্রিত রয়েছে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বাংলা হরফে একটি জার্মান নাম শ্রীসরজন্ত বল্‌পকাং মাএর।

(ঘ) 'Dissertio Selecta'। ১৭৪৩ সনে লাইডেন-এ ডেভিড মিল সাহেব গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ব্যাকরণ আলোচনা অংশে বাংলা ও দেবনাগরী অক্ষরে নমুনা পরিবেশিত।

(ঙ) ১৭৪৮ সনে লাইপজিগ-এ আর একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

(চ) ১৭৭৩ সনে ওলন্দাজ উইলিয়াম বোল্‌টস বিখ্যাত ইংরেজ মুদ্রাকর জোসেফ জ্যাকসনকে নিয়ে লন্ডনে ছাপালেন "আধুনিক সংস্কৃত" তথা বাংলা হরফের নমুনা।

(ছ) "A Code of Gentoo law"—১৭৭৬ সনে হ্যালহেড সাহেব লন্ডন থেকে এই বই প্রকাশ করেন।

(জ) ১৭৭৭ সনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন অনূদিত "আইন-ই-আকবরী'-র একটি খণ্ড।

৭। এই প্রসঙ্গে স্মিথের 'The Oxford History of India,' (১৯২৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত হেস্টিংস সম্পর্কে ঐতিহাসিক মিলের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "He was the first, or among the first, of the servants of the company, who attempted to acquire any language of the natives, and who set on foot those liberal enquiries into the language and literature of the Hindus" (p. 549-550)।

৮। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (১ম খন্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা -৩৪০।

৯। যখন ছাপাখানা এলো। শ্রীপান্থ। কলিকাতা, ১৯৭৭। পৃষ্ঠা ২০-২১।

১০। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেট-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ঃ

"The humble request of several Natives of Bengal. We humbly beseech any gentleman who will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengal Country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders; this favour will be gratefully remembered by us and our posterity for ever." Calcutta Gazette (Vol.I-II).

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খন্ড)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। শ্রাবণ ১৩৫৬। পৃষ্ঠা-৫৯।

১২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা-৭৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বানান-সংক্রান্ত আলোচনা :
কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাক্-মুদ্রণ ও মুদ্রণোত্তর যুগের বাংলা বানানের বৈচিত্র্য ও একরূপতার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এই বিশ্লেষণে সমকালীন বাংলা বানানের গতি-প্রকৃতির আভাস মিললেও বাংলা বানান সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার বা নির্দেশাবলির কোনো প্রত্যক্ষ লিপিবদ্ধ রূপ আমরা পাই না। ক্রমশ গদ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার লিখিত রূপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হল। স্বাভাবিকভাবেই বর্ণ, বানান এবং ব্যাকরণের প্রসঙ্গ এসে গেল। বাংলা ভাষায় বর্ণের আধিক্য যে বানানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে। এই ব্যাকরণগ্রন্থে তিনি বলেছেন : The great number of letters, the complex mode of combination, and the difficulty of pronunciation are considerable impediments to the Bengal Language, and the carelessness and ignorance of the people have much aggravated the inconvenience by the universal inaccuracy of their writings.[১]

বাংলা বানান যে পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুযায়ী নয় তাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

—ণ- is never distinguished from ন by the Bengalese.

—in the Bengalese ব wo is never distinguished from ব bo either in form or utterance.

কেরির বাংলা ব্যাকরণে (১৮০১) আমরা হ্যালহেডের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করি। তবে কেরি যে কেবল বাংলা বানান ও উচ্চারণের অসংগতিটুকু দেখিয়েছেন তা নয়, বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। রাইল্যান্ড সাহেবের কাছে লেখা পত্রে কেরি তাঁর অভিপ্রায় জানান : Writing, printing, spelling etc. in Bengal is almost a new thing, and we have to fix the orthography in a manner.[২]

বাংলা বানানকে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে কেরি সংস্কৃতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। কেরির বাংলা অভিধানে আমরা দেখি শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, তদ্ভব শব্দের বানানও তিনি সংস্কৃতানুযায়ী করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কেরির প্রবর্তিত বানান সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, তবু লিপিকরদের স্বেচ্ছাচারিতার যুগে কেরির এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কেরির পরই উল্লেখ করতে হয় রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ ; তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষার বর্ণমালা যে পুরোপুরি ধ্বনি-অনুসারী নয় সেদিকে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ

> *"গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু, ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।"*

এই গ্রন্থেই রামমোহন রায় জানাচ্ছেন ঃ

> "ণ, য, ব, ষ, ঋ, ঋৃ, ঌ, ৡ, অং, অঃ— এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।"

বাংলা বর্ণমালার অসংগতি নিয়ে পণ্ডিতমহলে বহু আলোচনা হলেও বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রস্তাব তখনো কেউ করেন নি। এই ধরনের প্রস্তাব প্রথম আমরা প্রকাশিত হতে দেখি ১৮৩৮ সালের ২২শে এপ্রিল 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায়। 'An important reform in the Bengalee alphabet' নামক এই প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, বাংলা বর্ণমালায় 'ণ' ও 'ন', 'জ' ও 'য', 'খ' ও 'ক্ষ', 'শ', 'ষ' ও 'স', তালব্য ব ও অন্তঃস্থ 'ব'-এই ধরনের সমোচ্চারিত বর্ণগুলির মধ্যে একটিকে রেখে বাকিগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। স্বরধ্বনির মধ্যে ই ও ঈ, উ ও ঊ-এর মধ্যে যে-কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে ঋ, ঌ-এর কাজ র বা ল দিয়ে সারা হলে অনায়াসে ঋ দীর্ঘ ঋ ঌ, দীর্ঘ ঌ-কেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বাংলা বর্ণমালা থেকে ১৪টি বর্ণ ও স্বরচিহ্ন বাদ দিয়ে বাংলা বানানের সরলীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাব সে সময়ে সর্বসাধারণের মধ্যে কোনো সাড়া জাগিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে বিশদ তথ্য জানা যায় না। তবে সেকালের ভাষাচর্চায় সংস্কারপন্থী রক্ষণশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রস্তাব বিশেষ সমর্থিত না হওয়াই সম্ভব।

পরবর্তীকালে বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংক্রান্ত যাঁর প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে (প্রথম ভাগ—১৩ই এপ্রিল ১৮৫৫) বাংলার নিজস্ব বর্ণমালার রূপ তুলে ধরেন। সেই কারণেই দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ঌ কে বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেন এবং ড়, ঢ় ও য়-কে বাংলা বর্ণমালায় স্থান দেন। চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে চিহ্নিত করেন। অনুস্বার এবং বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্থান দেন। এই ভাবে তাঁর বর্ণমালায় দেখা যায় ১২টি স্বরবর্ণ (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ , এ ঐ, ও, ঔ) এবং ৪০টি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ,, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ ং ঃ ঁ)।

বিদ্যাসাগর বাঙালির উচ্চারণ-প্রবণতার কথা স্মরণ রেখে বাংলা বর্ণমালাকে নতুন করে বিন্যস্ত করলেন। তবু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েই গেল। খাঁটি বাংলা বর্ণমালা রচিত হল না। সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ভাষার প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে এমন এক বর্ণমালা তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর। ক্রমশ সংস্কৃতচর্চা যত কমতে লাগল ততই বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বর্ণমালার

অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট হতে লাগল। বর্ণবিন্যাস নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন উঠল। অ-তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃতানুসারী হবে, না বাঙালির উচ্চারণকে সেক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে—এই ধরনের বানান-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল।

মোটামুটিভাবে এই সকল চিন্তাভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এইসব চিন্তাভাবনার প্রকৃতি ছিল ব্যক্তিগত। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রথম সূত্রাকারে বদ্ধ হতে দেখা যায়১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'চল্‌তি ভাষার বানান' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের নিয়মাবলি রচিত হয় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে। নিয়মগুলি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রণীত নয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যৌথভাবে আলোচনা করে নিয়মগুলি তৈরি করেছিলেন। এই চেষ্টার লক্ষ ছিল একটি বিশেষ প্রকাশন-সংস্থার বানানের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন। বানানে শৃঙ্খলা আনয়নের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ আরো ব্যাপক সামাজিক মাত্রা লাভ করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান সংস্কারের কাজে সেই সময়কার প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষীরা যুক্ত থাকলেও এই নিয়মাবলির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সোচ্চার হয়ে উঠে। বহু লেখালেখি শুরু হয়। জনমতের চাপে পড়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেরই অক্টোবর মাসে ঐ নিয়ম-পুস্তিকার সংশোধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সংশোধিত বানান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পালনের স্বীকৃতি সংযোজিত হয় (দ্র. চিত্র ১২)। তবু এই নিয়মাবলি বুদ্ধিজীবীদের মতৈক্য অর্জনে সমর্থ হল না। ফলে তাঁদের মতভেদ বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হল। এই বাদানুবাদে অংশ নিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনীকান্ত দাস. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই আন্দোলনের কাছে বানান কমিটিকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বানান কমিটি পুনরায় কিছু সংশোধন করে বাংলা বানানের নিয়মের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সংস্করণ প্রকাশের সময় বানান কমিটি ঘোষণা করেন : "সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোনো প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।" এই ঘোষণার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাশাপাশি পুরনো বানানও অবাধে চলতে লাগল। ফলে বিশৃঙ্খলার অবসান তো হলই না, বরং নতুন এক সমস্যা সংযুক্ত হল। আসলে বানান কমিটির নিয়মাবলির মধ্যেই বহু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীপর্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যাহ হোক বানান-সংক্রান্ত নিয়মাবলিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে বহু লেখা পাই, যার মধ্য দিয়ে বাংলা বানান সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান সংস্কার জনসমাজে এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে শুধু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাই নন, এ বিষয়ে আগ্রহী বহু সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানান। এই পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বাংলা বানান-সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাগুলির কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করা হল। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য অধ্যায়টিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হল ঃ

(ক) প্রাক্-১৯৩৬ পর্ব ঃ এই পর্বে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির প্রস্তাব-পুস্তিকা প্রকাশের পূর্ববর্তী বানান-সংক্রান্ত রচনাসমূহ আলোচিত হয়েছে।

(খ) ১৯৩৬-১৯৩৭ পর্ব ঃ *এই পর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তিনটি সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।*

(গ) ১৯৩৭-এর পরবর্তী পর্ব ঃ এখানে ১৯৩৭-এর পর থেকে বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বানানসংক্রান্ত ভাবনা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায় ঃ "প্রাক্-১৯৩৬ পর্ব"

১। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার। লেখক অজ্ঞাত।

বঙ্গদর্শন ঃ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ)।

এই প্রবন্ধে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা কীভাবে হ্রাস পেতে পারে সে সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সূত্রাকরে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

১.১। বাংলা বর্ণমালায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই ১৪টি স্বরবর্ণের মধ্যে ঋ, ঌ এবং ৡ ব্যবহার না থাকায় এগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১.২। বিভিন্ন ব্যঞ্জনসংযোগে বিভিন্ন স্বরবর্ণগুলি নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে— া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। এর মধ্যে অ এর সঙ্গে া যোগে আ হয় এবং ে-র সঙ্গে া যোগে 'ো' হয়। সুতরাং আ এবং ো বর্ণ দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। এখানে ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ এই বর্ণগুলি অি, অী, অু, অূ, অে, অো, অৈ-এভাবে লেখার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।

১.৩। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঃ ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র. ল, শ, ষ, স, হ।—এই ৩১ টি বর্ণ এবং এদেব 'অঙ্গীকার' মিলে মোট ৬২টি বর্ণ রাখার প্রস্তাব বযেছে।

১.৪। ্, ং, ঃ ঁ এই কটি রাখতে চান। `

১.৫। বিভিন্ন যুক্ত বর্ণের মধ্যে ক্ষ, জ্ঞ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৬। এছাড়া বিভিন্ন ফলার মধ্যে ্য, ্র. ন, ্ন, ´ রাখার প্রস্তাব রয়েছে।

প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিকভাবে বলা যায়. একশো বছর আগে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করার চিন্তাটি যে এই প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হয়েছে, সেদিক থেকে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর মধ্যে দু-একটি প্রস্তাব বর্তমানে গৃহীত হয়ে গেছে। যেমন, বাংলা বর্ণমালা থেকে ৠ, ৡ বর্জিত হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। যেমন, বিভিন্ন স্বরবর্ণগুলি অি, অী, অু, অূ, ইত্যাদি হরফে লেখার যে প্রস্তাব এখানে করা হয়েছে তাতে অক্ষরসংখ্যা হ্রাস পেলেও পরিচিত বিন্যাসটির অযথা রদবদল করলে বরং বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে। তাছাড়া কোন্ নীতির ভিত্তিতে অক্ষরসংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে তাও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কারণ বাংলা উচ্চারণে 'ঞ'-র ব্যবহার না থাকলেও 'ঙ' একটি নিত্য ব্যবহার্য ধ্বনি। কিন্তু এখানে 'ঙ' বর্ণটি বাদ দিয়ে 'ঞ'কে রাখা হয়েছে। আবার, বর্গীয় 'ব'কে রেখে অন্তঃস্থ 'ব' বাদ দেওয়া হয়েছে। লেখক উচ্চারণভিত্তিক বানান প্রবর্তনের পক্ষপাতী হয়ে এই 'ব'-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার তিনটি শিস-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণই রাখতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ প্রয়োগের পূর্ববর্তী নীতিটি কার্যকর নয়। অর্থাৎ লেখকের নিজের চিন্তার মধ্যেই

২। বাঙ্গলা ভাষা। লেখক শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'জন্মভূমি' ঃ মাঘ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ১১৮।

এই প্রবন্ধেও লেখক বাংলা বর্ণমালার অসঙ্গতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঃ

২.১। বাংলায় বর্ণমালা বলে এখন যা চলছে তা সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকবণ। বাংলা বর্ণমালায় এখন যেমন কিছু অনর্থক বর্ণ রয়েছে, তেমনি লক্ষ করা যায় কিছু আবশ্যক বর্ণের অভাব।

২.২। লেখক স্বরবর্ণ সম্পর্কে মনে করেন, বাংলায় যে যে স্বরধ্বনির প্রয়োগ হয় তার ভিত্তিতে স্বরবর্ণ চারটি 'শ্রেণী'তে বিভক্ত হতে পারে। যেমন ঃ

প্রথম শ্রেণী—তেড়চা। আ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে দুটি।

দ্বিতীয় শ্রেণী—চ্যাপ্টা। ই, এ, গা-হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে ছটি।

তৃতীয় শ্রেণী—গোল। উ, ও, অ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে ছটি।

চতুর্থ শ্রেণী—অৰ্দ্ধস্বর। একটি।

অর্থাৎ বাংলায় স্বরবর্ণ আছে পনেরটি। ং, ঃ, ঁ ধরলে আঠারোটি। তবে অক্ষরসংখ্যা প্রসঙ্গে লেখক দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন :

এক, হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুসারে দুটি পৃথক বর্ণ রাখতে হবে। প্রয়োজনানুসারে সেটি বসিয়ে বানানের রদবদল ঘটাতে হবে।

দুই, বানান না বদলিয়ে একই বর্ণ ভিন্ন সমাবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হবে এ ধবনের নিয়ম তৈরি করতে হবে। স্বববর্ণের সংখ্যা হ্রাস করার প্রসঙ্গে লেখক মনে কবেন হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক বর্ণ না রেখে উচ্চারণ অনুসারে নিয়ম করলে আটটি বর্ণেই কাজ চলতে পারে।

২.৩। ব্যঞ্জনবর্ণ . ব্যঞ্জনবর্ণেব বিন্যাস সম্পর্কেও লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন ·

'ক' থেকে 'ম' এর মধ্যে ঙ, ঞ, ণ বর্ণের কাজ বাংলা যথাক্রমে ং, ন, ন দ্বারাই চলতে পারে। যেহেতু উচ্চাবণ এক সেহেতু জ, য-দুটি পৃথক বর্ণ না রেখে 'জ' দিয়েই কাজ চলতে পারে। 'য়'-ধ্বনির আবশ্যকতা আছে বলে মনে কবেন। তাঁর অভিমত 'য়' ধ্বনি হয় ঐ মূর্তিতেই থাকুক নতুবা 'য' দ্বারা বোঝানো হোক। অন্তঃস্থ ব-এর প্রযোজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন। তবে বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর আকারগত সাদৃশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেই কারণে তিনি অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তিনটি শিশ্-ধ্বনির মধ্যে তিনি কেবল শ এবং স রাখার পক্ষপাতী। ক্ষ বর্ণের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তাঁর মত। সুতরাং লেখকের চিন্তানুসারে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ। ট, ঠ, ড, ঢ। ত, থ, দ, ধ। প, ফ, ব, ভ। য়, র, ল। ব, ড়, ঢ়, হ। ন, ম। শ, স।

এই একত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়াও লেখক ইংবেজি z ধ্বনি জ্ঞাপক উচ্চারণ বোঝানোর জন্য বাংলা বর্ণমালায একটি নতন বর্ণের সংযোজন জরুরি বলে মনে করেন।

উপরিউক্ত প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায়, প্রবন্ধটির দুটি অংশেই অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। ১৩০০ বঙ্গাব্দের গোড়ায় লেখক যে সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করেছেন, ১৪০০ বঙ্গাব্দে এসেও তার সমাধান পুরোপুরি হয়নি। অতিরিক্ত অক্ষরের বোঝা যেমন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় অক্ষরের অভাবও রয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচলিত রীতির পরিবর্তে অক্ষরের সংযোজন বা বর্জন ঘটিয়ে নতুন বর্ণমালার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

তবে এই প্রবন্ধেও কোথাও কোথাও অসংগতি ধরা পড়ে। যেমন, লেখক 'স্বরবর্ণ' অংশে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। হয় হ্রস্ব দীর্ঘ মেনে বর্ণমালা সাজাতে হবে, নয় উচ্চারণ অনুসারে নিয়ম করতে হবে। এক্ষেত্রে বক্তব্য : প্রথমত বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ-ভেদ নেই বললেই চলে। সুতরাং শুধুশুধু হ্রস্ব দীর্ঘ-ভেদ মেনে জটিলতা সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত এই বিকল্প প্রস্তাব যেকোনো ক্ষেত্রেই মতানৈক্য বা জটিলতা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া ং, ঃ, ঁ এই তিনটি বর্ণকে অযথা ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে স্বরবর্ণ মালায় বসানো যুক্তিহীন। রূপান্তর ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু একান্তই প্রয়োজন।

তবে ব্যঞ্জনবর্ণ প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব লেখক দিয়েছেন তা বেশ যুক্তিগ্রাহ্য।

৩। বাঙ্গালা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা। শ্রী অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত।

নব্যভারত ঃ শ্রাবণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা - ২০৮। •

এই প্রবন্ধের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, প্রবন্ধটিতে লেখক বাংলা বর্ণমালার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ

বিদেশি ভাষার বিভিন্ন ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ বাংলায় নেই। যেমন ঃ বাংলায় ক, খ, গ জিহ্বামূলীয় বর্ণ। 'পারশী'তে এই তিনটি জিহ্বামূলীয় ছাড়া এ ধরনের তিনটি কণ্ঠ্য বর্ণ আছে (কাফ্, খে, গায়েন)। এই ধরনের অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বাংলায় শুদ্ধ করে লেখার উপযোগী বর্ণ নেই। হিন্দির মতো বাংলাতেও ঐ অক্ষরগুলির নীচে বিন্দু বসিয়ে মূল ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাপন করা যেতে পারে।

নাগরীতে দুটি 'ব' ধ্বনি যেমন আছে, তেমনি তা ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন, বর্গীয় ব এর বাম ভাগ কোনো একটি রেখা দ্বারা কেটে দেওয়া হয়। লেখক মনে করেন, বাংলাতেও এই প্রথা চালু হলে দুটি বর্ণের ভিন্ন উচ্চারণে আর কোনো গোল থাকে না.

ইংরেজিতে F, V দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। এগুলি বাংলায় ফ, ভ দ্বারা লেখা হয়। ফ, ভ যেহেতু ওষ্ঠ্য বর্ণ তাই এগুলি দ্বারা F, V লেখা হতে পারে না। লেখক ফ বা ভ-এর নীচে বিন্দু বসিয়ে কাজ চালাতে পারেন।

ইংরেজিতে একটি যুক্তাক্ষর আছে zh। বাংলায় এর উচ্চারণ শ বা জ কোনোটির দ্বারাই বোঝানো যায় না। এক্ষেত্রেও শ এর নীচে বিন্দু বসিয়ে তিনি এই কাজ চালানোর পক্ষপাতী।

এই প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে বলা যায় এখানে উত্থাপিত সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বর্ণমালার এই অসম্পূর্ণতার জন্য বিদেশি শব্দের যথাযথ উচ্চারণভিত্তিক বানান লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে লেখকের প্রস্তাবগুলিও ভেবে দেখার মতো।

৪। বাংগলা অক্ষর। যোগেশচন্দ্র রায়।

প্রবাসী ঃ কার্তিক, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪৭১।

তৎকালে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে লেখক কীভাবে অক্ষর পরিচয় সহজ করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করেছেন :

৪.১। যোগেশবাবুর মতে অক্ষর যদি বর্ণজ্ঞাপক চিহ্নমাত্র হয় তবে শিশুকে 'চালিশটি' অক্ষর শিখতেই হয়। উল্লেখ্য বর্ণ বলতে তিনি মূল ধ্বনি এবং অক্ষর অর্থে বর্ণের লিখিত চিহ্ন বুঝিয়েছেন। 'চালিশটি অক্ষর' হল—অ, আ, ই, উ, এ, ও, ঁ, ং, ঃ, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ত, থ , দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য়, র, ল, শ, ষ, স, হ।

কিন্তু শিশুকে লিখতে হয় 'বাআন্নটা'—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ ঁ ং
ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ
ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল ব শ ষ স হ।

এর মধ্যে ঋ বাংলায় ই কার যুক্ত র। ঐ-অই। ঔ-অউ। ঌ, ঙ, ঞ পৃথক অস্তিত্ব-হীন। অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঌ - ল্, ঙ - ং, ঞ - ন উচ্চারিত হয়। এছাড়া ণ, য, অন্তঃস্থ ব বাংলায় ন, জ, বর্গীয় ব হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতে, "বাংগলার দোষ অনাবশ্যক, অক্ষরের সদ্ভাব।"

৪.২। স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর শেখার পর থাকে বিভিন্ন কার-চিহ্ন। এক্ষেত্রে অ-স্বর অভাব - বোধক চিহ্ন নিয়ে ্ া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ—এই এগারটি স্বরচিহ্ন। এই স্বরচিহ্নগুলি বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। লেখক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন. বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক উ-কার পাঁচ রকম, ঊ-কার ও ঋ-কার দুরকম রূপ ধারণ করেছে।

৪.৩। এরপর আছে বিভিন্ন ধ্বনের যুক্তবর্ণ। লেখক মনে করেন, সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাশাপাশি লিখবার রীতি চালু হলে অক্ষরসংখ্যা কম হতে পারে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে ক্ষ, জ্ঞ, ষ্ণ তিনি রাখতে চান, কারণ এগুলি মূল বর্ণের উচ্চারণের প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ করে। এছাড়া ্য, ্র, ্ এই তিনটি রাখতে চান। তাঁর মতে অবশিষ্ট আকার অনাবশ্যক।

৪.৪। অক্ষরের আকৃতি সম্বন্ধে তিনি মনে করেন, "১। যে অক্ষর কলমের একটানে লিখিতে পারা যায় ...... ; ২। যে অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ভ্রম হয় না ; ৩। যে অক্ষর দেখিয়া পড়িতে চক্ষুপীড়ন করিতে হয় না সেই অক্ষর ভাল।"

এই কারণে হ - ঈ, ঈ - ঈ ; ঝ - ঝ, এ - ত্র, ও - ত্ত, ব - র, য় - ষ, য - য়, ক্ষ ক্ষ ইত্যাদি কয়েকটি অক্ষর তাঁর মতে ভালো নয়। তাছাড়া র অক্ষর লিখতে গেলে কলম তুলতে হয় কাগজ থেকে। ি - কারের দোষও একই। ে, ৈ ব্যঞ্জনের বামে বসায় স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় না। ু ূ একই দিকে বেঁকে যাওয়ায় বোঝার অসুবিধা সৃষ্টি হয়। দু - তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত যুক্তাক্ষরে কোনো অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নীচে না বসিয়ে বর্ণগুলি পাশাপাশি বসানো তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন। বাংলা অক্ষরের

সূক্ষ্মকোণ-বাহুল্য তাঁর কাছে চক্ষুর পীড়াদায়ক বলে মনে হয়। তাই নাগরী অক্ষরের সাদৃশ্যে বাংলা অক্ষরের পরিবর্তন চান।

৪.৫। যোগেশবাবু কয়েকটি নতুন বর্ণের প্রচলন চান। তিনি অন্তঃস্থ ব এবং র-এর নাগরী রূপ (ব, র) নিতে চান। য এর নাগরী রূপ (য) চান। এতে ষ এর সঙ্গে ভ্রম হয় না। এ ত্র, ও ত্ত প্রভৃতি একই আকৃতির ভিন্ন ধ্বনিদ্যোতক বর্ণগুলির সংস্কার চান।

৪.৬। সংস্কৃত ব্যাকরণেও যখন দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ তখন রেফ্ যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বের পুরোপুরি বর্জন চান।

৪.৭। ঙ, ঞ, ণ্ ন, ম্, - এই পাঁচটি বর্ণের ঙ্, ঞ, ণ্ স্থলে লুপ্তচিহ্ন (০) বসাতে চান, যেহেতু এদের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেছে (ঙ - ং, ঞ - ন, ণ - ন)। ন, ম অপরিবর্তিত রাখতে চান। অনুস্বারের বিন্দুর সঙ্গে হসন্ত যোগ অনাবশ্যক মনে করেন।

৪.৮। ঈষৎ ই উচ্চারণ বোঝাতে ই অক্ষরের মাথার শৃঙ্গটুকু (˜) জুড়ে দিতে চান (') পরিবর্তে। খ˜ ল আ˜জ ইত্যাদি।

বাঁকা এ বোঝাতে ্যা য়্যা, অ্যা এ্যা ইত্যাদি লেখার বিরোধী। তিনি সোজা এ দিয়ে বাঁকা এ বোঝাতে চান। তবে সঠিক উচ্চারণ জানাতে হলে তিনি নতুন অক্ষর চান। যোগেশবাবু 'সিলেটী নাগরীর ন্যায়' অ, আ, ই প্রভৃতি মূল স্বরবর্ণের পরিবর্তে তাদের কার চিহ্ন (া, ি) রাখলে অক্ষরসংখ্যা কম হবে বলে মনে করেন। যেমন 'ে াহে প্রিভু তুমি মোরে কি দেখাে া ভয়।' ইত্যাদি।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে অক্ষরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যোগেশবাবু অক্ষর সংস্কার সম্পর্কে যে প্রস্তাবগুলি রেখেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ। প্রকৃতই বাংলা বর্ণমালাব প্রধান ত্রুটি অনাবশ্যক অক্ষরের সমাবেশ। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে ঋ, ৯, এ, ঔ অনাবশ্যক। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেও, ঞ, ণ, য, ম, অন্তঃস্থ ব ধ্বনিগত দিক থেকে বাংলা বর্ণমালায় অপ্রয়োজনীয় সংযোজন। তবু রাতারাতি বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। যোগেশবাবু নিজেই অন্তঃস্থ ব-কে অনাবশ্যক মনে করেও পুনরায় নাগরী থেকে এই অক্ষর (ব) নেবার প্রস্তাব রেখেছেন। তাছাড়া তিনি যদি মূল ধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষরগুলি শুধু রাখতে চান তবে তাঁর প্রস্তাবিত 'চালিশটি অক্ষর' থেকে স, ষ কেও বাদ দিতে হয়। সুতরাং দেখা যায় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। তবে স্বরবর্ণেব বিভিন্ন কার-চিহ্নগুলি (া, ি, ী) বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হযে একাধিক রূপ পায়। একই স্বরচিহ্নের এই ভিন্নরূপতার বিরোধিতা যোগেশবাবুর মতো আমরাও করি।

তিনি ক্ষ, জ্ঞ, ঙ্গ ছাড়া অন্যান্য যুক্তাক্ষর অনাবশ্যক মনে করেন। সহজ রূপ যোগ করে 'যুক্তাক্ষর' তৈরি করলে শুধু সময়ই বেশি লাগবে না, হসন্তেরও আধিক্য ঘটবে। তবে যুক্তবর্ণ স্পষ্ট করে লেখার প্রসঙ্গটি যুক্তিযুক্ত।

যোগেশবাবু হ - ই, ঈ - ঙ্গ, ঋ - ঝ, এ - ত্র, ও - ত্ত ইত্যাদি অক্ষরগুলির সংস্কার চান। কারণ এগুলির মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য থাকায় তা বিভ্রম সৃষ্টি করে। তবে আমাদের মনে হয়, এই আকারগত সাদৃশ্য প্রথম অক্ষর-শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সুবিধাই সৃষ্টি করে। কারণ এক অক্ষর থেকে তারা একাধিক অক্ষর লেখা শেখে। তাছাড়া বিভিন্ন অক্ষরের এই সাদৃশ্য

বানানের ক্ষেত্রে খুব একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। বরং প্রচলিত অক্ষরগুলিকে ঢেলে সাজাতে গেলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজি বর্ণমালাতেও এধরনের আকারগত সাদৃশ্যযুক্ত বর্ণ বহু রয়েছে। তাই সংস্কার বা সরলীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া করা অর্থহীন। সুতরাং তাঁর এই প্রস্তাবটি অযৌক্তিক।

যোগেশবাবু অন্তঃস্থ ব, র, য-এর নাগরী রূপ চান। বাংলা বর্ণমালায় বাংলা বর্ণের পরিবর্তে নাগরী বর্ণের সংযোজন যুক্তিযুক্ত হবে কি? 'কাগজ থেকে কলম তুলে' বিন্দু দিতে হয়— এই অপরাধে যদি র পরিত্যাজ্য হয় তবে বাংলা বর্ণমালার অর্ধেক অক্ষরকেই সংস্কার করতে হবে। য কে ম এর সাদৃশ্যজনিত বিভ্রান্তি থেকে যুক্ত করার জন্য তিনি য-এর কোণ ভেঙে নাগরী য করে দিতে চান। তাহলে খ, ঘ, য, ফ ইত্যাদি বর্ণগুলির ক্ষেত্রে লেখক কী করবেন? এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, লেখক যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাগরী বর্ণমালাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, সেই নাগরী বর্ণমালাতেও সাদৃশ্যসম্পন্ন একাধিক বর্ণ আছে।

রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাবটি যুক্তিগ্রাহ্য।

ঙ, ঞ ণ স্থলে একমাত্র লুপ্তচিহ্ন (০) বসাতে চান। ভিন্ন ধ্বনিদ্যোতক বর্ণ একই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বলে আমাদের মনে হয় না। এক্ষেত্রে বানান-শিক্ষার্থী বিভ্রান্তিতে পড়বে। ঈষৎ ই উচ্চারণ বোঝাতে তিনি ই-কারের শুধু শৃঙ্গটুকু (ˉ) দিতে চান। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় অন্যান্য ঈষৎ উচ্চারিত বর্ণের (উ, এ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে কোন্ চিহ্ন ব্যবহার করা হবে? তাছাড়া, এই ধরনের ঈষৎ উচ্চারিত ই ধ্বনি সাধারণত ঔপভাষিক গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মান্যায়িত বাংলায় ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার হয় না। সেজন্য এই সংক্রান্ত প্রস্তাব খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়।

বাংলায় বাঁকা এ ধ্বনির ব্যবহার এত বেশি যে এর জন্য নতুন একটি বর্ণ এবং একটি কার-চিহ্ন বাংলা বর্ণমালায় সন্নিবিষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। "এসিড, গেম হেটকোর্ট ইত্যাদি এ দিয়া লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না" ঠিকই, কিন্তু বাংলা উচ্চারণের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। তাই সোজা এ দিয়ে বাঁকা এ বোঝানো উচিত নয়।

যোগেশবাবু অক্ষরসংখ্যা কমাবার জন্য মূল স্বরবর্ণের পরিবর্তে তাদের কার চিহ্ন প্রয়োগের প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে অক্ষরসংখ্যা কমলেও বানানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

৫। পঞ্চস্বর। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ঃ কার্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৩২১ - ৩২৬।

এই প্রবন্ধে লেখক স্বরবর্ণের সংখ্যাহ্রাসের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে :

৫.১। ঋ, ঌ -> রি, লি।

৫.২। দীর্ঘ স্বরগুলিও অনাবশ্যক।

৫.৩। ঐ এবং ঔ-এর কাজ যেহেতু অই বা অউ দ্বারা চালানো যায়, সেহেতু ওই বর্ণ দুটিও নিষ্প্রয়োজন।

৫.৪। অ কারের বিকৃত উচ্চারণ ও কারের সঙ্গে অভিন্ন। যেমন, নরম, গরম, ইত্যাদি। তাই লেখক পৃথক ও-কারের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

সতরাং বাংলায় অ, আ, ই, উ, এ-এই পাঁচটি স্বরই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন।

লেখকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অক্ষরসংখ্যা হ্রাসের যৌক্তিকতা থাকলেও লক্ষ রাখতে হবে তার ফলে বানানের ক্ষেত্রে যেন জটিলতা সৃষ্টি না হয়। এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব অনুসারে অ, আ, ই, উ, এ-এই পাঁচটি স্বরবর্ণ রক্ষণীয়। এখানে লক্ষ করতে হবে তিনি 'ও' বর্ণটি বর্জন করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হল, অ-দ্বারা ও-কার বোঝানো যায়। যেমন (নরম, গরম) কিন্তু শব্দের আদিতে যেখানে 'ও' আছে (যেমন ঃ ওষুধ) সেক্ষেত্রে আদ্যক্ষরটি কী দিয়ে লেখা হবে। যদি তা অ দ্বারা লিখতে হয় এবং প্রসঙ্গ থেকে অ এবং ও-এর পার্থক্য বুঝে নিতে হয়, তবে প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে তা জটিলতা সৃষ্টি করবে। সমস্যাও বাড়বে।

তাছাড়া অনাবশ্যক অক্ষর বর্জনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি নতুন অক্ষর সংযোজনেরও প্রয়োজন আছে। যেমন অ্যা - ধ্বনি জ্ঞাপক একটি অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় স্থান পাওয়া খুবই জরুরি। এদিকটা লেখক ভাবেন নি।

তাই ভাবনাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পুরোপুরি অসংগতিমুক্ত নয়।

৬। চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ঃ ফাল্গুন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ৫২০-২৪।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধের মতো এখানেও লেখক ব্যঞ্জনবর্ণ কমাবার পক্ষপাতী। তাঁর প্রস্তাবগুলি নীচে দেওয়া হল :

প্রথম প্রস্তাব ঃ আমাদের বর্ণমালা থেকে বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং চন্দ্রবিন্দু, বর্জিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ ং, ঃ -কেও বিসর্জন দেওয়া উচিত।

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি সবই যেহেতু অনুনাসিক, তাই শুধু 'ম' কে রেখে অন্যগুলি খারিজ হোক।

চতুর্থ প্রস্তাব ঃ কেবল দন্ত্য'স', দন্ত্য'ন', বর্গীয় 'জ', 'র' রেখে বাকিগুলি বহিষ্কার করা হোক।

পঞ্চম প্রস্তাব ঃ ট-বর্গটি ত-বর্গের অপভ্রংশ এবং বর্বর অনার্য দ্রাবিড়ি জিনিস। সুতরাং 'আর্যবংশোদ্ভূত' বাঙালির ভাষায় থাকা অন্যায়।

সুতরাং, ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াল —ক, গ, চ, জ, ত, দ, ন, প, ব, ম, র, ল, স, হ।

এই প্রবন্ধে লেখক যে প্রস্তাব রেখেছেন তার প্রত্যেকটি অত্যন্ত যুক্তিহীন। তার প্রস্তাবিত বর্ণমালা চালু করলে বাংলার অধিকাংশ ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণই থাকবে না। তাছাড়া, লেখকের নিজের মধ্যেই স্ববিরোধ লক্ষ করা যায়। তিনি তৃতীয় প্রস্তাবে একমাত্র 'ম' রেখে বর্গের অন্য পঞ্চম বর্ণগুলি বাদ দিতে বলেছেন। আবার চতুর্থ প্রস্তাবেই দন্ত্য 'ন' কে গ্রহণ করেছেন। ট বর্গ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। ট বর্গীয় বর্ণগুলি ঐতিহাসিক ভাবেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, এই বর্ণগুলিকে ত-বর্গীয় বর্ণের অপভ্রংশ বলে মনে করার কোনো ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি নেই। তাছাড়া ট-বর্গীয় মূর্ধন্য বর্ণগুলিকে অনার্য বিবেচনায় পরিত্যাগ করার প্রস্তাবের মধ্যে যতখানি সংকীর্ণ 'আর্যামি' আছে ততখানি যুক্তিনিষ্ঠা

৭। বাংগলা শব্দের বানান। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
প্রবাসী ঃ আশ্বিন, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা-৫১৭।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাংগলা শব্দের বানান" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে লেখক বানান-বিভ্রান্তির ক্ষেত্রগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

৭.১। বানান যদি মূল ধ্বনিপ্রদর্শক হয় তবে রাম বানানটি র - আ - ম না, র - আ ম্—কী লেখা হবে? 'রাম' লেখা হলে যারা ভিন্ন ভাষাভাষী লোক তারা ভিন্ন উচ্চারণ করবে।

৭.২। সংস্কৃতমূলক শব্দের বানান যোগেশবাবুর মতে সবক্ষেত্রে মূল বিবেচনা করে লিখতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে বাংলা ভাষাকোশের সাহায্য নিতে হবে।

৭.৩। সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয়ে যে শব্দ বাংলায় এসেছে সেক্ষেত্রে কেউ মূলানুযায়ী কেউ ধ্বনিভিত্তিক বানান চান। সেক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

৭.৪। ই ঈ, উ ঊ, ঋ রী, অই ঐ, অউ ঔ, ং ঙ, য জ, ন ণ, শ স, ক খ, গ ঘ, জ ঝ, চ ছ, ট ঠ, ড ঢ, ত থ, দ ধ, ব ভ, ইত্যাদি বর্ণগুলির ক্ষেত্রে একটির স্থানে অন্যটির প্রয়োগ হওয়ায় বানানে বিভ্রান্তি হয়। তাছাড়া স্বরবর্ণ স্থানে য়, যা, য়ি, য়ী, য়ু, যে, য়ৈ, য়ো, য়ৌ, এবং ঙ্গ, ঞ স্থানে ঙ, ইঁ প্রয়োগ হয়।

৭.৫। কার্বন শব্দটিতে ব্যাকরণের নিয়মে ন ণ হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে শব্দের মূল সংস্কৃত নয়, সেক্ষেত্রেও কি সংস্কৃতবিধি মানতে হবে?

৭.৬। চারি - চাইর, আজি - আইজ - এই মাঝের ঈষৎ ই না লিখে অনেকেই বানান অশুদ্ধ করেন।

৭.৭। ইয়া, উয়া-তদ্ধিত প্রয়োগ যোগে বাংলা ভাষায় বহু শব্দ রয়েছে। যোগেশবাবু ইয়া, উয়া -র পরিবর্তে ইআ, উআ লেখার পক্ষপাতী, কারণ ইআ, উআ খাঁটি বাংলা প্রত্যয়। পাহাড়ে, শান্তিপুরে ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রূপগুলি তিনি অশুদ্ধ মনে করেন। কারণ তাঁর মতে এই সংক্ষিপ্ত বানান ধ্বনি বা ব্যুৎপত্তি কোনোটির সঙ্গেই মেলে না। এছাড়াও তিনি হল, করে, জলো, ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রূপগুলির পরিবর্তে হল্য কর্‍্যে, জল্যো লেখার পক্ষপাতী।

যোগেশবাবু বাংলা বানানের বিভ্রান্তির যে এলাকাগুলি দেখিয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সমাধানসূত্র দিয়েছেন তা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। যোগেশবাবুর আলোচনা থেকে বোঝা যায় তিনি ধ্বনিভিত্তিক বানানের পক্ষপাতী। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ধ্বনিভিত্তিক বানান গ্রহণীয় হতে পারে না। যেমন, বানান মূল ধ্বনিপ্রদর্শক হলেও রাম বানানটি রাম্ লেখার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থাকে। প্রথমত বাঙালিরা প্রসঙ্গ থেকেই এই বিভ্রান্তি দূর করে নিতে পারে। দ্বিতীয়ত বাংলায় শব্দান্তে অ চিহ্ন বজায় রেখেই হলন্ত উচ্চারণের প্রবণতা সংখ্যাগুরু বাঙালির বানানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যোগেশবাবু সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষাভাষীর স্বার্থে শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন, তাতে অনাবশ্যকভাবে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে যে শব্দগুলি বাংলায় এসেছে সেক্ষেত্রে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানই হওয়া উচিত।

যেক্ষেত্রে শব্দের মূল সংস্কৃত নয় সেক্ষেত্রে ধ্বনিভিত্তিক বানানই শ্রেয়। অযথা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম চাপানো যুক্তিহীন।

যোগেশবাবু একটির স্থানে অপরটির প্রয়োগ হতে পারে এমন কিছু বর্ণের তালিকা দিয়েছেন। এখানে তিনি কখ, গঘ, চছ, জঝ, টঠ, তত, দধ, বভ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক স্বনিম। সুতরাং একটির ক্ষেত্রে অপরটি প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

যোগেশবাবু চাইর আইজ হল্য করো্য জল্যো ইত্যাদি বানান লিখতে চান। এক্ষেত্রে লেখকের ভাবনাতে কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। হল্য, করো্য, জল্যো—এগুলি ভাষার মান্য রূপ নয়, প্রাদেশিক রূপ। ভাষার মান্য (standard) রূপ ধরলে হল, করে, জোলো ইত্যাদি বানানই শুদ্ধ।

৮। বঙ্গভাষায় বাণান সমস্যা। শ্রী অনুকূল চন্দ্র বসু।

প্রবাসী ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—১৯৪

১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে যোগেশচন্দ্র রায়ের "বাংগলা শব্দের বানান" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখক "বঙ্গভাষায় বাণান সমস্যা" প্রবন্ধটির অবতারণা করেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বাংলা বর্ণমালা ও বানান সম্পর্কিত কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধানসূত্র দিয়েছেন। যেমন—

৮.১। লেখক মনে করেন যে কোনো ভাষাতেই যতগুলি ধ্বনির ব্যবহার আছে ততগুলি অক্ষর থাকাই আবশ্যক। ধ্বনি অনুসারে অক্ষর সাজাতে গেলে বাংলা বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ ব, শ ও দীর্ঘস্বর বাদ দিতে হয়। ঙ, ঞ, দন্ত্য-ন, ও স এইকটি বর্ণ কেবল ফলায় ব্যবহারের জন্য রাখতে হয়। বর্ণসংযোগস্থল ভিন্ন সর্বত্র ণ ও ষ ব্যবহার করলেই আমাদের প্রচলিত ধ্বনি ঠিক থাকে বলে তিনি মনে করেন। কারণ শ এর প্রকৃত উচ্চারণ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা হয়। কিন্তু এভাবে আমরা কেউই উচ্চারণ করি না।

৮.২। বাংলা ভাষায় বর্ণবিন্যাসপ্রণালী কী রকম হবে সে সম্পর্কে লেখকের অভিমত—

(ক) দেশ-কালের ব্যবধানে যখন ধ্বনি পরিবর্তিত হয়, তখন ধ্বনি অনুযায়ী বর্ণ বিন্যাস স্থির করা সম্ভব নয়।

(খ) খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলির ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতকেই 'স্টান্ডার্ড' ধরতে চান।

(গ) ধ্বনির আমূল পরিবর্তনই যখন অপভ্রংশের কারণ তখন অপভ্রষ্ট শব্দগুলির বানান ধ্বনি অনুসারেই করা উচিত। অর্থাৎ কায বানানটি কাজ লেখাই সংগত।

(ঘ) অন্য ভাষা থেকে গৃহীত ও দেশজ শব্দগুলির বানানও ধ্বনির অনুরূপ হবে। ইআ, উআ, যেহেতু খাঁটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, সেহেতু ইয়া, উয়া লেখা উচিত নয়। যেমন—পড়ুআ।

৮.৩। যোগেশবাবু 'হ'লো, 'করে', 'জলো' প্রভৃতি স্থানে 'হল্য' 'করো্য' 'জল্যো' লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু লেখক মনে করেন 'হল্য' বানান প্রকৃত ধ্বনির অনুরূপ নয়। তাছাড়া প্রাচীনেরা

তিনি অশুদ্ধ বলে মনে করেন। তবে লেখক অর্ধ ই, বা অর্ধ উ-ধ্বনি প্রকাশের জন্য (') চিহ্নের পবিবর্তে যোগেশবাবুর প্রস্তাবিত (˘) লেখার পক্ষপাতী।

৮.৪। যোগেশবাবু ঙ, ঞ, ণ স্থলে একমাত্র 'লুপ্তচিহ্ন °" লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু লেখক একমাত্র (০) চিহ্ন দ্বাবা একাধিক অক্ষর প্রকাশ করা অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তবে অনুস্বারের আলগা লেজটা তিনিও ফেলে দিতে স্বীকৃত আছেন।

অনুকূলবাবুর অভিমত থেকে বোঝা যায় তিনি ধ্বনি-অনুসারী অক্ষরবিন্যাসের আবশ্যকতা অনুভব করলেও পুবোপুবি ধ্বনিভিত্তিক বানানের পক্ষপাতী নন। তাঁর অভিমতগুলি ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ করে বলা যায় ·

ধ্বনি অনুসাবে অক্ষব সাজাতে গেলে বাংলা বর্ণমালা থেকে কেবল অন্তঃস্থ ব, শ ও দীর্ঘস্ববগুলিই বাদ দিলেই চলবে না। ঋ, ঞ, য, ণ—ইত্যাদি বর্ণের যথার্থ উচ্চাবণ বাংলায় না থাকায—এই বর্ণগুলিও অতিবিক্ত মনে হয। তাছাড়া ণ ও ষ-এর প্রকৃত উচ্চাবণ আমরা বাংলায কখনোই কবি না। ববং শ (এবং কোথাও কোথাও স)-এর উচ্চাবণ আমরা করি। তাই ণ এবং ষ-বর্ণ বাখাব প্রস্তাব একেবাবেই ভিত্তিহীন।

অনুকূলবাবু ধ্বনি অনুসাবে অক্ষব বাখাব আবশ্যকতা অনুভব কবলেও পুরোপুরি ধ্বনিভিত্তিক বানান লেখাব বিপক্ষে। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসারী বানান লেখার প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত। তবে তৎসম শব্দেব বানানে যেখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুইই চলছে সেক্ষেত্রে হ্রস্ব-কেই অবিকল্পভাবে গ্রহণ কবা যেতে পাবে।

'অপভ্রষ্ট' অর্থাৎ তদ্ভব শব্দেব বানান ধ্বনিভিত্তিক হওযাই বাঞ্ছনীয। তবে এই পবিবর্তন সমযসাপেক্ষ। কারণ বেশ কিছু তদ্ভব শব্দেব ব্যুৎপত্তি অনুসাবী বানান রাতাবাতি পবিবর্তন কবলে প্রচলিত অভ্যাসকে আহত কববে। বানান সংস্কাবেব উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

দেশি ও বিদেশি শব্দেব বানান ধ্বনিভিত্তিক কবার প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত। অর্ধ ই বা অর্ধ উ ধ্বনি প্রকাশেব জন্য পুরাতন চিহ্নেব পবিবর্তে অযথা নতুন চিহ্ন সমর্থনের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

যোগেশবাবুব প্রস্তাবটিব বিবোধিতা কবে অনুকূলবাবু যে যুক্তি দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য। পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবটি বিশ্লেষিত হয়েছে।

৯। বাণান সমস্যা। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য ঃ শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ)। পৃষ্ঠা - ২৬৬ - ২৭৬, ৩৮০-৩৯৬।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায 'বাণান সমস্যা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখক শ্রী ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি লেখকের অপর একটি প্রবন্ধ 'ব্যাকরণ বিভীষিকা'ব পবিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য প্রবন্ধটি ১৩২০-তে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।) এই প্রবন্ধে লেখক বানান-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা তুলে ধরেছেন।

৯.১। হসন্ত-চিহ্নের আবির্ভাব - তিরোভাব ঃ

লেখক মনে করেন সংস্কৃত ভাষায় যেগুলিতে হসন্ত রয়েছে বাংলায সেগুলিতে হসন্ত হওযা উচিত। বাংলায শব্দেব শেষে যে ক্ষেত্রে অ-কার অনুচ্চারিত হয সেক্ষেত্রে পাঠকের

সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না করাই শ্রেয় বলে লেখকের ধারণা। তবে ইংরেজি শব্দ বাংলায় লিখতে গিয়ে সঠিক উচ্চারণ বোঝাবার ক্ষেত্রে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যায়।

৯.২। **বিসর্গ বিসর্জন ঃ** সমাস ও সন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গ বিসর্জনের ফল শোচনীয় হয় বলে লেখকের ধারণা।

৯.৩। **আ-কার গ্রহণ ঃ** অ-কারের আ-কারের প্রতি উচ্চারণটান ও য-ফলা উচ্চারণের দোষ বহু ভুল শব্দ সৃষ্টি করে।

৯.৪। **চন্দ্রবিন্দু -চন্দ্রোদয় ঃ** বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ বেড়ে গেছে। চন্দ্রবিন্দু সাধারণত বর্গের পঞ্চম বর্ণ এবং অনুস্বার বিলোপ ঘটলে বসে। তবে অনেকক্ষেত্রে অনুনাসিক বর্ণের পরিবর্তে চন্দ্রবিন্দু আসে না। যেমন ঃ শিকল (শৃঙ্খল)। আবার অনুনাসিক নেই তবু চন্দ্রবিন্দু আসে। যেমন ঃ আঁখি (অক্ষি)।

৯.৫। **হ্রস্ব - দীর্ঘ জ্ঞান ঃ** লেখকের মতে ব্যুৎপত্তি ধরে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্থির করা সঙ্গত।

৯.৬। **অ-কার ও য়-কারে গোলযোগ ঃ** আমরা অ এবং য় বর্ণ উচ্চারণে প্রভেদ করি না। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অ না লিখে য়, আ না লিখে য়া লিখে ফেলি।

৯.৭। **ঋ, রি, রী ঃ** ঋ, ও রি/রী সম্বন্ধে উচ্চারণে কোনো প্রভেদ করি না। তবে এজন্য বিশেষ কোনো বানান ভুল হয় না।

৯.৮। **ব, ব ঃ** আমরা বর্গ্য ব ও অন্তঃস্থ ব উচ্চারণে প্রভেদ করি না। ফলে বানানবিভ্রাট ঘটে।

৯.৯। **জ, য ঃ** লেখক মনে করেন, অপভ্রংশের বেলায় ব্যুৎপত্তি স্মরণ করে জ বা য কোন্‌টি হবে তা স্থির করা সঙ্গত।

৯.১০। **র, ড় ঃ** সংস্কৃতে ড় নেই। কিন্তু সংস্কৃতের র অনেক সময় বাংলায় ড় হয়েছে। কখনো র অর্থভেদে ড় হয়।

৯.১১। **খ, ক্ষ ঃ** সংস্কৃত ক্ষ অপভ্রংশে খ হয়েছে। লেখক মনে করেন যেখানে সংস্কৃত শব্দ অবিকল গ্রহণ করা হয়, সেখানে ক্ষ অবিকৃত রাখাই উচিত।

৯.১২। **সংযুক্ত বর্ণ ঃ** আমরা য ফলা, বাংলা ব ফলা, যুক্ত ত, ত-এ ব-ফলা, যুক্ত ক - ক-এ বফলা ইত্যাদি উচ্চারণে স্পষ্ট প্রভেদ করি না। ফলে বানান-বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

৯.১৩। **ণ, ন ঃ** এক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, ণত্ববিধি থাকলেও বহু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা বানানে বিশৃঙ্খলা আনছে।

৯.১৪। **শ, ষ, স ঃ** এক্ষেত্রেও লেখক ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানান করাই সঙ্গত মনে করেন।

৯.১৫। **বর্ণ বিপর্যয় ঃ** উচ্চারণদোষে এক বর্ণ আর এক বর্ণে পরিবর্তিত হয়। যেমন ঃ কুশণ্ডিকা > কুসুমডিঙ্গা। এর জের বানানেও আসে বলে তাঁর ধারণা।

৯.১৬। **অ-কারের 'ও' উচ্চারণ ঃ** লেখক মনে করেন সংস্কৃত কৃষ্ণবাচক 'কাল' কালো লেখা অসংগত। কিন্তু অনেকে বলেন একরূপ অথচ ভিন্নার্থক শব্দের প্রভেদ রাখবার জন্য এরূপ বানানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, লেখক এই প্রভেদজ্ঞানের জন্য বয়স্থ পাঠকের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী।

১৭। **এ র য়্যা উচ্চারণ ঃ** বাংলায় এ্যা বা অ্যা সমস্যাটি নিতান্তই উৎকট। হেনরী ও হেরিসন উভয় নামে 'হে' একভাবে উচ্চারিত হয় না।

১৮। **উচ্চারণানুযায়ী বানান ঃ** লেখক একাধিক উদাহরণযোগে উচ্চারণানুযায়ী বানানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, উচ্চারণানুযায়ী বানান চালু হলে কোন্ অঞ্চলের উচ্চারণকে আদর্শ ধরতে হবে তা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কানে যে ধ্বনিগুলি বাজে, সেরকম সূক্ষ্মধ্বনি বোঝাতে গেলে Phonograph (ফনোগ্রাফ)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া উচ্চারণানুযায়ী বানান শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানে বিঘ্ন ঘটায়।

এই আলোচনার মাধ্যমে লেখক বানান-সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'সাহিত্য' পত্রিকার এই প্রবন্ধ লেখার পূর্বে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকার কার্তিক ও ফাল্গুন সংখ্যায় লেখক 'পঞ্চস্বর' ও 'চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন'-শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধদুটি সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সমস্যাগুলি সম্পর্কে লেখক যে সমাধান সূত্র দিয়েছেন তার সঙ্গে পূর্বের প্রবন্ধের আলোচনার বিরোধ লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

'চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন' প্রবন্ধে লেখকের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল ং এবং ঃ বর্জন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সমাস ও সন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গ বিসর্জনের ফল শোচনীয় বলে মনে করেন।

'পঞ্চস্বর' প্রবন্ধে লেখক সমস্ত দীর্ঘস্বরগুলি অনাবশ্যক বলে মনে করেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ব্যুৎপত্তি অনুসারে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্থির করা সঙ্গত মনে করেছেন। অর্থাৎ দীর্ঘ স্বর বাদ দেন নি।

'চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন' প্রবন্ধে য, ণ, অন্তঃস্থ ব, শ, ষ— ইত্যাদি বর্ণগুলি পুরোপুরি বর্জন করেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ য, ন-ণ, বর্গীয় ব-অন্তঃস্থ ব, স-শ-ষ নির্ধারণ করা সঙ্গত মনে করেছেন। সুতরাং বোঝা যায় এখানে কোনো বর্ণই বাদ দেন নি।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় লেখকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রমশ বানান সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশও লক্ষ করা যায়।

১০। বাঙ্গালা শব্দ তথা বানান ও লিখন সমস্যা। সতীশচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ঃ বর্ষ—১৩১৯ (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ)। সংখ্যা—২ ; পৃষ্ঠা—৭৯-৯৩।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় লেখেন 'বাংগলা অক্ষর' প্রবন্ধটি (পৃষ্ঠা—৪৭১-৪৭৭)। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুধীজনের মতামত প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৯ বর্ষ ; সংখ্যা—২) শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ যোগেশচন্দ্র রায়ের অনুসৃত প্রণালী নিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর ভাবনার সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে দেওয়া হল।

১০.১। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু মনে করেন সংস্কৃত অক্ষরের যথাযথ ধ্বনি বাংলায় নেই। তবু বর্তমানকালের ধ্বনি অনুসারে বর্ণবিন্যাস করলে পরবর্তীকালে ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। (যোগেশবাবু নিত্ত", "ভ্রিত্তু", "রিদয়", "অনুখ্খন" প্রভৃতি বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী)। এভাবে বর্ণবিন্যাস করলে সংস্কৃত থেকে শব্দগুলি সরে আসবে। তাঁর মতে "খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসাধ্য পরিমাণে তাবৎ সংস্কৃতসূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য।"

১০.২। যোগেশবাবু ঙ, ঞ, ণ ইত্যাদি স্থলে একমাত্র "লুপ্ত চিহ্ন (০)" ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। এর বিরোধিতা করে সতীশবাবু বলেন ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতি বর্ণ অনুনাসিক হলেও ভিন্ন ধ্বনিদ্যোতক। সেক্ষেত্রে একমাত্র "(০) লুপ্তচিহ্ন" দ্বারা সকল বর্ণের উচ্চারণ জানানো সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে তিনিও অনুস্বারের আলগা লেজটা ফেলে দিতে স্বীকৃত আছেন এবং ম্-এর স্থলে অনুস্বার বা লাঙ্গুলহীন শূন্য বসাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

১০.৩। যোগেশবাবু সংস্কৃত শব্দাবলির রেফ্-ভারাক্রান্ত অক্ষরগুলির দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাব করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মন্তব্য : মত্ত, লজ্জা, সম্মান প্রভৃতি শব্দ যখন রয়েছে তখন "মাথায় ভার দিয়া বনিয়াদ হাল্কা করিবার প্রস্তাব" অবৈজ্ঞানিক। সংস্কৃতমূলক অপভ্রষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল রক্ষাই কর্তব্য বলে মনে করেন প্রবন্ধকার।

১০.৪। খাঁটি 'বাঙ্গালা' শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস করলে কোন্ স্থানের উচ্চারণকে ষ্টান্ডার্ড ধরা হবে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সর্বানুমোদিত একটি স্টান্ডার্ড 'বাঙ্গালা অভিধান' তৈরি করা উচিত বলে তিনি মনে কনে।

১০.৫। বিদেশি শব্দ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য "যথাসম্ভব উচ্চারণের সহিত লিখনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই তাঁর মতে, gas, office, Lantern, company প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে গ্যায, অফিস, লেন্টার্ণ, কোম্পেনী আকারে লেখাই সঙ্গত।

১০.৬। যোগেশবাবু বর্ণসংস্কারের তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১। বর্ণসংখ্যার ন্যূনতাসাধন, ২। কতকগুলি বর্ণের রূপান্তরবিধান, ৩। কতিপয় নূতন বর্ণের প্রচলন। এ প্রসঙ্গে লেখক তাঁর মন্তব্য জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করেছেন।

বর্ণসংখ্যার বাহুল্যে বানান-শিক্ষায় সময় নষ্ট হয় না বরং এর উপর বানান-সৌকর্য নির্ভর করে বলেই সতীশবাবু মনে করেন। তাছাড়া বাংলার সাধারণ উচ্চারণে ঈ, ঊ, ঋৃ, ঌ, ৯ৢ, ঋ ী, ঙ, ঞ, ন (যে কোনো এক) শ, স, ষ প্রভৃতি বর্ণ অনাবশ্যক হলেও সংস্কৃতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য এগুলির অভ্যাস দরকার। যোগেশবাবুর আ, ই, ঈ, উ, ঊ প্রভৃতি বর্ণের স্বাধীন রূপের পরিবর্তে মাত্র া, ি, ী, ু, ূ ইত্যাদি রাখার প্রস্তাবে নানা স্থানে বিপর্যয় ঘটবে বলে মনে করেন। ইহ কে হি পড়তে হবে।

বর্ণমালার রূপান্তরসাধন প্রসঙ্গে যোগেশবাবু অন্তঃস্থ ব, র, য প্রভৃতি বর্ণ দেবনাগরীর অনুরূপ করতে চান। তবে সতীশবাবু মনে করেন অন্তঃস্থ ব দেবনাগরীর মতো व দ্বারা বোঝানো হলে উচ্চারণ-সমস্যা সৃষ্টি হবে। বরং দেবনাগরী ব-এর পরিবর্তে বাংলা ব-এর মাত্রাটি ফেলে দিলে রূপান্তর সহজ হয় বলে তাঁর মত। র-এর নাগরী-রূপ নিষ্প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেছেন। য-এর নাগরীরূপ প্রবর্তনও তাঁর কাছে অর্থহীন। কারণ এতে যে অসুবিধা থেকে উদ্ধার পেতে য-য় দুই অক্ষর সৃষ্টি হয়েছে সেই অসুবিধাই পুনরায় সৃষ্টি হয়।

স্বর ও ব্যঞ্জন সংযোগে অক্ষরের রূপান্তর তিনিও চান। যেমন ই-কার ব্যঞ্জনের বামে না বসিয়ে তিনি ই-কারের দন্ডটি ত্যাগ করে শুধু ধনুকটি (⌒) বর্ণের মাথায় দেবার পক্ষপাতী। কারণ তা না হলে 'কি' শব্দটিকে ইক্ পাঠের সম্ভাবনা তবে থাকে। এ-কারকে বর্ণের পশ্চাদ্ভাগে দেবার প্রস্তাব রেখেছেন। উ বা ঊ কার প্রসঙ্গে যে ব্যবস্থায় অধিক অক্ষরকে নিয়মিত করা যায়, অথচ লিখতেও সুবিধা থাকে তিনি সেই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তিনি হু এবং হ্ন-এর

স্বতন্ত্র রূপ তুলে দিতে চান। কারণ যে চিহ্নের দ্বারা উ-কার বোঝানো হচ্ছে তার দ্বারা ঋ কার বোঝাতে গেলে ভুল হতে পারে। ব্যঞ্জন সংযোগের ক্ষেত্রে স্ক, ঙ্গ, ট্র, জ্ঞ, ন্ড, ষ্ণ ও খ, হ্ন ম্ম ক্ষ এই কয়েকটি সংযুক্ত আকার প্রচলিত আছে। এর মধ্যে স্ক ও এবং খ অক্ষরে আদ্যাংশ এবং ষ্ণ ট্র, ঞ্চ, হ্ন অক্ষরে শেষাংশ অস্পষ্ট। উভয়ক্ষেত্রেই বিকৃতাংশকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করার প্রস্তাব রেখেছেন। তবে ঙ্গ, ম্ম, ক্ষ অক্ষর পরিবর্তন নিষ্ফল বলেই মনে করেন।

নতুন বর্ণের প্রচলন করতে গিয়ে যোগেশবাবু ়, —, ৗ, ', ০ এই পাঁচটি চিহ্নের প্রস্তাব দিয়েছেন। যেহেতু আমাদের অধিকাংশ শব্দের শেষে অ-কারহীনতা রয়েছে, সেজন্য সতীশবাবু অযথা হসন্ত চিহ্নের বাড়াবাড়ি না করে পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। তবে যেক্ষেত্রে অর্থবোধে বিঘ্ন হতে পরে সেক্ষেত্রে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন কখন-কখন্ ইত্যাদি। অকারের বর্তমানতা বোঝাতে যোগেশবাবু ব্যঞ্জনকে (—) চিহ্ন দ্বারা নিম্নরেখ করতে চান। এক্ষেত্রে সতীশবাবু পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর ছেড়ে দিয়ে নিম্নরেখা দ্বারা অক্ষরের টানা উচ্চারণজ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। যেমন 'ওহো কোথায় গেলে।'

ঈষৎ উচ্চারণ বোঝাতে ঈষৎভাবে উচ্চারিত বর্ণের মাথায় ˆ কোণ চিহ্ন দেবার প্রস্তাব করেছেন। পূর্ববর্তী স্বরের পুনরুচ্চারণ বোঝাতে লুপ্তভাবে কমা চিহ্নটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন, যেমন নাভি—না'ই। যে বর্ণের উপর উচ্চারণে জোর পড়বে সেই বর্ণের উপর ° বসানোর প্রস্তাব করেছেন। যেমন স°লা (পরামর্শ)।

শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষের এই প্রস্তাবগুলির পবিপ্রেক্ষিতে কিছু বলার থেকে যায়। যেমন— "খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসাধ্য পবিমাণে তাবৎ সংস্কৃত সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য"—এই প্রস্তাব কতদূর গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কারণ যেক্ষেত্রে তৎসম শব্দগুলির সরলীকরণের প্রচেষ্টা চলছে সেক্ষেত্রে খাঁটি বাংলা শব্দগুলিকে পুনরায় সংস্কৃত অনুশাসনে বেঁধে প্রবাহের প্রতিকূলে চলা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না।

ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতি স্থলে যোগেশবাবুর প্রস্তাবিত 'লুপ্ত চিহ্ন' '৹' ব্যবহারের বিরোধিতা করে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সংগত।

রেফ্ ভারাক্রান্ত শব্দগুলির দ্বিত্ব বর্জনের বিরোধিতা করে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ কার্য্য-কার্য, দুর্ল্লভ-দুর্লভ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কারও ব্যক্তিগত উচ্চারণে তারতম্য থাকলেও বাংলার মান্য উচ্চারণে কোনো প্রভেদ ধরা পড়ে না। তাছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব যখন বিকল্পে সিদ্ধ, তখন সরলীকরণের জন্য রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনই শ্রেয়।

সংস্কৃতমূলক অপভ্রষ্ট শব্দ এবং খাঁটি দেশি শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই স্থানভেদে ভিন্ন উচ্চারণহেতু পৃথক হয় ঠিকই, কিন্তু কোনো আঞ্চলিক উচ্চারণ ভাষায় মান্য রূপে গৃহীত হবে না। ভাষার যে স্ট্যান্ডার্ড বা মানায়িত উচ্চারণ, বানান সেই অনুসারে হবে।

বিদেশি শব্দ সম্পর্কে উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেখার প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য। তবে লেখক যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তাতে উচ্চারণের সঙ্গে সামাঞ্জস্য কতটা রক্ষিত হয়েছে

তা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। যোগেশবাবুর প্রস্তাবিত বর্ণসংখ্যার ন্যূনতাসাধন সম্পর্কে সতীশবাবুর প্রস্তাব পুরোপুরি মানা যায় না। কারণ বর্ণসংখ্যার বাহুল্যের উপর বানানসৌকর্য যেমন নির্ভর করে, তেমনি একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বানানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বাংলায় ৠ ঌ ইত্যাদি বর্ণের ব্যবহার যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, তখন শুধু সংস্কৃতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য বাংলার বর্ণমালায় এদের অনুপ্রবেশ ঘটানো যুক্তিহীন। তবে স্বরবর্ণের স্বাধীনরূপের পরিবর্তে তাদের মাত্রাচিহ্ন বর্ণমালায় রাখার যে প্রস্তাব যোগেশবাবু রেখেছেন সতীশবাবু তার বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতা আমরাও করি।

বর্ণমালার রূপান্তর প্রসঙ্গে যোগেশবাবুর প্রস্তাবিত অন্তঃস্থ ব, র, য-এর নাগরীরূপ প্রবর্তনের বিরোধিতা করে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য। অন্তঃস্থ ব বোঝাতে নাগরী রূপের পরিবর্তে মাত্রাহীন ব-এর যে প্রস্তাব বর্তমান লেখক দিয়েছেন তাও ভেবে দেখার মতো। তবে যে যুক্তিতে ই-কারের দণ্ডটি ত্যাগ করে তিনি ধনুকটি বর্ণের মাথায় দিতে চান তা ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ই-কার বা এ-কারের বসার স্থানটিকে কেন্দ্র করে বানানে খুব একটা বিভ্রান্তি আসে না। তাই অযথা অভ্যস্ত সংস্কাবে ঘা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যুক্তিহীন। হু ও হৃ-এর স্বতন্ত্ররূপ তুলে দেবার এবং কিছু কিছু যুক্তব্যঞ্জনের রূপটি স্পষ্ট করার প্রস্তাবটি যুক্তিগ্রাহ্য।

নতুন বর্ণের প্রচলন করতে গিয়ে যোগেশবাবু পাঁচটি চিহ্নের প্রস্তাব রেখেছেন। সেক্ষেত্রে হসন্ত চিহ্ন সম্পর্কে সতীশবাবুর ধারণাটি গ্রহণযোগ্য। তবে অ-কারের বর্তমানতা বোঝানোর পরিবর্তে অক্ষরের টান বোঝানোর জন্য সতীশবাবু বর্ণকে নিম্নরেখ করতে চান। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় অক্ষরে টান বোঝানোর জন্য পাঠকের সহজ জ্ঞানই যথেষ্ট। অযথা নিম্নরেখা নিষ্প্রয়োজন। ঈষৎ উচ্চাবণ বোঝাতে গিয়ে যদি ঈষৎ উচ্চারিত বর্ণের মাথায় '^' চিহ্ন দিতে হয়, তবে পুনরায় কিছু টাইপকেস বাড়াতে হবে। এমনিতেই যেমন বিপুল টাইপকেস রয়েছে তার উপর এই নতুন সংযোজন যুক্তিহীন। তবে পূর্ববর্তী স্বরের পুনরুচ্চারণ বোঝাতে লুপ্তভাবে কমাচিহ্নের (') ব্যবহারের প্রসঙ্গটি বিবেচনাসাপেক্ষ। বানানে যে বর্ণের উপর শ্বাসঘাত পড়ে তা শব্দটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। অযথা এত চিহ্নের ব্যবহারে জটিলতা বাড়বে বলেই মনে হয়।

১১। বাঙ্গালা অক্ষর। সারদাকান্ত সেন।

প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ২৩৮।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সারদাকান্ত সেনের 'বঙ্গাক্ষর সহজ করিবাব প্রস্তাবে'র সমালোচনা করেন যোগেশ চন্দ্র রায়। এর প্রত্যুত্তরে সারদাকান্ত সেন 'বাঙ্গালা অক্ষর" প্রবন্ধটির অবতারণা করেন। এই প্রবন্ধে লেখকের ভাবনার সংক্ষিপ্ত রূপটি হল—

১১.১। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও ৪৯টি মূল বর্ণ ধরে নিলেও তাব জন্য ৪৯টি অক্ষরই যথেষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে ৪৯০টি অক্ষর শিখতে হয় কেন?

১১.২। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির সঙ্গে লুপ্ত অ (২) যোগে মহাপ্রাণ গঠিত হতে পারে। যেমন ঃ ক২ = খ২ চ২ = ছ ; ত২ = থ ; ট২ = ঠ ইত্যাদি।

১১.৩। স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না। তাই ব্যঞ্জনগুলির নাম ও উচ্চারণ অ-কারান্ত না হয়ে অ-কারাদ্য ও হলন্ত করার প্রস্তাব করেছেন। যেমন : অক্, অখ্ ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেছেন, বাংলা ভাষায় এত অক্ষর-আধিক্যের কারণ যুক্তাক্ষর। প্রাচীনকালে সময় বাঁচানোর জন্য যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে যুক্তাক্ষর নিষ্প্রয়োজন। যুক্তাক্ষর বর্জনের জন্য লেখক প্রস্তাব করেছেন—বাংলায় অ-ছাড়া সমস্ত স্বরবর্ণের একটি করে কার-চিহ্ন আছে। বর্তমান আ-কার চিহ্ন অ বর্ণে দিয়ে আ বর্ণের জন্য দুটি অ-কার গ্রহণ করা চলতে পারে। তাছাড়া অ এবং আ বর্ণের কার চিহ্ন কেবল থাকবে। অপর সমস্ত স্বরাক্ষর অখণ্ডরূপে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হবে। ব্যঞ্জনবর্ণের কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না। অক্ষরগুলি পাশাপাশি বসবে। কেবল তিনটি যুক্তাক্ষর থাকবে—শ্রী, জ্ঞ, ক্ষ। উদ্ভাবিত প্রণালী —শ্রী যওগএশ চনদরা বইদযানইদহই। (শ্রী যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি)।

এই প্রবন্ধে সারদাকান্তবাবুর প্রস্তাবগুলি পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। যে কোনো সংস্কারের ক্ষেত্রেই মনে রাখা প্রয়োজন সংস্কার কবা অংশটি যাতে গ্রহণযোগ্য হয়। লেখক শুধু অক্ষরসংখ্যা হ্রাসের জন্য যুক্তাক্ষর বর্জনের কথাই ভেবেছেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত প্রণালীতে অক্ষরবিন্যাসেব অসুবিধাগুলি ভাবেন নি। প্রথমত, সারদাকান্তবাবুব প্রস্তাবিত পন্থায় বাংলা বানান লেখা হলে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় দ্বিগুণ সময় ও স্থান প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সময়ের কথা না ভাবলেও স্থানেব কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ আকৃতি অনুসারে মুদ্রিত গ্রন্থের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, ক, খ-এব পরিবর্তে অক্, অখ্ লেখা হলে অক্ষবগুলির উচ্চাবণই বদলে যাবে।

তৃতীযত, অক্ষবসংখ্যা হ্রাসের জন্য অল্পপ্রাণ বর্ণের সঙ্গে লুপ্ত অ-কার যোগ করে মহাপ্রাণ লিখতে চান। অর্থাৎ কহ্ - খ, তহ-থ ইত্যাদি। কিন্তু শিশুশিক্ষার্থীব পক্ষে কীভাবে অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বর্ণ বোঝা সম্ভব?

চতুর্থত, বলা যায় লেখকের নিজস্ব ভাবনার মধ্যেই অসংগতি রয়েছে। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবে খ-এর পরিবর্তে কহ লেখার কথা বলেছেন। আবাব তৃতীয় প্রস্তাবেই ক, খ- অক্ষরকে অক্, অখ্ লেখার কথা বলেছেন। তাহলে মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কীভাবে লেখা হবে? অর্থাৎ খ অক্ষরটি কহ লেখা হবে, না অখ্ লেখা হবে? পবিশেষে বলা যায়, তাঁব প্রস্তাবগুলি ফলপ্রসূ তো নয়ই বরং অবৈজ্ঞানিক।

১২। প্রবাসী : ফাল্গুন ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৫২৮।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে 'প্রবাসীতে নূতন বানানের প্রবর্তন' অংশে (পৃষ্ঠা ৫২৮) লেখক বীবেশ্বর সেন কয়েকটি প্রচলিত বানানের পরিবর্তিত রূপ তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ শোয়া, খোয়া, গোযালা ইত্যাদি বানানের পরিবর্তে শোআ, খোআ, খাত্তা, দাত্তা ইত্যাদি বানানের পক্ষপাতী।

১৩। বাঙ্গলা ভাষা। বীরেশ্বর সেন।

প্রবাসী : চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৫৫৬।

এই প্রবন্ধে লেখক ভাষা-সংক্রান্ত একাধিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে শুধু বানান সম্পর্কিত আলোচনাগুলি বিশ্লেষণ করা হল ঃ

১৩.১। **বাঙ্গলা শব্দটির পাঁচটি বানান প্রচলিত রয়েছে—বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংগলা বাংলা।** এর মধ্যে কোন্ বানানটি সাহিত্যে ব্যবহার করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'বাঙ্গালা' শব্দে মধ্যবর্তী 'আ' কারের উচ্চারণ আমরা করি না। তাই বাঙ্গালা লেখা অনুচিত। বাঙ্গলা ও বাংগলা- এই দুটির মধ্যে প্রথমটি অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে লেখা যায় তাই বাংগলা পরিত্যাজ্য। 'বাংলা' শব্দটিও সাহিত্যে অচল, কারণ সংস্কৃত অনুস্বারের উচ্চারণ এক এক স্থানে এক একরকম। অবশিষ্ট বাঙ্গলা ও বাঙলার মধ্যে মূল বঙ্গ শব্দে যেহেতু ঙ্গ আছে, তাই মূলের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে 'বাঙ্গলা' বানানটি সাহিত্যে প্রচলিত হওয়া উচিত বলে লেখক মনে করেন। এছাড়াও তিনি শিলঙ দারজিলিঙ বানান লেখার পক্ষপাতী। ইংরেজ শব্দটিও ইঙরেজ বা ইঙ্গরেজ লিখতে চান।

১৩.২। **বাঙ্গলায় বিসর্গবর্জ্জনের প্রস্তাব ঃ** সংস্কৃতে নিয়ম আছে যেক্ষেত্রে বিসর্গের উচ্চারণ হয় না, সেক্ষেত্রে তা লিখিতও হয় না। বাংলাতে এই নিয়ম মানা উচিত বলে তিনি মনে করেন। বস্তুত বাংলায় ক, খ, প, ফ, শ, ষ, স এই কয়েক বর্ণের পূর্বের বিসর্গ রেখে আর সবক্ষেত্রে বিসর্গ বিসর্জন সংগত মনে করেন।

বীরেশ্বর সেনের প্রথম প্রস্তাবের উত্তরে বলা যায়, তাঁর ভাবনার মধ্যেই স্ববিরোধ রয়েছে। তিনি সাহিত্যে 'বাঙ্গলা' বানানটি চালু করতে চান। কিন্তু যে যুক্তিতে তিনি 'বাঙ্গালা' বানানটি ত্যাগ করতে চান সেই একই যুক্তিতে বাঙ্গলা বানানটিও পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ 'বাঙ্গালা' বানানে যখন মধ্যবর্তী আ-কারের উচ্চারণ হয় না বলে পরিত্যাগ করা হচ্ছে তখন 'বাঙ্গালা' বানানটির মধ্যবর্তী 'ঙ্গ' ধ্বনিটির উচ্চারণ হয় না বলে তা-ও পরিত্যক্ত হবে। ধ্বনিগত দিক থেকে 'বাঙলা' বানানটি রাখাই সংগত। সরলীকরণের জন্য বাংলাও চলতে পারে। তবে মূলের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে 'বাঙ্গলা' বানান প্রণয়নের ভাবনাটি অসংগত। 'বাঙ্গলা' না লেখার পেছনে আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন ঃ

(ক) সাহিত্যে বাঙলা বানানটি 'বাঙ্গলা' লেখা হলে বাঙালী বানানটি বাঙ্গালী লিখতে হবে যা পুরোপুরি উচ্চারণবিরুদ্ধ।

(খ) বীরেশ্বর সেন যখন শিলঙ, দারজিলিঙ বানানে ঙ রাখতে চান তখন বাঙ্গলা না লিখে বাঙলা লিখলেই বরং শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

(গ) মধ্যবর্তী অ-কারের উচ্চারণ হয় না বলে 'বাঙ্গালা' বানানটি যদি পরিত্যাগ করি তবে বানানটি করতে হবে বাঙ্গ্লা, বাঙ্গলা নয়।

তাঁর বিসর্গ বিসর্জনের প্রস্তাবটি প্রাথমিকভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটির প্রস্তাবে এই নীতির যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে (প্রথমত, ইতস্তত)। কিন্তু বিসর্গ বিসর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যে শর্তটি আরোপ করেছেন তার স্বরূপটি ঠিক স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতা তাঁর চিন্তার দুর্বলতাকেই পরিস্ফুট করে।

১৪। বাংলা বানান। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী : বৈশাখ১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৭৮।

১৩২২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে বীরেশ্বর সেনের "বাঙ্গলা ভাষা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে "বাংলা বানান"

প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি কেন "বাংলা" বানানটি লেখেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকেই তদ্ভব শব্দের বানান কেমন হবে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বীরেশ্বরবাবুর প্রবন্ধটির 'বাঙ্গলা না বাংলা" অংশটি পড়লেই বোঝা যায়, তিনি মূল শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তদ্ভব শব্দের বানান প্রচলনে আগ্রহী। তাই 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু বাঙ্গলা বানানটির সাহিত্যে প্রচলন চান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলা'-এই বানানের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, যদি মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তদ্ভব শব্দের বানান প্রবর্তন করতে হয় তবে 'বানান - মহলে' হুলস্থুল পড়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শাঁখ, আঁক, চাঁদ ইত্যাদি বানান পরিবর্তন করে লিখতে হবে শাঙ্খ্, আঙ্ক্, চান্দ্ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ আছে সেসবক্ষেত্রে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানতেই হবে. কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানে সংস্কৃতের শাসন টেনে আনা যুক্তিহীন। তিনি কান, সোনা প্রভৃতি বানানের পক্ষপাতী। তাঁর বক্তব্য, "বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়াম বহন করিতে পারে, হাটে বাজার তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়।"

এই প্রবন্ধের মধ্যে বাংলা বানানেব আদর্শ কী হওয়া উচিত তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়। বানান বিষয়টিকে তিনি প্রয়োগগত বাস্তবতার দিক থেকে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। কোনো রকম পূর্বসংস্কার বা হঠকারী পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি।

১৫। বঙ্গভাষায় অতিচার। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

প্রবাসী : আষাঢ়১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০৬।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রবাসীতে বীরেশ্বর সেন কয়েকটি বানান নিয়ে বিচার কবেছেন। 'বঙ্গভাষায় অতিচার' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

১৫.১। বীরেশ্বর সেনের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ও প্রবাসী সম্পাদকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়— ১। খাওয়া, দাওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়া স্থানে এবং ২। আকারান্ত অন্তঃস্থ ব স্থানে ওা লিখবার প্রস্তাব হযেছে।

এই প্রস্তাব যোগেশচন্দ্র রায় সমর্থন করেননি। তিনি মনে কবেন যে-মূর্তি কেবল ব্যঞ্জনাক্ষবে জুড়বার জন্য চলে আসছে, সেটা স্বরাক্ষরে জুড়তে পারা যায় না। যদি নতুন নিয়ম চালু করা হয় তবে তা অন্য স্বরাক্ষরের ক্ষেত্রেও চালু করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইউরোপ আইন বানানের আকৃতি হবে 'ইুরোপ', 'িআন'। তাঁর মতে, ওআ সংক্ষেপ করার জন্য সাধারণ বিধি ভেঙে লাভ নেই। অন্তঃস্থ ব-জ্ঞাপক অক্ষর চাই। সেটা ৱ হলেও মন্দ হবে না।

১৫.২। য, য়, য়-ফলা—লেখক একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন বাংলায় আদ্যবর্ণের য়-ফলার উচ্চারণ বাঁকা এ। বাঁকা এ ধ্বনিতে এ-র সঙ্গে আ মিশে থাকে। যোগেশচন্দ্র মনে করেন ্যা-এই দ্যোতক য়া দ্যোতকের সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দের আদিতে এ, এ্যা, অ্যা, এ্যা, য়্যা প্রভৃতি যথেচ্ছ লেখা হবে কিন্তু শব্দের মধ্যে য়া লেখা হবে—এরূপ লেখা ভাষায় অবিচার হবে। সুতরাং এ আ মিলিয়ে এমন নতুন অক্ষর চাই যা শব্দের আদ্যে ও মধ্যে বসতে পারবে।

য় নিয়েও বঙ্গভাষায় অতিচার হচ্ছে। আদ্যক্ষরে য় নেই। তাই য়ু হু দী, য়ুরোপ না লিখে ইহুদী, ইয়ুরোপ লেখাই কর্তব্য। ইউরোপ লেখা আরও শ্রেয়।

১৫.৩। 'বাঙ্গালা' বানানটি বীরেশ্বরবাবুর মতে অশুদ্ধ, কারণ 'বাঙ্গালা' বানানে মধ্যবর্তী আ রক্ষিত হলেও উচ্চারণে তা অনুপস্থিত। 'বাংলা' বানানটিও তাঁর মতে অচল। কারণ সংস্কৃত অনুস্বরের উচ্চারণ অনির্দিষ্ট। এজন্য তাঁর মতে শুধু 'বাঙ্গলা' বানানটি গ্রহণযোগ্য। কারণ মূল 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

অন্যদিকে যোগেশচন্দ্রের মতে উচ্চারণে অনুপস্থিত এই যুক্তিতে 'বাঙ্গালা' বানানটি অশুদ্ধ নয়। কারণ বাংলা উচ্চারণে মধ্যবর্তী অনেক স্বর লুপ্ত হয়। মূলানুগত্যের যে প্রশ্নটি বীরেশ্বরবাবু তুলেছেন সেদিক থেকেও 'বাঙ্গালা' বানান রক্ষণীয়, কারণ 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গেই বাঙ্গালার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গ + আল = বঙ্গাল + অ = বঙ্গালা > বাঙ্গালা।

দ্বিতীয়ত মধ্যস্বরলুপ্তি-সংক্রান্ত বীরেশ্বরবাবুর যুক্তি মানলে বানান হওয়া উচিত 'বাঙ্গ্‌লা' 'বাঙ্গলা' নয়, কারণ 'বাঙ্গালা'-র মধ্যবর্তী 'অ' লুপ্ত হলে শব্দটি 'বাঙ্গ্‌লা'--ই দাঁড়ায়। তবে যোগেশচন্দ্র পাশাপাশি 'বাংলা' বানানটিও গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কারণ অনুস্বারের মধ্যে 'গ'-এর ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়।

যোগেশচন্দ্রের প্রথম প্রস্তাবটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। বাস্তবিকই যে মূর্তি কেবল্‌ ব্যঞ্জনাক্ষরে জুড়বার জন্য চলে আসছে সেটি স্বরাক্ষরে জুড়তে গেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে. তবে তিনি অন্তঃস্থ ব-জ্ঞাপক যে অক্ষরটি চালু করার প্রস্তাব করেছেন, সেই অক্ষরটির (ব্‌) সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকায় তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও যুক্তিযুক্ত। সাধারণত শব্দের আদিতে মূল স্বরবর্ণটি বসে, কিন্তু শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সেই বর্ণের কার-চিহ্নটি যুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রেও তাই বাঁকা এ ধ্বনিজ্ঞাপক একটি মূল বর্ণ ও তার একটি কার-চিহ্ন প্রয়োজন।

যোগেশবাবুর তৃতীয় প্রস্তাবটি বিভ্রান্তিকর। তিনি বাঙ্গালা, বাংলা দুটি বানানই শুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু কোন্‌ বানানটির প্রচলন তিনি চান তা তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় না। একটি শব্দ বোঝাতে দুটি বানান থাকলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আমরা সর্বক্ষেত্রে উচ্চারণানুসারী বানান রক্ষা করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে বাঙলা বা বাঙালী বানান বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী লেখাও যুক্তিসংগত নয়।

১৬। বাংলা বানান। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসী : শ্রাবণ,১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৭।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বঙ্গভাষায় অতিচার' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। "বঙ্গভাষায় অতিচার' প্রবন্ধটিতে লেখক বানানে কয়েকটি 'অতিচার' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ও এবং এ-তে আ-কার চিহ্ন দেবার প্রস্তাবকে তিনি অতিচার বলে মনে করেন। তাঁর এই ধারণা সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

১৬.১। যোগেশবাবু অন্তঃস্থ ব-জ্ঞাপক একটি অক্ষর চান। কিন্তু রামানন্দবাবু মনে করেন ইংরাজীতে V এবং W দুটি অক্ষর আছে। যোগেশবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী অন্তঃস্থ ব চালালে সেটি V-এর সমধ্বনিব্যঞ্জক হয়। কিন্তু হওয়া, যাওয়া শব্দের শেষে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা W-এর ধ্বনি, V-এর নয়। তাই বাংলায় ব চালু হলেও, W-এর সমধ্বনিসূচক আর একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হবে। এটি ভেবেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হওা, খাওা লিখতে চান। W-এর উচ্চারণ বোঝাবার জন্য নতুন অক্ষর সৃষ্টি করার চেয়ে তিনি 'ওা' লেখার পক্ষপাতী।

১৬.২। যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ সমালোচকেরা 'ও' বর্ণের সঙ্গে আ-কার যুক্ত করার বিরোধিতা করেছেন। কারণ যে চিহ্ন ব্যঞ্জনাক্ষরে যুক্ত করা হয় সেটি তাঁরা স্বরাক্ষরে লাগাতে চান না। কিন্তু প্রবন্ধকার 'ও' বর্ণকে W-র মতো স্বর ও ব্যঞ্জনের যোগজাত মিশ্রবর্ণ বলে মনে করেন। যোগেশবাবুর মতে দুই স্বরাক্ষর বাংলায় পাশাপাশি বসে না। এই মত খণ্ডন করে রামানন্দবাবু কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন ঃ আইন, ইউ, এই ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'W'-এর উচ্চারণ বোঝাতে 'ওা' বর্ণটি চালু করতে চান। এইরকম বর্ণের প্রয়োগ প্রাচীন পুথিতে কোথাও কোথাও দেখা গেলেও বর্তমানে একেবারেই অপ্রচলিত। তাছাড়া হওয়া, খাওয়া ইত্যাদি বানানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। তাই অপ্রয়োজনে প্রচলিত অভ্যাসকে ভাঙলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সম্ভাবনাই প্রসারিত হয়।

১৭। বাঙ্‌লার বানান সমস্যা। বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

প্রবাসী : ফাল্গুন১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৯।

এই প্রবন্ধে লেখক বিশেষ কয়েকটি বানানের গঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন ঃ

১৭.১। ওয়া-র আ-কারটির উদ্ভব সম্পর্কে লেখক তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, অনট্ প্রত্যযান্ত শব্দগুলি বাংলায় আ-কারান্ত হযেছে। অন-এর ন লোপ পেয়েছে এবং অ স্থানে আ হয়েছে। যেমন ঃ মরণ-মরা, যুবন যুবা। যেমনভাবে খাদন থেকে খাঅন। খাঅন থেকে স্বাভাবিকভাবে বাংলায় খাআ পদ হয়।

যোগেশবাবু মনে করেন, খা-এর পরে আ মিশে খাআ হবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে মাঝে ও বসিয়ে ধাতুর আ থেকে প্রত্যয়ের আ পৃথক করে রাখা হয়েছে। বিধুশেখরবাবু এটিকে নিছক কল্পনা বলে মনে করেন।

W কে বাংলায় ও-চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা সঙ্গত কিনা, সে সম্পর্কে লেখকের অভিমত হল, W এবং ও-এই উভয় বর্ণের ধ্বনি এক নয়। এছাড়া 'W'-র ও যখন বিভিন্ন কার-চিহ্ন বিহীনভাবে থাকবে, তখন সাধারণ ও ধ্বনিজ্ঞাপক ও বর্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এই কারণে W-র ব্যঞ্জকরূপে ও ধরা ঠিক নয়। সংস্কৃত বর্ণমালার কোনো বর্ণকে যদি গ্রহণ করতে হয় তবে তা ব ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ হতে পারে না।

যোগেশবাবু মার এবং মায়ের—উভয়ের মধ্যে মায়ের রাখতে চান। কিন্তু বিধুবাবুর মতে, মাতা থেকে মাআ। তা থেকে মা। মা + এর = মা-এর। এখানে য়-শ্রুতি আছে বলে মনে হয় না, তাই 'য়ের' অপেক্ষা 'এর' লেখায় তাঁর পক্ষপাত বেশি।

বিধুবাবু ঙ্গ স্থানে ঙ লেখার পক্ষপাতী। যেমন ডাঙ্গায় স্থানে ডাঙায়, পিঙ্গল স্থানে পিঙল।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরই যোগেশচন্দ্র রায় প্রবাসীতে প্রকাশ করেন 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা' প্রবন্ধটি (চৈত্র ১৩২৩। পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০১)। এই প্রবন্ধে যোগেশবাবু বিধুবাবুর মতের সমালোচনা করে তাঁর নিজের মতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৮। অক্ষরের আলোচনা। শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রবাসী : ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪৯০।

এই প্রবন্ধে লেখক অক্ষরের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি মনে করেন আ, ঈ, ঊ -এই দীর্ঘ বর্ণগুলি চিত্রিত করার জন্য নতুন অক্ষর না গড়ে হ্রস্ব অক্ষরের গায়ে অতিরিক্ত সোজা বা বাঁকা টান দেওয়া হয়। কিন্তু ও অক্ষরের গায়ে আ কার কিংবা য-ফলা দেবার যে প্রস্তাব তোলা হচ্ছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। অন্য কোনো স্বরবর্ণের গায়ে ফলা জুড়বার প্রথা যখন নেই তখন 'ও' অক্ষরের বেলায় নিয়ম ভাঙলে জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

য় (ই + অ), র (ঋ + অ), ন (ঌ + অ) এবং ব (উ + অ) সবই দুটি করে স্বরবর্ণের মিলনে গঠিত হয়েছে। পরে ব্যঞ্জনের তালিকায় স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশের অক্ষর দিয়ে সংস্কৃত ভাষার ব লেখা চলে না। তাই প্রাচীন বাংলার পেট-কাটা অক্ষরটি চালালে বানানে বেশি গোল হয় না বলে লেখকের ধারণা।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় 'ও' -এর গায়ে া কার চিহ্ন লাগিয়ে অন্তঃস্থ ব বোঝানোর ভাবনাটি সত্যই অসংগত। বাংলাতে অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক বা স্বতন্ত্র উচ্চারণ যখন নেই, তখন তার জন্য একটি পৃথক বর্ণ বরাদ্দ করা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

১৯। বাঙ্গলা বানান সমস্যা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৯৪-৯৭।

এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা হরফে বিদেশি বানান লেখার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্ব-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা তুলে ধরে সম্ভাব্য সমাধানসূত্র দিয়েছেন—

১৯.১। বিদেশি বানান বাংলা অক্ষরে লিখতে গিয়ে এমন কিছু ধ্বনি আসে যেগুলি প্রকাশের উপযুক্ত বাংলা হরফ নেই।

এই সমস্যা সমাধানে সুনীতিবাবুর প্রস্তাব, বিদেশিধ্বনি যথাযথ উচ্চারণ করতে গেলে বাংলা হরফে ফুটকি বা অন্য কোনো চিহ্ন দেওয়া যায়।

১৯.২। বাংলা অক্ষরের আধুনিক উচ্চারণে দুটি ছাড়া আর সব সাধারণ বিদেশি স্বরধ্বনি মোটমুটি জানানো যায়। এই দুটি হল—

(ক) ইংরেজি but, her, sir, son-এর হ্রস্ব আ-কারের মতো ধ্বনি। এগুলি বাংলায় অ, আ, অ্য-তিন উপায়ে লেখা হয়। কিন্তু সুনীতিবাবু 'অ্য' রূপে লেখার পক্ষপাতী। যেমন Burns (ব্যর্‌ন্‌স) Milton (মিল্‌ট্যন) Goethe (গ্যটে)। তবে যেক্ষেত্রে পদের মাঝে স্বরধ্বনির পর য-ফলা যুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনা রোধের জন্য সুনীতিবাবু হাইফেন ব্যবহারের পক্ষপাতী। যেমন ঃ Chatterton-চ্যা-ট্যর্‌ট্যন ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় ধ্বনিটি ফরাসি u এবং 'জ্যর্ম্মান' ue-র ধ্বনি। এটি ই ও উ-এর মাঝামাঝি একপ্রকার ধ্বনি। সুনীতিবাবু বাংলায় এই ধ্বনিটি 'য়ু' দ্বারাই বোঝাতে চান। যেমন Hugo য়ুগো, Murat ম্যুরা ইত্যাদি।

১৯.৩। বিদেশি বানান লিখতে গিয়ে কিছু কিছু ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সুনীতিবাবু নতুন করে জ়, থ় ইত্যাদি হরফ না বানিয়ে ইংরেজি 'ফুলস্‌টপের' সাহায্যে কাজ চালাতে চান। যেমন ঃ

ক. আরবী ঃ 'বড়ী কা.ফ.', কু.ত.বু—দ্দীন

খ. আরবী, ফার্সীর 'খে', জার্মানের ch খ.ল্‌জী : Richter রিখ-ট্যর্.।

গ. আরবী, তুর্কী ও ফার্সীর 'ঘাইন' অক্ষরের ধ্বনি। মোঘ.ল, চিরাঘ্.।

১৯.৪। বাংলা ভাষায় V, W সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, খাঁটি বাংলা কথায় W ধ্বনি সাধারণত আ-কারের পূর্বে পাওয়া যায়। তাই পুরাতন পুথিতে এই wa ওআ, ওা, ওয়া রূপে লিখিত হয়। সুনীতিবাবু মনে করেন এই W-র জন্য নতুন করে র-কে না এনে বাংলায় wa-র ধ্বনি 'ওআ' দ্বারা বেশ চালানো যেতে পারে। তবে 'ওা' যদি বাংলায় চলে তবে বেশি সুবিধা হয়। তাছাড়া ভ-এর মহাপ্রাণ bh ও অন্তঃস্থ V উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষা করার জন্য বিদেশি শব্দে V বোঝাতে বিন্দুযুক্ত ভ (ভ.) ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই প্রবন্ধে সুনীতিবাবু যে সব প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলি সবই ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমাধানসূত্র হিসাবে এগুলি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য. তবে সাধারণভাবে বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে এইসব সূক্ষ্ম নিয়ম সকলে যথাযথ অনুসরণ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাবগুলি যতখানি তাত্ত্বিক, ততখানি ব্যবহারিক নয়।

২০। বাঙ্‌লার বানান সমস্যা। বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

প্রবাসী . আষাঢ়১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ২৬৭।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে বিধুশেখর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্‌লার বানান সমস্যা' (পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৯) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের উত্তরে যোগেশচন্দ্র রায় ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায় ''বাঙ্গালা বানান সমস্যা' নামে প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০১) প্রকাশ করেন। যোগেশ রায়ের এই প্রবন্ধের উত্তরে শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে (পৃ. ২৬৭) 'বাঙ্‌লার বানান সমস্যা' প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে বাংলা অক্ষর ও বানান-সংক্রান্ত কিছু বিশেষ সমস্যা তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

২০.১। অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব-এর পৃথক অক্ষর থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তবে যতদিন না স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে ততদিন বর্গীয় ব-এর জন্য তিনি দেবনাগরী হরফ অনুসারে পেটকাটা 'ৰ' এই হরফটি ব্যবহার করতে চান।

২০.২। লেখক 'বাঙ্‌লা' বানানটি লিখতে চান। কারণ এই বানান ধ্বনির অনুরূপ। ঙ্গ, ঙ্গা-কারে এই ধ্বনি প্রকাশ পায় না।

২০.৩। 'মায়ের' ও 'মাএর'-উভয়ের মধ্যে' লেখক 'মাএর' লেখার পক্ষপাতী। তবে যদি কোনো স্থানের উচ্চারণে য়-শ্রুতি থাকে তবে সেখানে 'মায়ের' হবে।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্যের ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় —

১। বাংলায় অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব-এর পৃথক উচ্চারণ করা হয় না। সুতরাং সংস্কার করতে হলে একটি ব থাকাই বাঞ্ছনীয়। দেবনাগরী অক্ষরের অনুসরণে বাংলা বর্গীয় ব বোঝানোর প্রস্তাবটি যুক্তিহীন।

২। 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' ইত্যাদি বানানের পরিবর্তে 'বাঙ্‌লা' বানান লেখাই যুক্তিসঙ্গত। তবে 'বাঙলা' বানানও চলতে পারে। কারণ হসন্ত না দিয়েও 'বাঙলা' বানানে ঙ ধ্বনির হসন্ত উচ্চারণ আমরা বুঝতে পারি।

৩। ২০.২নং প্রস্তাবে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে লেখক পুনরায় সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে 'মায়ের' ও 'মাএর'-এই দুয়ের মধ্যে 'মা-এর' উচ্চারণই মান্য। সুতরাং বানানও 'মা-এর' হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি এই শব্দের য়-শ্রুতিযুক্ত স্থানিক রূপান্তরকে স্বীকৃতি দিয়ে য়-শ্রুতিযুক্ত বানান 'মায়ের'-কেও গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। একই সঙ্গে বানানের দুরকম আদর্শ নির্দেশ খুবই বিভ্রান্তিকর।

২১। 'বাংলার বেখাপ বর্ণমালা"। শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবুজপত্র ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪৬৭—৪৮১

প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

২১.১। বাংলা কথায় যত রকমের ধ্বনির ব্যবহার হয় বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালা দিয়ে সব সময় তা লেখা যায় না। লেখক মনে করেন, উচ্চারণ হিসাবে একটি বর্ণমালা এবং অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দিয়ে ও প্রয়োজনীয় বর্ণ সংযুক্ত করলেও চল্লিশটি (প্রচলিত) অক্ষরের কমেই কাজ চলে। আলোচনার সুবিধার্থে লেখক এদের নয়টি বর্গে ভাগ করেছেন।

১।	ক-বর্গ	—	ক, খ, গ, ঘ।	....	৪
২।	চ-বর্গ	—	চ, ছ, জ, ঝ।	....	৪
৩।	ট-বর্গ	—	ট, ঠ, ড, ঢ।	....	৪
৪।	ত-বর্গ	—	ত, থ, দ, ধ।	....	৪
৫।	প-বর্গ	—	প, ফ, ব, ভ।	....	৪
৬।	ঁ-বর্গ	—	ঁ, ন, ম, ঙ। (ং হসন্ত ঙ মাত্র)	....	৪
৭।	য়-বর্গ	—	য়, র, ল, ড়, ঢ়, ৰ (W)।	....	৬
৮।	শ-বর্গ	—	শ, স, চ় (ts), জ় (z)।	....	৪
৯।	হ-বর্গ	—	হ, খ়, ফ, ভ়।	....	৪
			(ঃ = হসন্ত হ)		৩৮

লেখক মনে করেন প্রথম পাঁচটি বর্গের অক্ষর ঠিকই আছে। বাকি বর্গগুলি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ

ঁ-বর্গ ঃ এই বর্গে ঁ, ন, ম এর উচ্চারণ রয়েছে। ঞ, ণ-এদের পৃথক উচ্চারণ নেই তাই বাদ দেওয়া হয়েছে।

য়-বর্গ ঃ য ও জ এর উচ্চারণ বাংলায় অভিন্ন তাই য বাতিল। য় উচ্চারণ বাংলায় বহু রয়েছে। তাছাড়া "ও আর য় মিলিয়ে এ শব্দটাকে জবড়জং করে না লিখে ৰ দিয়ে লিখলেই তা বেশ পরিষ্কার হয়—যেমন ঃ মারৰাড়ী, কাবুলিৰালা।"

শ-বর্গ ঃ ষ এর উচ্চারণ বাংলায় নেই। তবে ইংরেজি বানান বাংলায় লিখতে 'স'-এর ব্যবহার গ্রহণীয়। তবে দন্ত্যস-র জায়গা বাদ দিলে সর্বত্র শ-র ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কলকাতার ভাষায় সাধু ভাষার ছ্ চ হয় যেমন, চলিয়াছি থেকে চলেচি। সেই চ এর উচ্চারণ চ় (ts) হয়। জ় (z) বর্ণেরও প্রয়োজন আছে সাজতে (Shazte) বুঝতে (buzte), মেজদা (mezda) ইত্যাদি বানান লেখার জন্য।

হ্ বর্গ ঃ বাংলায় ভ়, য়, খ় বর্ণগুলি যে ধ্বনি জ্ঞাপন করে তার ব্যবহার কম হলেও আছে। আর আছে বলেই বর্ণমালায় এগুলির সংযোজন প্রয়োজন।

২১.২ স্বরবর্ণ ঃ

বাংলার প্রচলিত স্বরবর্ণের বর্ণমালা সম্পর্কেও লেখকের অভিযোগ রয়েছে। তাঁব বক্তব্য যুক্তস্বব দুটি (ঐ, ঔ) বর্জন করা উচিত। আই, উই, এই—ইত্যাদি ক্ষেত্রে যখন যুক্তস্বর নিষ্প্রয়োজন তখন ওই আর ওউ শুধু এই দুটি ক্ষেত্রের জন্য যুক্তস্বর রাখা নিষ্প্রয়োজন।

রি, লি দ্বারা যখন কাজ চলে তখন ঋ, ঌ বর্ণমালায় রাখা নিষ্প্রয়োজন।

ই, উ-র যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে তেমনি অন্য অক্ষরেরও আছে। সেক্ষেত্রে যখন ভিন্ন অক্ষর দবকার হয় না তখন এক্ষেত্রেও অপ্রয়োজন।

বাংলা স্বরবর্ণের যে তালিকা দেওয়া হল সেক্ষেত্রে স্বরের দৈর্ঘ্য দুরকমের--১। টানে, ২। ঝোঁকে।

অ	—	হ্রস্ব	—	কত, কথা।
		দীর্ঘ	—	ছল, দল।
		চাপা	--	আপনি, আমরা।
আ	—	হ্রস্ব	—	আমি, রোগা।
		দীর্ঘ	—	গাছ, বাড়ী।
ই	—	হ্রস্ব	—	চিঠি, পাই, সতী।
		দীর্ঘ	—	তিন, দীন।
		অস্ফুট	—	কাইল, বাইক্ক।
উ	—	হ্রস্ব	—	সাধু, তূলা।
		দীর্ঘ	—	চুল, রূপ।
এ	—	হ্রস্ব	—	একটু, বেদানা।
		দীর্ঘ	—	বেদ, ক্লেশ।
অ্যা	—	হ্রস্ব	—	ব্যস্ত, ত্যাজ্য।
		দীর্ঘ	—	•এক, ত্যাগ।

লেখক মনে করেন, বাংলায় মাথায় • দিয়ে চাপা অ আর মাথায় ‿ দিয়ে খোলা এ চিহ্নিত হতে পারে। এছাড়া প্রয়োজনমতো য়ুরোপীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাধারণ চিহ্ন ব্যবহার করলে বাংলা স্বরলিপিকে আর পিছপা থাকতে হয় না।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে লেখক মূলত বাংলা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিছু নতুন বর্ণ সংযোজন করেছেন, কিছু বর্জন করেছেন। লেখকের চিন্তা-ভাবনা অত্যন্ত আধুনিক ঠিকই, তবে তাঁর সব প্রস্তাব পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়।

লেখক বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে যেভাবে সাজিয়েছেন তা যুক্তিপূর্ণ। তাঁর প্রস্তাবিত নতুন বর্ণগুলি বর্ণমালায় স্থান পেলে বেশ কিছু বহুল প্রচলিত ধ্বনি প্রকাশের ক্ষেত্রে আর অসুবিধায় পড়তে হয় না। তবে লেখকের প্রস্তাবিত হ বর্গের শেষের তিনটি বর্ণ না থাকলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ এর প্রয়োগ মানায়িত উচ্চারণে খুবই কম। যাই হোক, এই বর্ণগুলি বর্ণ-মালায় স্থান পেলে প্রচলিত অভ্যাসে সাময়িকভাবে আঘাত লাগলেও পরিণামে সুফল পাওয়া যাবে।

তবে স্বরবর্ণ প্রসঙ্গে লেখকের ভাবনা পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। যুক্তস্বরগুলি এবং ঋ, ৯ তুলে দিলে বিশেষ অসুবিধা হয় না ঠিকই, তবে ই, উ-এর দীর্ঘ রূপ তুলে দেওয়া যাবে কিনা তা ভাবনাসাপেক্ষ। কারণ প্রচলিত অভ্যাসে বড় রকমের ঘা দিয়ে রাতারাতি কোনো নিয়ম চাপাতে গেলে তা সমস্যা কমাবে না, বরং বাড়াবে। তাছাড়া লেখক টান ও ঝোঁকের ভিত্তিতে তাঁর প্রস্তাবিত স্বরবর্ণগুলির আবার হ্রস্ব-দীর্ঘ ভাগ দেখিয়েছেন এবং এগুলি বোঝাবার জন্য বিভিন্ন মাত্রাচিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব রেখেছেন। এটি নিত্য ব্যবহারের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই ধরনের ধ্বনিগত প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে বিশেষভাবে লক্ষ না করলে ধরা পড়ে না। তাছাড়া এর জন্য যখন বানানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না, তখন অযথা ভার বাড়ানো যুক্তিহীন।

২২। বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব। শ্রী অবনী মোহন চক্রবর্তী
ভারতী ঃ মাঘ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (১৯২১ খিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা— ৯১৭-১৯।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

২২.১। আমরা স্বরবর্ণের দুটি রূপ ব্যবহার করি। একটি স্বরূপ, অপরটি সংকেত। লেখক 'আ'-থেকে 'ঔ' পর্যন্ত বর্ণগুলিকে ভাষা থেকে উঠিয়ে দিয়ে তার সংকেতগুলি ব্যবহার করতে বলেছেন। তবে অ-এর ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করা চলে না, তাই অ যেমন আছে তেমন রাখা অথবা নতুন সংকেত তৈরি করাই লেখকের প্রস্তাব।

২২.২। তবে 'এ' সংকেত দিয়ে লিখলে গোলমালের আশঙ্কা থাকে। যেমন, এটা হয়ে যাবে টো। এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজি হাইফেনের মতো চিহ্ন ব্যবহার করা চলে বলে লেখকের মত। যেমন ঃ ২৩—লেখা চলে তে ি- শ।

লেখক উদাহরণযোগে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজা ে া পন সুর

।মার মধ্যে তোমার প্রবেশ—
তা ি ে- ত মধুর ॥”

প্রবন্ধ-লেখকের প্রস্তাবটি পুরোপুরি মানা যায় না। কারণ অক্ষরসংখ্যা হ্রাসই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অক্ষরসংখ্যা এমনভাবে হ্রাস করতে হবে যা প্রচলিত অভ্যাসকে খুব বেশি আঘাত কববে না অথচ বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অক্ষবের স্বরূপ না জানিয়ে শুধু সংকেতগুলি শেখালে প্রথম শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তা সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া অযথা এতদিনের বিন্যস্ত রূপটিকে ভাঙতে গেলে জটিলতা বাড়বে।

২৩। চ'ল্তি ভাষার বানান। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

প্রবাসী ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা - ১৮২।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের 'চ'ল্তি ভাষার বানান' প্রবন্ধটি (পৃঃ ১৮২) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি রচনার ইতিহাস সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন ঃ

"কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব যখন বিশ্বভারতীর হাতে আসে, তখন বাঙ্‌লা বানান বিশেষত চ'ল্তি ভাষার বানান-সম্বন্ধে একটি সাধারণ রীতি অবলম্বন কর্‌বার কথা হয়। সম্প্রতি অনেক আলোচনার পরে একটি খস্‌ড়া বানান-পদ্ধতি খাড়া করা হ'য়েছে।"

স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রচেষ্টাকে বানান-সংস্কার-সংক্রান্ত প্রথম সংঘবদ্ধ উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে নিয়মগুলি তুলে দেওয়া হল ঃ

"নিয়মাবলী ঃ

(১) সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়মে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম ঃ

(১,১) সাধু ও চ'লতি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাঙ্‌লা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও ী কারই বজায় থাকবে। ইন্-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে ই-বানান চ'ল্‌তে পারে, কিন্তু আমরা বাঙ্‌লায় ী-কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্‌লার শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন ঃ [ধনীকে, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি।]

(১,২) সাধু ও চ'ল্তি দুই ভাষাতেই ী-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে ী-কার বজায় থাকবে। যেমন ঃ [দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, উর্বশী ইত্যাদি।]

(১,৩)যেখানে অন্ত্য ঃ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে ঃ (বিসর্গ) না লেখাই ভালো। যেমন : জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত, সাধারণত ইত্যাদি। অবশ্য যেখানে ঃ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় সেখানে ঃ (বিসর্গ) লিখ্‌তে হবে। যেমন ঃ [মাতঃ, পিতঃ, নমোনমঃ ইত্যাদি।]

(২) হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার ঃ

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব'লে শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। যেমন ঃ [সকল, বালক, নিশ্চিত, ব'ল্‌লেন ইত্যাদি।]

(২,১) সাধু ও চল্তি দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন ঃ ["এ জিনিসটার চল্ হ'য়ে গেছে" ; 'যদিও ব্রাহ্মণ্য

বংশজাত, তবু জাত্ মানি না" ; "রোজ রোজ যোগান্ যোগানো চলে না"] এই সব বাক্যে চল্ জাত্ যোগান্ প্রভৃতি শব্দ সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো।

(২,২)চ'ল্‌তি ভাষার তুচ্ছ অনুজ্ঞায় (বিকল্পে) শেষে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন ঃ [ডাক্, কর্, বল্, হোক্, বলিস্, করিস্ ; ইত্যাদি] কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো।

(২,৩)সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যত্র তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার ; যেমন ঃ [মেঘ্‌লা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, এম্‌নি, জান্‌লা ইত্যাদি]।

কবিতার ছন্দ-অনুসারে অনেক সময়ে উপান্ত্য অক্ষরের অ অথবা হসন্ত দুরকম উচ্চারণই হয় ; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার যেমন ঃ [বর্‌ষা (বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাব্‌না, ভরসা আর ভর্‌সা] এইসব শব্দে উচ্চারণ-পার্থক্য দেখানো জন্য হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

(২,৪)চ'ল্‌তি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না ক'রলেও চলে। যেমন ঃ [ক'রতে, ব'লতে, চ'লতে, ধ'রতে, প'রতে, চিনতে]। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে ; যেমন ঃ ক'র্‌তে, ব'ল্‌তে, চ'ল্‌তে, ধ'র্‌তে, প'র্‌তে, চিন্‌তে ইত্যাদি। কোনোটাতে অসুবিধা হয় না : উচ্চারণের দিক্ থেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধহয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে সংযুক্ত বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রূপের অনুযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণগুলিকে পৃথক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা [কর্ত্তে, কর্ল্লে, পার্ব্ব, কর্ব্ব প্রভৃতি] বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরূপ অনাবশ্যকভাবে বিকৃত হয়ে যাবে, অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

(২,৫) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন ঃ [মশ্‌গুল, বুল্‌বুল শেক্‌স্‌পিয়র ইত্যাদি।]

(২,৬) চল্‌তি ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অসুবিধা হয় না। সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন যে, বাঙ্‌লা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রিক। দুই দুই অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়। তবে [দেখ্‌বার (দ্যাখ্‌বার), কর্‌বার, বল্‌বার প্রভৃতি শব্দে] হসন্ত ব্যবহার করা ভালো কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

(৩) ইলেক-চিহ্ন (') ব্যবহার

(৩,১) কবিতায় সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই ি - কারান্ত অসমাপিকা 'ক্রিয়ায় ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন ঃ ['করি', 'ভরি', 'ধরি', 'চুম্‌কি' 'উচ্ছ্বসি' ইত্যাদি]।

(৩,২) মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি দেখবার জন্য ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার হবে ; এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। (৬) সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩,২-১) চল্‌তি ভাষার ক্রিয়ার লুপ্ত ইকারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ্ন তা'র পাশে

ব'স্‌বে। যেমন—ক'রে, ব'লে, ক'র্‌বো, ব'ল্‌বো, ক'র্‌তে প'র্‌তে, ম'র্‌তে ক'রছো ইত্যাদি।

(৩,২-২) কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমনঃ [কর্‌বার, ধর্‌বার, বল্‌বার ইত্যাদি]

(৩,২-৩) সাধু ভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষায় দুয়েতেই বর্তমান অনুজ্ঞায় ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন ঃ [ডাক' (ডাকহ), দেখ' (দেখহ) কর' (করহ) বল' (বলহ) ইত্যাদি] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ো-কার ব্যবহার করাই সহজ। যেমন ঃ [ডাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাদি]। সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষার দ্বিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন ঃ [কাঁদ' কাঁদ', পড়'-পড়', নিব'-নিব',] কিন্তু চ'লতি ভাষার ো -কার লেখাই ভালো ; যেমন—[কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ইত্যাদি]।

(৩,২-৪) চ'ল্‌তি ভাষায় [আছ', দিল', দিত', ছিল'] এই কয়টি শব্দে ইলেক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগ্‌বে।

(৩,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্ত্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন ঃ [ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনোদিন), র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দে), তা'র (তাহার)] ও তার (তন্ত্রী) ; তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দিন) ইত্যাদি। কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'ট্‌বে।

(৩,৪) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ঃ ভ'র'সা ও ভর্‌সা এম'নি ও এম্‌নি ই'ত্যাদি। কিন্তু তাতে (৩,২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন ও-ধ্বনি আর অ-ধ্বনি দুয়ের জন্য ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। মধ্য ও-ধ্বনি সর্ব্বত্রই ো কার দিয়ে লিখ্‌লে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

(৪) **অ-কার ব্যবহার**

(৪,১) তৎসম শব্দে ঃ [স্নেহ, গত, নত, মৃগ, পালিত, বিহিত ইত্যাদি]

(৪,২) অন্ত্য সংযুক্ত বর্ণে ; তৎসম তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে সর্ব্বত্রই। [সূর্য্য, মন্দ, ফর্দ্দ, কর্জ্জ ইত্যাদি]

(৪,৩) সাধুভাষার ক্রিয়া-পদে। [বহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ইত্যাদি]

(৪,৪) [যেন, কেন, যত, তত, এত, কত] এই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে। উচ্চারণ-অনুসারে [যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা উচিত ; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে ো কার চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়।

(৪,৫) অন্ত্যঃ (বিসর্গ) যেখানে লোপ হ'য়েছে সেখানে আপাতত শুধু অ-কার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন ঃ [আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ইত্যাদি] তাতে কিছু অসুবিধা আছে ; [৬] মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(৪,৬) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩,২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'ট্‌বে। (৩,৪) দ্রষ্টব্য।

(৫) অ-এর ও-ধ্বনি

(৫,১) মধ্যস্থিত অ-এর ও-ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু (৩,২) ও (৩,৪) দ্রষ্টব্য।

(৫,২) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ো কার দেওয়া হবে। ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দ (কিন্তু চৌদ্দ) পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম ঃ [যেন, কেন, যত, তত, কত, এত]। এই সব শব্দে ো- কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পাবে। (৪.৪) দ্রষ্টব্য।

(৫,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষার' 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ো-কার দেওয়া হবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]

(৫,৪) সাধু ভাষার বিকল্পে ও চ'ল্‌তি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ো -কার ব্যবহার হ'তে পারে। [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো] (৩,২-৩) দ্রষ্টব্য।

(৫.৫) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধাবণত ো কার ব্যবহার হবে। [ডাকো (ডাকিও), থেকো (থাকিও), এলো, ব'ল্‌লো, ক'র্‌লো ; বয়েছো, ব'লেছে ইত্যাদি] (৩,২-৩) দ্রষ্টব্য।

(৬) ই - ঈ-কার ব্যবহার

(৬,১) সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষা দুয়েতেই ইন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্‌লা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও ঈ-কার লেখা হবে। [গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীবা, রোগীদের ইত্যাদি] (১.১) দ্রষ্টব্য।

(৬,২) সাধুভাষা ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি [হ্রস্ব] ই-কার দিযে লেখা হবে। নির্দেশক সর্বনাম 'কী' [দীর্ঘ] ঈ-কার দিযে লেখা হবে। যেমন ঃ [তুমি কি খাবে? (অব্যয) তুমি কী খাবে? [সর্ব্বনাম] তুমি কী কী খাবে [সর্ব্বনাম]।

(৭) উ-কার ব্যবহার ঃ

তদ্ভব শব্দে সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই [অ] উ-কার লেখাই ভালো , ঔ-কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহাব হবে। [বউ, লাউ, মউ ইত্যাদি] কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ৌ-কার লেখা যেতে পারে। [বৌঠাকুরাণী, চৌঘুড়ী, মৌমাছি, চৌধুরী ইত্যাদি]

(৮) ে -কার ও ৈ-কার ব্যবহার ঃ

(৮,১) চ'ল্‌তি ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতে বিকল্পে ে -কার লেখা হবে। যেমন ঃ [কাঁদলে, কর্‌লে, বল্‌লে ইত্যাদি]

অকর্ম্মক ক্রিয়ায ে-কার চলে না ; সর্বত্র ো -কাব কিংবা ইলেক ব্যবহার ক'র্‌তে হবে। যেমন ঃ[কাঁদলো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি]

(৮,২) চ'ল্‌তি ভাষার অতীত ক্রিয়ার বিকল্পে। যেমন [ক'র্‌তেম, কর্‌লেম, বল্‌তেম, বল্‌লেম ইত্যাদি]।

(৮,৩) সাধু ও চল্‌তি দুই ভাষাতেই এ্যা উচ্চারণে সর্বত্র ে -কার ব্যবহার হবে। যেমন ঃ [যেমন, দেখা, খেলা, বেলা, ফেলা, মেলা, যেন, কেন ইত্যাদি]।

(৯) ও - কার ব্যবহার ঃ

ও -ধ্বনি যতদূর সম্ভব ে া -কার দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ ক'রতে হ'চ্চে। (৩) দ্রষ্টব্য।

(৯,১) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোরু, কোলু এবং বিকল্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে।

(৯,২) [কোনো] আর [কোনও] এই দুয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আবশ্যক-মতো [কোনও, কখনও আজও, তখনও ইত্যাদি] লেখা হবে।

(৯,৩) [করিয়ো, নিয়ো প্রভৃতি] শব্দে 'য়ো' লেখাই আপাতত চ'ল্‌বে।

(১০) ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ

(১০,১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই [কান, বানান, পান, সোনা] এই শব্দগুলি দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙ্‌লা উচ্চারণ আর বাঙ্‌লা বানান এই দুয়েরই অনুমোদিত।

(১০,২) সাধুভাষা ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই 'আছ' ধাতুর বিকৃতরূপে সর্বত্র 'ছ' ব্যবহার করা হবে ; চ' লেখা হবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি]

(১০,৩) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরূপ অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। [শহর, শেক্‌স্‌পিয়র, শেলি, শাহাজান, হামেশা, মশ্‌লা ইত্যাদি] কিন্তু [সরম] শব্দটিতে প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য -স লেখাই চ'ল্‌বে।

(১১) স্বরানুক্রম ঃ

চ'ল্‌তি ভাষায় উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম (Vocalic Harmony) চ'ল্‌বে। যেমন ঃ [একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতী. দিশী, পূজো, জুযো ধুনুরী, খুড়ো. বুড়ো, গুখো. ফিতে, হিসেব ইত্যাদি।"

প্রশান্তচন্দ্রের প্রস্তাবে চলতি ভাষার বানানের বিশৃঙ্খলা এড়াবার জন্য যে নিয়মাবলি তৈরি করা হয়েছে তা অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। তবে কয়েকটি ক্ষেত্র আর একটু সরল হলে ভালো হত বলে মনে হয়। যেমন ঃ

১। ১ সংখ্যক নিয়মে - দেখি ইন্‌ -অন্ত শব্দে সমাসবদ্ধ পদে বিকল্পে ই বানান চলতে পারে। এই বিকল্পে ই-এর পরিবর্তে যদি সর্বক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ঈ-চালু করা যায় তবে নিয়মটি অপেক্ষাকৃত সরল হত বলে বোধ হয়।

'হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার' প্রসঙ্গে ২।২ সংখ্যক নিয়মটি সম্পর্কে বলা যায় যে এর মধ্যে দ্বিধা রয়েছে। কারণ একবার তুচ্ছ অনুজ্ঞার শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আবার পরেই হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো বলা হচ্ছে। কিন্তু এই দোলাচলতার পরিবর্তে সর্বত্র তুচ্ছ অনুজ্ঞায় শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার বিধানই শ্রেয় বলে মনে হয়। 'ওকে ডাক্‌' এবং 'ওকে ডাক' এই দুটি বাক্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার ফলেই স্পষ্ট হয়।

২। ৪ সংখ্যক নিয়মটিতেও একইরকম দ্বিধা লক্ষ করা যায়। (চলতি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদের উপান্ত্য অক্ষরটিতে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে—এরকমই বলা হয়েছে। তবে উচ্চারণের দিক থেকে হসন্ত দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে

মনে করা হয়েছে।) এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, তিন অক্ষরের চলিত ক্রিয়াপদের উপান্ত্য অক্ষরটি হসন্ত উচ্চারণই যেখানে সাধারণ নিয়ম বলে আমরা জানি সেক্ষেত্রে অযথা হসন্ত দিয়ে অক্ষরটির ভার না বাড়ানোই শ্রেয় বলে মনে হয়।

২।৬ সংখ্যক নিয়মটি সম্পর্কেও একই কথা প্রয়োজ্য।

ইলেক-চিহ্ন (') ব্যবহার প্রসঙ্গে (৩.২,-৩) সংখ্যক নিয়মটি সম্পর্কেও কিছু বলার থেকে যায়। বর্তমান অনুজ্ঞায় চলতি ভাষায় ইলেক্ চিহ্ন বা ে া কার ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে (২.২) সংখ্যক নিয়মটি পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ নিয়মে তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞার শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহারের বিধানটি যদি স্থিরীকৃত হয়, তবে তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রটিতে ইলেক বা ে া-কার কোনোটিই দেবার প্রয়োজন পড়ে না।

'অ-কার ব্যবহার' প্রসঙ্গে (৪.৪) সংখ্যক নিয়মটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। যেন, কেন, কত, তত, এত, কত ইত্যাদি শব্দগুলি এত প্রচলিত যে এগুলি উচ্চারণ অনুসারে ে া-কার দিয়ে না লিখলেও এদের উচ্চারণে ভুল হয় না। তাই অযথা ে া-কার দিয়ে ভার চাপানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

(৪.৫) সংখ্যক নিয়মটি প্রসঙ্গে বলা যায়, এই ক্ষেত্রগুলিতে যেখানে অন্ত্য বিসর্গ লোপ পেয়েছে সেক্ষেত্রে অন্ত্য বর্ণ অকার রাখা যেতে পারে।

"অ-এর ও-ধ্বনি" প্রসঙ্গে যে নিয়মগুলি তৈরি করা হয়েছে সেগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ।

'উ-কার ব্যবহার' প্রসঙ্গে যে নিয়মটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রেও বিকল্পটি বাদ দিয়ে যদি অউ রাখা হয় (যেমন বউঠাকুরাণী) তবে একরূপতা রক্ষিত হয়।

'ব্যঞ্জনবর্ণ' প্রসঙ্গে ১০.৩-সংখ্যক নিয়মটি সম্বন্ধে বলা যায়, বিদেশি শব্দে সব ক্ষেত্রেই যখন তালব্য-শ ব্যবহার করাই স্থিরীকৃত হল তখন শুধুমাত্র একটি শব্দে (সরম) দন্ত্য-স রেখে নিয়ম ভাঙার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রথম প্রথম বিসদৃশ ঠেকলেও পরে চোখ অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি প্রকাশ উপলক্ষে বাংলা বানান বিশেষ করে চলিত বাংলার নিয়ম নির্ধারণের এই চেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। কারণ এর আগে বানান সংস্কার ও অক্ষরবিন্যাসের ব্যাপারে যত চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তা সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। এক একজন লেখক বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি ও লিপিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিজ নিজ ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে নানা ধরনের প্রস্তাব করেছেন। এইসব প্রস্তাবে কোথাও কোথাও বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ত্রুটির ফলে সিদ্ধান্তের মধ্যেও নানাধরনের অসংগতি দেখা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে কয়েকজন ভাষা ও সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পাদিত হওয়ায় এর মধ্যে ব্যাপকতর নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এই চেষ্টার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক্ষেত্রে অনেকগুলি ব্যাপারে প্রচলিত অন্ধ পূর্বানুসরণকে অতিক্রম করার প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রধান দুর্বলতার দিকটি হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশের পরিবর্তে বিকল্প রক্ষার প্রস্তাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

২৪। বাংলা শব্দ ও বানান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ভারতবর্ষ ঃ ভাদ্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮৯।

সমগ্র প্রবন্ধটিতে ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ৩৮৫ পৃষ্ঠায় 'বানান' অংশে বাংলা বানান-সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধটিতে প্রতিফলিত লেখকের বানান সংক্রান্ত চিন্তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

(১) অভিধানকারকে বহু শব্দ নিজের বিবেচনায় বানান করতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ রাখতে হয় পারম্পর্য, ব্যুৎপত্তি এবং উচ্চারণের দিকে।

(২) অজ্ঞাতমূল শব্দ যেমন শুনি তেমনি বানান করি। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে তা করি না। বলি লবন, লিখি লবণ। ধ্বনির সঙ্গে মেলালে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অল্পই আছে তবু পারম্পর্য রক্ষা-হেতু আমরা সংস্কৃত বানান করে থাকি।

(৩) বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দের বানান ঃ লেখক বিদেশি শব্দে ধ্বনিসংবাদী বানান লেখা ঠিক মনে করেন। যেমন কমি, বেশি বাকি ইত্যাদি। নতুন শব্দে ধ্বনিসংবাদী বানান যত বাখতে পারা যায় ততই ভালো হবে বলে তাঁব অভিমত। অ-কারান্ত বিশেষণের 'অ'-কার স্থলে ও-কাব লেখার যে প্রবণতা রয়েছে তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব কোথাও অ-কাবান্ত করতে হলে অক্ষরের পাশে বিন্দু বসানো চলে। যেমন, ভালো নয, ভাল.।

(৪) যাবতীয় তান্ত শব্দ অ-কাবান্ত। এই নিযমে ম-ত বিশেষণ, মত্ বিশেষ্য। এখানে আবশ্যক শব্দে হসন্ত দিলেই বিশেষ্য বুঝতে পাবা যাবে বলে তাঁর অভিমত।

(৫) প্রযোজক অর্থে ধাতুর উত্তরে আ-ন প্রত্যয় হয়। যেমন √ কর্ > ক-রা-ন। কেউ কেউ কবানো লিখছেন। ক-রা-ন বিশেষণ, সুতরাং অ-কারান্ত। তবে বিশেষণ কোথাও কোথাও বিশেষ্যরূপেও চলে। যেমন ঃ দুধের যোগান্। এই অল্পের জন্য বহুর বানান-বিকার কর্তব্য নয় বলে তাঁর অভিমত।

নিতান্ত 'মনস্তুষ্টি'র জন্য আনা লাগানো যেতে পাবে। যেমন ঃ করা, করা-না।

(৬) নতুন স্বরযোগের মত, আবশ্যক স্বরলোপ 'দোষাবহ'। আজ. কাল, চাল ইত্যাদি বানান তাঁর মতে ঠিক নয়।

কল্য > কালি > কাইল।

চালু > চাউল > চাইল।

এই-ই ঈষৎ উচ্চারিত হলেও এর জন্য অক্ষর কবানো অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তাঁর অভিমত। আ`জ, কা`ল, চা`ল ইত্যাদি।

(৭) এমন যেমন প্রভৃতি শব্দে উচ্চারিত 'এ' ধ্বনির জন্য পৃথক অক্ষরের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে বিদেশি শব্দে ধ্বনিসাম্য চাইলে নতুন অক্ষর করানো যেতে পারে বলে তাঁর অভিমত। কিন্তু য়্যা, এ্যা লেখা ঠিক নয়। তবে নাগরী এ (ए) নেওয়া যেতে পাবে। তবে যাই হোক শব্দের আদ্যে, মধ্যে একই রূপ হবে।

(৮) বাংলা অক্ষর দ্বারা 'z' ধ্বনি প্রকাশ করা যায় না। এতে জটিলতা বাড়ে। তাছাড়া অন্তঃস্থ ব ধ্বনিজ্ঞাপক একটি বর্ণ থাকলে ওয়া লেখার একটি অক্ষর কম হত বলে তাঁর অভিমত।

(৯) রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন বিকল্পে দ্বিত্ব লেখার রীতি যেহেতু বহু পূর্ব থেকেই চালু ছিল সুতরাং বর্তমানে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন একটি লেখাই ভাল।

(১০) দ্বিত্ব দ্বারা অক্ষরের আকৃতি না করাই তাঁর অভিমত। র্, র্, শ্ লিখলে বানান অপরিবর্তিতই থাকে।

(১১) ইয়া প্রত্যয়যুক্ত বিশেষ্য শব্দ বহু রয়েছে। যেমন, বারমাসিয়া, চাকরিয়া। এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ হল বারমাস্যা বা বারমেস্যে, চাকর্যে। চাকরে বা বারমেসে অশুদ্ধ বানান কারণ এতে প্রত্যয় নেই।

তেমনি উয়া প্রত্যয় যুক্ত শব্দেও একই কথা বলেছেন জল্যো শুদ্ধ, জলো ভুল।

(১২) ভিজা-ভিজে, খুড়া-খুড়ো প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে দুই রূপই স্বীকার কতে হয়।

(১৩) ক্রিয়াপদের বানান ঃ ইব, ইল, ইত—এই তিন বিভক্তি যুক্ত পদে তিনি সর্বত্র অ-কারান্ত লেখার পক্ষপাতী। যাবো বা গেলো লেখা নিষ্প্রয়োজন।

(১৪) ইব, ইল, ইত বিভক্তির ই-কার কখনও কখনও ক্ষীণ উচ্চারতি হয়। এই ক্ষীণতা বোঝাতে অনেকে মাথায় ঊর্ধ্বকমা (') চিহ্ন দিচ্ছেন। কিন্তু লেখক মনে করেন ঊর্ধ্বকমা চিহ্নটি শব্দ উদ্ধারের চিহ্ন। লেখক এক্ষেত্রে '৲' চিহ্ন দিতে চান। তাঁর মতে করিয়া কবিতে প্রভৃতি শব্দের ইয়া, ইতে বিভক্তি ক্ষীণ হয়, লুপ্ত নয়। তাই ক-রে বা ক-র-তে বানান ঠিক নয়। শুদ্ধ বানানটি হবে কর্যে।

(১৫) ছিলাম, ছিলুম, ছিনু—এই তিনটিব মধ্যে ছিনু প্রাচীন। ছিলাম যখন চলছে তখন ছিলুম রূপটি অপ্রযোজনীয়।

(১৬) যে সকল ধাতুর আদ্যস্বর অ, সে সকল ধাতুরূপে ক্ষীণ ই-কার চিহ্ন দিতে হবে। অন্যক্ষেত্রে অনাবশ্যক। শুনে শুন্‌বার ইত্যাদি বানান শুদ্ধ। কিন্তু করিলাম-ক৲রলাম।

(১৭) লেখক 'লোকটি ব'লে ক'যে চ'লে গেল' না বলে 'লোকটি বল্যে কয়ে চল্যে গেল' বলতে চান।

এই প্রবন্ধে লেখক বানান সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে কয়েকটি চিন্তা ভেবে দেখার মতো। তবে কিছু কিছু চিন্তা সমর্থনযোগ্য নয়। ২, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৫ সংখ্যক প্রস্তাবগুলি যুক্তিযুক্ত। তবে অন্যান্য প্রস্তাবগুলি পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। যেমন ঃ

৩-সংখ্যক প্রস্তাবে লেখক অ-কারান্ত বিশেষণের অ-কার স্থলে ও-কারের বিরোধিতা করে অ-কারান্ত শব্দের পাশে বিন্দু বসানোর পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয়, বিন্দু বসিয়ে শব্দটি ভারাক্রান্ত না করে ও -কার দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া ও-কার দেওয়া যখন চালু হয়ে গেছে তখন উচ্চারণানুসারী বানান রাখলেই একরূপতা রক্ষা হয়।

৪-সংখ্যক প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায়, যাবতীয় তান্ত শব্দ অ-কারান্ত হলেও বিশেষ্য এবং বিশেষণের পার্থক্যটি প্রসঙ্গ থেকেই বুঝে নেওয়া যায়। আলাদা করে বিশেষ্য পদে হসন্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

৫-সংখ্যক প্রস্তাবে আন্ প্রত্যয়যুক্ত প্রযোজক ধাতু যেখানে বিশেষণ সেখানে লেখক ও-কার দেবার বিরোধিতা করেছেন। যেমন—করানো নয়, করান। এক্ষেত্রে বলা যায় বানান

যতদূর সম্ভব ধ্বনিসংবাদী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই 'করানো' বানানটি যখন চালু হয়ে গেছে তখন তাকে রোধ করা যুক্তিহীন।

৬-সংখ্যক প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায়, আমরা আজ, কাল, চাল-ই উচ্চারণ করি। ঈষৎ ই সাধারণত আঞ্চলিক ভাষাতেই উচ্চারিত হয়। তাই ভাষার মানায়িত বা আদর্শায়িত রূপের মধ্যে এগুলির ব্যবহার অযৌক্তিক।

৭-সংখ্যক প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদেব মনে হয় বাঁকা এ ধ্বনির উচ্চারণ 'এ' দ্বারা কখনোই বোঝানো যায় না। শুধু বিদেশি শব্দ কেন যেকোনো ধরনের শব্দেই এই ধ্বনি বোঝানোর জন্য পৃথক অক্ষর প্রয়োজন।

১১ সংখ্যক প্রস্তাবে ইয়া-প্রত্যয়যুক্ত বিশেষ্য পদের সংক্ষিপ্ত রূপগুলি সম্পর্কে বলা যায় এগুলি সবই আঞ্চলিক রূপ, শিষ্ট ভাষায় এগুলির প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

১২-সংখ্যক প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের মনে হয় বিভিন্ন শব্দের দুটি রূপ চললেও আমাদের স্বরসংগতিবিশিষ্ট মানায়িত রূপের প্রতি জোর দেওয়া উচিত।

১৩-সংখ্যক প্রস্তাবে ইব ইল ইত-বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের বানান ও-কারান্ত লেখার বিরোধিতা করেছেন। তবে আমরা যখন ও কারান্তই উচ্চারণ করি এবং এই উচ্চারণভিত্তিক বানান যখন চালু হয়ে গেছে তখন তাকে চলতে দেওয়াই ভালো বলে মনে হয়।

১৪, ১৬ এবং ১৭ সংখ্যক প্রস্তাবগুলি সবই অযৌক্তিক। কাবণ তিনি যে বানানগুলি চালাতে চান সবই আঞ্চলিক উচ্চারণেব অনুগামী।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বিভিন্ন লেখকের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। এখানে বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হল মাত্র :

যোগেশ চন্দ্র রায়ের প্রবন্ধেব প্রত্যুত্তরে বীরশ্বর সেন তাঁর মতামত জানান নিম্নলিখিত প্রবন্ধটির মাধ্যমে ঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা (বীরেশ্বর সেন।) (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৮। পৃষ্ঠা-৯০)

এই প্রবন্ধে বীবেশ্বব বাবু যোগেশ চন্দ্রের সব অভিমত মানতে পারেন নি। যেমন ঃ "বলে কয়ে চলে গেল" বিদ্যানিধি উদ্ধৃত এই শব্দকটি তিনি ও-কার দ্বারা লেখা উচিত বলে মনে করেন।

এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখক যোগেশ চন্দ্র রায় পুনরায় তাঁর মতের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেন নিম্নে উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে ঃ

বাংলা বানান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮)

এরপর বাংলা বানান শীর্ষক আলোচনায় **বীরেশ্বর সেন** পুনরায় তাঁর মতের সপক্ষে যুক্তি দেন। আলোচনাটির প্রকাশকাল ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৮।

যোগেশ চন্দ্র রায়ের 'বাংলা শব্দ ও বানান' প্রবন্ধটি সম্পর্কে **হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়** তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে। প্রকাশকাল ঃ ভারতবর্ষ ; চৈত্র ১৩৩৮।

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে **কালিদাস ভট্টাচার্য্য** তাঁর মতামত জানান 'বাংলা বানান' শীর্ষক আলোচনায়। এটি প্রকাশিত হয়—ভারতবর্ষ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯-এ।

২৫। 'বাংলা টাইপ ও কেস। শ্রী অজরচন্দ্র সরকার।
প্রবাসী ঃ পৌষ, মাঘ, চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)
পৃষ্ঠা—৩২৫-৩৩, ৫১১-৫২০, ৭৮৩-৭৮৭

১৩৩৯ সালের প্রবাসীতে পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে অজরচন্দ্র সরকারের "বাংলা টাইপ ও কেস' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতে থাকে। অজরচন্দ্র ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস ও প্রকাশন বিভাগের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ মুদ্রণবিশেষজ্ঞ। যদিও তাঁর প্রবন্ধটি মূলত বাংলা মুদ্রণ-সংক্রান্ত, তবু সেটি এখানে সন্নিবেশের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তিনি এই প্রবন্ধে মুদ্রণ সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে অক্ষর, টাইপ-কেস ও সেই সঙ্গে বাংলা বানান সংস্কারের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর তিনটি প্রবন্ধকে অবলম্বন করে অক্ষর ও বানান সংক্রান্ত কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

একটি বাংলা কেসের মধ্যে মোট ৫৬৩ টি বিভিন্ন ধরনের টাইপ রয়েছে। (১) স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি অযুক্ত ও যুক্ত টাইপ—৪৭৪। (২) পাদটীকার চিহ্ন ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা, গণিতের চিহ্ন, ছেদ যতিচিহ্ন প্রভৃতি —৪৯ (৩) কর্ন্ টাইপ—৪০ ; মোট—৫৬৩।

এইবার লেখক কয়েকটি টাইপের উপযোগিতা-অনুপযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অক্ষর ও বানান সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় মেলে ঃ

(১) অ, ই প্রভৃতি স্বরের কোঠায় ১৪টি টাইপের মধ্যে একই আকারের দুইটি ই-এর মধ্যে একটি, ঋৃ, ৯, ৯ৢ উঠিয়ে দিতে চান।

(২) ২ ি ী প্রভৃতি কোঠায় ১৯টি টাইপের মধ্যে ২ ৄ এবং দুই প্রকাব ে, ৈ, ৌ রয়েছে। এর মধ্যে হ, ৄ সরিয়ে দিলে এবং । ৌ এক প্রকারের রাখলেই চলে বলে তিনি মনে করেন।

(৩) ং ঃ ন-ফলা প্রভৃতি কোঠায় ১০টি টাইপের মধ্যে ँ (ঈশ্বর) চিহ্ন ফেলে দিতে চান।

(৪) খৃ এবং খ্রী—দুটি পৃথক টাইপ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

(৫) গ্-ন-যুক্ত গ্ন টাইপ আছে, কিন্তু গ্ ণ জোড়া টাইপ নেই। তাই বানান অশুদ্ধ হলেও গ্ণ-য়ের বদলে গ্ন চালানো হচ্ছে। (যেমন ঃ রুগ্ণ, এর বদলে রুগ্ন)

(৬) র্ভ্ভ টাইপ নিষ্প্রয়োজন। গর্ব্ভের বদলে গর্ভ বানান চালানো উচিত। লেখক স্পষ্ট জানালেন "আর যদি এ কথা খাঁটি ব্যাকরণসম্মত হয় যে রেফের খাতিরে যে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়, তাহা কেবলমাত্র বিকল্পে, তবে সংস্কৃতের সেই বিকল্প ব্যবস্থাটিকে বাঙ্গালায় জোর করিয়া অবশ্য প্রতিপালিত বিধি বলিয়া এখনও চালাই কেন?" (প্রবাসী ঃ পৌষ ১৩৯৯ পৃষ্ঠা-৩২৯)। রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের এই প্রস্তাবটি অজরচন্দ্রই করেছিলেন। প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি এই মুদ্রণবিশেষজ্ঞের অভিমতটির বিশেষ মূল্য দেন।

(৭) র্জ্জ, র্দ্ধ এবং ষ্ট্রীট শব্দের জন্য যে ষ্ট্রী, ষ্ট্রি এই জটিল চিহ্ন সন্নিবেশ টাইপ-কেসে রাখতে হয় তার সরলীকরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের প্রস্তাব করেছেন।

(৮) তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে কিছু অতিবিরল এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যুক্তাক্ষর রয়েছে। যেমন ঃ দ্ধ্ব, ধ্র, শ্বর, প্ল, ঝ্ঝ ত্ত, ব্চ ব্ল ব্লু ভ্র ন্ড ক্ষ্ম কুঁ স্ত্ব প্রভৃতি। এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বিচার্য বিষয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে মূল ৪৭৪ টি টাইপকে বিভিন্ন দফায় সাজিয়ে সেগুলির উপযোগিতা-অনুপযোগিতার ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।

১ম দফা ঃ অ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋৃ ঌ ঌৢ এ ঐ ও ঔ ই — ১৪

এর মধ্যে ঋ ঌ ঌৢ এবং দুই নম্বর ই-এই ৪টি টাইপ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন না।

২য় দফা ঃ া া ি ী ু ূ ৃ ে ে ৈ ৌ ৗ ি ী ৢ ৣ ২ = ১৯।

শেষের া, গোড়ার ে ৈ এবং শেষের ী-এই ৪টি অর্থাৎ মাত্রাহীন চারটিকে দিয়ে পাশের এবং মাঝের সব কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় বলে তিনি মনে করেন। এ কারের অ্যা উচ্চারণ বোঝাবার জন্য যদি গোড়ার এ-কারের (ে) বদলে মাঝের একার (ে) চালানো যায় তাহলে আরও গোলযোগ ও বিভ্রাট ঘটবে। ৄ, লুপ্ত ২ বাদ দেওয়া যেতে পারে।

৩য় দফা ঃ ং ঃ ঁ (চন্দ্রবিন্দু) ্ (হসন্ত চিহ্ন) এবং ্য ্র ্ন ্ল প্রভৃতি ফলা = ১০।

এখানে ১০টিই থাকবে। একটিও বাদ দেবার উপায় নেই।

৪র্থ দফা ঃ ক, ক্, কু, কূ, কৃ, ক্ক, ক্কু, ক্ট, ক্ত, ক্তৃ, ক্ন, ক্ব ক্ম ক্র, ক্রু, ক্ল, ক্স, = ১৭

কৃ, ক্ক, ক্কু, ক্ট, ক্ব, ক্ম, ক্স - এই ৮টি টাইপ বাদ দেবার প্রস্তাব করেছেন। কারণ—

কৃ—যুক্ত শব্দ বাংলায় কম ব্যবহৃত হয়। দরকার মত 'কর্ন' ক -যে জুড়ে দিযে অনায়াসে কাজ চলতে পারে।

ক্ক—এই যুক্ত বর্ণের ব্যবহার কম। প্রত্যেকটি ক্‌ক দিয়ে মুদ্রিত করা যেতে পারে।

ক্কু—'ক্‌কু' দিয়ে লেখা যায়।

ক্ট, ক্ন—বাংলায় ব্যবহার আছে কি?

ক্ব— 'পক্ব' পক্‌ব রূপে চালাবার পক্ষে অনেকের উচ্চারণগত আপত্তি থাকতে পারে।

ক্ম-এবং ক্স-এর ব্যবহারও খুবই কম।

বাংলা ভাষার মধ্যে এমন কিছু যুক্তাক্ষর আছে যেগুলি শব্দের আদিতে বসে, যেমন ঃ ক্ল, গ্ল, প্ল, ম্ল, শ্ল জ্ঞ স্ক স্খ স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্ফ প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকের উপরকার অক্ষরে হসন্ত জুড়ে দিয়ে এবং নীচের অক্ষরটি স্বরান্ত রেখে মুদ্রিত করা এবং লেখা সুনীতিবাবুর মত। লেখক এই মতের পক্ষপাতী নন।

৫ম দফা ঃ খ, খু, খূ, খৃ, খ্রী = ৫

খূ এবং খ্রী বাদ দেবার প্রস্তাব করেছেন।

'পণ্ডিত' যোগেশচন্দ্র রায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর টাইপের আকৃতি পরিবর্তন করতে চান। টাইপগুলির তালিকা দেওয়া হল ঃ

ক্তু, ক্রু, গু, গ্ধ, ঙ্গ, জ্ঞ, ঞ্চ, ট্রু ন্ড, ত্তু, ত্থ, ত্র, ত্রু, ত্রু, ত্রূ, দ্ধ, দ্রু, দ্রূ, ধ্রু, ধ্রূ, ন্থ, ন্ধ, ন্তু, প্রু, প্রূ, ব্ধ, ব্রু, ব্রূ, ভ্র, ভ্রু, ভ্রূ, রু, রূ, শু, শ্রু, শ্রূ, ষ্ণ স্থ, স্তু, স্রু, স্রূ, হু, হূ, হৃ, হ্ম, ক্ষ।

লেখকও মনে করেন, "এই ৪৬টি টাইপের রূপ বদল করিলে কোন ক্ষতি ত নাই, অধিকন্তু ছেলেমেয়েদের বাণান শিক্ষার সম্বন্ধে মহালাভ।"

হিন্দীতে ঙ, ঞ, ণ ন, ম—এই পাঁচটি অনুনাসিক বর্ণের স্থানে অনুস্বার (ং) চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেখক মনে করেন, যুক্তাক্ষরের পরিবর্তে অনুস্বারের এই বহুল প্রচলনে সংস্কৃত ব্যাকরণের কতটা আঘাত লেগেছে সেটা বিশেষজ্ঞের বিচার্য বিষয়। তবে টাইপের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং বানানের বিভীষিকা কমেছে তা বলা যায়।

৬ দফা ঃ গ, গ্, গী, গু, গূ, গৃ, গদ, গ্ধ, গ্ন, গ্ব, গ্ম, গ্র, গ্ল = ১৩

গ্ টাইপ কেসে থাকবে কিনা সেই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বানান সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

"বাঙ্গালায় যে সকল ব্যঞ্জনান্ত খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে এবং সাধারণত যে শব্দগুলির প্রথমার একবচন বাঙ্গলায় মূল শব্দরূপে প্রচলিত আছে, সেই সকল শব্দ কি হসন্ত চিহ্ন দিয়া লেখা ও ছাপা হইবে, না হসন্ত বাদ দিয়া অকারান্তরূপে ব্যবহৃত হইবে?"

ববীন্দ্রনাথ এ সকল শব্দে হসন্ত চিহ্ন দেন না। বিদ্যাসাগব সংস্কৃত শব্দের খাঁটি রূপটিই বাংলায ব্যবহার করতেন। বিদ্যাসাগব মহাশয়ের পববর্তী লেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ছাড়া অন্য সকলে এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। লেখক মনে কবেন, "যেগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সেগুলির খাঁটি সংস্কৃত রূপই (কখন মূল শব্দ, কখন প্রথমাব একবচন আব কখন-বা বহুবচন) বাঙ্গালায় ব্যবহার করাই উচিত।" তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বাংলা টাইপেব সংস্কার কবতে গেলে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশজ এবং বিদেশি যাবতীয় শব্দের বানান ঠিক করতে হবে।

গী—বাদ দেওযা যেতে পাবে বলে তাঁব প্রস্তাব। কারণ প্রযোগ কম, ী জুড়েই কাজ চলে।

গু—আকৃতির পবিবর্তন আবশ্যক।

গূ—দু-একটি শব্দেব জন্য কেসে না থাকাই ভাল।

গদ, গ্ব—সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও বাংলায় প্রয়োগ কম। কাজেই বাদ দেওযা যেতে পারে। বাগ্দান, বাগ্দেবী ইত্যাদি লিখলে ক্ষতি কী?

গ্ধ—এটিকেও বাদ দেওয়া যেতে পাবে। আব গ্ধ যখন কোনো শব্দেব আদিতে বসে না তখন অনাযাসে গ্ চালিযে দেওযা যায।

গ্ন— এটিকেও পূর্বের কারণেই বাদ দেওয়া যেতে পাবে।

গ্ম—গ্ম বাখতে হবে।

গ্র—থাকবে।

গ্ল—'গ্লানি'। এক্ষেত্রে গ্ ব্যবহার করলে 'স্টেশন' হযে যাবে, কিন্তু মাত্র একটি শব্দের জন্য একটি পৃথক টাইপ রাখতে তিনি অনিচ্ছুক।

এইভাবে লেখক বিভিন্ন 'টাইপেব' প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা জানিযেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বানান সংক্রান্ত ভাবনার কথাও এসেছে।

প্রবন্ধটি যদিও বাংলা মুদ্রণ তথা টাইপ বিন্যাসেব সবলীকবণের দিকে লক্ষ রেখেই রচিত হয়েছে, তথাপি বাংলা বানানেব সমতাবিধান তথা সবলীকরণের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক

ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত এই প্রবন্ধে গৃহীত কোনো কোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতিকে প্রভাবিত করেছে (যেমন রেফ্ যুক্ত শব্দে দ্বিত্ব বর্জন)। দ্বিতীয়ত ছাপাখানার টাইপ বিন্যাসের ক্ষেত্রে সরলীকরণ ঘটলে বানানের ক্ষেত্রে তার একটা সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটে। এই তথ্য আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রণের ক্ষেত্রেও পর্যালোচনা করেছি।

২৬। বাঙ্গালা অক্ষর। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

প্রবাসী ঃ ফাল্গুন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৬৮২-৬৮৭।

প্রবাসীতে শ্রী অজরচন্দ্র সরকারের 'বাঙ্গালা টাইপ ও কেস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধটি যোগেশচন্দ্র রায় পড়েন। 'বাঙ্গালা অক্ষর' প্রবন্ধে ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান। এখানে লেখকেব মতামতটি তুলে ধবা হল ঃ

তিনি মনে করেন কতগুলি টাইপ হলে এক সাট হতে পাবে সেটা মুদ্রাকারের ভাবনার বিষয়। কতগুলি অক্ষর প্রযোজন তা বলেছেন—

স্ববর্ণেব জন্য অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ অঁ অং অঃ ১৪টি।

ব্যঞ্জনে জুড়তে চাই - ´ ˎ া ি ী ু ূ ৃ ে ো ৌ—১২টি

সংস্কৃত লিখতে লুপ্ত অ-কাব, ৄ , ৯ চাই। মোট ১৪ + ১২ = ২৬

২৬ + ৩ ২৯

ব্যঞ্জনাক্ষব অন্তঃস্থ বাদে ক থেকে ক্ষ ৩৩টি। আর জ্ঞ, ঋ, ড়, ঢ়, য়—৫টি। মোট ৩৮টি। স্বাক্ষব ২৬টি। মোট ৬৪টি। সংস্কৃত লিখতে অন্তঃস্থ ব চাই। সংস্কৃতের জন্য অতিরিক্ত ৫টি পৃথক একটি খোপে থাকতে পাবে।

(১) উপবে লিখিত স্বাক্ষরে স্বল্পাকৃতির মধ্যে ˘ অক্ষর আছে। এই শৃঙ্গটি দ্বারা ঈষৎ ই বোঝানো হয। বর্তমানে লেখকেবা ঊর্ধ্ব কমা দিচ্ছেন। করিযা, ক - রে, কো - বে কদাপি নয়। ক ˘ রে কিংবা কর্য্যে।

(২) ি অক্ষরেব বাঁয়ে দাঁড়ি। ে, ৈ ব্যঞ্জনের বাঁয়ে দিয়ে কে, কৈ লিখি। ক + এ, ক + ঐ, ক এব পবে এ, ঐ, পূর্বে নয়।

(৩) গু, রু, বূ, শু - না লিখে গু, রু রূ শু লিখলে কোনো লাভ নেই। কারণ সঙেকত যত বাড়ে, লিখতে আয়াসও তত বাড়ে।

(৪) ক্ষ একটি স্বতন্ত্র অক্ষর। এটি বাংলায় ক্ষ বর্ণদ্যোতক নয। এর নাম খিঅ, তাই ক্ষুধা খি-দা। জ্ঞ, নাম গাঁ। জ্ঞান গেঁ-য়ান, য-জ্ঞ, য-জ্ঞঁ যগ্য। ঋ, নাম ষ্টঁ। কৃ-ঋ ক্রি-ষ্টঁ কিষ্ট।

(৫) সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব নইলে নয়, বর্গীয় ব অল্প। বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচারে অন্তঃস্থ ব আবশ্যক নয। বাংলা টাইপেব সাটে ব তৈরি করে নিলে দোষ থাকে না। অন্তঃস্থ ব-টিব পুনরুদ্ধাব হলে ব-ফলার উচ্চারণ আসতে পারে। হওয়া, খাওয়া ইত্যাদি হবা, খাবা লিখতে পাবা যাবে।

(৬) বেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন কেউ দ্বিত্ব করত, কেউ করত না। আমাদেরও কেউ করে, কেউ কবে না। যারা দ্বিত্ব উচ্চারণ করে তারা সকল বর্ণে করে না। যাবতীয় ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করা হলে আপত্তি উঠতে পারত।

(৭) বাংলা বানানে বাঁকা এ-কার আবশ্যক হয় না কিন্তু কেহ কেহ বাঁকা একারকে ব্যাঁ-কা না করে স্বস্তি পান না। বিষয়-বিশেষে বাঁকা এ কার আবশ্যক হয়। লেখক ^ উল্টিয়ে 2 নিয়েছেন। এতে একই আকারে শব্দের আদ্যে ও মধ্যে বসতে পারে। নতুন টাইপ দরকার হয় না। নতুন টাইপ করলে বোধ হয় আরও ভাল। 2ক্‌ট প্ল2ন।

(৮) ব্যঞ্জনাক্ষর ক্ষ বাদে ৩৩ টি। হস্‌ চিহ্নিত টাইপও ৩২টি রাখতে হয়। এতে ব্যঞ্জনাক্ষর দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অ-কারান্ত ব্যঞ্জন যত লাগে হসন্ত ব্যঞ্জন তত লাগে না। হসন্ত টাইপ না রাখলেও চলতে পারে। তাঁর প্রস্তাব, "সব ব্যঞ্জন টাইপ কর্ণিত ও স্থায়ী করাইতে পারিলে পরম লাভ হইবে।" হস্‌-চিহ্নের বিপরীত, অ-কার চিহ্ন। লেখকের প্রস্তাব O চিহ্ন দেওয়া যায়। যেমন—বিষ্‌বৃক্ষ নয়, বিষ°বৃক্ষ।

(৯) মারাঠী লেখকেরা ব্যক্তিবাচক নামের আদ্যক্ষর মোটা করেন। 'হিমালয় হিমালয় বটে।' ইংরেজির অনুকরণে **হি**মালয় ছাপতে পারলে শিশুরা বাক্যের অর্থ প্রভেদ কবতে পারে।

এই প্রবন্ধে লেখক তাঁর অক্ষর-সংক্রান্ত ভাবনা তুলে ধরেছেন। তবে লেখকের সব ভাবনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। স্ববর্ণের মধ্যে অঁ, অং, অঃ বর্ণগুলি রাখার কারণটি স্পষ্ট হয় না।

লেখক 'করিয়া' পদটি চলিত ভাষায় ক'রে কিংবা কর‍্যে লিখতে চান, ক-রে বা কোরে নয়। কর‍্যে ভাষাব মানায়িত রূপ নয়। তাই 'Standard language'-এব মধ্যে বানানটি বাখাব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নেই।

বিভিন্ন কাব-চিহ্নগুলিব প্রচলিত অবস্থান বিজ্ঞানসম্মত নয় ঠিকই, তবু এই সমস্যা বানানেব ক্ষেত্রে বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করে না। তাই অযথা এগুলিব স্থান পরিবর্তন নিরর্থক।

গু, রু, বু, শু ইত্যাদি লেখাব প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত।

লেখক ক্ষ, জ্ঞ, ষ্ণ এর পবিবর্তে খ, গ্যঁ, ষ্ট লিখতে চান। তবে ষ্ণ-যুক্তব্যঞ্জনটিতে যে দুটি বর্ণ রয়েছে, আমবা সেই দুটিই উচ্চারণ কবি, ষ্ট নয়। ষ্ণ এব অর্ধতৎসমরূপে ষ্ট আসে।

তিনি অন্তঃস্থ ব ধ্বনিটি বোঝাতে নাগবী ব (ৱ) লেখার পক্ষপাতী। বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃত বর্ণের সংযোজন অযৌক্তিক। তাছাড়া হওয়া, খাওয়া বানান হৱা, খাৱা লিখলে জটিলতা বাড়বে।

রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন সম্পর্কে তাঁব প্রস্তাব স্পষ্ট নয়।

বাঁকা এ-কার সম্বন্ধে লেখকেব প্রস্তাবটি ভেবে দেখার মতো। তবে বাঁকা এ-কাবের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও একথা বলা যায় তার প্রস্তাব কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তা সংশয়ের বিযয।

হস্‌-চিহ্ন দেওয়া না হলে শব্দটি স্বাভাবিকভাবেই অ-কারান্ত হয। অযথা বিভিন্ন চিহ্নের ভারে শব্দটিকে ভারাক্রান্ত কবলে প্রথম শিক্ষার্থীব ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়বে।

লেখকেব শেষ প্রস্তাবটিও ভিত্তিহীন। কাবণ এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গ থেকেই হতে পারে।

২৭। উচ্চারণ ও বানান। লেখক ঃ বীরেশ্বর সেন।

প্রবাসী ঃ ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—৬৪৫-৬৪৭।

অজরচন্দ্র সরকারর 'বাঙ্গালা টাইপ ও কেস' প্রবন্ধটি বীরেশ্বর সেন মহাশয়কে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে। মুদ্রণ-সংক্রান্ত কঠিন সমস্যার সরল সমাধান কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই প্রবন্ধে জানিয়েছেন ঃ

২৭.১। ক থেকে হ পর্যন্ত ৩৩টা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকবে। এছাড়া প্রচলিত য়, ড়, ঢ়, ং ঃ ঁ থাকবে। f, z, zh এবং v আমরা ইংরেজির মতো উচ্চারণ করি। এই চারটি ধ্বনি অভিধানে প্রদর্শন করবার জন্য ফ জ য—র নীচে বিন্দু এবং ব থাকা উচিত। এছাড়া আরবী পারশী খে, কাফ্ গাইন্ স্থানে যথাক্রমে নীচে বিন্দুযুক্ত খ ক এবং গ অথবা ঘ রাখা উচিত। অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৪৬ টি রাখতে চান।

২৭.২। স্বরবর্ণ ঋ ৯ ৯৯ নিয়ে মোট ১৪ টা থাকা উচিত। এছাড়া থাকবে ঽ (লুপ্ত অ)। অভিধানের জন্য সংস্কৃত অ এবং ইংরেজি cat শব্দের a জ্ঞাপন করার জন্য একটা অক্ষর থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

২৭.৩। তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে হসন্ত বিবেচনা করেন। তাই ব্যঞ্জনবর্ণের পর স্বরবর্ণ বসিয়ে বানান লেখার পক্ষপাতী। যেমন ঃ কর্ত্তব্যপরায়ণ = ক অ র ত ত অ ব য় প অ র আ য় অ ণ।

ফলাগুলি এবং কারচিহ্ন একেবারে তুলে দিতে চান।

২৭.৪। কার্য্য শব্দের বাংলায় কায না কাজ কোন্‌টি লেখা উচিত— তা নিয়ে একটা সমস্যা থেকে যায়। তিনি উচ্চারণভিত্তিক বানানের পক্ষে। তাই কাজ বানানটি রাখতে চান। তাছাড়া যাওয়া যেমন প্রভৃতি শব্দ জ দিয়ে লেখাই উচিত বলে তাঁর অভিমত।

২৭.৫। খৃষ্ট, খ্রিষ্ট খ্রীষ্ট-—এর মধ্যে খৃষ্ট বানান 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলে তাঁর মত। দীর্ঘ ঋ হলে আরও ভালো হয় বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া শিক্ষিত লোক যখন মসৃণ সরীসৃপ ইত্যাদি বানান মস্রিণ, সরীস্রিপ রূপে উচ্চারণ করেন তখন তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। কারণ ঋ কখনই ব্যঞ্জনস্পৃষ্ট ধ্বনি নয়।

২৭.৬। যতভাবে স্বর উচ্চারিত হয়, তার প্রত্যেক ধ্বনির জন্য বিভিন্ন চিহ্ন রাখার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও নয়। তাই ঊর্দ্ধকমা ঊর্দ্ধশৃঙ্গ কিংবা ঊর্দ্ধপুচ্ছ ইত্যাদির প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না।

২৭.৭। 'করিতে' পদের সংকুচিত রূপে ঊর্ধ্বকমা প্রভৃতি সৃষ্টি না করে কোর্‌তে লেখাই ভালো। লেখক করিয়া স্থলে কোরে, হইল স্থলে হোলো, চাকুরিয়া থেকে চাক্‌রে লেখার পক্ষপাতী।

২৭.৮। রামানন্দবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে লেখক হওা, খাওা, দাওা বানান চালাতে চান।

২৭.৯। 'বানান' শব্দটি ন দিয়েই লিখতে চান।

বীরেশ্বর সেন রোমীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে যেভাবে বর্ণবিন্যাস করতে চান তা একেবারেই অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কারণ এই পদ্ধতি প্রচলিত বাংলা বর্ণবিন্যাসরীতির পুরোপুরি পরিপন্থী হওয়ায় প্রাথমিকভাবে বানানশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট জটিলতা আনবে। দ্বিতীয়ত, লেখকেব বর্ণবিন্যাস প্রণালীতে গ্রন্থ মুদ্রিত হলে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি স্থান দখল করবে। ফলে গ্রন্থাদির আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সেই সকল গ্রন্থাদি

ক্রয় করা সাধারণ আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে অসম্ভব হবে।

লেখক খৃষ্ট বানান রাখতে চান। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ঋ-র প্রয়োগ আরো যথোপযুক্ত বলে মনে করেন। লেখকের এই চিন্তা যুক্তিযুক্ত নয়। দীর্ঘ ঋ-এর ব্যবহার যখন লোপ পেয়েছে তখন অযথা টেনে আনার কোনো সার্থকতা নেই।

বিভিন্ন কার-চিহ্ন সাধারণত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া হওয়া বা খাওয়া ইত্যাদি বানান যখন জটিলতা সৃষ্টি করে না তখন অযথা এগুলির পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এছাড়া, লেখকের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং এগুলির প্রচলন বানানের ক্ষেত্রে জটিলতা কমাবে বলেই মনে হয়।

২৮। বাংলা ভাষার বানান ও মুদ্রণ। *লেখক ঃ* শ্রী সুধীর মিত্র।
বিচিত্রা ঃ ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—১৮৬।

এই প্রবন্ধে লেখক দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন—একটি বাংলা শব্দের বানান গঠন সম্পর্কিত, অপরটি মুদ্রণাদি কার্যের সুবিধার জন্য টাইপকেস সম্পর্কিত। দুটি বিষয় সম্পর্কে লেখকের ভাবনা এবং প্রস্তাব এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হল ঃ

২৮.১। আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকেই বানান ধ্বনিমাত্রিক করার চেষ্টা করলেও, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে করেছেন। যেমন, গরু বা ভাল স্থলে গোরু বা ভালো লেখা হলেও সরু বা মরু সোরু বা মোরু লেখা হচ্ছে না। লেখক মনে করেন—"সর্বত্র এক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে গেলে প্রথমটা একটু অসুবিধা হইত বটে—কিন্তু পরিণামে সুবিধা হইত।"

২৮.২। বাংলা বর্ণমালায় ন-ণ, শ-ষ-স, ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য—এই কটি বর্ণের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে বানানে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ন স, ই, উ, জ কে রেখে বাকিগুলি ভাষার অঙ্গহানি না করেও বাদ দেওয়া যেতে পারে বলে তাঁর অভিমত।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে বিভিন্নরূপ বানানে যেখানে একইরূপ ধ্বনি উৎপন্ন করে বিভিন্ন অর্থের সূচনা করে সেরূপ ক্ষেত্রে কী হবে? যথা—বীণা, বিনা। লেখক মনে করেন—"এরূপ ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ অনুসারেই অর্থ স্বচ্ছন্দে সূচিত হইতে পারে—সেজন্য গতানুগতিক বানানের প্রয়োজন হইবে না।" (পৃঃ ১৮৯)

২৮.৩। বৈদেশিক শব্দকে কোন্ সূত্রাধীনে নিয়ন্ত্রিত করা হবে? লেখক মনে করেন হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি বানানে 'স' স্থলে 'শ' লেখা হলে প্রচলিত রীতি অনুসারে ভুল বলা হবে। কেন ভুল তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ বিদেশি শব্দে এরকম গোলমাল চলবেই।

২৮.৪। লেখকের প্রস্তাব "বানান ধ্বনিমাত্রিক হইলে কোন শব্দ চয়নের সময় ষত্ব, ণত্ব, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি লইয়া অনাবশ্যক মাথা ঘামাইতে হইবে না এবং যে যাহার খুসী মত বানান চালাইয়া ভাষাকে দুর্বহ ভারে এবং শিক্ষার্থীকে দুরূহ সমস্যায় ফেলিতে পারিবেন না।" লেখক ব্যাকরণের নিগড়ে ভাষাকে বেঁধে ফেলার পক্ষপাতী নন। তিনি মনে করেন "আজ যদি সাহিত্যিকেরা বানানের উক্তরূপ সংস্কার চালাইয়া লইতে চেষ্টা করেন—ব্যাকরণ তাও সসম্মানে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

২৮.৫। এরপর লেখক যুক্তবর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর সঙ্গে মুদ্রণ-সমস্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে লেখক মনে করেন। তবে বীরেশ্বর সেন বাংলা হরফগুলিকে রোমীয়

অক্ষরের ধরনে যেভাবে লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন লেখক তা মানেন না। তাঁর প্রস্তাব ঃ অ-কার, ই-কার ইত্যাদি স্বরের চিহ্ন এবং য-ফলা, ব-ফলা এই দুটিকে মাত্র রেখে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে হস্ চিহ্ন দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন—

কর্ত্তব্যপরায়ণ = কর্‌তব্য পরায়ণ।
স্ত্রী = স্‌ত্রী।
সম্মান = সম্‌মান।

২৮.৬। এরপর এই প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। যেমন ঃ

(ক) যে অক্ষবেব বাম দিকে হস্ চিহ্ন থাকবে সেটিকে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত কবে ডচ্চারণ করতে হবে। যুক্তাক্ষরের উপরের বর্ণটি হসন্ত দিয়ে, নীচেরটি স্বরান্ত রেখে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ঃ শ্লোক - শ্‌লোক। ব্রাহ্মণ = ব্রাম্‌হন।

(খ) বাংলায় বর্গ্য ব এবং অন্তঃস্থ ব আকার ও উচ্চারণে যখন এক তখন যে উচ্চারণ বাংলায লুপ্ত হয়েছে সেই অন্তঃস্থ ব কে ফিবিয়ে আনার সার্থকতা নেই। যাঁরা সংস্কৃতানুরূপ অন্তঃস্থ ব ধ্বনি শেখাতে চান তাঁরা যা (আ) বা ওযা যোগ কবে কবতে পারেন। যেমন— স্বাধীনতা সোআধীনতা।

(গ) "ণ্, ন্, ম্, য্ , ব্ , ল্ , ব্—ইহাবা কোন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে যথাক্রমে ণ ন য ল ব এইরূপ রূপ ধারণ করে—এই সংযোগকে ফলা বলা হয।" লেখকের প্রস্তাব এগুলির মধ্যে য বর্ণমালায না থাকলেও য-ফলা রাখতে হবে এবং র-ফলাও থাকবে। এছাড়া আর কোনো ফলা থাকবে না।

(ঘ) ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্ববের এবং ব্যঞ্জনের সংযোগকালে কতকগুলি বর্ণেব আকার পবিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন গু রু ইত্যাদি বণের আকার লেখক সর্বত্র সমান বাখার পক্ষপাতী। যেমন—গু বু ইত্যাদি।

(ঙ) উ-কার, ঋ-কার, র ফলা প্রভৃতি চিহ্নগুলি অক্ষরেব সঙ্গে যুক্ত কবে ঢালাই না কবার পক্ষপাতী। মুদ্রণের সুবিধার্থে চিহ্নগুলি প্রয়োজন বদলে নেওয়া যেতে পারে বলে তাঁর অভিমত। যেমন—ব-ফলা (‿) স্থানে (০)।

(চ) উচ্চারণের দিক দিয়ে দেখলে ক + ষ = ক্ষ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে বাংলা বর্ণমালায় বাখা ভালো। তবে তার উচ্চারণ বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই যেহেতু খ বা ক্‌খ-এর মতো হয়। তাই অসুবিধা সৃষ্টি না হলে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

(ছ) ঞ-ব সঙ্গে জ অথবা চ বর্ণের সঙ্গে কোনো বর্ণ যুক্ত হলে ঞ যেহেতু ন-এর মতো উচ্চারিত হয় তাই ঞ-এর পরিবর্তে ন দিয়ে কাজ চলতে পারে।

(জ) জ এর সঙ্গে ঞ যুক্ত হলে বর্ণের আকার উচ্চারণ দুই বদলে যায়। তাই স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে জ্ঞ-কে বর্ণমালায় রাখার প্রস্তাব করেছেন।

(ঝ) লেখকের প্রস্তাব দ্বিত্ববর্ণ একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে এবং রেফ্ স্থলে র-এ হস্ চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে। যেমন, বর্ব্বর—বর্‌বর।

(ঞ) ধ্বনির দিকে লক্ষ রেখে যে সকল শব্দ অপেক্ষাকৃত সরলভাবে বানান করা চলতে পারে সেই সকল শব্দের বানান সুবিধা এবং প্রয়োজনানুসারে বদলিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছেন। যেমন ঃ উর্দ্ধ—উর্ধ, অন্তর্দ্ধান—অন্তর্ধান, ধৈর্য্য—ধৈর্জ ইত্যাদি।

(ট) স্বরের পর ঃ বসাতেই হবে, তাই একে বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

(ঠ) র এর স্থানে রেফ্ দিলে মুদ্রণের স্থান কম লাগে, তাই সুবিধা হলে রেফ্ রাখার প্রস্তাব করেছেন।

(ড) বাংলা বর্ণমালায় ঋ এবং ঋ কার-এদের প্রয়োগ বেশি নেই।

"পৃথিবীকে প্রিথিবি লিখিলে অনভ্যাসবশতঃ প্রথমতঃ একটু দৃষ্টিকটু হইতে পারে—কিন্তু লাভ হইবে অনেক—ঋ এবং রি এর দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে যাইবে।"

(ঢ) সুতরাং বাংলা ভাষা মুদ্রিত করতে টাইপ লাগছে ঃ

স্বরবর্ণ	—	অ, ই, উ, ঋ, এ, ঐ, ও , ঔ = ৮								
স্বরের চিহ্ন	—	া ি ‌ু ‌ৃ ে ৈ ৗ = ৭								
ব্যঞ্জনবর্ণ	—	ক	খ	গ	ঘ	ঙ				
		চ	ছ	জ	ঝ	ঞ				
		ট	ঠ	ড	ঢ					
		ত	থ	দ	ধ	ন				
		প	ফ	ব	ভ	ম				
		র	ল	হ	স					
		ং	ঃ	ঁ	ড়	ঢ	য়	ক্ষ	জ্ঞ	= ৩৬
		ব্যঞ্জনের চিহ্ন য ফলা, ব ফলা								= ২
										৫৩টি

ঋ, ঋ কার ঞ বাদ দিলে
এবং রেফ কার ধরে—৫১ টি।

লেখক মনে করেন যুক্তাক্ষব প্রণালী বর্জিত হওযায ছাপার স্থান একটু বেশি লাগলেও অন্যান্য সুবিধা অনেক।

(ণ) লেখক বিভিন্ন কার চিহ্নগুলি ডানদিকে লেখার প্রস্তাব করেছেন।

(ত) সুতরাং বাংলায় লেখকের প্রস্তাবিত প্রণালীতে টাইপের সংখ্যা হয় ৫৩ + ৪৯ (সংখ্যা বা বিরাম চিহ্ন)—১০২ টি।

যুক্তাক্ষর বর্জিত হওয়ায় যেহেতু হসন্তযুক্ত টাইপের সংখ্যা বেশি লাগে, সেহেতু ব্যঞ্জনেব সঙ্গে পৃথক হস্ চিহ্ন না দিয়ে হস্-চিহ্ন যুক্ত এক সেট ব্যঞ্জনের টাইপ রাখা যেতে পাবে। এতে ঢ, ঝ, ঘ, ফ, হ, ং, ঃ, ঁ, ড, ঢ়, য, ক্ষ . জ্ঞ—এই ১৩ টি ব্যঞ্জনের স্বতন্ত্র হস্ চিহ্ন যুক্ত টাইপ রাখা নিষ্প্রয়োজন। সুতবাং টাইপ ৫৩ + ৪৯ + ২৩ = ১২৫ টির অধিক হবে না। এছাড়া স্বর বা ব্যঞ্জনের যে যে চিহ্ন টাইপের সঙ্গে ভালো করে মেশে না মুদ্রণের সুবিধার জন্য সেগুলি টাইপের সঙ্গে সংযুক্ত করে আর ২।১ সেট টাইপ রাখা যেতে পারে।

সুতরাং ১০০ বা ১০২, ১০৫ বা ১৬০ যে কোনো একটি ভাগ নিয়ে বাংলা টাইপ কেস্ গঠিত হতে পারে।

লেখকের বানান ও মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি খুবই সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞানসম্মত। তবে প্রচলিত অভ্যাসকে অতিক্রম করে লেখকের প্রস্তাবিত প্রণালী প্রয়োগ করলে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই লেখকের প্রস্তাবমতোই বলা যায়, যদি সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় এই বানানের প্রচলন করেন তবে ধীরে ধীরে এই বানান সমাজে চালু হয়ে যাবে। তখন ব্যাকরণও মেনে নিতে বাধ্য হবে। তবে গোটা ব্যাপারটাই দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

২৯। বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংগলা, বাংলা। কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
বিচিত্রা ঃ আষাঢ়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—৮২৫।

বিচিত্রায় শ্রী কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংগলা, বাংলা—এগুলির মধ্যে কোন্ বানানটি শুদ্ধ তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিচিত্রায় উত্থাপিত এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিচিত্রা পত্রিকায় 'বিতর্কিকা' অংশে বহু লেখক তাদের প্রস্তাব জানান। এখানে খুব সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ কবা হল মাত্র।

৩০। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা—না বাংলা?। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বিচিত্রা ঃ শ্রাবণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—১১৭।

"সাধুভাষায় (Literary Dialect) বাঙ্গালাই একমাত্র ব্যবহার্য কিন্তু চলতি বাঙ্গালায় (Standard Colloquial) 'বাংলা' লিখলেও ভুল হ'বে না। তাই ব'লে এছাড়া এর উপর অন্য কোন উপদ্রব সহ্য হবে না।"

৩১। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা—না বাংলা?। শ্রী অমরেন্দ্র নাথ দত্ত।
বিচিত্রা ঃ শ্রাবণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—১১৭।

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর অভিমত ঃ এদের মধ্যে শুদ্ধ হচ্ছে 'বাঙ্গলা'। 'বাঙ্গালা' এই কথার মাঝে 'া' কারটি অতিবিক্ত। 'বাংলা' ও 'বাঙলা'—এই শব্দ দুটি ভুল, কারণ মূল শব্দটি বঙ্গ।

৩২। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা—না বাংলা?। শ্রী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিচিত্রা ঃ শ্রাবণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—১১৮।

লেখক বহু প্রমাণাদিব দ্বাবা 'বঙ্গ' এবং তজ্জাত 'বাঙ্গালা' শব্দের প্রাচীনত্ব ও ব্যাকরণ-ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন 'বাঙ্গালা' কেবল সাধু ভাষায়, 'বাঙ্গ্লা' সাধু ও চলিত ভাষায় এবং 'বাঙলা' কেবল চল্‌তি ভাযায় চলে।

৩৩। বানান সমস্যা ঃ শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বিচিত্রা ঃ ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—২৩৫-৩৬।

'বাঙ্গলা' ভাষার বানান বিশেষত কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে দুরূহ সমস্যা গড়ে উঠেছে। যেমন, 'করিয়া' পদটি কথ্য ভাষায় বিভিন্নরূপ ধারণ করে। যেমন—

(১) কোরে (২) ক'রে (৩) করে' (৪) করে (৫) কর্যে।

এই ধরনের ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব ঃ "শব্দের দুটি আশ্রয় আছে, বানান এবং উচ্চারণ ; তার মধ্যে কোনোটিকে যদি নিত্যমূর্ত্তি দিতে হয় ত' বানানকেই দেওয়া চলে, উচ্চারণকে নয়।"

৩৪। "বানান সমস্যা ঃ শ্রী সরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৬৭৮।

এই আলোচনায় তিনি ধ্বনিভিত্তিক বানানের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, "যে দিন হইতে বঙ্গীয় লেখকগণ ধ্বনিনিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সেইদিন হইতে এই সমস্যা বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে।"

৩৫। "বানান সমস্যা ঃ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ

বিচিত্রা ঃ পৌষ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৮১৬।

লেখকের অভিমত, "বানানের বাজারে Phonetis এর প্রচলন থাকা ভাল কিন্তু অতি প্রচলন হলে তা বাজারদরকে মাটি করে দেবে।" উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হলে তা পূর্ব-বঙ্গীয় পশ্চিমবঙ্গীয় দুশ্রেণির হবে। তাই লেখক মনে করেন ঃ প্রত্যেক শব্দেব বিশেষত ক্রিয়াপদগুলির যতটা সম্ভব একটা standard বানান প্রচলতি হওয়া দরকার।

'বানান-সমস্যা' সম্পর্কিত আলোচনাগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এখানে প্রত্যেকেই ধ্বনিসংবাদী বানানের বিরোধিতা করেছেন। সংস্কারমূলক কাজে চরমপন্থী মনোভাব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া কথ্যভাষার বানানে উচ্চারণকে প্রাধান্য দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে হয়। যদি অবশ্য তা প্রচলিত রীতিকে খুব বেশি আঘাত না করে। তবে উচ্চারণভিত্তিক বানান হলেই যে তা পূর্ববঙ্গীয় বা পশ্চিমবঙ্গীয় শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যাবে তা নয়। কারণ ভাষার একটা standard বা মান্য রূপ রয়েছে। উচ্চারণভিত্তিক বানান ভাষার সেই মান্য রূপকে আশ্রয় করেই গঠিত হবে।

৩৬। বানান সমস্যা ঃ শ্রী অমলানন্দ ঘোষ।

বিচিত্রা ঃ মাঘ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৭৭-৭৮।

৩৬.১। বহুদিন ধরেই যখন দুটি 'ব' এ ভেদ নেই তখন এতকাল পরে অন্তঃস্থ 'ব' কে ধরে থাকা নিষ্প্রয়োজন। '৯' সম্পর্কেও একই প্রস্তাব। বাক্য এবং বিল্ব-এই দুটি পদে য-ফলা এবং ব-ফলার কাজ পূর্ববর্ণের উচ্চারণকে দ্বিত্ব করা। তাই অযথা এগুলি বজায় রেখে ভাষার জড়তা বৃদ্ধি করার কারণ নেই। কায ও কাণ না লিখে কাজ ও কান লেখাই উচিত।

৩৬.২। উচ্চারণানুগত বানান বর্তমান অব্যবস্থা দূর করার জন্য অনেকাংশে প্রয়োজনীয় হলেও সমস্ত ধ্বনিকে অক্ষরে বাঁধা যায় না। এতে বানান-সৌকর্য বাড়ে না বলে লেখকের অভিমত।

৩৬.৩। বোল্‌তা, সল্‌তে ইত্যাদির জন্য 'ল' ও 'ত'-এর সংযুক্ত অক্ষর রাখতে চান।

৩৬.৪। সুনীতিবাবুর প্রস্তাবিত রোমান অক্ষরে বাংলা লেখা ও ছাপাকে তিনি সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন, এই পদ্ধতির যা সুবিধা তা দু-একটি টাইপের সংস্কার করলেই পাওয়া যায়।

লেখকের প্রস্তাবগুলি প্রায় সবই যুক্তিযুক্ত তবে বোল্‌তা বা সল্‌তে—ইত্যাদির জন্য নতুন করে সংযুক্ত অক্ষর তৈরির কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না।

৩৭। " বাঙ্গলা ভাষার বানান সমস্যা ঃ শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী।

বিচিত্রা ঃ ফাল্গুন, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—২৪৫।

৩৭.১। ধ্বনিপ্রাণ ভাষার রেখাচিত্রকেই বানান বলা যায়। কোন শব্দের বানান সমস্যা উঠলে শব্দটির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন। 'নোতুন' শব্দটির বিভিন্ন রূপভেদ দেখা যায়। এগুলির মধ্যে লেখক 'নোতুন' কে ধরতে চান। কারণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" গ্রন্থে বলেছেন, "বাঙ্গালা উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট নিয়ম এই যে পরবর্ত্তী অক্ষরে ই, উ, বা য ফলা থাকিলে পূর্ববর্ত্তী অক্ষরের উচ্চারণ ও হইয়া যায়।" সুতরাং লেখক গোরু, মোতি, নোতুন ইত্যাদি বানান লেখার পক্ষপাতী।

৩৭.২। হ'য়েছে, হয়েছে, হোয়েছে, কোরে, ক'রে, করে ; জোলো, জ'লো, জলো ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লেখক ও [ো কার] দ্বারা উচ্চারণ করাই ভাষাবিজ্ঞানসম্মত মনে করেন। ['] দ্বারা [ক'রে] ইত্যাদি বানানে স্বরপতন দেখানো হয়। এক্ষেত্রেও অ দ্বারা [করে] ইত্যাদি বানান লেখা নিরর্থক মনে করেন।

৩৭.৩। বৈদেশিক শব্দের বানান সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব কোন্ উচ্চারণ অধিক সংখ্যক লোক মানবে তার উপরই বানান নির্ভর করছে। তিনি ষ্টীমার বা ইষ্টিমার, অফিস বা আপিস দুই রূপই অনুমোদন করেছেন।

৩৭.৪। 'কোন' এবং 'তবু' বানান নিয়েও জটিলতা রয়েছে। কারণ কোন (কোন্‌টা চাই?) এবং কোন (যে কোনো জিনিস) দুটি শব্দ একই বানানে লেখা হয়। তিনি প্রথমটি কোন্ এবং দ্বিতীয়টি কোনও লেখার প্রস্তাব করেছেন। 'তবু' অনেকে তবুও লেখেন। বানানকে অযথা ভারাক্রান্ত করার পক্ষপাতী তিনি নন।

লেখকের এই প্রবন্ধে সবকটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। তবে বৈদেশিক শব্দের বানানে দুটি রূপ না রেখে একটি রূপ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৩৮। বানান সমস্যা ঃ শ্রী কামাখ্যাচরণ বসু।

বিচিত্রা ঃ ফাল্গুন, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—২৪৭-৪৮।

৩৮.১। এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার বানান সমস্যাকে ৮ ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন ঃ

(ক)	'এ' কার, য়্যা কার সমস্যা।	যথা — দেখ, দ্যাখ।
(খ)	'অ' কার, 'ো' কার সমস্যা।	যথা — মন, মোন
(গ)	'ই' কার, 'ঈ' কার সমস্যা।	যথা — একটি, একটী
(ঘ)	'শ', 'স', 'ষ' সমস্যা।	যথা — খুসি, খুশি
(ঙ)	'জ' ও 'য' সমস্যা।	যথা — কাজ, কায।
(চ)	ন ও ণ সমস্যা।	যথা — কান, কাণ
(ছ)	বিদেশি ও দেশি শব্দের বানান সমস্যা।	যথা — চাবি, চাবী।
(জ)	মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ হয়ে যাওয়ার সমস্যা।	যথা — পাথর, পাতর।

৩৮.২। লেখক মনে করেন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করতে গিয়েই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান সব সময় করা হয় না। তাছাড়া লেখক মনে করেন ঃ

"যেখানে সাধু ভাষার মতো বানান ক'রলেও উচ্চারণ চলতি ভাষার মতো হয়, সেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না করাই ভালো।" (পৃঃ ২৪৮) আমরা লেজ লিখলেও যখন পড়ি ল্যাজ তখন এইরকম শব্দগুলিকে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না করলেও চলে বলে তাঁর অভিমত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ১ ও ২ নং সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন তাহলে কী? লেখক মনে করেন—বিদেশি বা ভিন্ন ভাষাভাষী বা প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য ১ ও ২ নং সমস্যার জন্য নিয়ম গড়া উচিত।

লেখক এই প্রবন্ধে বানান-সমস্যার ক্ষেত্রগুলি যথার্থই দেখিয়েছেন। তবে উচ্চারণভিত্তিক বানান সম্পর্কে লেখকের অভিমত পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। 'এ'-কার ও য়্যা-কার সংক্রান্ত সমস্যা শুধু বিদেশি বা ভিন্ন ভাষাভাষী বা প্রথম শিক্ষার্থীর সমস্যা নয়, এটি এখন একটি সাধারণ সমস্যা। সকলের স্বার্থেই এ সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

৩৯। বাঙ্গালা রচনা ও বানান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ঃ শ্রী মণীন্দ্র মন্ডল।
বিচিত্রা ঃ চৈত্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৩৬৪।

এই প্রবন্ধে লেখক উচ্চাবণভিত্তিক বানান লেখাই সঙ্গত বলে মনে করেছেন। তবে তাঁর মতে উচ্চারণ যদি বিকৃত হয়ে যায় আর সেই বিকৃত উচ্চারণের ধ্বনি যদি বানানে চালানো হয় তবে তা অত্যন্ত অমার্জনীয়। লেখকের এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪০। ভারতের লিপি সমস্যা ঃ শ্রী সুধীর চন্দ্র আচার্য।
প্রবাসী ঃ ফাল্গুন, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৭০৪-৭০৫।

ভারতেব লিপিসংক্রান্ত সমস্যাটি প্রবাসীতে প্রথম উত্থাপিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দেব পৌষ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা—৩৬৩)। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন শ্রী নিরঞ্জন নিয়োগী। যদিও লিপিসমস্যা আমাদের আলোচনার বিষয়ভুক্ত নয় ; তবু যেহেতু বানানের সঙ্গে লিপির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে তাই বিষযটি এখানে বিশ্লেষিত হল। নিরঞ্জন নিয়োগী রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি হল রোম্যান বর্ণমালা আমাদের অক্ষরমালার চেয়ে অনেক বেশি সহজ, জটিলতাহীন এবং আদর্শলিপির নিকটবর্তী। তাঁর প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর মতামত প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে প্রথমে শ্রী সুধীরচন্দ্র আচার্যেব মতামতটি বিশ্লেষিত হল।

সুধীরচন্দ্র রোম্যান লিপি গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন। এই বর্ণমালা গ্রহণে যে অসুবিধার দিকগুলি দেখা দিতে পারে এখানে তিনি তাই দেখিয়েছেন। যেমন ঃ

৪০.১। খ, ঘ, ঠ, থ ইত্যাদি বর্ণগুলি রোম্যান লিপিতে kh, gh, ṭh, th ইত্যাদি রূপে লেখা হয়। কিন্তু লেখক বর্ণগুলিকে একটি পৃথক বর্ণবিশেষ দ্বারা সূচিত করা উচিত বলে মনে করেন।

৪০ ২। নতুন সংস্কারে বাংলা বর্ণমালার এতখানি পরিবর্তন হলে নতুন শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়বে।

৪০.৩। আমাদের প্রতিলিখন অনুযায়ী 'বই লও'-র জায়গায় 'bailao' লিখতে হবে। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সবই অ-কারান্ত। কিন্তু এতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির 'অ' লোপ পাবে। পূর্বে 'ব' এর মধ্যেই যে ব্ + অ ছিল তা রাখা যাবে না।

৪১। ভারতে লিপিসমস্যা ঃ শ্রী উমাদাস গুপ্ত।

প্রবাসী ঃ ফাল্গুন, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭০৪-৭০৫।

শ্রী উমাদাস গুপ্ত মহাশয়ও রোমান বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষপাতী নন। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি হল ঃ

(১) ভারতীয় বর্ণমালা সমূহের আদি সংস্কৃত বর্ণমালা রোমান বর্ণমালা থেকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তাই রোমান বর্ণমালা গ্রহণের প্রস্তাবটিতে পশ্চাদ্‌বর্তন হবে।

(২) সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রটিগুলি দূর করে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যুক্তিসম্মত।

(৩) মাত্র একাদশ বর্ণ দ্বারা সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং পাঁচটি বর্ণ দ্বারা সমস্ত স্বরবর্ণ প্রকাশ করা যেতে পারে।

(৪) অন্ত্যবর্ণ বাদ দিলে পাঁচটি বর্গের প্রত্যেকটি বর্ণ একটি মূল শব্দের উচ্চারণে গাঢ়ত্ব ভেদ মাত্র।

(৫) ঐতিহ্য ও সেন্টিমেন্টের কথা পুরোপুরি বাদ গেছে।

শ্রী সুধীর আচার্য এবং শ্রী উমাদাস গুপ্ত— দুজনের সমালোচনারই প্রত্যুত্তর দেন শ্রী নিরঞ্জন নিয়োগী।

সুধীর চন্দ্র আচার্যের সমালোচনার উত্তরে নিয়োগী মহাশয় বলেন ঃ

(১) খ, ঘ, ছ ইত্যাদির জন্য পৃথক বর্ণ রাখা নিষ্প্রয়োজন। কারণে এগুলি প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের সঙ্গে হ যোগ করেই প্রকাশ করা যায়।

(২) অসংযুক্ত বর্ণের বানানে কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে না, কেবল অ-কারান্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনের পরের স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ এখনকার মতো ও ফলা করে বানান করতে হবে।

(৩) অযথা কোনো অক্ষরের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। অক্ষর পরিচয়ের সময় এখন যে ভাবে পড়ি সেভাবেই k, khকে ক, খ পড়া হবে। কেবল লেখার সময় অ-কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির পরে a অর্থাৎ অ-কার প্রকাশ করতে হবে।

উমাদাস গুপ্তের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে লেখক জানিয়েছেন ঃ

(১) সংস্কৃত বর্ণমালা বিজ্ঞানসম্মত, কারণ এই ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ; কিন্তু এর বর্ণের আকার প্রশংসনীয় নয়।

(২) সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রটি অপসারণ সম্ভব নয়।

(৩) মাত্র একাদশটি বর্ণ এবং কতকগুলি সহজ চিহ্নের দ্বারা যে বর্ণমালার উদ্ভাবন করতে চান তার উদাহরণ না দেওয়ায় প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যায় না।

'ভারতের লিপিসমস্যা' সংক্রান্ত সমগ্র আলোচনাটি বিশ্লেষণ করলে নিরঞ্জন নিয়োগীর প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বাংলা বর্ণমালা সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয় ঠিকই ; তবে সেই

ত্রুটিগুলি যতদূর সম্ভব দূর করে বাংলা ভাষা বাংলা বর্ণমালাতে লেখাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। সুধীর আচার্য মহাশয়ের অভিমতগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে উমাদাস গুপ্তের সব অভিমতগুলি ঠিক স্পষ্ট নয়। প্রকৃতই কতকগুলি সহজ চিহ্ন এবং একাদশটি বর্ণ দ্বারা কীভাবে বাংলা বর্ণমালা সাজাতে চান তা দৃষ্টান্তের অভাবে অস্পষ্ট থেকে যায়।

৪২। বাংলা ভাষার একদিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫ খিস্টাব্দ), পৃষ্ঠা ৯১৯।

এই প্রবন্ধের লেখক বাংলা লিপি ও সেই প্রসঙ্গে বানান-সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ণমালা ও বানানের যে যে ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তন চান সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল। প্রবন্ধটিতে লেখকের প্রস্তাবিত বানান এখানে অনুসৃত হয়েছে ঃ

৪২.১। ি, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ 'স্বরচিহ্নগুলিকে' পরিবর্তন করে া, ী-এর মত 'ব্যঞ্জনের' দক্ষিণভাগে ব্যবহারের উপযোগী 'চিহ্ণের' উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা।

৪২.২। 'যুক্তাক্ষর' নীতির পরিবর্তন করে ইউরোপী ভাষীর মত পাশাপাশি লিখার সুবিধা সৃষ্টি করা।

৪২.৩। ণত্ব, ষত্বের বহুদিনের 'দ্বন্দ্ব' উপেক্ষার জিনিস শ-ষ নয়। কেন না খাঁটি স্বর্ণ বাংলার সোণা বা সোনার বাজারে একই দর পাচ্ছে। যে সংস্কৃতে পাণটি থেকে চূণটি খস্বাব যো নেই সেই চূর্ণ পর্ণ বাংলার চুনে, পানে যখন একসাৎ হয়ে গেছে তখন প্রুয়োজনে বাংলার রূপ পরিবর্তনে তত আতঙ্ক কেন? তাই ণত্বের ন্যাকামি আর ষত্বের স্বত্ব কতটা 'পর্যন্ত' ছাড় দেওয়া চলে, সেটির হিসাব নির্দেশ করা।

৪২.৪। দ্বিত্ব নীতির অবসান করা।

৪২.৫। বর্গীয় 'ব' ও 'অন্তস্থ ব' এর মধ্যে আকৃতিগত কোনো পার্থক্য নির্ধারণ কবা।

৪২.৬। মিশ্র সংযোগে মূল অক্ষবের আমূল পরিবর্তন নীতি ত্যাগ করা। যেমন ঃ ক্ষ—ক্ষ, জ্ঞ—জ্ঞ, হ্ম—হ্ম ইত্যাদি।

লেখকের প্রস্তাবগুলি বিজ্ঞানসম্মত, তবে পুরোপুরি রূপায়িত করা সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন না করলেও বানানের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। যেমন ি, ু ইত্যাদি কারচিহ্নগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের দক্ষিণভাগে বসানো বিজ্ঞানসম্মত ঠিকই, তবে এভাবে না বসালেও বানানের ক্ষেত্রে যখন কোন অসুবিধাই সৃষ্টি হয় না তখন অযথা পরিবর্তন ঘটালে জটিলতা বাড়বে। তাছাড়া ো, ৌ-কার কীভাবে বসানো হবে—তাতেও সমস্যা সৃষ্টি হবে। লেখকের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি রূপায়িত হলে বানান অপেক্ষাকৃত সরল হবে।

৪৩। পারিভাষিক শব্দের বানান ঃ শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য, রাজশেখর বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

প্রবাসী ঃ শ্রাবণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—৫৮৩।

৪৩.১। পরিভাষা সমিতি আ-কারের দ্বিবিধ প্রয়োগ না করে শব্দভেদে অ-কারেবই দ্বিবিধ উচ্চারণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। সেই কারণে অপার, ক্লব, সর এইসব বানান মঞ্জুর করেছেন।

৪৩.২। বাংলা উচ্চারণে স, শ, ষ অভিন্ন। বিদেশি শব্দে sh, s বোঝাবার জন্য শ ও স কাজে লাগানো যেতে পারে।

৪৩.৩। হস্‌ চিহ্ন ঃ অযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত দেশীয় ও বৈদেশিক শব্দের শেষে হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্যক। যথা—ফাঁক, খোপ। কিন্তু উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হলে অন্ত্য বর্ণে হস্‌ চিহ্ন বিধেয়। যেমন ঃ ফট্‌, হল্‌।

যুক্ত ব্যঞ্জনান্ত বৈদেশিক শব্দের শেষে হস্‌ চিহ্ন বিধেয়। যথা—ভোল্ট্‌।

শব্দের মধ্যস্থিত অক্ষরে হস্‌ চিহ্ন দেওয়া বা না দেওয়া যেতে পারে। যেমন ঃ ফল্‌সা, জামবুল।

৪৩.৪। বিবৃত ও সংবৃত অ ঃ অ কারের বিবৃত উচ্চারণ (cut—u) বুঝাবার জন্য আ-কার প্রয়োগ অবিধেয়। স্থানভেদে অ-কারের বিবৃত ও সংবৃত উভয় উচ্চারণ হতে পারে। যেমন-বিবৃত সোডিয়ম (সোডিয়াম নয়) ; সংবৃত নিয়ন, ইয়র্ক।

৪৩.৫। বক্র আ ঃ বৈদেশিক শব্দে যদি বিকল্পে সরল আ বা বক্র আ উচ্চারিত হয়, তবে বাংলায় আ লেখাই বিধেয়। যেমন—আফ্রিকা কিন্তু বক্র উচ্চারণ স্পষ্ট হলে আ এই নতুন বর্ণ ও I চিহ্ন প্রযোজ্য। যেমন—কালসিয়ম।

৪৩.৬। ণ ন—বৈদেশিক শব্দে ণ বর্জনীয়। কিন্তু কয়েকস্থলে বাংলা টাইপের বশে চলতে হয়। যেমন ঃ ন্ট, ন্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ।

৪৩.৭। S, Sh—বৈদেশিক শব্দে S স্থানে স, Sh স্থানে শ বিধেয়। যেমন—পটাসিয়ম। ষ অনাবশ্যক। S স্থানে ছ অবিধেয়। (অরছেনিক নয়, আর্সেনিক)। St স্থানে স্ট—যুক্তাক্ষরটি অনাবশ্যক। যেমন ঃ স্টকহলম্‌।

৪৩.৮। f, v, w, z স্থানে যথাক্রমে ফ, ভ, ব, জ চলবে। যথা—ফ্রান্স, কেলভিন বা কেলবিন। W প্রচলিত বানানে লেখা যেতে পারে। উইলসন। Z স্থানে অধোরেখাযুক্ত জ্র বিধেয়। যথা বেনজ্রিন।

৪৩.৯। রেফের পর দ্বিত্ব—যদি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের জন্য আবশ্যক হয়, তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হবে, অন্যত্র হবে না। কার্ত্তিক, বার্ত্তা কিন্তু বর্তমান, পর্দা।

৪৩.১০। যুক্ত ব্যঞ্জন—বৈদেশিক শব্দে যথাসম্ভব দুটির বেশি ব্যঞ্জন যুক্ত না করাই ভালো। যেমন ঃ ইলেক্ট্রন নয়, ইলেক্‌ট্রন।

পরিভাষা সমিতি বানান-সংক্রান্ত যে প্রস্তাবগুলি রেখেছেন তার সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন ঃ অপার, ক্লব, সর এই সকল বানান চালু হলে তা প্রচলিত উচ্চারণের পরিপন্থী হবে বলে মনে হয়। বৈদেশিক শব্দ যেখানে হসন্ত উচ্চারিত হয় সেক্ষেত্রে হসন্ত দেওয়াই বিধেয়। শব্দের মধ্যস্থিত অক্ষরে হস্‌ চিহ্ন দেওয়া বা না দেওয়া যেতে পারে—এই প্রস্তাবটির মধ্যে ফাঁক রয়ে গেছে। যে কোনো একটি নির্দিষ্টকরে বলা হলে প্রস্তাবটি স্পষ্ট হয়। অ-কারের বিবৃত উচ্চাবণ আ দিয়ে লেখার পক্ষপাতী নন পরিভাষা সমিতি। তবে না দিয়ে লিখলে উচ্চারণের পরিপন্থী হয়। রেফের পর দ্বিত্ব প্রসঙ্গে সমিতির বক্তব্য বানানের সমতা বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনার বিষয়।

৪৪। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান ঃ বীরেশ্বর সেন।

প্রবাসী ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—২৭৭।

শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত 'পারিভাষিক শব্দের বানান' প্রবন্ধটি সম্পর্কে বীরেশ্বর সেন মহাশয় এখানে খুব সংক্ষেপে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

৪৪.১। পরিভাষা সংকলকরা বিবৃত অ স্থলে আ লেখার পক্ষপাতী নন। কিন্তু লেখক মনে করেন, বাবা, মামা শব্দের আ-কার এবং সর্বনামগুলির আ-কার বিবৃত অ ভিন্ন কিছুই নয়। তবে ইয়র্ক, লন্ডন শব্দে আ-কার দেওয়া উচিত নয়।

৪৪.২। বিদেশি হসন্ত শব্দের শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়াই ভালো। কেননা, তা না হলে স্বরান্ত শব্দও ব্যঞ্জনান্ত রূপে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪৪.৩। বীরেশ্বর বাবু রোমান অক্ষর গ্রহণের পক্ষপাতী। কারণ এতে যে কেবল বাংলা বানানের উন্নতি ও সংশোধন হবে তা নয়, বাংলা ভাষাও জীবন্ত হবে।

এখানে বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত হলেও তৃতীয় প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য নয়। রোমান অক্ষর গ্রহণের ফলে প্রচলিত অভ্যাসে বিরাট আঘাত সৃষ্টি হবে। ফলে বাংলা বানানের উন্নতি সাধন অপেক্ষা জটিলতা বাড়বে।

৪৫। বাংলা বানান সমস্যা। অধ্যাপক জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৪ ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (৮ই মার্চ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)

প্রবন্ধটির দুটি ভাগ রয়েছে। লেখক প্রথমভাগে বানান সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে লেখক তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

বাংলা ভাষার বানানের বিভিন্নতার একাধিক কারণ দেখিয়েছেন। যেমন ঃ

(ক) বহু সংস্কৃত শব্দ বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতার জন্য এইসব শব্দের শুদ্ধ বানান সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্যের কাছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

(খ) প্রায় সমান উচ্চারণযুক্ত বর্ণের (শ, ষ, স, ন, ণ, ই, ঈ) মধ্যে পার্থক্যরক্ষা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না।

(গ) বহু দেশীয় বা বিদেশীয় শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে। এগুলির বানান সম্বন্ধে ব্যাকরণ রচিত হয়নি। ফলে এদের বানানে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে।

বানান সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বহু চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও সচেষ্ট হয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখক তাঁর মতামত জানিয়েছেন ঃ

৪৫.১। সংস্কৃত থেকে গৃহীত শব্দের বানান সংস্কৃতের মতো হবে। তবে ভালো বাংলা লিখতে সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃত ভাষা বা ব্যাকরণ না জেনেও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ যাতে সম্ভব হয় তাই করতে হবে।

৪৫.২। দ্রুত গতিশীল বাংলা ভাষার বানান সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলে পূর্বের নিয়ম পালন অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি কর্তৃক প্রচারিত প্রশ্নপত্র থেকে কতকগুলি সমস্যা এখানে তুলেছেন। যেমন ঃ এক অনুস্বার দ্বারা ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম এই পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণ সাধারণের পক্ষে কঠিন উচ্চারণ-সমস্যা রূপে দেখা দেবে।

বিসর্গান্ত পদগুলি নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে। যদি বিসর্গ রাখা হয়, তবে মুখ্যতঃ সতত, সাধারণতঃ স্বর্গত প্রভৃতি শব্দে কোন্‌টি বিসর্গান্ত এবং কোন্‌টি নয় তা জানতে হলে সংস্কৃত জানতে হবে। যদি বিসর্গ না রাখেন তবে পুনপুন ইততত লিখতে হবে।

ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত পদের হস্‌ চিহ্ন নিয়েও একই সমস্যা। ত্বক্‌ বক দিক্‌ ঠিক এগুলির কোন্‌টি সংস্কৃত কোন্‌টি নয় তা নিরূপণের উপায় কী হবে?

কোথায় ও কার হবে এবং কোথায় হবে না এ সম্বন্ধে কোনো নিয়ম প্রণয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া আজ যারা যে কারণে 'ও'-কারের পক্ষপাতী, ভবিষ্যতে সে-কারণ বর্তমান নাও থাকতে পারে।

৪৫.৩। বানান সম্বন্ধে কতকগুলি সরল নিয়ম যখন করা সম্ভব নয় তখন বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার নিবারণ করতে হলে বহু নিয়ম, বহু ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। একখানা বিশাল ব্যাকরণ প্রস্তুত করাও সম্ভব নয়। আর করলেও, সেই ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম ও ব্যতিক্রম আয়ত্ত করে তদ্দ্বারা বাংলা রচনা অভ্যাস অসম্ভব।

৪৫.৪। বানান সমস্যা ছাড়া রয়েছে লিখন সমস্যা। সম্প্রতি লাইনো মুদ্রণ প্রবর্তিত হওয়ায় এর সমাধানের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও পূর্ণ সমাধান এখনও হয় নি।

এরপর লেখক বানান-সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাবগুলি জানিয়েছেন ঃ

৪৫.৫। বানান-সমস্যার সমাধান অল্পসংখ্যক বা বহুসংখ্যক নিয়ম প্রণয়ন বা উদাহরণ সংগ্রহের দ্বারা হবে না।

৪৫.৬। বহু যত্নে লিখিত নতুন ব্যাকরণের দ্বারা বানান-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও, এ যুগে তা বাঞ্ছনীয় নয়।

৪৫.৭। একখানি মাঝারি আকারের অভিধান প্রণয়নই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে হয়। অভিধানে প্রত্যেকটি শব্দের বানান ও লিখনপ্রণালী স্থির করতে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে—(ক) সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধ, (খ) প্রসিদ্ধ লেখকগণের মত, (গ) শ্রুতিমাধুর্য্য (ঘ) লিখন-সৌকর্য্য, (ঙ) মুদ্রণ-সৌকর্য্য, (চ) লাইনো মুদ্রণের সঙ্গে সামঞ্জস্য।

এইরূপ অভিধান প্রণীত হলে আরও সংস্কারের আবশ্যক হবে। দশ বছর অন্তর একবার সংস্কার করলেই চলতে পারে।

৪৫.৮। বর্তমানে নতুন পরিভাষার সাহায্যে যে সকল পুস্তক লেখা হবে তার মধ্যে এখনই বানান সমস্যা টেনে আনা কর্ত্তব্য নয়। দুই বা তিন বছর পর অভিধান সঙ্কলিত হলে তখন ঐ সকল পুস্তকের নতুন সংস্করণে নতুন বানান ব্যবহার আরম্ভ করা যেতে পারে।

৪৫.২। নতুন বানান প্রবর্তিত হলে, পুরাতন লেখকগণের রচনা কী হবে তাও ভেবে দেখার বিষয়। তাছাড়া বহু লেখক পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, কেউ অর্ধেক লিখেছেন, কারো অর্ধেক ছাপা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে কী অবস্থা হবে তাও ভাবতে হবে। এইসব বিবেচনা করে তিনি মনে করেছেন বানান-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অতিরিক্ত দ্রুত করে লাভ নেই।

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে লেখক বানান সংক্রান্ত কটি প্রকৃত সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন এবং সেগুলির সমাধান সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়েছেন। লেখক মনে করেন নিয়ম প্রণয়ন করে বাংলা বানানের সংস্কার সম্ভব নয়।

বাস্তবিকই এই ধরনের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। তাই প্রবন্ধ প্রকাশের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি পর পর তিনবার বানানের সংস্কার করে নিয়মাবলি প্রকাশ করেন। কিন্তু এত করেও বাংলা বানান সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। বাংলা ভাষা গতিশীল। সেখানে কোনো সংস্কারই নিয়ম করে গ্রহণ করানো যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মগুলি স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়ে যায়। যেমন, শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে; যুক্তাক্ষর আপন খেয়ালেই ভেঙে যাচ্ছে। লেখক অভিধানের সাহায্যে বাংলা বানান স্থিরীকৃত করার পক্ষপাতী। কিন্তু এখানে সমস্যা থেকে যায়। অভিধানে বানানের কোন্ রূপটি স্থান পাবে তা নিয়েও তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হতে পাবে। তাই শেষ পর্যন্ত মনে হয়, পথ দেখানো বুদ্ধিজীবীদের কাজ কিন্তু সে-পথ প্রয়োজনের তাগিদে সময়ের আনুকূল্যে আপনা-আপনি গৃহীত হবে। জোর করে গ্রহণ করানো সম্ভব নয়।

৪৬। চলিত ভাষার সংস্কার ঃ রাধারাণী দেব ও নরেন্দ্র দেব।

ভারতবর্ষ ঃ চৈত্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা—৪৮৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা চলিত ভাষার বানান নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এঁদের মতে সে প্রচেষ্টা একটু দ্বিধাজড়িত ; সাধু ও চলিতেব মধ্যে একটা রফা করে চলার চেষ্টামাত্র। এই প্রবন্ধে কীভাবে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জন করে বাংলা বর্ণমালাকে ভারমুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে এঁরা চিন্তা করেছেন। এঁদের প্রস্তাব হল ঃ

৪৬.১। বাংলা ভাষায় ১৪টি স্বরবর্ণের পবিবর্তে কেবলমাত্র অ, আ, ই, উ, এ, ও— এই ৬ টি থাকলে যথেষ্ট। কাবণ চলিত বাংলা ৯ ৯৯ কে বর্জন কবে চলে। আর ঋ, ঐ, ঔ স্বাধীন বর্ণ নয়, তাই অনায়াসে সন্ধিবিচ্ছেদ করে উচ্চারণ করা চলে (ঋ = র-ই, ঐ = অ-ই বা ও-ই, ঔ - অ-উ বা ও-উ)। চলিত বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই, তাই ঈ, ঊ না হলেও চলে।

৪৬.২। ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে ঙ, জ, ঞ, ণ, ব, শ, স ঢ ঃ এবং ৎ সহজেই বাদ দিয়ে চলিত ভাষা মাত্র ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে কাজ চালাতে পারে। তবে এভাবে অক্ষরসংখ্যা হ্রাস করলে বানানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হবে কিনা বা হলে কীভাবে তার সমাধান সম্ভব সে দিকটি নিয়েও ভেবেছেন। যেমন ঃ

ঙ স্থানে ং কে বসানো হবে। তবে বাঙালী বাঙালী ইত্যাদি বানানে 'ঙ'-য় আকার ?-চিহ্ন দেওয়ার পবিবর্তে 'ঙ'-টাকে বাদ দিয়ে পুরো আ-কারটাই ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

বর্গীয় 'জ' এর কায অন্তঃস্থ 'য' দিয়ে সারতে চান। কারণ য এর তলায় ফুটকি দিয়ে 'য়' অক্ষরটি পাওয়া যায়। এতে মুদ্রণের সুবিধা হবে।

ঞ-র প্রয়োজন দন্ত্য 'ন' দিয়েই মেটে। 'জ্ঞ' ')'ফলা ও ँ চন্দ্রবিন্দু দিয়েই চলতে পারে। হসন্ত চিহ্নটি প্রয়োজনীয়। এটি না হলে যুক্তাক্ষর বর্জন সম্ভব নয়।

'ণ' এর পরিবর্তে দন্ত্য ন দ্বারাই চলিত বাংলার প্রয়োজন মেটানো যায়। অন্তঃস্থ 'ব'-টি বাংলা ভাষায় কোনো কাজেই আসে না।

তিনটি শ-এর মধ্যে মূর্ধন্য 'ষ' কে রাখতে চান। কারণ অন্তঃস্থ 'য'-এর পেট কাটলেই এটি পাওয়া যায়।

ঃ বিসর্গের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। দুঃসময়, দুঃখ ইত্যাদি বানান 'দুষ্‌সময়, 'দুক্‌খ' এইভাবে লিখতে চান।

ঢ় নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের মতে 'কেবলমাত্র 'ড়' থাকলেই 'মূড়্‌হ' জনেরাও তার 'গুড়্‌হ' অর্থটা 'গাড়্‌হ' ভাবেই বুঝবে।

ত-এ হসন্ত দ্বারা ৎ বোঝানো যায়।

৪৬.৩। হসন্ত দিয়ে সমস্ত যুক্তব্যঞ্জন তুলে দিতে চান (যেমন ঃ রক্‌খা, বক্‌তব্য)। 'দ্বৈগুণী' যুক্তাক্ষর ছাড়া 'ত্রৈগুণী' যুক্তাক্ষরেরও তাঁরা বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা লক্ষ্মণ, উজ্জ্বল, মহত্ত্ব ইত্যাদি বানান লিখতে চান 'লখান' 'উজ্যাল্‌' ইত্যাদি।

৪৬ ৪। এঁরা ই'কার উ'কার প্রভৃতি চিহ্ন ও য'ফলা র' ফলা ম' ফলা, ব'ফলা ন'ফলা, প'ফলা—এর কিছু পরিবর্তন চান। যেমন ঃ

স্বরবর্ণ থেকে ঈ, ঊ যখন বাদ যাচ্ছে, তখন ই-কার ব্যঞ্জনের ডান দিকে লেখাই সুবিধা (যেমন ঃ তীনী)। '◌ু' চিহ্নটি সর্বদাই নীচের দিকে একপাশে থাকবে। ঋষি লেখা হবে 'রীষী'। ◌্র ফলা তলার দিকে থাকলে হবে—র + ই = রি। উপর দিকে থাকলে হবে 'র' ফলা। যেমন, ত> ম্ব্যাক ত^ ইলক্য, বৃষারূড়্‌হ)। 'ে' চিহ্ন অপরিবর্তিত রেখে 'ও কারের বেলায় পুরাতন 'ঔ' কার চিহ্নটার শেষাংশটি ব্যবহার করা প্রস্তাব করেছেন। যেমন ঃ শোক নয়, শীক)।

ঐ, ঔ কারের প্রয়োজন নেই। কারণ ই বা উ দিয়েই লেখা যাবে।

৪৬.৫। বিভিন্ন ব্যঞ্জনফলাও তাঁরা বাদ দিতে চান। যেমন ঃ ক্র না লিখে 'ক' এর মাথার পাশে 'র' ফলা অর্থে প্রযুক্ত 'রি' ফলা দিলেই হয। যথা—বক>। ব-ফলাও অনাবশ্যক। কারণ অধিকাংশ শব্দেই এর উচ্চারণ হয় না। যেমন ঃ স্বাধীন, শ্বেত ইত্যাদি। যেখানে এর উচ্চারণ রয়েছে সেখানে '্য' ফলাতেই কাজ চলবে। যেমন ঃ 'বিদ্যেষ', 'অষ্য' ইত্যাদি। 'ন' ফলারও প্রয়োজন নেই, সেটির কাজ '্য' ফলাতেই চলবে। যেমন ঃ অন্য, বিষন্য দন্ত্য ন'য়ে হসন্ত ও 'ন' দিলেও চলে। যেমন, কৃষ্‌ন। ভর্সাঁ, পদ্যাঁ,—এইভাবে ম-ফলার কাজ চলতে পারে। রেফ্‌টা তাঁরা রাখতে চান।

সুতরাং তাঁদের প্রস্তাবানুযায়ী স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, উ, এ, ও—৬

ব্যঞ্জনবর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, হ, ং ঁ ড়, য় = ৩০,

স্বরচিহ্ন—া, ী, ◌ু , ে, ৗ = ৫

ব্যঞ্জনফলা—্য, ◌্র , ◌, ◌, ´ = ৫

এই কটি দ্বারাই তাঁরা চলিত বাংলা চালাতে চান।

৪৬.৬। উচ্চারণ-সঙ্কট নিয়েও তাঁরা ভেবেছেন। 'এ' কারের সোজা ও বাঁকা দুরকম উচ্চারণের জন্য অথবা 'য' ও 'য়' এর উচ্চারণ-পার্থক্য প্রকাশের জন্য পৃথক চিহ্ন রাখার যৌক্তিকতা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। এ ব্যাপারটি পাঠকের জ্ঞানের উপর ছেড়ে দিতে চান।

৪৬.৭। ঈ, ঊ, জ, ণ ইত্যাদি বর্ণ তুলে দিলে অর্থ বিভ্রাটের প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত হল, বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ রয়েছে যার বানান এক, কিন্তু অর্থ বহু। সুতরাং এ আপত্তি একেবারেই টেকে না। প্রসঙ্গ থেকেই অর্থ বুঝে নেওয়া যায়।

৪৬.৮। লিঙ্গ বিপর্যয়ের আশঙ্কাও ভিত্তিহীন। কারণ ই ও নি প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির ক্ষেত্রে কোনো রদবদল হয় না। তবে ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলি 'ই' দিয়ে লেখা হলে কোনো ক্ষতি হয় না বলে তাঁদের মত।

৪৬.৯। শেষ পর্যায়ে তাঁরা ভাষা নিয়ে চিন্তা করেছেন। চলিত ভাষায় তাঁরা সাধুশব্দ যতদূর সম্ভব কম ব্যবহারের পক্ষপাতী। যাইহোক, ভাষাপ্রসঙ্গ আমাদের বানান-সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিশেষে তাঁদের অভিমত এই যে, "বিশ্ববিদ্যালয় আগে বর্ণ সংক্ষেপ করে নিয়ে, যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করে চলিত ভাষার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করুন, কেন না ভাষা একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ না নেওয়া পর্যন্ত তার সঠিক ব্যাকরণ গড়া সম্ভব হতে পারে না এবং তার বানান নিরূপণও সহজসাধ্য নয়।"

প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু বর্ণসংক্ষেপ করা। বাংলা বর্ণমালা সংক্ষেপ করা জরুরি ঠিকই, তবে এঁরা যেভাবে বর্ণসংক্ষেপ করতে চান তা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। বিভিন্ন অসংগতির ক্ষেত্রগুলি এখানে তুলে ধরা হল ঃ

স্বরবর্ণ ঃ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ না থাকলে বানানের একটি জটিল সমস্যা দূরীভূত হয় ঠিকই তবে এ রীতি নিয়ম করে চালু করা সম্ভব না। প্রয়োজনের তাগিদে যখন স্বাভাবিকভাবে এই রীতি অনুসৃত হবে তখনই তা ফলপ্রসূ হবে।

ঐ বা ঔ বর্ণটি অই বা অউ রূপে লেখার প্রচলন বর্তমানে কোথাও কোথাও লক্ষ কবা যাচ্ছে। তবে কাব-চিহ্নগুলি বানানেব ক্ষেত্রে যখন সমস্যা সৃষ্টি করে না তখন অযথা এগুলি পরিবর্তন করা যুক্তিহীন।

ব্যঞ্জনবর্ণ প্রসঙ্গটি সম্পর্কেও কিছু বলার থাকে। যেমন, জ-য এর মধ্যে একটি যদি বাদ দিতেই হয় তবে সেটি য, জ নয়। যে যুক্তিতে য রাখতে চান তা ভিত্তিহীন।

তিনটি শিস্‌ধ্বনি জ্ঞাপক বর্ণের মধ্যে যে যুক্তিতে তাঁরা 'ষ' রাখার প্রস্তাব করেছেন তাও ভিত্তিহীন। বাংলা যে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় সেটি 'শ'। তাই 'শ' কোনোমতেই বাদ দেওয়া যায় না। কোথাও কোথাও 'স' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তাই 'স' বর্ণটিকেও পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না। যদি কোনো বর্ণ দিতে হয় তবে সেটি 'ষ'।

ব্যঞ্জন ফলাগুলি সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব বিবেচনাসাপেক্ষ। সমস্ত ফলাগুলি তাঁরা যে পদ্ধতিতে তুলে দিতে চান তা বানানের জটিলতা কতটা কমাবে তা ভাব্যর বিষয়। সব ফলাগুলি যদি তুলে দেন তবে ' ্য ' ফলাটি কোন্ যুক্তিতে পড়ে থাকে তা বোঝা যায় না। বিদ্বেষ বানানটি 'বিদ্যেষ' না লিখে 'বিদ্‌দেষ' লিখলে অসুবিধা কোথায়?

বর্ণ সংক্ষেপ করার তাগিদে প্রয়োজনীয় ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণগুলি অস্বীকার করা যুক্তিহীন। বাঁকা এ এবং z ধ্বনিজ্ঞাপক কোনো বর্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন না। কিন্তু দুটি বর্ণই বর্ণমালায় স্থান পাওয়া জরুরি।

যাইহোক, এই প্রবন্ধে উত্থাপিত সব কটি প্রস্তাব মেনে নেওয়া না গেলেও, কিছু কিছু প্রস্তাব ভেবে দেখার মতো।

৪৭। বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার। ব্রহ্মানন্দ সেন।

ভারতবর্ষ ঃ মাঘ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ), পৃষ্ঠা—২৪৪-৪৬।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি বানান-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন মে, ১৯৩৬। এই প্রবন্ধ তার পরেই লেখা। তবু ক্রম রক্ষার জন্য সংস্কার-পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'চলিত ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধটির পর এই প্রবন্ধটিকে রাখা হল। কারণ রাধারাণী দেব ও নরেন্দ্র দেব ('চলিত ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধটিতে) যা বলেছেন এই প্রবন্ধে লেখক ব্রহ্মানন্দ সেন সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন।

৪৭.১। তিনি অতিরিক্ত বর্ণ সংক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে লেখক স্বরবর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, শুধু পদ্যে কেন, গদ্যেও রীতিমত দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই দীর্ঘ ঈ কার বা দীর্ঘ উ কার ওঠানোর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া যে যুক্তিতে তাঁরা ি - কার আগে না বসিয়ে পরে বসানোর পক্ষপাতী সেই যুক্তিতে ে - কারও বর্ণের পরে বসানো উচিত বলে লেখক মনে করেন। তাঁরা 'ৗ' চিহ্ন দ্বারা 'ও' কারের কাজে চালাতে চান। লেখকের বক্তব্য, এই চিহ্নটি দ্বারা যোগেশবাবু আউ বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি যেখানে দুটি স্বরের (া + উ) বদলে একটি স্বর ('ৗ') রাখছেন, তাঁরা সেখানে একটি স্বর কমিয়ে দুটি স্বরের পক্ষপাতী (ঐ বা ঔ এর বদলে 'অই', 'অউ')।

৪৭.২। ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্যা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। লেখকও 'ঙ' বাতিল করার পক্ষপাতী। তবে তিনি 'বাঙ্গালী'র প্রস্তাবিত বানান 'বাংআলী' না লিখে বাংলী লেখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

ণত্ব-ষত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন। 'ণ' বাতিলের বিরোধিতা করেছেন। কারণ তাঁর অভিমত দুই 'ন'-এর উচ্চারণে পার্থক্য এখনও আমাদের মুখে উচ্চারিত হয়।

শ, ষ, স—তিনটির মধ্যে তাঁরা কেবল ষ রাখতে চান। লেখকের প্রস্তাব, বাংলা ভাষায় 'স' যুক্ত শব্দ সকলের চেয়ে বেশি, তাই 'স' কোনোমতেই বাদ দেওয়া যায় না। আর 'শ' ও 'ষ' এর মধ্যে কোনো একটিকে বাদ দিতে হলে 'ষ'-কেই বাদ দেওয়া উচিত। তাঁরা 'ব' ফলা বাতিল করে 'য' ফলা রাখতে চান। কিন্তু লেখকের বক্তব্য সত্য এবং দ্বিত্ব-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য কোনো শব্দ বা অক্ষরকে দায়ী করা যায় না বা বর্ণসংক্ষেপের জন্য অশুদ্ধ উচ্চারণকেও মেনে নেওয়া উচিত না। লেখক মনে করেন, 'ন' ফলা বাদ দিলে অন্ন এবং অন্যের পার্থক্য বোঝানো যাবে না।

'ক্ষ' বাদ দিলে সংস্কৃত শ্লোক বা সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনা উদ্ধৃত করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না বলে তার অভিমত।

এককথায় চল্‌তি ভাষার দোহাই দিয়ে এই 'কালাপাহাড়ী' বর্ণসংস্কার নীতিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

লেখক ধর্ম বানানটি ধর্‌ম—এইভাবে লেখার পক্ষপাতী। তাতে দ্বিত্বের সম্ভাবনা থাকে না।

লেখক চলতি ভাষার দোহাই দিয়ে এই অতিরিক্ত বর্ণসংক্ষেপ নীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ রাখতে চান। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে বর্ণানুযায়ী হ্রস্ব দীর্ঘভেদ

কোথাও নেই। এই হ্রস্ব দীর্ঘ-ভেদ উঠে গেলে বানানের একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে এ দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। যেমন ভাবে আজ স্বাভাবিক নিয়মে যুক্তাক্ষর ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে সেইভাবে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ একদিন উঠে যাবে। জোর করে বর্ণ সংক্ষেপ করতে গেলে জটিলতা বাড়াবে।

কার-চিহ্নের অযথা রদবদল ঘটালে জটিলতা বাড়বে বলেই মনে হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণের সমস্যা সংক্রান্ত লেখকের প্রস্তাবগুলি পুরোপুরি মানা যায় না। কারণ বাংলা উচ্চারণে ন এবং ণ এর মধ্যে পার্থক্য নেই। তাই ণ-এর বোঝা যদি স্বাভাবিক নিয়মে হালকা হয়ে যায় তবে তাই বাঞ্ছনীয়।

তবে সমস্ত ফলাগুলি তুলে দিয়ে মাত্র পাঁচটি রাখার যে প্রস্তাব পূর্ববর্তী প্রবন্ধে করা হয়েছে লেখক তার বিরোধিতা করেছেন। সব ফলাগুলি এভাবে তুলে দেওয়া যায় কিনা তা বিভিন্ন দিক থেকে বিচারসাপেক্ষ।

৪৮। বাংলা বানান সমস্যা। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১ বৈশাখ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)

আনন্দবাজারে প্রকাশিত জ্যোতির্ময় ঘোষের 'বাংলা বানান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে এই প্রবন্ধে লেখক তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি লেখকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে বাংলা বানানের প্রকৃত কটি সমস্যার দিক তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই প্রবন্ধের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান সমস্যার সমাধানকল্পে উদ্যোগী হয়েছেন সে সংবাদ জনসাধারণের গোচরীভূত হয়েছে। এই সংবাদ তখন বিশেষভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে লেখকের অভিমত। কারণ ঃ

(১) বাংলার বানান-সমস্যা সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক সচেতন নন। বানানের এই বিশৃঙ্খলা যে কতপ্রকারে আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি কবেছে তা বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে কাজ সহজ হবে বলে লেখকের বিশ্বাস।

(২) বাংলা বানান-সমস্যা যে বাস্তবিকই একটা সমস্যা একথা যখন সকলেই বুঝতে পারবেন, তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট প্রণালীর চাহিদা আপনা থেকেই দেখা যাবে। তখন বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সমবেত চেষ্টায় যে বানান-প্রণালী প্রস্তুত হবে সর্বসাধারণের তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না।

এরপর লেখক পূর্ববর্তী প্রবন্ধে ডঃ ঘোষ বিসর্গান্ত ও হসন্ত শব্দগুলি সম্বন্ধে যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন ঃ

লেখক মনে করেন, সংস্কৃত শব্দের যেখানে হস্ বা বিসর্গ আছে তা রক্ষা করাই যদি স্থির হয় তাহলে সংস্কৃত না জানলেও লোকে বানান অভ্যাস করবে।

৪৯। চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান। শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষ ঃ বৈশাখ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ), পৃষ্ঠা—৬৫৭।

চলতি বাংলায় বানানের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা ও সে সম্পর্কে লেখকের অভিমত এই প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন।

৪৯.১। **অ-ও ঃ** বাংলা শব্দের শেষ অক্ষরে যদি অ-স্বর থাকে এবং সেই অ যদি গ্রস্ত না হয়, তার উচ্চারণ হয় কতকটা 'ও'র মতো, যেমন, মত—মতো।

লেখকের মতে, এ নিয়মের বিপর্যয় যখন কখনই ঘটে না তখন ও-কার যোগ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

'এমনতর', 'অধিকতর' উভয় শব্দেরই 'র'-এর উচ্চারণ হয় 'রো'-এর মতো। প্রশ্ন হল কোথায় ও-কার হবে। লেখক মনে করেন সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ অবিকৃত থাকবে এমন যদি স্থির হয় তবে 'অধিকতর'তে 'ও' যোগ করা চলে না। কিন্তু 'এমনতর'-কে এমনতরো লিখলে ক্ষতি হয় না।

পরে ই বা ঈ স্বর থাকলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মত হয়। ই স্বর লোপ পেলেও পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হয়। যেমন ঃ কেমন 'করে' এলে? কিন্তু সে এখন কী 'করে'। এইসব শব্দে 'ও' কারের চিহ্ন কিছু না থাকলেও 'ও' কারের অস্তিত্ব বোঝাবার পক্ষে অসুবিধা হয় না বলে লেখকের ধারণা।

এছাড়াও বিভিন্ন কাবণে 'অ' 'ও' এব মতো উচ্চাবিত হয়। তবে লেখকের মত "উচ্চারণ অনুসারে বানান-পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাংলা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে।" তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যুৎপন্ন এবং বানানে ভেদ আছে এমন অনেক শব্দ একই রূপে উচ্চারিত হয়, এক্ষেত্রে বানান এক করে ফেললে অর্থগ্রহণের পক্ষে অসুবিধা জন্মাবে। যেমন— 'লক্ষ' 'লক্ষ্য', 'কটী' 'কোটী'।

৪৯.২। **ই-ঈ ঃ** বাংলায় 'ই' ও 'ঈ' র উচ্চারণে কোনো ভেদ নেই বললে অনেকে মনে করবেন উভয় ই স্বরেব উচ্চারণ একই রকম।

মামী, মাসী, পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ঈ'-এর ব্যবহার বেশি। কিন্তু 'ঈ' যদি সর্বজনগ্রাহ্য হয় তাহলে 'দিদি'-র কী বানান হবে?

বিভিন্ন ইন্-ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দ সাধারণত ঈ-কারান্ত। অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হলে কোথাও সংস্কৃত নিয়মে ই কার হয কোথাও ঈ কার রাখা হয়। এখন কর্তব্য কী তাই নিয়ে সমস্যা দেখা যায়।

বিদেশী-জাতীয়-দেশীয় বোঝাতে উভয় স্বরের ব্যবহার হয়। যেমন ঃ খ্রিষ্ট-খ্রীষ্ট, হিন্দুস্থানী-নি, ফারসী-সি ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

৪৯.৩। **উ-ঊঃ** উ কারের গোলমাল বেশি না হলেও রয়েছে।

৪৯.৪। **ঋ-ঌ ঃ** লেখকের প্রস্তাব, ঋ তৎসম শব্দে আছে থাক। তদ্ভব শব্দে রাখা সম্ভব হলে থাকুক কিন্তু দেশজ বা বিদেশি শব্দে ঋ রাখার প্রয়োজন নেই।

ঌ-এর স্থান বর্ণমালায় থাকলেও, ভাষায় এর ব্যবহার নেই।

৪৯.৫। 'এ'-এর উচ্চারণ দ্বিবিধ। একটি সাধারণ উচ্চারণ। যেমন ঃ বেল, তেল। এছাড়া রয়েছে একটি বক্র উচ্চারণ। যেমন ঃ বেচা, হেলা ইত্যাদি। এই বাঁকা উচ্চারণটি বর্ণমালায় কীভাবে স্থান পাবে তাই নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৪৯.৬। **ঐ-ওই-অই ঃ** ঐ ধ্বনির বানান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক বলে লেখক মনে করেন। কেউ লেখেন ঐ, কেউবা ওই, আবার কেউ অই। কোন্ বানানটি থাকবে তা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৪৯.৭। **ঔ-ওউ-অউ :** ঔ সম্বন্ধেও একই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪৯.৮। **মহাপ্রাণ বর্ণ :** বাংলায় মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা শব্দের আদি ব্যতীত অন্যত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাই মহাপ্রাণ বর্ণগুলির সম্বন্ধে একটা নিয়ম করা আশু প্রয়োজন বলে তাঁর প্রস্তাব।

৪৯.৯। **জ-য :** কোথায় 'জ' এবং কোথায় 'য' হবে এটা একটা সমস্যার বিষয়। লেখক দেশজ বা বিদেশি শব্দে একটিমাত্র 'জ' রাখাই বিধেয় মনে করেন।

৪৯.১০। **র-ড় :** পূর্ববঙ্গীয় লেখকদের হাতে পড়ে কখনো 'ড়' 'র' হয়ে যাচ্ছে। এগুলিকে অবশ্য তিনি সাধারণ ভুল বলেই মনে করেন।

৪৯.১১। **ন-ণ :** ন ও ণ সমস্যাও বড়ো জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় দন্ত্য-ন কোথায় মূর্ধন্য ণ হবে সে বিচারের ভার পন্ডিতের উপর।

৪৯.১২। **রেফ (́) :** সংস্কৃতে রেফযুক্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। লেখকের অভিমত হল, "দ্বিত্ব না করিলে যখন সংস্কৃতে অশুদ্ধ হয় না তখন বাংলায় তৎসম শব্দ বানান করিতে বৃথা দ্বিত্ব করার আবশ্যক কি?"

৪৯.১৩। **বিসর্গ (ঃ) :** ক্রমশঃ, অন্ততঃ, বস্তুতঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গকে অনেক লেখকই বিসর্জন করছেন, আবার রক্ষাও করছেন। কী করা কর্তব্য তা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

৪৯.১৪। **ম-ব:** 'ম' চলিত বাংলায় কোনো কোনো লেখকের হাতে স্থান-বিশেষে 'ব' হয়ে যায়। যেমন আম থেকে আঁব, তামা থেকে তাঁবা। কোন শব্দটি রাখা হবে তা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৪৯.১৫। **ঊর্ধ্বকমা বা ইলেক (') :** লেখকের প্রস্তাব : ইলেকের ব্যবহার যদি আদৌ থাকে তবে তা কোথায় বসবে তা স্থির করা দরকার। ইলেক-সংক্রান্ত সমস্যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়। যেমন : অসমাপিকা ক্রিয়ায়, অনুজ্ঞায়, বিসর্গান্ত শব্দে বিসর্গ লোপ হলে সেক্ষেত্রে তার (তাহার) যার (যাহার) প্রভৃতি শব্দে লুপ্ত 'হা'র স্থলে ইত্যাদি।

৪৯.১৬। **হাইফেন [-] ও ফাঁক :** সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে (কূল-কিনারা) ও এ, যে প্রভৃতি সর্বনামের পরবর্তী অংশে (এ-কথা, যে-লোক) হাইফেন বসবে কি বসবে না এ নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়।

৪৯.১৭। **ং, ঙ্, ঙ্গ্ । ঙ, ঙ্গ :** এই বর্ণ কটি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দেয়। যেমন :

(ক) অনুস্বার, ঙ্, এবং ঙ্গ্ নির্বিচারে একই স্থানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন : বাংলা, বাঙ্‌লা, বাঙ্গালা, বাঙলা, বাঙ্গলা।

(খ) স্বরান্ত উচ্চারণে ঙ ঙ্গ দুই ব্যবহার হচ্ছে। যেমন : বাঙালী, বাঙ্গালীর মতো শুধু অ-তৎসম শব্দে নয়, তৎসম শব্দেও এই বিপত্তি ঘটে। যেমন : গংগা, অংগ। কিন্তু লেখকের মতে, এ সকল স্থলে ং-এর প্রয়োগ ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ। বিকল্প বর্জন করে সর্বত্র পঞ্চম বর্ণ ব্যবহার করাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

এছাড়া হসন্ত ব্যবহারের অনিয়মবশত আর এক ধরনের বিপত্তি ঘটে।

এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা বানানের কতকগুলি জটিল সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের আগে এ প্রবন্ধ লেখা। বানান সংস্কার কমিটির সুপারিশ চালু করার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবু আজও লেখক-বর্ণিত অনেকগুলি সমস্যার সমাধান হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৩৬-১৯৩৭ পর্ব

বাংলা বানানকে কেন্দ্র করে যখন তুমুল বাগ্‌বিতন্ডা চলছে, সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানে একরূপতা ও সরলতা সম্পাদনের জন্য বানান সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার কমিটি গঠন করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তিনটি সংস্করণ পর পর প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই বিধিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে সংস্কারের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করব। শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধির গোড়ার কথা' প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এখানে আমরা অনেকটাই তার সাহায্য নিয়েছি।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশকালীন অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রদের কয়েকটি ভাষণ দেবেন এবং বাংলা ভাষার অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মে সহায়তা করবেন।

এই গবেষণা প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়েব নিকট একটি প্রস্তাব তোলেন। তিনি বলেন, বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখনও উপাচার্য না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তিনিই পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবও তিনি অনুমোদন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ কাজেব প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথকেই অনুরোধ করেন। কবি সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। কবির পরিচালনায় পরিভাষা সংকলন ও বানান সংস্কারের কাজ চলতে লাগল। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকাল শেষ হলে শান্তিনিকেতনে পরিচালিত কবির এই পরিভাষা ও বানানের কাজ একরকম বন্ধ হয়।

এর মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনেই একটি সমিতি গঠন করেন। এই পরিভাষা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং সম্পাদক ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। এছাড়া অন্য সদস্যরা ছিলেন হলেন ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

পরিভাষা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কারের কাজেও হাত দেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিরও সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। সদস্যরূপে আসেন ঃ

প্রমথনাথ চৌধুরী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বানান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু প্রাথমিক কাজকর্ম করেন সবই কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির হাতে পূর্বেই তুলে দেন। নতুন বানান সংস্কার সমিতি এই প্রাথমিক উপকরণগুলি নিয়ে কাজ শুরু করেন। বানানের একটি রীতি নির্দিষ্ট করাই ছিল বানান সমিতির উদ্দেশ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দ সমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটি বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতে গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।"

এই কারণেই সর্বজনমান্য একটি বানানরীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

সেই কাবণেই সাধাবণত আমরা বানান সম্পর্কে যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হই, তারই ভিত্তিতে সংস্কার সমিতি একটি প্রশ্নতালিকা তৈরি করেন। বিভিন্ন লেখক ও অধ্যাপকদের কাছে তা পাঠানো হয়। প্রায় শ-দুয়েক উত্তরও আসে। সমস্ত মতামত বিচার করে সংস্কার সমিতি বানানবিধি তৈরি করেন। বানান সমিতি গঠনের মাস ছয়েকের মধ্যেই (অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নতুন বানান পদ্ধতিসম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হল। এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই যুক্তিঋদ্ধ সমালোচনার আলোকে সংস্কার সমিতি তাঁদের সংকলিত নিয়মগুলি পুনর্বিচার করে ঐ বছর অক্‌টোবর মাসে বানানবিধি-সম্বলিত পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। একই কারণে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে সমিতি কতকগুলি মূল নীতি গ্রহণ করলেন। সেগুলি হল ঃ

(১) "বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়।"

(২) "নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এই প্রকার শব্দের বাংলা রূপ এখনও বদ্ধ হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম কর্ত্তব্য।"

(৩) "অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। বহুস্থানে সংস্কৃত রীতিতেই সমাস সন্ধির দ্বারা নূতন শব্দ গঠন করা হয়। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।"

আলোচনার সুবিধার্থে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তিনটি সংস্করণই এখানে তুলে দেওয়া হল।

বাংলা বানানের নিয়ম (প্রথম সংস্করণ)

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ**

যদি পদের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, যথা—'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না, যথা ঃ 'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব।

শেষোক্ত স্থলে রেফের পর দ্বিত্ব সংক্রান্ত ব্যাকরণ-অনুসারে বিকল্পে, সিদ্ধ না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়। হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় এই দ্বিত্ব হয় না।

২। **সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার ঃ** যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন, অথবা অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা সঞ্জাত, স্বয়ম্ভু। বাংলার সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গেব পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, কারণ বাংলায় অনুস্বারের উচ্চারণ ঙ-র সমান।

৩। **বিসর্গন্ত পদ ঃ** বাংলায় বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে, যথা—'আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, সদা। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হইবে। যথা—'আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, প্রাতঃকাল, পুনরাগত, মনোযোগ, সদ্যোজাত।

'আয়ুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ দুর্বাসাঃ প্রভৃতি সংস্কৃত পদ বাংলায় প্রায়শ বিসর্গ না দিয়া লেখা হয়। কিন্তু অব্যয় শব্দে কেহ বিসর্গ দেন, কেহ দেন না, যথা ঃ বিশেষতঃ বিশেষত'। সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়।

৪। **হসন্ত পদ ঃ** হসন্ত সংস্কৃত পদের (বা শব্দের) শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, যথা—'ত্বক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ্, বিদ্বান্, শ্রীমান্।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৫। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** অসংস্কৃত শব্দের এইরূপ দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জনীয়, যথা ঃ 'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি।

৬। **হস্ চিহ্ন ঃ** শব্দের শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন দেওয়া হইবে না। যথা ঃ 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্ চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা ঃ 'দহ, অহরহ, কান্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্ চিহ্ন আবশ্যক, যথা ঃ 'শাহ্, তখ্ত, জেম্স্, বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত

শব্দে না থাকিলে চলিবে, যথা : 'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা : 'খট্কা, তদ্বির, এক্স্প্রেস'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা : 'কট্ কট্, খপ্, সার্'।

বাংলায় কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা : 'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত, অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ। যথা : 'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই সকল সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। সাধারণত অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু শব্দে হস্ চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

৭। **ই ঈ উ ঊ :** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা উ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে, ই বা উ হইবে, যথা : 'কুমীর, কুমির ; শীষ, শিষ ; রানী, রানি ; ময়রানী, ময়রানি। পাখী, পাখি ; শাড়ী, শাড়ি ; ঊনিশ, উনিশ, চূন, চুন ; পূব, পুব। কিন্তু তদ্ভব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব উ হইবে, যথা : 'ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, কাকি, মামি, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, দুটি'।

বহু লেখক তদ্ভব শব্দে মূল অনুসারে ঈ ঊ বজায় রাখিতে চান, পক্ষান্তরে অনেকে সর্বত্র ই উ লেখা উচিত মনে করেন। সেজন্য তদ্ভব ও তৎসদৃশ শব্দে বিকল্প বিহিত হইল। অন্য শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৮। **ণ ন :** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা : 'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'।

৯। **ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি :** সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়, যথা : 'যত, মত (সদৃশ), কাল (সময় কল্য, কৃষ্ণ), ভাল (কপাল, উত্তম), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দালি, শাখা), এত, এখন, কে, দেখা খেলা'।

'তো, হয়তো' বানান বিধেয়,

'কোন, এখন, কখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বানান বিধেয়—'কোন্' লোক? কোন কোন লোক, বর্ণান্ধ। কোনও লোক আসে নাই। কখন্ হইবে জানি না। কখন মেঘ কখন রৌদ্র। এমন কখনও হয় না।'

ইয়া উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে—'একঘরে, জটে, কটকটে, ছটফটে, জলো, যদো, ঘরো, পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ো'। উপান্ত্য বর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে, যথা : 'এ'কঘ'রে, জ'লো'।

১০। **ং ঙ ঃ** 'বাঙালি, আঙুল, রঙের' প্রভৃতি বানান বিধেয়। যদি স্বরচিহ্নযোগ না হয় তবে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা ঃ 'রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা'।

'ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্প ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'বঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, 'রং' ও রঙ' সমান। 'বাঙ্গালি ও বাঙালি'র উচ্চারণও সমান নয়।

১১। **শ ষ স ঃ** মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা ঃ আঁশ (অংশু) আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতৃঃস্বসা)। দেশজ শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা ঃ 'সরেস, করিস, ফরসা (শা) উশখুশ'। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে, যথা ঃ 'আসল, খাস, জিনিস, সাদা, সবুজ, মাসুল, মসলা, পেনসিল, সিমেন্ট. পুলিস, ক্লাস, শববৎ, শরম, খুশি, পোশাক, পেনশন. বার্নিশ, শার্ট, শেক্স্পিয়র'।

তদ্ভব ও দেশজ শ ষ স প্রয়োগের যে নিয়ম দেওয়া হইল তাহা প্রচলতি রীতির অনুযায়ী। প্রায় সকল লেখকই এই বীতি বজায় বাখিতে চান। অধিকাংশ বিদেশী শব্দের প্রচলিত বানানে মূল উচ্চাবণ অনুসারে শ বা স লেখা হয়, যথা ঃ 'আসল, সবুজ, ক্লাস ; চশমা, পশম, পেনশন'। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যথা ঃ 'মাশুল, মশলা, সরবৎ, সরম। নবাগত বিদেশী শব্দেব বাংলা রূপে অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ বজায় রাখার চেষ্টা করেন। সাধারণের জন্য সকল বিদেশী শব্দেই মূল উচ্চারণ অনুসারে শ স প্রয়োগ সমীচীন হইবে।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়।

১২। **চন্দ্রবিন্দু ঃ** কতকগুলি শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ সম্বন্ধে লেখকগণ একমত নহেন এবং অনেকে সংশয়গ্রস্ত। বিশিষ্ট লেখকগণেব অধিকাংশের মত অনুসারে নিম্নলিখিত বানান নির্ধারিত হইল ঃ

কুচি (টুকবা)। কুঁচি (শূকরাদির লোম)
কুঁজা (কুজ, সোরাই)
কুঁদা (লাফান, কুঁদ যন্ত্রে কাটা, কাঠেব গুঁড়ি ইত্যাদি)
কুড়ে (অলস)। কুঁড়ে (কুটীর)
খোঁপা (কববী)
ছুঁচ (সূচ)
ছোড়া (নিক্ষেপ করা)। ছোঁডা (ছোকবা)
টেকা (স্থায়ী হওয়া)
পুথি (পুস্তিকা)
বাটা (পেষণ করা)। বাঁটা (বন্টন করা)
বেজি (নকুল)

১৩। ***ক্রিয়াপদ ঃ*** সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের বানানে অধিক মতভেদ দেখা যায় না। অনেকে 'করানো, পাঠানো' লেখেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক 'করান, পাঠান' বানানের পক্ষে। ও-কার

অনাবশ্যক, অর্থ হইতেই উচ্চারণবোধ হয়, সেজন্য 'করান পাঠান' ইত্যাদি বানান বিধেয়। 'করিয়ো, দিয়ো' ইত্যাদি বানানে য় অনাবশ্যক, 'করিও দিও' বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক ; কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ' চিহ্ন বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ক্রিয়াপদের-লাম বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও -লাম বিধেয়, কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিক রূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও অনুযায়ী।

হ-ধাতু ঃ হয়, হন, হও হস (হ'স), হই। হচ্ছে। হয়েছে। হোক, হোন, হও, হ। হল (হ'ল) হলাম। হত (হ'ত)। হচ্ছিল। হয়েছিল। হবে। হয়ো, হস (হ'স)। হতে (হ'তে) হয়ে হলে (হ'লে) হবার, হওয়া।

খা-ধাতু ঃ খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে, খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলো, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল, খেয়েছিল। খাবে। খেও, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিবে, লিাম, দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে, শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শোন। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু ঃ করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। করলে (ক'রলে), করলাম। করত (ক'রত)। করছিল। করেছিল। করবে। করো (ক'রো), করিস। করতে (ক'রতে), করে (ক'রে) করলে (ক'রলে), করবার, করা।

কাট্-ধাতু ঃ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্ ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্ ধাতু ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ। উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা ধাতু ঃ করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করাস, করাও, করা। করালে করালাম। করাত। করাচ্ছিস। করিয়েছিল, করাবে। করিও, করাস। করাবে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান।

১৪। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ ঃ** 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়। যথা ঃ 'পিতল,

ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিতরূপ মৌখিকরূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা ঃ 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

Cut এর u, cat এর a, f, v, w, z—প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নতুন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। সাধারণ বাঙালির ইংরেজি উচ্চারণ ইংরেজের সমান নয়, তথাপি তাহাতে কাজ চলিতেছে। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অবশ্য ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই লিখিতে হইবে।

১৫। **বিবৃত অ (cut-এর u) :** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—ক্লাব (club) বাস (bus), বাল্‌ব (bulb), সার (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget) জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), অগস্ট (August) রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৬। **বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat এর a) :** মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা ঃ 'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে ্যা কে য ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে যেমন' হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat-हैट)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার লাগাইলে ও (ओ) হয়, সেই রূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৭। **ঈ ঊ ঃ** মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা ঃ সীল (seal), ঈস্ট্ (East), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (Spool).

১৮। **f v :** f ও v স্থানে যথাক্রমে ক্ষ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot). ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৯। W : W স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ ব্‌ ও বিধেয়, যথা ঃ 'উইলসন (wilson), উড (wood) ওয়ে (way)।

২০। **য় ঃ** নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বন্ড' না লিখিয়া 'এডওআর্ড, ওঅর বন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

২১। **s, sh :** ১১ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২২। **st :** ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা ঃ 'স্টোন'।

২৩। **z :** z স্থানে জ় বা জ বিধেয়।

২৪। **হস্ চিহ্ন** ঃ ৬ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

৩১ মার্চ ১৯৩৬।

বাংলা বানানের নিয়ম (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব** ঃ রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথাঃ 'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ না করিলে দোষ হয় না বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। **সন্ধিতে ঙ স্থানে-অনুস্বার** ঃ যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা ঃ অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কাব, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকবণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ বাংলার সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পাবে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

৩। **বিসর্গান্ত পদ** ঃ বাংলায় বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষে বিসর্গ বর্জিত হইবে, যথা ঃ 'আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, সদ্য'। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হইবে, যথা ঃ 'আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, প্রাতঃকাল. পুনবাগত, মনোযোগ, সদ্যোজাত।

আয়ুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ, দুর্বাসাঃ প্রভৃতি সংস্কৃত পদ বাংলায় প্রায়শ বিসর্গ না দিযা লেখা হয। কিন্তু অব্যয় শব্দে কেহ বিসর্গ দেন, কেহ দেন না, যথা—বিশেষতঃ বিশেষত। সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়।

৪। **হসন্ত পদ** ঃ হসন্ত সংস্কৃত পদের (বা শব্দেব) শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, যথাঃ 'ত্বক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ. উদ্ভিদ্, বিদ্বান্, শ্রীমান্' ইত্যাদি।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৫। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব** ঃ এইরূপ দ্বিত্ব বর্জনীয়। যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দাব, চর্বি. ফর্মা. জার্মানি'।

৬। **হস্ চিহ্ন** ঃ শব্দেব শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা ঃ 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ. টন, টি-পট, ট্রাম, তছনছ, পকেট. মক্তব, হুক, কবিলেন, কবিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চাবণেব সম্ভাবনা থাকে তবে হস্ চিহ্ন বিধেয। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনেব উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা ঃ দহ, অহবহ, কান্ড, গঞ্জ। যদি হসন্ত উচ্চাবণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পব হস্ চিহ্ন আবশ্যক, যথা ঃ শাহ্, তখত্, জেমস্, বন্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা ঃ আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট. স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা ঃ খট্‌কা, তদ্‌বির, এক্‌সপ্রেস। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা ঃ 'কট্ কট্, খপ্, সার্'।

বাংলায় কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা : গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা : 'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই সকল সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। সাধারণত অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা : 'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপব বহু বহু শব্দে হস্ চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলেই হস্ চিহ্ন বিধেয়।

৭। **ই ঈ উ ঊ :** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে। যথা : 'কুমীর, কুমির ; শীষ, শিষ ; পাখী, পাখি ; শাড়ী, শাড়ি, রানী, রানি ; ঊনিশ, উনিশ, চূন, চুন ; পুব, পুব। অ-সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্তে ঈ বা বিকল্পে ই হইবে, যথা : 'কাকী, কাকি ; খুকী, খুকি, পিসী, পিসি ; মামী, মামি, ময়রানী, ময়রানি, কিন্তু ঝি ও দিদি কেবল ইকারান্ত হইবে। তদ্ভব ও স্ত্রীলিঙ্গ ও অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ হইবে, যথা : 'ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, দুটি'। অব্যয় হইলে 'কি', সর্বনাম হইলে বিকল্পে 'কী' বা 'কি' হইবে, যথা : 'তুমি কি যাইবে? তুমি কী (কি) খাইবে বল'।

বহু লেখক তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে ঈ উ বজায় রাখিতে চান এবং প্রায় সমস্ত অ-সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শেষে ঈ দিতে চান ; পক্ষান্তরে অনেকে সর্বত্র ই উ লেখা উচিত মনে করেন। সেজন্য তদ্ভব শব্দে ও অ-সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে বিকল্প বিহিত হইল। অর্থপ্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত 'কি' ও 'কী'রভেদ বিকল্পে বিহিত হইল। অন্যত্র ঈ ই প্রয়োগের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৮। **ণ ন :** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা : 'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'।

৯। **ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি :** এই সকল বানান বিধেয় : 'এত, কত, যত, তত ; তো, হয়তো, কাল, সময়, কলা, চাল (চাউল, ছাদ, গতি) ডাল (দালি, শাখা)।

এই সকল বানানে বিকল্প বিধেয়--'কাল, কালো (কৃষ্ণ) ; ভাল, ভালো (উত্তম) ; মত, মতো (সদৃশ)।

'কোন, এখন, কখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বানান বিধেয়' 'কোন লোক' কোন কোন লোক বর্ণান্ধ' কোনও লোক আসে নাই। কখন্ হইবে জানি না, কখন মেঘ কখন রৌদ্র। এমন কখনও হয় না।'

ইয়, উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে— 'একঘ'রে, জ'টে, কটম'টে, ছটফ'টে, জ'লো, য'দো, ঘ'রো, প'ড়ো, প'টো, খ'ড়ো, ঝ'ড়ো।

১০। **ং ঙ :** 'বাঙালি আঙুল, রঙের প্রভৃতি বানান বিধেয়। যদি স্বরচিহ্নযোগ না হয় তবে বিকল্প ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা, বাঙলা'।

'ং ও ঙ র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গে' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং' এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান। 'বাঙ্গালি' ও 'বাঙালির' উচ্চারণ সমান নয়।

১১। **শ ষ স ঃ** মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা ঃ আঁশ (অংশু) আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতুঃস্বসা)। দেশজ শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা ঃ 'সরেস, করিস, ফরসা (-শা) উশখুশ'। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে, যথা ঃ 'আসল, খাস, জিনিস, সাদা, সবুজ, মাসুল, মসলা, পেনসিল, সিমেন্ট, পুলিস, ক্লাস, শরবৎ, শরম, শহর, খুশি, পোশাক, পেনশন, বার্নিশ, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র'।

তদ্ভব ও দেশজ শব্দে শ ষ স প্রয়োগের যে নিয়ম দেওয়া হইল তাহা প্রচলতি রীতির অনুযায়ী। প্রায় সকল লেখকই এই রীতি বজায় বাখিতে চান। অধিকাংশ বিদেশী শব্দেব প্রচলিত বানানে মূল উচ্চারণ অনুসাবে শ বা স লেখা হয়, যথা ঃ 'আসল, সবুজ, ক্লাস, চশমা, পশম, পেনশন'। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যথা ঃ 'মাশুল, মশলা, সববৎ, সবম'। নবাগত বিদেশী শব্দেব বাংলা রূপে অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ বজায় রাখার চেষ্টা কবেন। সাধাবণেব জন্য সকল বিদেশী শব্দেই মূল উচ্চাবণ অনুসারে শ স প্রয়োগ সমীচীন হইবে।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষব বর্জনীয়।

১২। **ক্রিয়াপদ ঃ** সাধু ও চলিত প্রযোগে কৃদন্ত রূপে 'কবান, পাঠান' অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বানান বিধেয। 'করিযো, দিয়ো' ইত্যাদি বানানে য অনাবশ্যক, 'করিও দিও' বিধেয। চলিত ভাষায ক্রিযাপদেব বিহিত বানানেব কয়েকটি উদাহবণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন কবা যাইতে পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু ঃ হয, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হোক, হোন, হও, হ, হ'ল, হ'লাম, হ'ত। হচ্ছিল। হযেছিল। হব (হবো), হবে। হ'যো, হ'স। হ'তে, হ'যে, হ'লে, হ'বাব, হওযা।

খা-ধাতু ঃ খায, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেযেছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম, খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেও, খাস। খেতে, খেযে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিযেছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম, দিত। দিচ্ছিল। দিযেছিল। দেব (দেবো), দিও, দিস। দিতে, দিযে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম, শুত। শুচিছল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুল। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু ঃ করে, করেন, কর, করিস, করি। কবছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কব্‌। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল, করেছিল। ক'রব। ক'রবো। ক'রবে। ক'রো, ক'রিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, ক'রবার, কবা।

কাট্-ধাতু ঃ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম, কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো) কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্ ধাতু ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্, উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো) উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু ঃ করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিস। করিয়েছিল। কবাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে., করালে, কবাবার, করান (করানো)।

১৩। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ ঃ 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা— 'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা ঃ 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো।'

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলার নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয। এক ভাষার উচ্চাবণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। সাধারণ বাঙালির ইংরেজি উচ্চারণ ইংরেজের সমান নয়, তথাপি তাহাতে কাজ চলিতেছে। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই লিখিতে হইবে।

১৪। **বিবৃত অ (cut-এর u) ঃ** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা— 'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্ব (bulb) সার্ (sir), থার্ড (third) বাজেট (budget), জার্মান (German) কাটলেট (cutlet) সার্কস (circus) ফোকস (focus) অগস্ট August) রেডিয়ম (radium) ফস্ফরস (phosphorus) হিরোডোটস (Herodotus)।

১৫। বক্র (বা বিকৃত এ। cat-এর a) : মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা— অ্যাসিড (acid) হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে 'ৗা' কে য-ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat = হৈট)। নাগরী

লিপিতে যেমন ঃ অ-অক্ষরে ও -কার লাগাইলে ও (ओ) হয়, সেই রূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৬। ঈ ঊ ঃ মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা ঃ সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার (worcester), স্পূল (spool)।

১৭। **f v :** f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot) ভোট (vote), যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—ফন (von)।

১৮। **w :** w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৯। **য় ঃ** নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার - বন্ড' না লিখিয়া এডওয়ার্ড, ওঅর-বন্ড লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানান-এ দোষ নাই।

২০। **s, sh**

১১ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২১। st

ইংরেজির (st) স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টেশন'।

২২। **z**

z স্থানে জ় বা জ বিধেয।

২৩। **হস্ চিহ্ন ঃ**

৬ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি

শ্রী রাজশেখব বসু—সভাপতি
শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী
শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য
শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদাব
শ্রী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায
শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রী দুর্গামোহন ভট্টাচার্য
শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
শ্রী সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায
শ্রী বিজনবিহাবী ভট্টাচার্য
শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাব

শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। —সম্পাদক

বাংলা বানান সংস্কার সমিতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

বাংলা বানানের নিয়ম (তৃতীয় সংস্করণ) ঃ

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** রেফেব পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মুর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ। না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। **সন্ধিতে ম্ স্থানে অনুস্বার ঃ** যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়। যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার' 'ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা –'সংজাত, স্বয়ংভু' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** রেফের পব ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। **হস্-চিহ্ন ঃ** শব্দের শেষে সাধারণত হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথ—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা— 'দহ, অহরহ, কান্ড, গঞ্জ। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্ চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয, যথা—'কট্‌কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চাবণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়,

যথা—'বাই-ন'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

৫। **ই ঈ উ ঊ ঃ** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ই বা উ অথবা বিকল্পে ঈ বা ঊ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীঘ্র, ঊনিশ, চূন, পূব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিম, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল ঊ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চূল), তাড়ু (তর্দূ) জুয়া (দ্যূত)।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা ঃ 'ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ ও কর্ম বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, ছুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। **জ য ঃ** এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোতা, জোয়াল'।

৭। **ণ ন ঃ** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার, কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ ণ্ড চলিবে, যথা ঃ 'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। **ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি ঃ** সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার অতিরিক্ত ও-কাব, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধ্য হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো, ভাল, ভালো, মত, মতো, পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়—'এত, কত, যত, তত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। **ং ঙ ঃ** 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। **শ ষ স ঃ** মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা ঃ আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিন্‌সে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে, যথা ঃ 'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র'। কিন্তু কতগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌) ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু প্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'শরবৎ, সরবৎ ; শরম, সরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s ধ্বনির জন্য বাংলার ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস্‌, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১। **ক্রিয়াপদ ঃ** সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'কবান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'কবানো, পাঠানো', প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদেব বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওযা হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকর্মা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে—লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু ঃ হয, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক. হ'ন, হও, হ ; হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে হবার, হওয়া।

খা-ধাতু ঃ খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেযেছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম, দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু ঃ করে, করেন, কব, করিস,করি। কবছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্‌। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ,ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু ঃ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু ঃ করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাব, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ ঃ** 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

১৩। **বিবৃত অ (cut-এর u) :** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—ক্লাব (club) বাস্ (bus), বাল্‌ব (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget) জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), অগস্ট (August) রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। **বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat এর a) :** মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা ঃ 'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে 'যা'-কে য ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat-হৈট)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऑ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। **ঈ উ ঃ** মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা ঃ সীল (seal), ঈস্ট্ (East), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (Spool).

১৬। **f v :** f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৭। **W :** W স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা ঃ 'উইলসন (wilson), উড (wood) ওয়ে (way)।

১৮। **য় ঃ** নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়র, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, যা য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়াব-বন্ড' না লিখিয়া 'এড্ওআর্ড, ওঅর-বন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। **s, sh :** ১০ সংখ্যক নিযম দ্রষ্টব্য।

২০। **st :** নবাগত বিদেশী শব্দে ইংবেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয, যথা ঃ 'স্টোভ (stove)'।

২১। **z :** z স্থানে জ় বা জ় বিধেয়।

২২। **হস্ চিহ্ন ঃ** ৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

বানান-বিধির পর্যালোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণটির বহু জনমান্য বিধিগুলি নিয়েই এখানে মুখ্যত আলোচনা করা হল। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের বিধিগুলি তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে আনা হল।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নিয়মটি হল, রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। এই নিয়মটিকে কেন্দ্র করে সেই সময় প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ বানান সংস্কার সমিতি ভূমিকাতেই বলেছিলেন, "অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজন মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির সামনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।" এ কথা ঘোষণা করেও তৎসম শব্দের বানানে হাত দেওয়া প্রাচীনপন্থীরা একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি। সম্ভবত, এঁদের কথা স্মরণে রেখেই সংস্কার সমিতি তাদের প্রথম সংস্করণে "যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে" এই অংশটুকু যুক্ত রাখেন। তবু শুরু হয়ে যায় প্রচন্ড আলোড়ন। তবে শুধু যে বিরোধিতাই হয়েছিল তাই নয়, পক্ষেও বহু লেখা পাওয়া যাচ্ছে। গোবর্দ্ধন শাস্ত্রী প্রমুখ পন্ডিতেরা পাণিনির ব্যাকবণের বিভিন্ন সূত্র ব্যাখ্যা করে দেখালেন, রেফের পর

ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বিলোপেরও মধ্যে কোথাও সংস্কৃত বিধি লঙ্ঘিত হয়নি। সংস্কৃত অনুশাসনকে রক্ষা করেও যদি বানানের সরলীকরণ ঘটানো যায় তবে বাধা থাকা উচিত নয়। যাইহোক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে সংস্কার সমিতি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, রেফের পর কোথাও দ্বিত্ব হবে না। বহু আলোড়ন, বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিধিটিই সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল। সংস্কার সমিতির এই বিধিটি প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত পদক্ষেপ। প্রথম সংস্করণে যেটুকু অতিরিক্ত অংশ যুক্ত ছিল তা প্রাচীনপন্থীদের শান্ত রাখার জন্য আবশ্যক ছিল।

২। **সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার ঃ** বানান সমিতির প্রবর্ত্তিত এই বিধিটি সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি সূত্রের অংশ। সংস্কৃতে সন্ধিতে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে পদের শেষে ম-স্থানে অনুস্বার অথবা সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। কিন্তু বানান সমিতি কেবল ক-বর্গের ক্ষেত্রে ঙ বা বিকল্পে অনুস্বার লেখার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যত্র নয়। কারণ তাঁদের অভিমত, সর্বত্র অনুস্বার দিলে উচ্চারণে বাধতে পারে। কিন্তু এই বিধানের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সাধারণত, সন্ধিবদ্ধ নয় এমন তৎসম পদের মধ্যস্থ ঙ স্থানে কখনই অনুস্বার হয না যেমন, আতঙ্ক, বিহঙ্গ, ভঙগ, সঙগ, ইঙ্গিত ইত্যাদি। এই বানানগুলি আতংক, বিহংগ, ভংগ, সংগ, ইংগিত এইভাবে লেখা হয় না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক-বর্গের ক্ষেত্রে অনুস্বাব বা বিকল্পে ঙ লেখার যে বিধান দিযেছেন তা কোন্ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ পদে বা সন্ধিবদ্ধ নয় এমন ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। ফলে আতঙ্ক, বিহঙ্গ ইত্যাদি বানান লেখার সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তবে একরূপতা রক্ষার জন্য সর্বত্র সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ ক বর্গের ক্ষেত্রে কেবল ঙ) লেখা যেতে পারে। যেমন, অহঙ্কার, শুভঙ্কর ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে অনুস্বাব লেখার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রবাহের বিপরীতমুখে চলাটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। তবে পরবর্তীকালে বানান সংস্কারে যাঁবা আগ্রহী হবেন তাঁরা এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে বানান-সমস্যার একটি দিকের নিরসন হবে। আধুনিককালে রমেন ভট্টাচার্য "বাংলা বানানেব নিয়ম ও অনিয়ম" গ্রন্থে এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে তৃতীয় সংস্করণে আর কোনো বিধি নেই। কিন্তু লক্ষণীয় প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বিসর্গান্ত পদ ও হসন্ত পদ সংক্রান্ত বিধি পাচ্ছি। তৃতীয় সংস্করণে সমিতি এদের সম্পর্কে নীরব। সম্ভবত এই বিধি দুটি কেন্দ্র করে বিরুদ্ধ সমালোচনা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে সমিতি তৃতীয় সংস্করণে এ সম্পর্কে নীরব থাকেন। তবে বিসর্গান্ত পদ সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত যে বিধিটি পাচ্ছি তা আধুনিককালে গৃহীত হতে দেখা যাবে। কিন্তু হসন্ত পদ সংক্রান্ত চতুর্থ সংখ্যক বিধিটি মোটেই গৃহীত হয় নি। না হবার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যক বিধির মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। বিসর্গান্ত পদের ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তৎসম বিসর্গান্ত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হবে। কিন্তু সন্ধির ক্ষেত্রে তা বজায় থাকবে। কিন্তু চতুর্থ সংখ্যক বিধিতে হসন্ত তৎসম শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও যদি পূর্বের মতো সাধারণভাবে হস্ চিহ্ন বিসর্জনের নির্দেশ দিয়ে সন্ধির ক্ষেত্রে তা ধরে নেবার বিধি থাকত তবে সামঞ্জস্য রক্ষা হত। তবে এ দুটি ক্ষেত্রই বানানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিক। তাই তৃতীয় সংস্করণে এ সম্পর্কে নীরব না থেকে বানান সমিতি কোনো সুচিন্তিত বিধান দিলে সমাজ উপকৃত হত।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশী ও বিদেশী শব্দ

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** প্রথম বিধিটির আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাছাড়া এ বিধিটি বর্তমানে সর্বত্র মানা হচ্ছে। তাই এ নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৪। **হস্-চিহ্ন :** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত অ-সংস্কৃত শব্দে হস্ চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়মটির মধ্যে একধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাব লক্ষ করা যায়। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে, শব্দের শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন দেওয়া হবে না। আবার পরেই বলা হচ্ছে 'যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্ চিহ্ন বিধেয়'। এই অংশটুকু নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। একজনের ক্ষেত্রে যে বানানে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকবে আরেকজনের ক্ষেত্রে তা নাও থাকতে পারে। তাছাড়া প্রথম শিক্ষার্থী যে কোনো উচ্চারণই ভুল্ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ থাকলে জটিলতা কমে। এই নিয়মের অপর একটি অংশেও অস্পষ্টতা রয়েছে। হ ও যুক্তব্যঞ্জন সাধারণত স্বরান্ত উচ্চারিত হয। সমিতির নিয়মে রয়েছে "যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, খত্, জেম্‌স্, বন্ড্'।" এ নিয়ম থাকলে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হত না। কিন্তু এব পরই সমিতি যুক্ত করেছেন "সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ"। এই নিষেধাজ্ঞা নিযমটিকে জটিল করেছে। কারণ সুপ্রচলিত বা অপ্রচলিত হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক, সেক্ষেত্রে হ ও যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত প্রচলিত বা অপ্রচলিত সকল শব্দেব ক্ষেত্রেই যদি হস্ চিহ্ন ব্যবহারের সাধারণ বিধান দেওয়া হত তবে নিয়মটির প্রয়োগিক উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেত।

৫। **ই ঈ উ ঊ :** এক্ষেত্রে সমিতির নির্দেশ হল, যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে, যথা—কুমীর, কুমির ইত্যাদি। বর্তমানে অবশ্য এসব বানান প্রায সর্বক্ষেত্রেই ই বা উ দিয়েই লেখা হচ্ছে। বিকল্পের প্রয়োজনীযতা স্বাভাবিক নিয়মেই ফুরিয়েছে। সমিতিব সদস্যগণের অভিপ্রায়ও একই ছিল বলেই মনে হয। তবে তাঁরা যে সময় এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন সেই সময় বিকল্প রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল। নতুবা বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনায় নিয়ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হত। তবে সমিতি স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ লেখার যে প্রস্তাব করেছিলেন তা বর্তমানে অনেক্ষেত্রেই মানা হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন ঈ বা ঊ কারের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের কোনো যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাব প্রথম সংস্করণে এই সকল ক্ষেত্রে হ্রস্ব-ই-কার লেখার প্রস্তাব ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বিকল্পে হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। বোঝাই যায় চাপের মুখে সমিতি তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রথম সংস্কবণের সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে বানানের ক্ষেত্রে একরূপতা রক্ষিত হত। তবে ইন্ ভাগান্ত শব্দেব ক্ষেত্রে সর্বত্র ঈ-কার লেখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমিতি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বাংলায় ব্যবহৃত ঈ-কারান্ত পদটিকে বাংলায় প্রাতিপদিক হিসাবে ধবলে পদটি সমাসবদ্ধ বা প্রত্যয়যুক্ত হলে আব পরিবর্তত হওয়ার প্রশ্ন থাকে না।

৬। **জ, য ঃ** জ, য সংক্রান্ত কোনো নিয়ম প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পাই না। তৃতীয় সংস্করণে বানান সমিতি বিশেষ কয়েকটি বানানে প্রচলিত ধ্বনিভিত্তিক রূপ লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—কাজ, জাউ, জাঁতা ইত্যাদি। অন্যত্র 'য' লেখা হচ্ছে। অনেকে বাংলা উচ্চারণে 'জ' ও 'য' এর ধ্বনিগত পার্থক্য না থাকায় সর্বত্র জ লিখতে চান। যদিও সর্বত্র জ লিখলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একরূপতা বজায় থাকে। কিন্তু সমিতি যে সময় এ নিয়ম করেন তখন প্রচলিত প্রথা ভেঙে সর্বত্র জ লেখার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আধুনিককালেও শব্দের আদিতে য-ই লেখা হয় (যথা—যায়, যখন, যেমন ইত্যাদি)। কাজেই 'য' এর জায়গায় 'জ'-র নির্বিচার ব্যবহার কতটা সুবিধাজনক হবে তা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

৭। **ণ ন ঃ** ণ ন সংক্রান্ত নিয়মটি বানান সমিতির অত্যন্ত সাহসিক পদক্ষেপ। তবে চারটি যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম রেখেছেন আধুনিককালে অনেকক্ষেত্রে সেগুলিতে ন দিয়ে লেখা হচ্ছে। আসলে ট বর্গের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সর্বত্র ণ হয়। বাংলায় অসংস্কৃত শব্দে সেখানে ন চলতেই পারে। রাণী না লিখে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রানী লেখা হচ্ছে।

৮। **ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি ঃ** ও কাব ও ঊর্ধ্ব কমা প্রসঙ্গে সমিতির প্রস্তাব পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। সমিতি সুপ্রচলিত শব্দে অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য ও কার, ঊর্ধ্ব কমা বা অন্য চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে সমিতি প্রসঙ্গ থেকে অর্থ বুঝে উচ্চারণ স্থির করার পক্ষে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে এ নিয়ম যে কত অসুবিধার সৃষ্টি করবে তা সমিতি ভাবেন নি। এই নিয়মেই অর্থগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হলে কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে অন্ত্যঅক্ষবে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব কমা বিকল্পে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিকল্পের উল্লেখ বানানের ক্ষেত্রে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করবে। বরং অর্থগ্রহণে সুবিধার জন্য সর্বত্র ও-কারের ব্যবহাব থাকলে বানান সরলও হয় আবার একরূপতাও রক্ষিত হয়। তাছাড়া শুধু 'তো', 'হয়তো' বানানে বিচ্ছিন্নভাবে ও-কার দেবার সুপাবিশ বিস্ময় উদ্রেক করে। কারণ এ ক্ষেত্রে ও-কার না দিলেও অর্থগ্রহণে অসুবিধা হয় বলে মনে হয় না।

৯। **ং ঙ ঃ** ং ঙ সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে সমিতিব দ্বিধাগ্রস্ততা স্পষ্ট। আমাদের অভীষ্ট উচ্চারণ যখন 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী ভাঙন ইত্যাদি তখন বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ইত্যাদি বানানও চলবে—এ ধরনের প্রস্তাব যুক্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। হসন্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে রং, রঙ প্রভৃতি দুরকম বানানের মধ্যে বিকল্পটি পরিত্যাগ করে কেবল ঙ-এর বানান রাখলে বানান-বিভ্রান্তি হ্রাস পায়। যদিও বর্তমানে হসন্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে ং-এর ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।

১০। **শ-ষ-স ঃ** সমিতি বাংলা তদ্ভব শব্দে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যত্র ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ, ষ, স রাখার প্রস্তাব রেখেছেন। বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণে ণ-এর ব্যবহার যেমন নেই ষ-এর ব্যবহারও তেমন নেই। কোথাও কোথাও স-এর ব্যবহার হলেও স্বাভাবিক উচ্চারণে শ ধ্বনি আসে। অসংস্কৃত শব্দে সমিতি যখন দৃঢ়তার সঙ্গে ণ পুরোপুরি বিসর্জন দেবার নির্দেশ দেন (সংখ্যা ৭) তখন অসংস্কৃত শব্দে 'শ-ষ-স' ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন ব্যুৎপত্তি অনুসারী নীতি গ্রহণ করলেন—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। বানান সমিতি নিজেও বোধ হয় এ অসংগতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কারণ সমিতি ১০ সংখ্যক নিয়মে বলছেন ঃ

"শ ষ স এই তিন বর্গের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।"

সমিতির এই কৈফিয়ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। এই নিয়ম প্রণয়নের সমকালে তদ্ভব শব্দের বানান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত নিয়মানুসারেই চলত। সেক্ষেত্রে ৫-সংখ্যক, ৭ সংখ্যক নিয়মে যখন বাংলা উচ্চারণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন ১০ সংখ্যক নিয়মেও বাংলা উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে মূল অনুসারে যেখানে স বা ষ হয় সেক্ষেত্রে অন্তত বিকল্পে শ লেখার প্রস্তাব রাখলে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক নিয়মেই বানানের সরলীকরণ ঘটত।

১১। **ক্রিয়াপদ ঃ** ক্রিয়াপদের বানান প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সমিতির প্রস্তাব বিভ্রান্তিকর। যেমন, কৃদন্তরূপে দুরকম বানান না রেখে কেবল করানো, পাঠানো প্রভৃতি বানান লেখার নির্দেশ দিলে অভীষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বানান লাম বিভক্তি-র স্থানে আঞ্চলিক ও কথ্য লুম বা লেম বিভক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব যুক্তিহীন। কয়েকটি ধাতুর বিভিন্ন কালের যে রূপগুলি লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও অসংগতি রয়েছে। যেমন, হ-ধাতু, খা-ধাতু, শু-ধাতু-র ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় হ'য়ো, খেয়ো, শুয়ো ইত্যাদি বানান লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু দি-ধাতুর ক্ষেত্রে একই বানান 'দিও' লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বানানটিতে 'দিয়ো' রূপটি লেখাব প্রস্তাব করলে একরূপতা রক্ষিত হত। উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালে দুটি করে রূপ স্বীকার করা হয়েছে, যেমন হব হবো, করব, করবো ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যে কোনো একটি রূপ প্রস্তাব করলে একরূপতা বজায় থাকত। সমিতি যেখানে অতিরিক্ত ঊর্ধ্বকমা এবং ও-কার বর্জনের পক্ষপাতী সেখানে ক্রিয়াপদের বানানে অতিবিক্ত ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার জটিলতা এনেছে।

অতীতকালেব ক্ষেত্রে যেখানে কালবাচক বিভক্তির ক্ষেত্রে মাত্র অ-কারান্ত রূপটি প্রস্তাবিত হয়েছে, সেখানে তার সঙ্গে সংগতি রেখে ভবিষ্যৎকালেও শুধু অ-কারান্ত রূপ (অর্থাৎ 'করব', 'শোব' 'দেব' ইত্যাদি) প্রস্তাব করলে প্রস্তাবের ব্যবহার্যতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হত।

১২। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ ঃ** এ ব্যাপারে সমিতির প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ

১৩। **বিবৃত অ (cut এর u) :** মূল শব্দে বিবৃত অ থাকলে সমিতি আদ্য অক্ষরে আ-কাব এবং মধ্য অক্ষরে অ কার লেখার বিধান দিয়েছেন! কিন্তু বিবৃত অ আমরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আ-কার দিয়েই উচ্চাবণ করি। যেমন—ক্লাব, বাস, রেডিয়াম, ফস্ফরাস। সার্কাস। সমিতির প্রস্তাবিত সার্কস, ফোকস, রেডিয়ম, ফস্ফরস ইত্যাদি বানানে বাঙালি যেভাবে শব্দগুলি উচ্চারণ করে সেই অভীষ্ট উচ্চারণ আসে না। যেখানে সমিতি বলেছেন, "এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই চলিবে।" সেক্ষেত্রে সার্কাস ফোকাস ইত্যাদি বানানই যুক্তিযুক্ত।

১৪। **বক্র আ (বা বিকৃত এ) ঃ** সমিতি মূল শব্দের বক্র আ বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা দ্বারা লেখার প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত। তবে সর্বাপেক্ষা জরুরি হল বক্র আ-জ্ঞাপক নতুন একটি বর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণে যোজ্য একটি কার-চিহ্ন অবিলম্বে উদ্ভাবন করা।

১৫। **ঈ, ঊ ঃ** এ সম্পর্কে সমিতির প্রস্তাব যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ঠিকই, তবু বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে মূলে ঈ বা ঊ ধ্বনি থাকলেও প্রতিবর্ণীকরণে ই, উ দিয়ে লেখা হচ্ছে এমন উদাহরণ রয়েছে। যেমন : ফুট (foot), স্কুল (school) ইত্যাদি।

১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২ সংখ্যক নিয়ম বানানের একরূপতা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

১৬। **z :** সমিতি z স্থানে জ় বা জ় বর্ণ বিকল্পে গ্রহণের দু রকম প্রস্তাব দিয়েছেন। বিকল্পের সংস্থান নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপন্থী। সেক্ষেত্রে যে কোনো একটি বর্ণ (যেমন জ়) রাখার প্রস্তাব দেওয়া যেত। তবে নিত্য ব্যবহারে জ-এর বদলে জ় কতজন নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করবেন তাও বিবেচনার বিষয়।

বাংলা বানান সমিতির প্রস্তাবিত এই বিধিগুলিতে বাংলা বানান-সংক্রান্ত সমস্যার সমস্ত দিকগুলি নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নয়, তবু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে পথনির্দেশ করা হয়েছে। সমিতির সকল প্রস্তাবের প্রায়োগিক মূল্য সমান নয়, তবু কালের প্রেক্ষাপটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানান সমিতি'র এই উদ্যোগের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগই বাংলা বানানকে প্রথম একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে সাহায্য করে। সমিতির প্রস্তাবগুলিতে বহুক্ষেত্রে বিকল্প প্রয়োগের কথা রয়েছে, যা সমকালের প্রেক্ষাপটে সমিতির মানসিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সময়কার মানসিকতা বিচার করলে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, রক্ষণশীল মানসিকতাকে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে এই বিকল্পের প্রস্তাব অনিবার্য ছিল। না হলে সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হত। ববং এই বিকল্পের সূত্র ধরে বানানের সরলতর রূপটি স্বাভাবিক নিয়মেই গৃহীত হয়ে গেছে। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাবগুলিতে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ায় এই অনুশাসনগুলি আজও অনেকাংশেই কার্যকর রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯৩৭-এর পরবর্তী পর্ব

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম। শ্রী ভোলানাথ ঘোষ
বিচিত্রা ঃ আষাঢ়, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—৭৮৯

এই প্রবন্ধে লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি যে বানানের নিয়মাবলি (প্রথম সংস্করণ) সংকলন করেছেন, তার কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১.১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** এ সম্পর্কে সমিতির প্রস্তাব হল, তৎসম রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্ব হবে না। শুধু ব্যুৎপত্তির জন্য প্রয়োজন হলে হবে।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে লেখকের আপত্তি। তাঁর বক্তব্য দ্বিত্ব কোথায় প্রয়োজন, কোথায় প্রয়োজন নয়, তা সাধারণ পাঠক কীরূপে বুঝবে। কারণ কার্ত্তিক ও কার্তিকের মধ্যে সাধারণ পাঠকের কাছে কোনো অর্থবৈষম্য নেই।

১.২। **৩ সংখ্যক নিয়ম—বিসর্গান্ত পদ ঃ** এক্ষেত্রে বিসর্গান্ত পদের শেষে বিসর্গ থাকবে না, এরকম নিয়ম করা হলেও আবার এও বলা হয়েছে যে সন্ধি করতে গেলে শব্দগুলিকে বিসর্গান্ত মানতে হবে। অর্থাৎ আয়, আশী, পুন ইত্যাদি স্বীকৃত হলেও আয়ুকাল, আশীবাদ, পুনাগত ইত্যাদি বানান চলবে না। সেক্ষত্রে আয়ুষ্কাল, আশীর্বাদ, পুনরাগত ইত্যাদি বানান মানতে হবে। এর ফলে কতকগুলি বিসর্গমুক্ত শব্দ (যেমন, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুজল) পুনরায় বিসর্গযুক্ত হল (যেমন-চক্ষুর্দ্বয়, চক্ষুর্জল)।

১.৩। **৪ সংখ্যক নিয়ম—হস্ অন্ত পদ ঃ** এই নিয়মে হসন্ত সংস্কৃত শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন বাখবার বিধান রয়েছে। যেমন—সম্রাট্, শ্রীমান্।

লেখকেব অভিমত হল, বাংলা বানানে এ নিয়ম এতদিন অনুসৃত না হলেও কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া কোন্ শব্দ কী প্রত্যয়ান্ত, প্রথমার একবচনে কী রূপ এসবের খোঁজ বাখাও সব লেখকের পক্ষে সম্ভব নয। শব্দের জাতিরক্ষার প্রশ্ন উঠলে বলা যায়, হস্ চিহ্নের শাসনমুক্ত হলে সত্যই তারা জাতিভ্রষ্ট হয় না। তাই যখন উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন নেই তখন অযথা হস্ চিহ্নকে বানান-বিভীষিকা রূপে বাখা যুক্তিহীন।

১.৪। **৭-সংখ্যক নিয়ম—ই, ঈ উ, ঊ ঃ** এই ব্যাপারে সমিতি প্রস্তাব করেছেন, মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকলে তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে। অন্য শব্দে শুধুই ই বা উ হবে। যথা বাঙালি।

লেখকের প্রস্তাব, তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দের বানানেও শুধু ই বা উ থাকলে খুবই সুবিধার বিষয় হত। এক্ষেত্রে বানানের একটি মাত্র রূপ থাকাই শ্রেয়।

১.৫। ৮ সংখ্যক নিয়মে সমিতি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ছাড়া সকল শব্দেই ণত্ববিধান বর্জনের প্রস্তাব রেখেছেন।

লেখক এটিকে 'বোল্ড' পরিবর্তন বলে মনে করেন এবং ৭ সংখ্যক নিয়মেও একই পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

১.৬। **৯ সংখ্যক নিয়ম ঃ ও-কার ও ঊর্ধ্ব কমা প্রভৃতি ঃ** সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য ও-কার, ঊর্ধ্বকমা প্রভৃতি চিহ্নের যথাসম্ভব বর্জন

এই নিয়মে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই নিয়মের শেষের দিকে তো, হয়তো বানান বিধেয় বলা হয়েছে।

লেখকের অভিমত, 'তো', 'হয়তো' বানান ত, হয়ত হলে উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের কোনো ভেদই প্রদর্শন করে না। তাই ও-কার বসানো অর্থহীন। বরঞ্চ কাল (কৃষ্ণ) শব্দটি লেখক 'কালো' বানানে লেখার পক্ষপাতী।

১.৭। **১১ সংখ্যক নিয়ম—শ, ষ , স ঃ** এক্ষেত্রে সমিতি মূল সংস্কৃত নিয়মানুসারে তদ্ভব ও দেশজ শ, ষ, স এই তিনটি বর্ণ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। তবে বিদেশি ও দেশজ শব্দে ষ কে বাদ দিয়ে উচ্চারণ অনুসারে শুধুই শ রাখতে চান।

লেখকের বক্তব্য বাঙালির মুখে ষ ও ণ এর যথার্থ উচ্চারণ নেই। ৮-সংখ্যক নিয়ম থেকে যখন ণ নির্বাসিত হয়েছে, তখন ১১ সংখ্যক নিয়মে তদ্ভব ও তৎসদৃশ শব্দে ষ থাকল কেন? একেও অসংস্কৃত সকল শব্দ থেকে নির্বাসিত করাই শ্রেয়।

১.৮। **১৫-সংখ্যক নিয়ম ঃ** বিবৃত অ (cut u) এই নিয়মে বলা হয়েছে ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশীয় মূল শব্দের আদ্য অক্ষরের বিবৃত অ বাংলা বানানে আ হবে। মধ্যে হলে অ হবে। যথা ঃ ক্লাব (club), ফোকস (Focus) ইত্যাদি।

লেখক মধ্যের অ-কেও আ-করা উচিত বলে মনে করেন। যথা, অগাস্ট (August)। শুধু য় হলে নয়। যথা ঃ রেডিয়ম।

১.৯। ১৬ সংখ্যক নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়-'্যা' কে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন বলে স্বীকার করতে বলেছেন।

লেখক '্য'-কেও বিবৃত অ-এর উচ্চারণজ্ঞাপক আর একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেয় বলে মনে করেন।

১.১০। **২৩ সংখ্যক নিয়ম ঃ** এই নিয়মে বাংলা লেখায় z এর উচ্চারণ দেখাবার জন্য 'জ্‌' বা 'জ়' লেখার বিধান আছে।

লেখকের অভিমত, জ এর তলায় ফুটকি চলে চলুক, কিন্তু 'জ্‌' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জ্র' বলে মনে হয়। এইরকম ভ্রমাত্মক বর্ণের প্রচলন অযৌক্তিক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম করেছেন তাতে বাংলা লেখকদের বানান নিয়ে যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ হবে বলে এই প্রবন্ধের লেখক মনে করেন। তবে বাংলায় যে অসংখ্য বহুল প্রচলিত অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ রয়েছে তাদের কী হবে—লেখক এই প্রশ্ন রেখেছেন।

এই প্রবন্ধটিতে ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিমত পরিস্ফুট হয়েছে। লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির সংকলিত নিয়মাবলিকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। সমিতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে যেমন সাধুবাদ জানিয়েছেন, তেমনি নিয়মাবলির নানাবিধ অসম্পূর্ণতার দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। আবার এগুলিকে সম্পূর্ণ করার দায়ও গ্রহণ করেছেন। লেখকের প্রস্তাবে কোথাও বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিফলন নেই। আবার অন্ধ রক্ষণশীলতাও প্রশ্রয় পায়নি। তাঁর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে বাংলা বানানের সরলীকরণ ঘটবে বলেই বোধ হয়।

২। বাংলা বানানের নিয়ম। শ্রী গোবর্ধন শাস্ত্রী

ভারতবর্ষ ঃ ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—৪৩৭-৩৯

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট (পৃষ্ঠা—১৩৫)। ভাদ্র সংখ্যায় গোবর্ধন শাস্ত্রী মহাশয় ঐ নিয়মাবলির কিছু কিছু নিয়ম সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। যেমন ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাংলা বানানের নিয়ম" পুস্তিকার 'রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব' অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, শাস্ত্রীমহাশয় তা মানেন নি। তাঁর মতে ঃ

২.১। "অর্চনা, মূর্চ্ছা, অর্জুন, কর্তা' আদি শব্দে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব যেমন বিকল্পে সিদ্ধ, তেমনি "কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক" আদি শব্দেও তা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন। লেখক পাণিনির ব্যাকরণ থেকে সূত্র তুলে দেখিয়েছেন, প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিত্ব ছিল না, সেখানে তা বিকল্পে বিধান করা হয়েছে। দ্বিতীয়টায় মূলীভূত 'কৃত্তিকা' আদি শব্দে যে দ্বিত্ব ছিল তার একটাব বিকল্পে লোপ করা হয়েছে। ফলে ফল দুটিরই সমান। দুটি ক্ষেত্রেই ইচ্ছা করলে রেফেব পর দ্বিত্ব না দিয়ে লেখা চলে। তবু বাংলা বানান সংস্কার সমিতির সদস্যগণ শব্দের ব্যুৎপত্তির দোহাই দিয়ে এই দুটির মধ্যে জাতিবৈষম্য সৃষ্টি কবে ভাষাকে জটিল করেছেন বলে তাঁর অভিমত। লেখক জানিয়েছেন, অন্য ভাষাকেও ইচ্ছানুসারে দ্বিত্ব লেখার বা না লেখার স্বাতন্ত্র্য থাকলেও সাধারণত দ্বিত্ব লেখা হয় না। তাই লেখকের প্রস্তাব ঃ

'বাংলা ভাষায় কোনখানেই রেফের পর দ্বিত্ব লেখা হবে না'—এরূপ একটি সরল নিয়ম প্রবর্তন করা যায়।

২.২। বিসর্গ, হস্ চিহ্ন, ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা আদির ব্যবহার সম্বন্ধেও সমিতির সঙ্গে লেখক একমত হতে পারেননি। তিনি মনে করেন ঃ

শেষ অ-কারের উচ্চারণ নিযে বাংলা ভাষায় কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। সর্বত্র ব্যতিক্রম নিয়ে চালাতে হয়। কোথাও শব্দান্তের অ-কার উচ্চারিত হয় না। যেমন ঃ রাম। কোথাও শব্দান্তে অ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ ছোট বড়। অনেকস্থানে অর্থভেদে বিভিন্ন উচ্চারণ করতে হয়। যেমন ঃ ভাল, ভাল। বালকগণের পক্ষে এটা কতখানি অসুবিধা সৃষ্টি করে তা সমিতি মনে করেননি। তাদের ব্যবস্থায় অসুবিধা বেড়ে গেছে। পূর্বে বাংলা ভাষায় অন্ততঃ বিশেষতঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গ লেখায় উচ্চারণে কোনো গোল ছিল না। কিন্তু সমিতির সদস্যগণ তা তুলে দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। লেখক মনে করেন, "সমিতি এ বিষয়ে 'আয়ু, চক্ষু, মন, দুর্বাসা, আদি শব্দেব যে নজিব দেখিয়েছেন তা একেবারে অচল।"

সাধারণত বাংলা ভাষায় হ এবং যুক্তবর্ণ স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। যথা ঃ দাহ, দহ, রক্ত। যদি হসন্ত অভীষ্ট হয়, তবে হস্ চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন ঃ শাহ্, জেম্স বন্ড্। এ নিয়ম থাকলে জটিলতা থাকে না। কিন্তু সমিতির সদস্যগণ সুপ্রচলিতত্বের দোহাই দিয়ে আর্ট, কর্ক, স্পঞ্জ ইত্যাদি শব্দে হস্ চিহ্ন দিতে নিষেধ করে বানানের ক্ষেত্রে অধিক জটিলতা সৃষ্টি করেছেন বলে লেখকের অভিমত।

বানানের দিক থেকে ভাষা দুরূহ হয়ে ওঠে দুটি কারণে ঃ

(১) একই উচ্চারণের অর্থভেদে নানা প্রকারের বানান। যেমন—বিনা—বীণা।

(২) (ক) একই বানানের অর্থভেদে বিভিন্ন উচ্চারণ। যেমন—বল, ভাল।

(খ) একই বর্ণের শব্দভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ। যেমন—গরিব-করিব।

লেখকের মতে, প্রথম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বাংলা বর্ণমালার বহু বর্ণের উচ্চারণগত তারতম্যের অভাবে। এ থেকে অব্যাহতি পাবার সুচিন্তিত পথ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে লেখকের মত ঃ

২.২.১। "হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনোখানেই শেষের অ-কার উচ্চারিত হবে না"। এরকম নিয়ম চালু করলে দাহ, রক্ত শক্ত ইত্যাদি শব্দে নিঃসন্দেহে অ-কার উচ্চারিত হবে। এবং রাম শ্যাম ইত্যাদি শব্দে তা উচ্চারিত হবে না।

"যে সকল শব্দে হ এবং যুক্তবর্ণে শেষ অ-কারের উচ্চারণ বাঞ্ছনীয় নয় সে সকল শব্দে তা প্রচলিতই হোক কিংবা অপ্রচলিতই হোক সর্বত্র হস্ চিহ্ন দিয়ে লেখবার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন ঃ আর্ট, কর্ক্, স্পঞ্জ ইত্যাদি।"

হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া যে সকল স্থানে শেষের অ-কার উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক সে সমস্ত স্থানে ও কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন ঃ ছোটো বড়ো, এমনতরো ইত্যাদি। তবে লেখক মনে করেন এরূপ ও-কার দিলে কোনোখানে উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য হলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

২.২.২। "সদ্য বক্ষ আদি শব্দের শেষে যুক্তাক্ষর থাকায় বিসর্গ না দিলেও উচ্চাবণে কিছু আটকাবে না।" মন যশ ইত্যাদির শেষ অ-কার উচচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিসর্গের কোনো আবশ্যকতা নেই। অন্ততঃ বিশেষতঃ, সাধারণতঃ, ইতস্ততঃ, ক্রমশঃ ইত্যাদি শব্দে বিসর্গ লেখাই উচিত অন্যথায় হসন্ত উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে। "আয়ু, চক্ষু, বিশ্রবা" আদি শব্দ অ-কারান্ত নয় বলে হসন্ত উচ্চারিত হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এরূপ শব্দে বিসর্গ দেবার কোনো সার্থকতা নেই।

২.২.৩। তবে প্রিয়, হৈম, শৈল, গাঢ়, ঘন, গলিত, হ্রস্বতর, অধিকতর—এরূপ শব্দে শেষের অ-কার উচ্চারিত হয়। কিন্তু ও-কার লেখার উপায় নেই বলে এগুলিকে লেখক ব্যতিক্রম বলে স্বীকার করতে বলেছেন।

ও-কার এবং ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করলে প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। বানান সংস্কার সমিতি বলেছেন—"ও কার অনাবশ্যক, অর্থ হইতেই উচ্চারণবোধ হয়।" লেখক মনে করেন, কথাটা বড়ো বড়ো অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে ঠিক হলেও নব্যশিক্ষার্থীর পক্ষে দুরূহ।

লেখক এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটিতে বানান সংস্কার সমিতির নিয়মাবলির ফাঁকগুলি তুলে ধরেছেন। শুধু যে সমস্যার ক্ষেত্রগুলি দেখিয়েছেন তা নয়, প্রতিটি বিষয়ের সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়েছেন। লেখকের প্রতিটি প্রস্তাবই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক।

৩। বাঙ্গালা বানান-সমস্যা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

ভারতবর্ষ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা-৮১৭-২০।

এই প্রবন্ধে লেখক বানান-সংক্রান্ত কিছু কিছু সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংক্রান্ত নিয়মগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

লেখক মনে করেন, এক ভাষার বর্ণমালা অন্য ভাষায় ব্যবহার করলে সাধারণত দ্বিতীয় ভাষায় অনেকক্ষেত্রে কিছু বর্ণের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা দেখা দেয়। ফলে বানান-বিভ্রাট ঘটে। সংস্কৃত বর্ণমালা বাংলায় চালাতে গিয়ে সর্বত্র ধ্বনিগত বানান রাখা সম্ভব হয় নি। জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ

১। একই এ-কার দ্বারা দুই পৃথক ধ্বনি সূচিত করা হচ্ছে। (এক, এস)।

২। জল, যম প্রভৃতি শব্দে জ, য-এর, গণ বন শব্দে ণ ন এর, এবং বিশ, মেষ, দাস প্রভৃতি শব্দে শ ষ স-এর একই ধ্বনি অথচ সংস্কৃতের অনুসরণে বিভিন্ন বর্ণ দ্বারা এই শব্দগুলির বানান করি।

৩। অনেক সংস্কৃত শব্দের বাংলায় উচ্চারণবিকৃতি ঘটেছে, কিন্তু বানানে আমবা সংস্কৃতের অনুসরণ করি। যেমন ঃ জ্ঞান, লক্ষ্মণ, পদ্ম ইত্যাদি।

৪। যে সকল সংস্কৃতভব শব্দ বাংলায় আছে, তাদের বানান নিয়েও নানান মতভেদ রয়েছে। যেমন ঃ কাণ- -কান, সোনা—সোণা।

৫। দেশি বিদেশি শব্দেও বিভিন্ন বানান রয়েছে। যেমন ঃ খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট, খৃষ্ট।

পরবর্তী পর্যাযে লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাংলা বানানের নিয়ম" সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

(ক) **সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ঃ** বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দগুলি লেখক বাংলার উচ্চারণ মতো লিখিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। কিন্তু সমাজ এতখানি পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে না। এই কাবণেই মতবিরুদ্ধ হলেও এই সকল শব্দেব সংস্কৃত ব্যাকরণ-সঙ্গত মূল বানানই সমর্থন করেছেন।

৩.১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** সমিতি প্রথম সংস্করণে প্রস্তাব রেখেছেন, রেফের পর দ্বিত্ব হবে না, যথা : উর্ধ্ব, কার্য, কর্ম, সর্ব। তবে ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হলে দ্বিত্ব হবে, যথা : কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক। লেখক জানিয়েছেন ব্যুৎপত্তির জন্য রেফের পর দ্বিত্ব হবে—পাণিনির ব্যাকরণে এরকম কোনো নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি না করে তিনি সর্বত্রই দ্বিত্বলোপের প্রস্তাব করেছেন।

৩.২। **সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার ঃ** সমিতি বলেন, ঙ এবং ং দুই চলতে পারে, কিন্তু লেখক সরলতার জন্য বাংলায় কেবল অনুস্বার চালানো উচিত বলে মনে করেন। যেমন—অহংকার, সংখ্যা।

৩.৩। **বিসর্গান্ত পদ ঃ** সমিতি বলেন, বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হবে, কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গ সন্ধি যথা নিয়মে হবে, যথা—আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ ইত্যাদি।

কিন্তু লেখক তদ্ভব মন শব্দে উচ্চারণ-হেতু বিসর্গলোপ সমর্থন করেন। অন্যত্র বিসর্গের স্পষ্ট উচ্চারণ না হলেও ব্যুৎপত্তি ও সন্ধির জন্য রক্ষা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয় যখন সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করতে চান না, তখন শুধুশুধু বিসর্গ ওঠানো অযৌক্তিক।

৩.৪। **হসন্ত পদ ঃ** সমিতি বলেছেন, সংস্কৃত পদের (বা শব্দের) শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হবে, যথা—দিক্, শ্রীমান্। লেখক এই মত সমর্থন করেছেন।

(খ) অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দ।

৩.৫। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ** এক্ষেত্রে সমিতি বর্জনীয় মনে করেন, যথা : পর্দা, জর্মানি। লেখকও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৩.৬। **হস্ চিহ্ন ঃ** হস্-চিহ্ন বিষয়ে তিনি সমিতির সঙ্গে একমত। তবে বিদেশি শব্দের শেষে অ উচ্চারণ প্রদর্শনের কোনো নিয়মের প্রয়োজন আছে বলে সমিতি মনে করেন না। কিন্তু লেখক মনে করেন এর প্রয়োজনীয়তা আছে। লেখক এক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহার করতে চান ; যথা—থিব', বাই ল'।

৩.৭। **ই ঊ উ ঊ ঃ** সমিতির নিয়মের সঙ্গে এখানে লেখক একমত নন। তিনি মনে করেন বিকল্প বিধি নিষ্প্রয়োজন। বানানের ঐক্য রক্ষার জন্য তিনি সর্বত্র ই বা উ লেখা উচিত বলে মনে করেন। তবে কেউ যদি ঈ বা ঊ বানান রাখতে যান, তাতেও লেখকের আপত্তি নেই। কিন্তু একই শব্দের দুরকম বানানে তাঁর আপত্তি।

৩.৮। **ণ ন ঃ** সমিতির প্রস্তাব, অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন হবে, যথা—কান, সোনা, কোরান ইত্যাদি। লেখকও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৩.৯। **ও-কার ও ঊর্ধ্বকমা প্রভৃতি ঃ** সমিতি "সুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার ঊর্ধ্বকমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়" মনে করেন, অথচ 'তো, হয়তো' এইরূপ বানান করেন।

লেখক এই মত সমর্থন করেন না। তিনি কাল (= কৃষ্ণ), কাল (= কল্য), কাল (= সময়) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন শব্দের বানান এক হলেও উচ্চারণ পৃথক সেক্ষেত্রে ভেদ দেখাতে চান। যেমন—কাল' (কালো), কা'ল (= কল্য), কাল। সর্বত্র একারের খাঁটি বাংলা উচ্চারণে এ' ে' লেখার প্রস্তাব করেছেন। তিনি বিকল্পের বিরুদ্ধে।

৩.১০। **ং, ঙ ঃ** লেখক সমিতির প্রস্তাবিত বাঙালি, আঙুল প্রভৃতি বানান সমর্থন করেন কিন্তু সেটা চলিত বাংলায়। সাধু বাংলায় বাঙ্গালি, অঙ্গুলি প্রভৃতি লিখতে চান। তবে চলিত বাংলায় রং, রঙ ; সং, সঙ প্রভৃতি দুরকম বানানের মধ্যে প্রথমটি অধিক সমীচীন মনে করেন। বিকল্প বানান পরিত্যাগ করতে চান।

৩.১১। **শ ষ স ঃ** সমিতি বাংলা তদ্ভব শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ, স রাখার প্রস্তাব করেছেন। যথা ঃ আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ) প্রভৃতি।

লেখক এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে যদি মূলানুযায়ী বানান রাখতে হয় তবে, কুমির, পাখি, চুন পুব ইত্যাদি বানান রাখার প্রস্তাব যুক্তিহীন। তিনি মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় সমস্ত তদ্ভব শব্দে শ রাখার প্রস্তাব করেছেন। যদি মূলানুযায়ী বানান করতে হয়, তবে আশে (আবিশতি), বশে (উপবিশতি) ইত্যাদি বানান রাখতে হয়। লেখক সর্বত্র মতৈক্য রাখার পক্ষপাতী। অবশ্য বিদেশি শব্দে শ ষ স সম্বন্ধে সমিতির প্রস্তাব গ্রহণে তাঁর আপত্তি নেই।

৩.১২। **চন্দ্রবিন্দু ঃ** এ সম্বন্ধে সমিতি কোনো নিয়ম দেননি। লেখক প্রস্তাব রেখেছেন—"মূল সংস্কৃত শব্দে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং থাকিলে তদ্ভব শব্দে অবশ্য চন্দ্রবিন্দু হইবে ; যথা—পাঁক, পাঁচ, কাঁটা, দাঁত, কাঁপ, হাঁস। অন্যত্র Standard বা শিষ্ট উচ্চারণ অনুযায়ী ঁ বসিবে।"

৩.১৩। **ক্রিয়াপদ :** চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ সম্পর্কে সমিতির প্রস্তাব লেখক মেনেছেন। তবে খাঁটি বাংলা এ কারের উচ্চারণে লেখক ঊর্ধ্ব-কমা বসানোর প্রস্তাব করেছেন। যেমন—দে'য়, গে'ল ইত্যাদি।

৩ ১৪। **কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ :** এ বিষয়ে লেখক সমিতির প্রস্তাব অনুমোদনীয় মনে করেন।

(গ) 'নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ'

৩ ১৫। এ ব্যাপারে লেখক সমিতির প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তবে z ধ্বনির জন্য য ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছেন। কারণ সকল ছাপাখানায় নীচে ডট্‌যুক্ত বা রেখাযুক্ত জ পাওয়া যায় না।

(ঘ) পরিশিষ্ট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি সমস্যাব সমাধান করেননি। এ ব্যাপারে লেখক তাঁর প্রস্তাব জানিয়েছেন :

৩.১৬। তদ্ভব শব্দে সর্বত্র ঐ এবং ঔ বর্জন করতে বলেছেন। যেমন, খই, দই, বউ, মউমাছি ইত্যাদি।

৩ ১৭। তদ্ভব শব্দে ক্ষ বর্জন করতে হবে। পাখি, এখন প্রভৃতি শব্দে যদি খ হয়, তবে খুব. খেত প্রভৃতি শব্দে খ লেখা হলে আপত্তি উঠবে না।

৩.১৮। তদ্ভব শব্দে সর্বত্র জ হবে, যথা—কাজ. জে, জিনি, জুঁই ইত্যাদি।

৩ ১৯। ভাইযের, বউয়ের এইরূপ বানান চালানো উচিত।

৩ ২০। "গণ যোগে শব্দেব কোন পরিবর্তন হইবে না. যথা—গুণীগণ, মহাত্মাগণ।" এক্ষেত্রে সমাস হয়নি। কিন্তু সব সকল প্রভৃতি শব্দের গণ বহুবচনের চিহ্ন। এটা না মানলে, 'সুন্দরী বালিকাগণ' ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ হয না। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলা ভাষায় সর্বত্র খাটে না। তাই মহাত্মগণ লেখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে লেখক মনে করেন না।

এই প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে বাংলা বানান সংস্কার সমিতির নিয়মাবলির বিভিন্ন অসংগতির দিক তুলে ধরেছেন এবং সেগুলির যথাযথ সমাধান কীভাবে করা উচিত সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তবে সংস্কার সমিতি পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের অনেক অভিমত পরিবর্তন করেছেন। সেখানে লেখকের ভাবনার অনেক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তবে লেখকের সমস্ত প্রস্তাব রূপায়িত হলে বানানের জটিলতা যে অনেক হ্রাস পাবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৪। **বাংলা বানানের একটি নিয়ম। আশুতোষ ভট্টাচার্য।**

ভারতবর্ষ : পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭

৪ ১। বাংলায় যে সমস্ত তৎসম শব্দ আছে তাদের বানানে "রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব" হবে কিনা তা নিয়ে সেই সময় মতবিরোধ দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রকাশ করেন, সেখানে তাঁরা নির্দেশ দেন, যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির

জন্য প্রয়োজন হয়, তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হবে—অন্যত্র হবে না। যেমন—কার্ত্তিক কিন্তু কর্তা। কিন্তু লেখক এই প্রস্তাব মানেন নি।

এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত হল পাণিনির ব্যাপক বিধান থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি নির্দিষ্ট বর্ণই কেবল সংস্কৃত বানানে রেফ্ যুক্ত হলে দ্বিত্ব হচ্ছে। এখানে ধ্বনিতত্ত্বমূলক কারণ নিহিত আছে বলে তিনি মনে করেন। সংস্কৃতের রেফযুক্ত দ্বিত্বের ব্যবহার থেকে তিনি সূত্র করেছেন, "রেফ্ যুক্ত হইলে 'চ' ও 'ত' বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ, 'প' বর্গের তৃতীয়-বর্ণ ও 'য' 'ল' দ্বিত্ব হইবে, অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না।"

যারা দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষপাতী তাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি হল দ্বিত্ব শব্দের উচ্চারণের সহায়ক। 'দরজা এবং দুর্জ্জন' উচ্চারণ করলেই এই পার্থক্য ধরা পড়ে। সুতরাং দ্বিত্ব মানলে যেমন উচ্চারণে সহায়তা হয় তেমনি প্রচলিত রীতির প্রতি নিষ্ঠাও প্রদর্শিত হয় বলে লেখক মনে করেন। তাছাড়া তাঁর ধারণা, মূল সংস্কৃতে দ্বিত্বের এই বিধান আদৌ ছিল না। এটি প্রাকৃতের ব্যঞ্জন সমীকরণের রীতি থেকে উদ্ভূত।

রেফ্ যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ত্যাগ করলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে তাঁর ধারণা। যেমন—(১) উচ্চারণেব মর্যাদা রক্ষা পাবে না। (২) বাংলায় আজ সহসা বানানের নতুন নিয়ম গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী বানানের সঙ্গে বর্তমান বানানের বৈসাদৃশ্য হেতু প্রথম শিক্ষার্থীদের অসুবিধা সৃষ্টি হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়ম সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ রয়েছে। বানান সমিতির প্রস্তাব হল, যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয়, তবে রেফের পর দ্বিত্ব থাকবে। লেখক মনে করেন শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধান যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি কোনো কোনো শব্দেব ব্যুৎপত্তি নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যেও নানা মতভেদ রয়েছ। তাছাড়া কতকগুলি শব্দে দ্বিত্বের বিধান যখন রইল তখন এই নিয়ম দ্বারা কোনো ব্যবহারিক সুবিধাও হবে না।

বাংলা বানানের নিয়ামকগণের কাছে তাঁর প্রস্তাব "কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আদ্যোপান্ত ওলট্ পালট্ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত প্রথাকে নিয়মিত করিয়া লওয়া সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতার পথ যেমন রুদ্ধ হইয়া যায়, বর্ত্তমানের কার্য্যও অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে।"

প্রবন্ধটি থেকে বোঝা যায়, লেখক রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষপাতী নন। তিনি যে কারণে দ্বিত্ব রাখতে চান সেগুলির খুব একটা ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির রেফ্ সংক্রান্ত প্রস্তাবেব যে ফাঁকগুলি তিনি দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। এই ধরনের যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা বানান সংস্কার সমিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বোঝাই যায়। কারণ সমিতি যে বানান সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রকাশ করেন তার তৃতীয় সংস্করণে রেফ্ সংক্রান্ত নিয়মটি পরিবর্তন করে আরো সরল কবেন।

৫। বাংলা বানানের নিয়ম। রাজশেখর বসু।

ভারতবর্ষ ঃ পৌষ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—১৩৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম সংকলন করেছেন, তার উপযোগিতা কতখানি সেই আলোচনা প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম সংকলন করেছেন তা নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। রাজশেখরবাবু মনে করেন্ এরকম আলোচনার প্রয়োজনও আছে। কারণ নিয়মাবলির ভূমিকাতেই 'ভাইস্‌চান্‌সেলর' মহাশয় লিখেছেন 'আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে।' অতএব সংস্কার তো করা যেতেই পারে।

এরপর লেখক ব্যুৎপত্তিবাদী, উচ্চারণবাদী এবং লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বানান-সংক্রান্ত একটা কৃত্রিম কথোপকথন তৈরি করে দেখিয়েছেন পণ্ডিতদের মধ্যে বানান নিয়ে কী প্রবল মতভেদ। কিন্তু তর্কের সময় যাঁরা বৈজ্ঞানিক জেদ অবলম্বন করেন, ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাঁরাই স্বচ্ছন্দে নানারকম অসংগতি মেনে চলেন। আসলে মতের চেয়ে আমাদের কাছে অভ্যাসই প্রবল।

"বানানের সমস্যা কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিটবে না" বলে রাজশেখরবাবু মনে করেন। কারণ বানান-সমিতি নিয়ম সংকলনের পূর্বে প্রায় দু-শ বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত সংগ্রহ করেন। তাঁদেব মধ্যে অনেক বিষযে ঐক্য আছে, অনেক বিষয়ে ঐক্য নেই। আবার একই ব্যক্তিব অভিমতে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। যেমন, যিনি চূণ লিখবেন তিনি নুণ লিখবেন না। বানান সমিতির সদস্যদের মধ্যেও মতভেদ আছে। তাই বানান সমিতি এ সংস্কারের পূর্বে প্রথমেই সম্পাদ্য স্থির করলেন ঃ

(১) বানানের সংস্কার যত হোক না হোক, নির্ধারণ আবশ্যক।
(২) বানান যতটুকু সরল করা সম্ভবপর, তা করা উচিত।
(৩) প্রথম উদ্যমে সমস্ত শব্দের বানান নির্ধারণ করা অনুচিত, এ চেষ্টা ক্রমে ক্রমে করাই ভালো।

বাজশেখববাবুব অভিমত, সকল ভাষার বানানেই অল্পাধিক অসংগতি-দোষ আছে, বাংলা বানানেও থাকবে। তবু যে নিয়মাবলি সংকলিত হয়েছে, তাতে খুব বেশি বৈপ্লবিক পবিবর্তন আনার চেষ্টা হয়নি। তবে নিযমে যদি ত্রুটি থাকে, তবে তা সংশোধনেরও অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাই তিনি মনে করেন সমালোচকের কাজ যেমন ত্রুটি দেখানো তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি সংশোধনের জন্য একটা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য উপায় নির্ধারণ করাও।

রাজশেখব বসু মহাশয় স্বয়ং বানান-সংস্কাব সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় তাঁর প্রবন্ধটিব স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। তিনি সুচিন্তিতভাবে সংস্কার সমিতির অসুবিধার দিকগুলি যেমন পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তেমনি সমিতির প্রচেষ্টাগুলিও পাঠককে অবহিত করিয়েছেন। এ দিক থেকে প্রবন্ধটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৬। **বাংলা বানান ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
প্রবাসী ঃ কার্তিক ১৩৪৩। পৃষ্ঠা—৫৯।

এই প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বানান সংস্কার সমিতি যে বানান প্রবর্তন করেছেন, তার একটি অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচনা করেছেন।

৬.১। "হ-ধাতু, খা ধাতু, দি ধাতু ও শু-ধাতুব অনুজ্ঞায় বানান কমিটি নিম্নলিখিত ধাতুরূপেব নির্দেশ করেছেন—হও, হযো। খাও, খেও। দাও, দিও। শোও, শুয়ো। অর্থাৎ খা এবং দি ধাতুতে তাঁবা ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় প্রচলিত খেয়ো দিয়ো বানানের পরিবর্তে খেও, দিও বানান নির্দেশ করেছেন। অথচ হয়ো শুয়ো বানান রেখেছেন।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। তাঁর বক্তব্য,করিয়া, খাইয়া শব্দের বানান পূর্বে ছিল করিআ খাইআ। কিন্তু পূর্ব স্বরের অনুবর্তী দীর্ঘ স্বর য়-যোজকের অপেক্ষা রাখে। তাই স্বভাবতই আধুনিক বানান উচ্চারণের অনুসরণ করেছে। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই বলেই তিনি মনে করেন। কিন্তু বানান সংস্কার কমিটি শুয়ো হয়ো শব্দে এ কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু অন্যত্র করেননি। যে কারণে সাধু ভাষায় করিয়া হইয়া বলিয়ো খাইয়ো চাহিয়ো বানান স্বীকৃত হয়েছ, সে কারণ চলিত ভাষাতেও আছে। দিয়েছে শব্দে তাঁরা যদি 'এ' স্বরের বাহনরূপে য় কে স্বীকার করেন তবে দিয়ো শব্দে য়-কে উপেক্ষা করা অযৌক্তিক। কেবলমাত্র দি এবং খা-ধাতুর য় অপহরণ তাঁর মতে তাদের প্রতি অবিচার করা।

রবীন্দ্রনাথ এখানে বানান সংক্রান্ত নিয়মাবলির ১৩-সংখ্যক নিয়মটিতে যে ফাঁকটি রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। বাস্তবিকই খা-ও দি-ধাতুর ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী নিয়ম চালু করায় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা বানান কমিটির দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই মনে হয়। কারণ নিয়মাবলির তৃতীয় সংস্করণে ১১ সংখ্যক নিয়মে এব্যাপারে কমিটিকে সচেতন হতে দেখি। সেখানে খা-ধাতুর ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় খেও-র পরিবর্তে খেয়ো বানান লেখার নির্দেশ রয়েছে। যদিও 'দিও' বানানটি অপরিবর্তিতই রয়েছে। এক্ষেত্রে সমিতি দিয়ো বানানের নির্দেশ দিলে একরূপতা রক্ষিত হত। তবে সমিতি নিয়ম না করলেও 'দিয়ো' বানানটি এখন বহুপ্রচলিত।

৭। **বাংলা বানান ঃ রাজশেখর বসু।**
প্রবাসী ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ পৃষ্ঠা—২১৭।

কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানানের নিয়মের যে অসংগতির দিকটি দেখিয়েছেন, এই প্রবন্ধে রাজশেখর বসু সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানাচ্ছেন।

তাঁর মতে 'করিআ' আর 'করিয়া'-র বর্ণগত উচ্চারণভেদ অতি অল্প। উচ্চারণ বিশেষ করার জন্য নয়, অ অপেক্ষা য় লেখা সহজ বলেই অ-স্থানে য় এসেছে। তবে 'হয়ো' 'শুয়ো' বানানে য়-এর প্রয়োজন আছে। কারণ 'হও' 'শুও' লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসে না। কিন্তু খেয়ো দিয়ো না লিখে 'খেও', 'দিও' লিখলে য়-র অভাব বোঝা যায় না। সুতরাং অনাবশ্যক বর্ণ বাদ দেওয়াই লাভ। করিয়া, খাইয়া-তে য় অনাবশ্যক। মোয়া, খাওয়া-তে একেবারেই ভুল। তাই য় স্থানে অ চালালে বানান সরল ও শুদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে লেখক কয়েকটি সূত্র দিয়েছেন ঃ

৭.১। যদি উচ্চারণের জন্য আবশ্যক হয়, তবে য় থাকবে। যেমন—হয়ো, শুয়ো।

৭.২। যেখানে কায়েম হয়ে বসেছে, সেখানে অনাবশ্যক বা ভুল হলেও য় আপাতত থাকবে, যথা হইয়া, হওয়া।

৭.৩। যেখানে য় এখনও সর্বসম্মত হয়নি সেখানে তাকে আর প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। যথা—দিও, করিও।

৭.৪। নবাগত বিদেশি শব্দে, যার বানান এখনও পাকা হয়নি সেক্ষেত্রে য়-এর অপপ্রয়োগ যথাসাধ্য বর্জনীয়। যেমন— সোডাওআটার।

লেখক মনে করেন সংস্কারমুক্ত হলে অ-বর্ণের প্রচলন হবে, আর য়-ঘটিত অসংগতিও দূর হবে।

৮। **বাংলা বানান ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

প্রবাসী ঃ পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৩৩৩-৩৩৪।

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট করে তাঁর বক্তব্য এখানে জানিয়েছেন।

ই-কারেব পরে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগম হয় তখন উভয়ে মিলে য়-ধ্বনির উদ্ভব হয়। এই নিয়ম অনুসারে পূর্বে খায়্যা, পায়্যা প্রভৃতি বানান প্রচলিত হয়েছিল। 'হয়' ক্রিয়াপদে হঅ বানান চলেনি। এখানে হয়-এর য় একটি লুপ্ত 'এ' কার বহন করে। অন্ত্য এ স্বরের উচ্চারণকে দীর্ঘ করতে হলে 'য়' যোগ করা অনিবার্য হয়। তেমনি খাও শব্দের 'ও'হ্রস্বস্বর কিন্তু খেও শব্দে ও হ্রস্ব নয়, তাই দীর্ঘ ও-কারের আশ্রয়রূপে য়-র প্রয়োজন অনিবার্য।

আসলে ই-কারের পরবর্তী স্বরবর্ণের যোগে য়-র উদ্ভব স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী। বেআইন বেআড়া ইত্যাদি বানান সুসঙ্গত। কারণ এ-কারের সঙ্গে অন্য স্বরবর্ণের মিলনে ঘটক নিষ্প্রয়োজন। বানান অনুসারে খেও এবং খেয়ো উচ্চারণে ভেদ নেই—এ কথা মানা শক্ত। মনে রাখা প্রয়োজন খেয়ো (খাইয়ো) শব্দের মাঝে লুপ্ত ই-কার আছে। উচ্চারণে তার প্রভাব লুপ্ত হয়নি।

৯। **বাংলা বানান। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।**

প্রবাসী ঃ ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৭১১।

খেও বা দিও বানান-সংক্রান্ত যে বিতর্ক শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন প্রচলিত বাংলা বানানে 'য়' অক্ষরের চারটি উচ্চারণ আছে ঃ

(১) অ-কারাদি স্বরের সঙ্গে অভিন্ন। যথা—পেযারা।

(২) উ-কার বা ও-কারের পরস্থিত য়া ইংরেজি wa-র মত। যেমন ঃ কূয়া, মোয়া।

(৩) ইংরাজী y এর মত। যথা—বায়ু, ময়ূর। হইয়া, দেখিয়া প্রভৃতির স্থলে য়ার উচ্চারণ আ এবং ya-র মধ্যবর্তী। বস্তুত ই-কার ও স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত য়-কে দুই স্বরের অন্তর্বর্তী সন্ধিবর্ণ বলা হয (glide)। শব্দের আদিতে 'ইয়া' ইং ya-এর উচ্চারণ প্রকাশ করে। যথা—ইয়ার, ইয়ারিং ইত্যাদি।

(৪) অ, আ, এ স্বরেব পরবর্তী হসন্ত য় পূর্ব স্বরের সঙ্গে সন্ধিস্বর (diphthong) সৃষ্টি করে। যথা—হয়, পয়সা। এক্ষণে য় হসন্ত এ-কারের সঙ্গে অভিন্ন।

শহীদুল্লাহের মতে, 'খেয়ো' শব্দের য় উচ্চারণ তৃতীয় প্রকারের। সুতরাং খেও বানানে প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত হয় না। এই কারণে খেয়ো, যেয়ো, পেয়ো (খাইও, যাইও, পাইও শব্দের চলিতরূপে) ইত্যাদি বানান তিনি সঙ্গত মনে করেন।

'দিয়ো' বা 'দিও'-এর মধ্যে কোন্ বানান ধ্বনিসঙ্গত এ প্রশ্নও উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হল, ই এবং ও-এর মধ্যে সন্ধিবর্ণ য় আসে। এই কারণে দিয়ো বানান অধিকতর সঙ্গত। এইজন্য করিও দেখিও, যাইও ইত্যাদি স্থলে করিয়ো, দেখিয়ো, যাইয়ো বানান প্রচলনের পক্ষপাতী।

১০। ভাষা সমস্যা। শ্রী কমলাকান্ত বসু।

মাসিক বসুমতী ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—২৪২।

শ্রী কমলাকান্ত বসু 'ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) ভাষার স্বরূপ (২) বর্ণমালার রূপ (৩) শব্দবিভ্রাট। আমাদের বানান-সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত শেষোক্ত দুটি বিষয়। এই দুটি প্রসঙ্গ আলোচনা সূত্রে লেখকের বানান সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বর্ণমালার রূপ" (পৃঃ ২৪৫)

বাংলা বর্ণমালা রোমান অক্ষরে লেখার নিয়ম প্রবর্তন করা নিয়ে বহু আলোচনা চলছে। এ সম্পর্কে লেখক তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

১০.১। লেখক মনে করেন, সংযুক্ত বর্ণের ভয়ে রোমান হরফ প্রবর্তনের পরিবর্তে সংযুক্ত বর্ণ সহজতর করে লেখাই শ্রেয়। যোগেশবাবু বর্ণের নীচে বর্ণ লিখে সংযুক্ত বর্ণ বোঝানোর পক্ষপাতী। কিন্তু কমলাকান্ত বসু মহাশয়ের অভিযোগ হল ঃ

"ইহা খুব আপত্তিকর না হইতে পারে কিন্তু ইহা চক্ষুর পীড়াদায়ক।"

তাছাড়া লেখক মনে করেন, ২৬ টি রোমান বর্ণের সাহায্যে বাংলার ৫২ টি বর্ণের উচ্চারণ করা যেতে পারে না। ঐ, ঔ-এই দুটি স্বরবর্ণ এবং খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ত, থ, ধ, ড়, ঢ়, য়, ঃ, ঁ —এই ১৪ টি ব্যঞ্জন কীভাবে লেখা হবে তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ রোমান অক্ষরের অপ্রাচুর্যের জন্য বিভিন্ন diacritical marks ব্যবহারের পক্ষপাতী, কিন্তু এই চিহ্নগুলি শিশুদের ভাষাশিক্ষার অন্তরায় বলেই প্রাবন্ধিকের অভিমত। মোট কথা এখানে রোমান হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে।

"শব্দবিভ্রাট" ঃ পৃষ্ঠা—২৪৮।

১০.২। বাংলায় বর্ণমালার সংখ্যাধিক্য ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে—এই আশঙ্কায় বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঋ, ৯, ঐ, ঔ এই ছটি স্বর এবং ঙ, এঃ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ঢ়, ৎ, ঃ—এই দশটি ব্যঞ্জন বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভবই করেছেন। বর্ণ বাদ গেলে তার কাব-চিহ্ন ও ফলা-গুলিও বাদ যাবে। কিন্তু লেখকের বক্তব্য, এরূপ বানান সংস্কারের ফলে বর্ণবিভ্রাট দূর হলেও অর্থবিভ্রাট দেখা দেবে। এটি ভাষাশিক্ষার অন্তরায়। বিভিন্ন ফলা বা যুক্তাক্ষর তুলে দিলে এক একটি শব্দ 'কিম্ভূতকিমাকার' হয়ে উঠবে। যেমন ঃ শস্য—শশ্‌শ ; তত্ত্ব—তত্‌ত।

বর্তমান কালে প্রস্তাব উঠেছে, সংস্কৃত-অনুযায়ী বংলা শব্দের উচ্চারণ যখন হয় না, তখন বানান কেন সংস্কৃত-অনুযায়ী হবে? উচ্চারণ অনুসারে যাঁরা বানান লিখতে চান তাঁরা ভিক্ষা বানানটি লিখতে চান ভিক্‌খা। কিন্তু লেখকের বক্তব্য, উচ্চারণ দেশের সর্বত্র সকল লোক একরূপ করে না। উচ্চারণানুসারী বানানের ক্ষেত্রে, যদি ঘোঁড়া উচ্চারণ করি তবে ঘোঁড়া লেখা উচিত, ঘোড়া নয়। সুবর্ণ থেকে সোণা। অনেকে সোনা লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু লেখক মনে করেন যদি উচ্চারণানুসারী বানান লিখতে হয়, তবে বানানটি হবে শোনা। তখনই শ্রবণ করা অর্থে যে শোনা বানানটি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে রূপগত সাদৃশ্য এসে যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাধানে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা সুদীর্ঘ শব্দ তালিকা প্রস্তুত করে নতুন

বানানের নমুনা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যসেবীগণ তা মেনে নিলেও লেখক তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কারণ ভাষার রূপ এক মুহূর্তের ব্যাপার নয় বা তাকে যেমন খুশি ঢেলে সাজানোও যায় না।

এই প্রবন্ধে 'বর্ণমালার রূপ' অংশটিতে লেখকের ভাবনা যুক্তিযুক্ত। তবে 'শব্দবিভ্রাট' অংশে লেখকের অভিমত পুরোপুরি মানা যায় না। লেখক উচ্চারণানুসারী বানানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, দেশের সর্বত্র উচ্চারণ এক নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন আঞ্চলিক উচ্চারণ ভাষায় গৃহীত হয় না। যে অঞ্চলের উচ্চারণকে আদর্শায়িত বা মান্য বলে ধরা হচ্ছে, একমাত্র সেই উচ্চারণই বানানে রূপ পাবে। পুরোপুরি উচ্চারণভিত্তিক বানান লেখা সম্ভব নয় ঠিকই, তবে বানান যতদূর সম্ভব উচ্চারণভিত্তিক করাই যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক।

১১। **বাঙ্গালা বানান সমস্যা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অভিভাষণ।** দেশ ঃ ৪ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (৬ই মার্চ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)।

দেশে প্রকাশিত শহীদুল্লাহের ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যুক্তিসম্মত এবং আধুনিক মনোভাব-প্রসুত। তাঁর ভাষণে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন—"যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত থেকে ধাব করিয়া বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লওয়া হয় নাই সেখানে বাঙ্গালার স্বরাজ্য চলিবে।" বোঝাই যায়, ড. শহীদুল্লাহ তদ্ভব বা দেশি শব্দের বানানে সংস্কৃতের বিধি-নিষেধ মানতে রাজি নন। তিনি 'সোনা' (স্বর্ণ) বানানটি বাংলার উচ্চারণ অনুযায়ী 'শোনা' লেখার পক্ষপাতী। উচ্চারণ ও বানান এক হয়ে যাওয়ায় অর্থ বিভ্রাটের প্রশ্ন উঠতে পারে। সে ব্যাপাবে তাঁর বক্তব্য, "ভাষায় অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না। অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জডাইয়া আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশাইযা। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড একটা হয় না।" তাছাড়া তিনি মনে করেন অক্ষর দিয়া একটি ভাষার শব্দ প্রকাশ করার নাম বানান। সুতরাং বানানের আসল উদ্দেশ্য হল সেই ভাষার উচ্চাবণের পরিচয় বহন করা। পালি প্রাকৃতের বানান যেমন উচ্চারণ-অনুযায়ী ছিল বাংলার বানানও তেমন হওয়া উচিত। উচ্চারণমতো বানান সংস্কার কবলে বানান কীরকম হবে তার নমুনা দিয়েছেন।

১১.১। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে হ্রস্ব স্বরগুলি হবে—অ আ ই উ এ ও অ' আ' এ'। শেষোক্ত তিনটি স্বরবর্ণ বিকৃত স্বর বোঝাতে ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে। তবে দীর্ঘ স্বর বোঝাবার জন্য আলাদা কোনো হরফের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ বাংলা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব-দীর্ঘ ধবা পড়ে।

ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব হল ঃ

ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল। শ হ। ং ঁ। য় অন্তঃস্থ ব।

ঙ ঞ -র পরিবর্তে ং দ্বারা কাজ চালাতে চান। ঃ -র উচ্চারণে হ্ বা পরের অক্ষরের দ্বিত্ব করতে চান। যেমন, দুহ্খ বা দুক্খ।

১১.১। যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। যেমন, বাংলায় য-ফলা বা ব-ফলার সার্থকতা নেই বলে তাঁর মত। জ্ঞ-র উচ্চারণ গঁ-র মতো। যেমন (বিগগঁ)।

ম-ফলা নিষ্প্রয়োজন। উচ্চারণানুসারী বানানে শ্মশান, পদ্ম হবে শঁশান, পদ্দঁ। ক্ষ-র পরিবর্তে ক্‌খ লেখার প্রস্তাব করেছেন।

১১.৩। উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের বিপক্ষে প্রশ্ন উঠতে পারে উচ্চারণ বাংলাদেশের সকল জায়গায় যখন এক নয়, তখন কোন্ স্থানের উচ্চারণ ধরে বানান করা হবে তা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁব উত্তর হল, লেখ্য ভাষায় যেমন একটি সাধারণ ভাষা বা standard language ব্যবহার করা হয় তেমনি একটা সাধারণ শিষ্ট উচ্চারণও আছে। বানান সেই অনুযায়ী হবে। তিনি তৎসম না হোক তদ্ভব ও দেশি শব্দগুলিতে ধ্বনিমূলক বানান চালানোর পক্ষে।

লেখকের প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তৎসম শব্দের বানান দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। তাই এখানে হস্তক্ষেপ ঘটালে জটিলতা বাড়বে। তবে তদ্ভব, দেশি, অথবা বিদেশি শব্দেব বানান ধ্বনিভিত্তিক হলে বাংলা বানানে বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে সরলতা আসবে। অবশ্য প্রচলিত অভ্যাস ভেঙে এতটা এগিয়ে আসা সময়সাপেক্ষ বিষয়। নিয়মের প্রয়োজন আছে এও যেমন সত্য, তেমনি ভাষার মতো জীবন্ত বিষয়কে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যায় না, এও সমান সত্য। সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যখন ধ্বনিভিত্তিক বানানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁদের রচনায় এই ধরনের বানান ব্যবহার কববেন, তখন ধীরে ধীরে সমাজের সবশ্রেণির মধ্যে এই বানান ছড়িয়ে পড়বে। ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

১২। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে দেবপ্রসাদ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে পত্রমারফত দীর্ঘ বানান বিতর্ক চলে। উত্তর-প্রত্যুত্তর মিলিয়ে প্রায় আটটি পত্র পাওয়া যায়। পত্রগুলি কিছু কিছু প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে পত্রাদিতে বানান সংক্রান্ত যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলিব উল্লেখ করে সে সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করব।

১২.১। **রেফের পরে কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব প্রয়োগ বিষয়ে। (৮ই জুন, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ঃ** দেবপ্রসাদ ঘোষ এ প্রস্তাব মানেন নি। তিনি মনে কবেন, সুপ্রচলিত ব্যাকরণসম্মত রূপ পরিবর্তন করাব পেছনে কোনো কারণ নেই। তাছাড়া "ভাষার রূপের চরম প্রামাণ্যই হইতেছে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা ; ...... সুপ্রচলিত রূপ পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টার ফলে আবার নানাবিধ রূপ প্রচলিত হইয়া বিশৃঙ্খলাব কারণ"। (৮ই জুন, ১৯৩৭)

যেমন রবীন্দ্রনাথ রেফের পর দ্বিত্ববর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিয়ম সমর্থন করেন। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, "রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশী তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করিনে। .... এখন থেকে 'কার্ত্তিক', 'কর্ত্তা' প্রভৃতি দুই-ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক 'ত' আমরা নিশ্চিত মনে ছেদন করে নিতে পারি। সেটা সাংঘাতিক হবে না।" (১২.৬.৩৭)

আসলে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব বানান সরল করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি পত্রে (২৬/৬/৩৭) এ প্রসঙ্গে লিখছেন "বানান-সংস্কার-সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সেজন্য নবজাত ও অজ্ঞাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।"

১২.২ ণ-ন সংক্রান্ত বিষয়।

ণ-ন সংক্রান্ত সমস্যা থেকে বাংলা বানান এত বানান সংস্কারের পরও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। এই পত্রাদি থেকে আমরা এ সম্পর্কে দেবপ্রসাদ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হই।

দেবপ্রসাদ ঘোষ তদ্ভব শব্দের বানানের 'ণ'-ও মূলানুযায়ী রাখতে চান। এই কারণে 'বাণান' লেখেন, 'বানান' নয়। যেহেতু শব্দটি বর্ণন থেকে আগত। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি জানান, "যেখানে "ণ" দিয়া বাণান কোন শব্দের মূলানুযায়ী, যেখানে বোধসৌকর্য্যার্থে "ণ" দিয়া লিখিলে সুবিধা হয়, যেখানে "ণ"ই প্রচলিত প্রয়োগ—সেখানে স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই যে আমি মোটেই 'ণ' এর বিরোধী নহি" (২৬.৭.৩৭)। তিনি 'রাণী'র পরিবর্তে রানি বা রাণী লেখাব পক্ষপাতী মোটেই নন। তিনি মনে করেন সংস্কৃত উচ্চারণে যেমন ন ও ণ-এর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, তেমনি বাংলা উচ্চাবণে ন ও ণ-এব সমান মূল্য। ন ও ণ-এর ব্যবহাব রযেছে বলেই বাণান (বর্ণ বিন্যাস) বানান (তৈরি) ; মণ (ওজন), মন (চিত্ত) ; আপণ (দোকান), আপন (নিজের) ইত্যাদি বানানে অর্থের পার্থক্য সহজে ধরা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি মনে করতেন "প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত কবে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণেব মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না" (২৬/৬/৩৭)। এই কারণেই 'বর্ণন' শব্দটিতে হস্তক্ষেপ করেন না , কিন্তু 'বর্ণন' থেকে আগত শব্দটি লেখেন বানান, 'বাণান' নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণ-এর স্থান কোথাও নেই বলেই তাঁর অভিমত। তাই বানান সংস্কার সমিতির অ-তৎসম শব্দে 'ণ' তুলে দেবার প্রস্তাবটিতে তাঁর পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছেন। কেবল এই সকল পত্রাদিতেই নয়, অন্যত্রও তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১২ ৩। **তৎসম, অ-তৎসম শব্দের বানান কেমন হওয়া উচিত**—তা নিয়ে বিস্তর বাদানুবাদ চলেছে এই সকল পত্রাদিতে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, "কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভাণ করা হয় মাত্র। বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসমশব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় না। অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি সে সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ।" রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন "যদি প্রাচীন ব্যাকরণ-কর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারতুম" (১২/৬/৩৭)। তবে মনে এ ইচ্ছা থাকলেও তিনি তৎসম শব্দে নমস্যদেরই নমস্কার জানিয়েছেন। এমনকি যে সকল অবিসংবাদিত তদ্ভব শব্দ অনেকটাই তৎসম-ঘেঁষা তাদের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন এতে প্রতি পদে 'গৃহবিচ্ছেদের' আশঙ্কা থাকবে।

তবে 'প্রাকৃত' বাংলার তদ্ভব শব্দবিভাগের বানান উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য মেনে চলুক—এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। তবে এই কাজ চালাবার জন্য উপযুক্ত বিধির প্রয়োজন আছে বলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সে বিধানকর্তা হবার জোর আছে বলে তাঁর অভিমত।

দেবপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। বাংলার প্রচলিত তৎসম শব্দে অক্ষরই শুধু সংস্কৃতানুযায়ী হয়, উচ্চারণ বহু স্থলে হয় না—রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ

দেবপ্রসাদবাবুও মেনেছেন। তবে কোনো জীবন্ত ভাষাকেই phonetic কাঠামোতে আবদ্ধ করে রাখা যায় না বলে তিনি মনে করেন। তাই বর্তমানে যে রূপের যে ধ্বনি দাঁড়িয়েছে তাকেই তিনি মেনে নেবার পক্ষপাতী। যেখানে একই ধ্বনির একাধিক রূপ রয়েছে, সেখানেও ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারাই সে সমস্যার সমাধান হবে। তাছাড়া বাংলাতে অসংখ্য সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূল শব্দ আছে। তাই তিনটি 'স', দুটি 'ন', দুটি 'জ' কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া বাংলাতে প্রচলিত তৎসম শব্দের বানানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই বলেই তিনি মনে করেন। তাই এক্ষেত্রে কোনো রদবদলের পক্ষপাতী নন।

তদ্ভব, দেশজ, বিদেশি শব্দের বানানে দেবপ্রসাদবাবু কোনোরকম রদবদল চান না। কারণ তিনি মনে করেন এই ক্ষেত্রগুলিতেও বানান একপ্রকার প্রচলিত হয়ে গেছে। যে যে ক্ষেত্রে বিকল্প বানান রয়েছে সেক্ষেত্রে একরকম রূপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। তবে তিনি মনে করেন এরও বিশেষ আবশ্যকতা নেই। বোঝাই যায় কোনো ক্ষেত্রেই দেবপ্রসাদবাবু পরিবর্তন চান না।

১২.৪। **"ইলেক" চিহ্ন ঃ**

দেবপ্রসাদ ঘোষ 'ইলেক' চিহ্নের পরিবর্তে ও-কার ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবণতার প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন "ইলেক্‌টা কেহ খামখা দেয় না, যেখানে কোন বর্ণ লোপ পাইয়াছে বা elision হইয়াছে সেইখানেই বর্ণলোপের চিহ্নস্বরূপ ইলেক্‌ দেওয়া হয়।" ইংরেজি থেকেও তার নজির দিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ইলেক্‌'দেবার পক্ষপাতী নন। করিয়া শব্দের ই-কার বিদায় নিয়েছে এবং তারই চিহ্ন রূপে ইলেকের স্থাপনা বলে অনেকের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন করিয়া থেকে হয়েছে কোরে। প্রথমবর্ণের ওকারটি পরবর্তী ই-কারের দ্বারা প্রভাবিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথার্থই "ই" কার লুপ্ত হয়েছে ; যেমন ডাহিন থেকে ডান, বহিন থেকে বোন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে লুপ্তস্বরের স্মরণটির ব্যবহার নেই। শুধু স্বরবর্ণ কেন, যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে সেখানেও এই চিহ্ন বসেনি। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "এই সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত করার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করাবার প্রয়োজন আছে কি?" (২৬/৬/৩৭) অসমাপিকার সূচনা করতে ইলেকের পরিবর্তে ও-কার ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২.৫। **"ই" এবং "ও" র প্রয়োগ ঃ** "এব" শব্দের অপভ্রংশ "ই" এবং "অপি" শব্দের অপভ্রংশ "ও"-কে রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দে উচ্চারণ করবার "মুদ্রাভঙ্গীর সঙ্কেতচিহ্ন" বলে মনে করেন। সেই কারণে এখনি, তখনি, আমারো, তোমারো শব্দের ই-কার, ও-কারকে ঝোঁক দেবার কাজে ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ও-দুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দেবপ্রসাদ ঘোষ তা সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন "ই" এবং "ও" স্বতন্ত্র। সার্থক অব্যয়, এরা কোনো স্বরভঙ্গীর চিহ্ন নয়। তাছাড়া যখনই, তখনই, আমারও, তোমারও ইত্যাদি বানানকে যদি যখনি, তখনি, আমারো, তোমারো ইত্যাদি লেখা হয় তবে লিখতে হবে "ভাতি (ভাতই) বাঙালীদের প্রধান খাদ্য, তবে মাঝে মাঝে তাহারা দুধো (দুধও) খাইয়া থাকে আবার মাছো (মাছও) খুব ভালোবাসে।" রবীন্দ্রনাথ ২৬/৬/১৯৩৭-এ লেখা চিঠিতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানিয়েছেন, যখন আমরা বলতে চাই 'বাঙালি ভাতই খায়' তখন ঝোঁকটা পড়ে

আ-কারের পরে, ই-কারের পরে নয়। ই-কারের কাজ ঝোঁক দেওয়া নয়। সুতরাং 'ভাতি' লিখলে ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে পড়বে। সেটা রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব নয়।

১২.৬। **"কি"—'কী" সমস্যা ঃ** রবীন্দ্রনাথ অব্যয় শব্দ "কি" এবং সর্বনাম শব্দ "কী" রূপে লেখেন। কারণ তিনি মনে করেন "তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমনকি প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না।"

কিন্তু দেবপ্রসাদবাবু তা অনুমোদন কবেন না।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও পত্রাদিতে আরো ছোটোখাটো বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে; যেমন ঙ্গ ং ইত্যাদি। এগুলি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

পত্রগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, দেবপ্রসাদ ঘোষ অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁর প্রথানুগত্য এতই প্রবল যে তিনি তাব বাইরে আসতে চান না। যেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঁচিয়েও বানানের পবিবর্তন বা সবলীকরণ সম্ভব সেখানেও তিনি পরিবর্তনে অনিচ্ছুক। লেখকের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান" (১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬) গ্রন্থে তাঁর বাংলা বানান-সংক্রান্ত ভাবনা আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। তাই বাহুল্যবোধে সেগুলিকে নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না। আসলে তিনি মনে করতেন বহুল প্রয়োগ ও প্রাচীনতাই বানান সম্বন্ধে বড়ো কথা। তাছাড়া বাংলা শব্দের গঠনে সংস্কৃত মূলের সাদৃশ্য যতটা রক্ষিত হয় ততটাই ভালো বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত করে বাংলা বানানকে স্বরূপে প্রকাশ করতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। আজকের যুগে বাংলা বানানের মতো ভাষার একটি জীবন্ত দিককে বিশেষ কোনো মোহে আবদ্ধ করে রাখা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় বলেই আমাদের মনে হয়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানমনস্ক। তিনি যে বৈপ্লবিক পবিবর্তন চেয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণেব প্রভাবে থেকেও যতদূব সম্ভব বানানে সবলতা আনাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। শুধুমাত্র দেবপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে লিখিত পত্রেই নয়, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে সংকলিত বানান সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাতেই তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন বয়েছে। আসলে বাংলাকে তিনি বাংলা রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন, সংস্কৃতের মোড়কে নয়। তাই যতদূর সম্ভব উচ্চারণসঙ্গত বানানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন : "প্রাকৃত ভাষাব স্বভাকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না।" (২৬/৬/১৯৩৭-এ আলমোড়া থেকে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা পত্র)

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা আমাদের কাছেও গ্রহণীয়।

১৩। **বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।**
প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা—৬৭।

১৩.১। ড. শহীদুল্লাহের অভিমত, বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বা ধ্বনিসঙ্গত যে কোনো একরকম হওয়া উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু বানান ধ্বনিসঙ্গত রেখে অনিয়ম সৃষ্টি করেছেন। যেমন ঃ

১০ নং নিয়মে বলা হয়েছে, "মূলসংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে", যথা ঃ আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), এক্ষেত্রে নিয়মটি ব্যুৎপত্তিগত কিন্তু ৭ নং নিয়মেই বলা হয়েছে "অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে।" যেমন—কান, সোনা।

লেখক মনে করেন ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বলে শ, ষ, স চলবে কিন্তু ণ চলবে না এরকম নিয়ম তৈরি ঠিক নয়।

১৩.২। শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন সংস্কার সমিতি কোথাও কোথাও 'এও হয়, ওও হয়" এই ধরনের স্বেচ্ছাচার চালিয়েছেন। যেমন—৫ নং নিয়মে সংস্কৃতানুসারে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ কুমীর/কুমির, পাখী/পাখি।

১৩.৩। ৬ নং নিয়মে—কাজ, জাউ, জাঁতা ইত্যাদি বানানে জ লেখার বিধান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বানানগুলি ধ্বনিসঙ্গত। কিন্তু সর্বনাম শব্দগুলি ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'য' দিয়ে লেখা হচ্ছে। এই অসংগতির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

১৩.৪। চলতি বাংলার ক্রিয়াপদের বানানের ক্ষেত্রে সমিতি হব বা হবো দুরকম বিধানই দিয়েছেন। কিন্তু হল শুল, উঠল ইত্যাদি বানানে অন্ত্য ও-কার উচ্চারিত হলেও বিকল্পে ও কার বিধান কেন দেওয়া হল না তা স্পষ্ট হয় না। হলাম, হলেম, হলুম যখন লেখা যেতে পারে বলে বিধান দেওয়া হয়েছে তখন করতেছে, করে, করতে এই রূপগুলি কেন চলবে না?

১৩.৫। সমিতি অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদেব (তুমি কর, লেখ, ওঠ) শেষে ও-কার দেন না কিন্তু করো, লিখো, ওঠো স্থলে অন্ত্য ও-কারের বিধান দিয়েছেন। ব্যুৎপত্তি বা উচ্চারণ যে কোনো দিক থেকে উভয়ক্ষেত্রে অন্ত্যস্বর একরূপেই বানান করা উচিত বলে লেখকের মত।

১৩.৬। করাইও প্রভৃতি পদের চলতি রূপে তাঁরা 'করিও' বানানের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু লেখক চলতি বাংলায় 'করিয়ো' বানান লেখা উচিত বলে মনে করেন।

১৩.৭। যে সকল ধাতুর অন্তে বা উপান্তে ই কাব বা উ-কার আছে, কথ্য ভাষায় কোনো কোনো স্থলে এ-কার বা ও কার হয়। যথা লেখে, লেখেন। লেখকের বক্তব্য সাধু ভাযাতেও এইরূপ বানান হওয়া উচিত।

১৩.৮। উপান্তে এ-কারযুক্ত 'দেখ্' প্রভৃতি ধাতুর কথ্য ভাষার রূপ সম্বন্ধে সমিতি কোনো নিয়ম করেন নি। এক্ষেত্রে দ্যাখে, দ্যাখেন প্রভৃতি বানান হওয়া উচিত বলে লেখক মনে করেন।

১৩ ৯। অভিশ্রুতিতে উৎপন্ন ও-কার দেখানোর জন্য কোনো স্থানেই ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার না করে লেখক তৎপরিবর্তে ও-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী।

১৩.১০। সংস্কৃত ক্ষ অক্ষরের বিকৃতিতে সর্বত্র যদি ছ লেখা চলতে পাবে, তবে ক্ষ এর বিকৃতিতে খ লেখাতেও আপত্তি থাকতে পারে না বলে শহীদুল্লাহ মনে করেন।

১৩.১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নং নিয়মে বিকল্পে কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; প্রভৃতি লেখার বিধান দিয়েছেন। কিন্তু শহীদুল্লাহের বক্তব্য কাল (সময়), কাল (কল্য), কাল (কৃষ্ণ) এই তিনটি পৃথক শব্দ, এদের উচ্চারণও পৃথক। তাই এদের ধ্বনিগত বানান লেখা কর্তব্য। অর্থাৎ কাল (সময), কা'ল (কল্য), কালো (কৃষ্ণ)।

১৩.১২। "ক'নে ঘরের কোণে ব'সে আছে"—এই বাক্যে ক'নে ও কোণে এই দুই শব্দের উচ্চারণ লেখকের কাছে এক নয়। কাজেই ব'সে স্থানে বোসে লেখা চলে কিন্তু ক'নে স্থানে কোনে চলবে না বলে লেখক মনে করেন।

১৩.১৩। বিদেশি শব্দের বানানের অন্ত্য অ-কার উচ্চারণ বানানে দেখানোর জন্য ঊর্ধ্বকমা বানানে দেখানো আবশ্যিক বলে তাঁর অভিমত। যেমন, Thibaw—থিব'।

১৩.১৪। z উচ্চারণের জন্য জ-এর নীচে ফুটকি বা রেখা দেবার বিধান দিয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সব প্রেসে এই অক্ষর না পাওয়ার জন্য লেখক 'য' ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে অক্ষর পাওয়া গেলে সমিতির নিয়ম পালনে তাঁর আপত্তি নেই।

শহীদুল্লাহ বানানের ক্ষেত্রে হয় ধ্বনিভিত্তিক না হয় ব্যুৎপত্তি-অনুসারী—যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তিনি যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন, তাতে বোঝাই যায় ধ্বনিভিত্তিক বানানের প্রতি তাঁর পক্ষপাত। তবে বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি রীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। কারণ তাতে বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র সমালোচনা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত করবে। তবে তিনি যে যে দৃষ্টিকোণ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান-সংক্রান্ত নিয়মাবলির ফাঁকগুলি দেখিয়েছেন, তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় আর একটু সাহসী হলে এই ফাঁকগুলির কিছুটা পূরণ করতে পারতেন। যেমন ৫ নং নিয়মে বিকল্প না রেখে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে সর্বত্র ই বা উ চালু করলে বানানে অনেকটাই সরলতা আনা সম্ভব হবে। তেমনি ৭ নং নিয়মে সমস্ত অসংস্কৃত শব্দে 'ন' লেখার বিধান দেওয়া হয়েছে। তেমনভাবে ১০ নং নিয়মে সমস্ত তদ্ভব শব্দে যদি 'শ' লেখার বিধান দেওয়া হত তবে সাময়িকভাবে দৃষ্টিকটু লাগলেও নিয়মের চাপে বানান-সমস্যার একটি বড়ো অংশের সমাধান সম্ভব হত।

যাই হোক, এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়মাবলী'র ত্রুটিগুলি যথাযথভাবে তুলে ধবা হযেছে এবং লেখক নিজেও যেভাবে সংশোধিত যথার্থ রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, সেদিক থেকে প্রবন্ধটির মূল্য অনস্বীকার্য।

১৪। বাংলা বানানেব সঙ্গে লিপির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' বিভিন্ন পত্রিকায় বানান ও লিপি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাওযা যাচ্ছে। যদিও আমাদের মূল আলোচনার বিষয লিপি নয়, তবু বানানের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে এখানে প্রবন্ধগুলি আলোচনা করা হল।

লিপি-সংস্কার ঃ শ্রী গোবর্ধন শাস্ত্রী

ভাবতবর্ষ ঃ ভাদ্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠা--৩৯৮।

অনেক বুদ্ধিজীবী বাংলা বর্ণমালা ও লিপির পরিবর্তে এদেশে রোমান বর্ণমালা ও লিপির প্রবর্তনে মত দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে লেখক সে সম্পর্কে তাঁব অভিমত জানিয়েছেন। তিনি মনে কবেন রোমান লিপির প্রচলনে বেশ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এখানে তিনি অসুবিধাগুলির উল্লেখ কবেছেন ঃ

(১) বাংলা শব্দেব বানান রোমান লিপিতে লিখতে গেলে অথবা বাংলায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলির যথাযথ উচ্চারণ ব্যক্ত করার জন্য প্রচুর সাংকেতিক চিহ্নেব ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে মৌখিক গণনাব সময় বর্ণ ও লিপির সংখ্যা কম দেখালেও কার্যত কিছুই কমবে না।

(২) একটি স্বরযুক্ত বর্ণ লিখতে রোমান লিপিতে একাধিক অক্ষর বসাতে হবে। যেমন—শশধর—৪ টি/Ś a ś a d h a r a—৯ টি।

(৩) রোমান লিপিতে বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা লিখতে গেলে উপরে নীচে নানা চিহ্ন দিতে হয়। তাই সময়, স্থান, হাতের কাজ নানা দিক থেকে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

(৪) রোমান লিপির উচ্চারণ পরিকল্পনা কখনও ইংরেজি উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলায় প্রচলিত 'রেল, ষ্টেশন, কোট, বুট' ইত্যাদি শব্দের বানান নব পরিকল্পনা অনুসারে rel,stesan ইত্যাদি লেখা হবে, না প্রচলিত নিয়মানুসারে rail station লেখা হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে।

(৫) বাংলা ভাষার পদোচ্চারণে কোনো বাঁধাধরা ব্যবস্থা নেই। আমাদের উচ্চারণগত তারতম্যের অভাবে বাংলায় বহু শব্দের একাধিক বানান দেখা যায়। কাজেই প্রথমে বাংলা লিপি ও বর্ণমালা আয়ত্ত করে, তাতে প্রত্যেকটি শব্দের বানান মুখস্থ করে, পরে রোমান বর্ণমালা ও লিপি শিখে তাতে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ ব্যক্ত করবার জন্য সাংকেতিক চিহ্নগুলি আয়ত্ত করা দরকার। পরে সেই সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রোমান লিপিতে বাংলা বানান ঠিক করা দুরূহ প্রচেষ্টা মাত্র। লেখকের প্রস্তাব, বাংলা লিপির সামান্য পরিবর্তন করলেই বর্ণমালার সমস্যা দূর হয়।

লেখক রোমান লিপি প্রচলনের যে অসুবিধার দিকগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিকই বাংলা বর্ণমালার যে সমস্যা তা বাংলা লিপিগুলির কিছুটা সংশোধনেই মিটতে পাবে। এর জন্য রোমান লিপির প্রয়োজন হবে না। রোমান লিপিব প্রচলনে সমস্যা কমবে না বরং প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

বাঙ্গালা নবলিপি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

প্রবাসী ঃ আষাঢ়, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা—২১৩।

এই প্রবন্ধে যোগেশবাবু কিছু নতুন অক্ষর প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন ঃ

১। ই—ঈ ২। ি — ী ৩। ু — ু ৪। ৃ —ই

৫। ৃ—্ ৬ ে— ৈ ৭। ৈ —ৈ, ো—ো, ৌ—ৌ ৮। ত—ত্ত

৯। ভ—ঊ ১০। য—ঘ ১১। র—ৎ ১২। অন্তঃস্থ ব— ৵

১৩। য়—য ১৪। ড়---ড় ১৫। ঢ়—ঢ। ১৬। শৃঙ্গ—S, পাতী— ্।

যোগেশবাবু কী উদ্দেশ্যে এতদিনের প্রচলিত অক্ষরের ছাঁদ পালটে পুনরায় নতুন অক্ষর প্রচলন করতে চান তা স্পষ্ট হয় না। তাঁব প্রস্তাবিত প্রতিটি হরফই পূর্বাপেক্ষা জটিল। তাঁর এই প্রস্তাব অযৌক্তিক।

বাঙলা নবলিপি। করালীকুমার কুন্ডু।

প্রবাসী ঃ আশ্বিন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৫৭২।

এই প্রবন্ধে লেখকের প্রস্তাব খুব সংক্ষেপে তুলে দেওয়া হল ঃ

(১) সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যখন কোথাও ঌ-এর ব্যবহার নেই, তখন বর্ণমালা থেকে ঌ-কে পুরোপুরি তুলে দেওয়া উচিত। তেমনি ঋষি, ঋতু, ঋণ—তিনটি শব্দের জন্য একটি অক্ষর রাখা বাড়াবাড়ি। সেক্ষেত্রে রিষি, রিতু, রিণ লেখা যেতে পারে।

(২) ং ঙ-এর পরিবর্তে ঙ-র চলন যখন বহুক্ষেত্রে রয়েছে, তখন সর্বক্ষেত্রে চালানো সুবিধাজনক। ত যখন আছে তখন ৎ এর ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন।

(৩) উ, ঊ, র ফলা প্রভৃতি যাই যোগ করা হোক বর্ণের আকৃতিগত পরিবর্তন করা উচিত নয়। কু, ত্রু, হু, ক্র, শু—এভাবে লেখা উচিত।

(৪) কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাক্ষর যোগের সময় নতুন অক্ষর সৃষ্টি হয়। যেমন—স্থলে। যুক্ত করি থ কিন্তু লিখি হ। এক্ষেত্রে বানানটি স্থলে লেখা উচিত।

লেখকের প্রতিটি প্রস্তাবই অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত। প্রস্তাবগুলির অনেকটাই বর্তমানে গৃহীত হয়েছে। পুরোপুরি গৃহীত হলে বানানের ক্ষেত্রে সরলতা আসবে।

১৫। **বানান সংস্কার। শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।**
দেশ ঃ ২৫ চৈত্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

বাংলা ভাষাব বৈদেশিক শব্দের বানানে আনন্দবাজার পত্রিকা যে নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন, সে সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকাতে বহু পন্ডিত ব্যক্তির সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছ। মণীন্দ্রকুমাব ঘোষও এই প্রবন্ধে আনন্দবাজারের বানানরীতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান। পববর্তীকালে প্রবন্ধটি মণীন্দ্রকুমাব ঘোষের "বাংলা বানান" গ্রন্থটিতে (প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৫) সঙ্কলিত হয়।

লেখক আনন্দবাজারেব নতুন বানান রীতি সমর্থন করেন না। তিনি দেখিয়েছেন নতুন নিযমে 'অত্যন্ত' শব্দের বানান হবে 'অতয়নত', 'হ্রস্ব' শব্দের বানান হবে 'হরসব'। ক্ষুদ্র শব্দের বানান একরকম হলে বৃহৎ শব্দেব বানান আরো খাবাপ হবে। তাই তাঁর মতে, 'এই বানান-ব্যবস্থায পাঠক, লেখক, শিক্ষার্থী, মুদ্রাকর সকলেবই অযথা শক্তিক্ষয় হইতেছে। সর্বোপবি, ভাষাব একটা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালী নষ্ট হইতেছে।'

আনন্দবাজাব অধিকাংশ বানানেই যুক্তাক্ষর তুলে দিলেও হস্- চিহ্ন দেন না। মণীন্দ্রবাবু এ রীতি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে বাংলা লিপিতে হস্ চিহ্ন না দিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পাশাপাশি বসালে ঈপ্সিত যুক্তিগুলি মেলে না, যেহেতু বর্ণগুলি অ-কারান্ত। তাছাড়া বণিক্, সম্রাট্, বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি শব্দ আধুনিক লেখকের হাতে হয়েছে বণিক সম্রাট, বুদ্ধিমান। এই হস্ চিহ্ন না দেওয়ায় সন্ধির ক্ষেত্রে বিপর্যয দেখা যায় বলে তিনি মনে করেন।

শুধু এই প্রবন্ধেই নয়, "হস্-বর্জন প্রহসন" প্রবন্ধটিতে (শিক্ষা : অগ্রহায়ণ ১৩৭৩) লেখক দেখিয়েছেন হস্ বর্জিত হলে বানানের সঠিক রূপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। পুনরাবৃত্তি এড়ানোব জন্য প্রবন্ধটি বিস্তারিত আলোচনা করা হল না। এককথায় এখানেও লেখক হস্ বর্জনের বিরোধিতা করেছেন।

১৬। **বাঙ্গালা অক্ষরে ইংবেজী নাম ও শব্দ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**
দেশ ঃ ২১ মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—২১।

বর্তমানে বাংলা বানানে যেভাবে ইংরেজি নাম ও শব্দ লেখবার চেষ্টা আনন্দবাজার পত্রিকাতে চলছে তা নানা দিক থেকে বাংলা লিপি, বর্ণবিন্যাস এবং বাংলা উচ্চারণরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ছে। সেই প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

১৬.১। বাংলা বানানকে রোমান পদ্ধতির নকলে সাজাবার প্রয়াস দু-একবার লক্ষ করা গেছে। কিন্তু তা টেঁকে .নি। সুনীতিবাবু এর চেয়ে সোজা রোমান লিপি গ্রহণ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। তাছাড়া সংযুক্ত বর্ণের পরিবর্তে কেবল হসন্ত চিহ্ন দিয়ে লেখবার চেষ্টা আনন্দবাজারের নতুন বানানে লক্ষ করা যাচ্ছে। রেফ্ বর্জন করে, বা সংযুক্ত বর্ণ তুলে দিয়ে অধিকমাত্রায় হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার করলে লিখতে স্থানও অনেক বেশি লাগে। তাই এই রীতি তাঁর কাছে নিরর্থক এবং কষ্টদায়ক।

১৬.২। রেফ-যুক্ত ও অন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্জন করে এবং হসন্তের প্রয়োগ না করে, এই বানানে বাংলা উচ্চারণরীতি ও বাংলা বানানের সঙ্গে যে একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে তা ছিন্ন করাকে অপচেষ্টা বলে মনে করেন। কারণ বাঙালির মুখে শব্দের অন্তের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি পরপর আসে না। বিদেশি শব্দেও যদি শেষে পর পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তবে শব্দটি বাংলায় এলে সেই শব্দের অন্ত্য দুটি ব্যঞ্জনের পরে, একটি স্বরধ্বনি এসে যায়। box = বাক্স (bakso), mark = মার্কা, inch = ইঞ্চি। বাংলা উচ্চারণের এই রীতির পরিপন্থী হচ্ছে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণরীতি। সেই রীতি অনুসারে, উচ্চারণকে বাংলা লিপিতে দেখাবার প্রয়োজন হলে সহজ উপায় হচ্ছে সংযুক্ত ব্যঞ্জন রাখা এবং প্রয়োজনমতো হস্ চিহ্ন দেওয়া। সুতরাং সংস্কৃতের নিকট থেকে গৃহীত বাংলা শব্দে যখন সংযুক্ত বর্ণকে বিদায় দেওয়া যাচ্ছে না, তখন ইংরেজি শব্দের বেলায় এই অবাঙালি রীতি এনে বিভ্রাট ঘটানোর পক্ষপাতী তিনি নন।

১৬.৩। এই নতুন পদ্ধতি সুনীতিবাবুর কাছে আপত্তিজনক, কারণ এতে চলতি মৌখিক বাংলার কতকগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অস্বীকার করে, বানানের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যকে নষ্ট করা হচ্ছে। বাঙালির মুখে শব্দের শেষে যেখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনি আসে না, সেখানে অবাঙালি উচ্চারণ দেখানোর জন্য, সংযুক্ত ব্যঞ্জনের জন্য যে সব সম্মিলিত বর্ণ বাংলা লিপিতে রয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে। যেমন, ইংরেজি east শব্দটিকে যদি ইংরেজি উচ্চারণে প্রকাশ করে বাংলা হরফে লিখতে হয় তবে লিখতে হবে 'ঈষ্ট্ (ইস্ট্)'। ইস্ট্ বা ইস্ট লেখা যায় কিন্তু ইসট কখনই লেখা যেতে পারে না। লেখক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, প্রয়াত যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা বানানে কিছু সংশোধন আনার চেষ্টা করেন। যেমন, অনুস্বার 'ং' এর সাহায্যে সমস্ত বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনি জানাবার প্রস্তাব তিনি করেন। একমাত্র 'ক' বর্গের পূর্বের অনুস্বার বিকল্পে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া আর কোনোটি গৃহীত হয় নি।

১৬.৪। আধুনিক বাংলায় দ্বিমাত্রিকতা অর্থাৎ দুই মাত্রা বা দুই অক্ষরেব প্রতি ঝোঁক বেশি দেখা যায়। সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন, 'আনন্দবাজার'-এ বোম্বাই বোমবাই পাঞ্জাব স্থলে পানজাব, মাদ্রাজ স্থলে মাদরাজ ইত্যাদি বানান ছাপা হচ্ছে। কিন্তু সংযুক্ত বর্ণ ভেঙে পৃথক বোম বাই, পান জাব—এভাবে লিখলে ম ও ন কে পূর্বের Syllable বা অক্ষরের অংশ বলে ধরতে হয় এবং আপনা থেকেই 'ম' ও 'ব' এবং 'ন' ও 'জ' এর মধ্যে যতির আভাস দেখা দেয়। কিন্তু ম্ব, ঞ্জ, এরূপ সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করলে ব্যঞ্জনদুটির মধ্যে কোনো ফাঁকের আভাস থাকে না।

তবে কতকগুলি শব্দের বানানে সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন। যেমন—লক্ষ্ণৌ স্থলে লখনৌ। চ্যবন স্থলে চৌহান, ন্যাটিসান স্থলে নটেশন পারদুমান স্থলে প্রদ্যুম্ন বা পর্দুমন, আজমীঢ় স্থলে আজমের, চিতোর স্থলে চিতোড় ইত্যাদি।

তবে সুনীতিবাবুর অভিমত, যে কোনো সংশোধন বা পরিবর্তনের আগে তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে ঃ

(১) পরিবর্তনের আবশ্যকতা আদৌ আছে কিনা।

(২) পরিবর্তনের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কিনা।

(৩) পরিবর্তনের উপযোগিতা বা উপকারিতা কোথায় তার নির্দেশ।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সুনীতিবাবুর কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে ঃ

(১) বাংলা বানানে কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। বিবর্তনের পথে সেগুলির যথাশক্তি সমাধানের চেষ্টাও চলছে। তবে বৈপ্লবিক কিছু করা যাবে না।

(২) যে সমস্ত পরিবর্তন জোর করে ভাষার উপর চপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে সেগুলির মধ্যে কোনো জ্ঞান বা যুক্তি নেই।

(৩) প্রস্তাবিত পরিবর্তন অযৌক্তিক হওয়ায় বাংলা ভাষা-শিক্ষায় নানা সমস্যা দেখা দেবে। এতদিনের নিয়মানুবর্তিতার উপরে আঘাত আসবে।

১৭। **বাংলা বানানে সু-নীতি কু-নীতি ঃ অমিতাভ চৌধুরী।**
দেশ ঃ ২৮ শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—১৮৯

আনন্দবাজার পত্রিকা অ-তৎসম কিছু বানানের নতুন রীতি প্রবর্তন করে। গত ২১শে মাঘ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় আনন্দবাজারের এই 'অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' জানিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অমিতাভ চৌধুরী এই প্রবন্ধে সুনীতিবাবুর মতামত বিশ্লেষণ করেছেন।

অমিতাভবাবু আনন্দবাজারের পক্ষ নিয়ে সুনীতিবাবুকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, সুনীতিবাবু পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে এক্ষেত্রে "অপ্রাসঙ্গিক, মাত্রাতিরিক্ত, ও অতিসূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের ধোঁয়া ছড়িয়েছেন।" ভাষার প্রথম দাবি সচলতার। ভাষাকে যদি সচল করতে হয়, যদি আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী করতে হয় তবে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এই কারণেই আনন্দবাজার তৎসম শব্দে আপাতত হাত না দিয়ে অসংস্কৃত শব্দের যুগল বিচ্ছেদে উদ্যোগী হয়েছে।

বানানের এই অভিনবত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ব্যাকরণ ও উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি মুদ্রণের প্রয়োজনে শব্দের বন্ধন ভাঙা যায়, তবে প্রচলিত অভ্যাসকে আমল দেওয়া উচিত নয়। 'বোমবাই', 'মাদরাজ'—এভাবে লেখা হলে সুনীতিবাবুর আপত্তির কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ এতে উচ্চারণ ঠিকই থাকে, সহজ হয় টাইপ রাইটারদের এবং লাইনোছাপায়। লন্ডনকে 'লনডন' লেখায় সুনীতিবাবুর আপত্তি। তাঁর মতে, এটা পড়া হবে লনোডনো। অমিতাভবাবু এটা মানতে পারেন নি। তাঁর অভিমত 'লন্ডন', 'বারবার' যদি লন্ডনো, বারোবারো না পড়া হয়, তবে 'লনডন' কেন লনোডনো পড়া হবে?

পরিচিত দেশি বা বিদেশি শব্দের সবলীকরণে বিভ্রান্তির আশঙ্কা কম। কিন্তু কম চেনা এবংহাল আমদানির বিদেশি শব্দে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাই সেক্ষেত্রে কিছুকাল হসন্তের শরণ নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই বলে উচ্চারণ ঠিক রেখে অসংস্কৃত শব্দ ভাঙাকে যথেচ্ছাচার বলে না। সুনীতিবাবু লিখেছেন বাংলা উচ্চারণে বোম্বাই

ও বোমবাই এক নয়। কারণ—এই সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহারে ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে কোনো ফাঁকের আমেজ থাকে না, কিন্তু যুক্তাক্ষর ভাঙলে এই ফাঁক এসে যায়। সূক্ষ্ম বিচারে একথা হয়তো ঠিক কিন্তু বোম্বাই শব্দটি কি আমরা বোম-বাই উচ্চারণ করি না? অমিতাভবাবু মনে করেন উচ্চারণের এত সূক্ষ্মতা মানলে অমিত, অতুল না লিখে ওমিৎ, ওতুল লেখা হত। সুনীতিবাবু টরেসিং, বরিটিশ ইত্যাদি বানানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিদেশি শব্দের প্রারম্ভিক যুক্তাক্ষর ভাঙার কোনো চেষ্টাই আনন্দবাজার করেনি। তাছাড়া সব ভাঙতে না পারলে কোনোটাই ভাঙা উচিত নয়—এ যুক্তি অমিতাভবাবু মানেন না। যুক্তাক্ষরের কাঁটা কিছুটা সরাতে পারলেও কাজ হবে বলে তিনি মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে অমিতাভবাবু উল্লেখ করেছেন, ১৮৬৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা জন মারডকের চিঠির কথা। মারডক সাহেব বাংলা শিখতে গিয়ে আরও পাঁচজন নতুন শিক্ষার্থীর মতো যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার একটি হল যুক্তব্যঞ্জন সমস্যা। মারডক সাহেব যুক্তাক্ষর সরল করার কাজে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। তবে তিনি শুধু বিদেশি শব্দ নয়, খোদ সংস্কৃত শব্দ ভেঙে লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই পরিবর্তনের কেন দরকার তার উত্তরে মারডক সাহেব জানান ঃ

(ক) প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হলে বাংলা লেখাপড়া সহজ হবে।

(খ) মুদ্রিত গ্রন্থপাঠ সহজ হবে।

(গ) যুক্তাক্ষর-বাহুল্য কমলে রোমান হরফে ছাপার মতো বাংলা মুদ্রণও পবিচ্ছন্ন হবে।

(ঘ) স্বল্প ব্যয়ে বাংলা হরফের ক্ষুদ্রায়তন সাট নির্মাণ সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে। তিনিও আনন্দবাজারের এই সংস্কারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। প্রবোধ সেনও মনে করেন বাংলা বানানের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেই। যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ যত কমানো যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু যুক্তাক্ষর বর্জন করলেও উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান রক্ষা করতে গেলে হস্ চিহ্ন দ্বারা ভাষা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সম্প্রতি অ-বর্ণটি বাংলায় অনুচ্চার্য বলে গণ্য করার রীতি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। যেমন, জল, গান। সুতরাং আনন্দবাজার পত্রিকা যখন অ-সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জনের নীতি গ্রহণ করেছেন তখন বাংলায় অনুচ্চারিত এই অ-কারের নবস্বীকৃত নীতির পথেই অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং বাংলা ভাষার অনুরাগী ও সংস্কারকামী মাত্রেরই অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য।

১৮। **বাংলা বানান সংস্কার ঃ প্রবোধচন্দ্র সেন।**

দেশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ১০৮।

লেখক প্রবোধচন্দ্র সেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ চৌধুরীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটি পড়ে বানান সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন ঃ

১৮.১। তিনি মনে করেন, বানান-সংস্কার এমন হওয়া চাই যাতে পাঠকের উচ্চারণ-সৌকর্যে বা অর্থগ্রহণে বাধা না ঘটে। সে আশঙ্কা থাকলে সংস্কারের আগ্রহ কমানো উচিত। সংস্কৃত শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই কারণে বিদ্যা, উদ্‌যাপন লেখা হয়, বিদযা বা উদ্যাপন নয়। খাঁটি বাংলার ক্ষেত্রেও তিনি কোন্ বা কোনো লেখার পক্ষপাতী, কোন নয়।

১৮.২। বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন না। যেমন চলছে, তেমনি চলুক—এতেই তাঁরা বিশ্বাসী। এই সচেতন বিচার-বিশ্লেষণের যুগে লেখক এই মত মানেন না।

১৮.৩। লেখকের অভিমত, আধুনিককালে কোনো চলিতভাষার বানানই সর্বতোভাবে উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, সে চেষ্টা অনাবশ্যক। আমরা লিখি 'চলি' 'হল' কিন্তু পড়ি 'চোলি' 'হোলো'। তেমনি ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দের বানান অবিকল উচ্চারণসম্মত হবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ইংরেজি শব্দ বাঙালির উচ্চারণে ও বাংলা লিপিতে কিছু পরিমাণে বাঙালিত্ব লাভ করবেই।

১৮.৪। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অসংস্কৃত শব্দে প্রয়োগ করা লেখক বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। এতে বিভ্রাট ঘটবে বলেই তাঁর ধারণা। লণ্ঠন, লন্ডন প্রভৃতি শব্দে এখনও 'ণ' রয়েছে। 'টনটনানি' ব্যথা, টুনটুনি পাখি, বা ঠুনঠুন আওয়াজ ইত্যাদি শব্দে যদি যুক্তাক্ষর বর্জন করলে দোষ না হয়, তবে লনডন, লনঠন ইত্যাদি লেখাতেও আপত্তির কারণ থাকে না। তবে প্রথার প্রভাব, দীর্ঘকালের অভ্যাস ও চোখের সংস্কারকে সর্বক্ষেত্রে লেখকও অস্বীকার করেন না।

১৮.৫। বাংলা উচ্চারণের মৌলিক উপাদান দুই মাত্রা ও তিন মাত্রা অর্থাৎ বাঙালির মুখে দু-এর কম এবং তিন-এর বেশি মাত্রা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয় না। দুই বর্ণ বা তিন বর্ণের শব্দের শেষের বর্ণটি যদি অ-কারান্ত হয়, তবে সে অ-কার অনুচ্চারিত থাকে। যেমন—জল, দিন, বিশেষ ইত্যাদি। এই নিয়ম বিদেশি শব্দেও প্রযোজ্য। সুতরাং সেক্ষেত্রে হসন্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যেমন—খুব, খরিদ ইত্যাদি। তবে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন—ছোট, ভাল।

দ্বিবর্ণ বা ত্রিবর্ণ উভয়বিধ শব্দের ক্ষেত্রেই যদি শেষ বর্ণ যুক্তবর্ণ হয় তবে তার হসন্ত উচ্চারণ হয়না। যথা—তর্ক, সমুদ্র ইত্যাদি। অ-কারান্ত দ্বিবর্ণ শব্দ যদি সংস্কৃত পদ্ধতিতে সমাসবদ্ধ হয় তাহলেও উক্ত অ-কার অনুচ্চারিত হয় না। যেমন—জলযান, দিনমণি। কিন্তু দ্বি-বর্ণ শব্দের অন্ত্য অ-কার লোপের প্রবণতা এত বেশি যে বহু প্রচলিত সমাসবদ্ধ শব্দেও উক্ত অ-কার লুপ্ত হয়ে থাকে। যেমন—মেঘদূত মেঘনাদ। তাছাড়া বেশ কিছু শব্দে উক্ত অ-কার বিকল্পে লুপ্ত হয়। যেমন—গীতগোবিন্দ, লোকশিক্ষা ইত্যাদি। সমাসবদ্ধ হলেও অ-কারান্ত ত্রিবর্ণ শব্দের অন্ত্য অ-কার সাধারণত লুপ্ত হয়েই থাকে। যেমন—ভারতবর্ষ, চরণকমল। ত্রিবর্ণ বাংলা শব্দের শেষ বর্ণে যদি অ-ভিন্ন অন্য স্বর যুক্ত থাকে তবে মধ্যবর্তী স্বরবর্ণের প্রবণতা অ-কারের লুপ্ত হবার দিকে। যেমন—পাগল-পাগলা, জানালা-জানলা।

দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ শব্দের অন্ত্য অ-কার ও ত্রিবর্ণ শব্দের মধ্যবর্তী অ-কারের উচ্চারণ-প্রবণতা সম্বন্ধে যা বলা হল দীর্ঘ শব্দের দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ পর্ব সম্বন্ধেও তা অনেকাংশে প্রযোজ্য। যেমন—মস-জিদ, পিচ-কারি।

লেখক জানিয়েছেন, এগুলি সবই খাঁটি বাংলা উচ্চারণেরই প্রবণতা, সংস্কৃতের নয়। তাই যেসব বহিরাগত শব্দ বাংলা ভাষায় এসে মিশেছে সেসব ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ শব্দের বা শব্দপর্বের শেষবর্ণ এবং ত্রিবর্ণ শব্দ বা শব্দপর্বের মধ্যে বর্ণ অ-কারান্ত রূপে লিখিত হলেও সে অ-কার অনুচ্চারিতই থাকে। তাই মাদরাজ, লনডন প্রভৃতি

শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হস্ চিহ্ন না দিলেও ওই অ-কার লুপ্ত হয়। ফলে উচ্চারণবিভ্রান্তি না ঘটাই স্বাভাবিক, তবে সংশয় স্থলে হস্‌চিহ্ন বা যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করা বিধেয়। মোট কথা, বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে লঙঘন না করে যদি অসংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙা হয় এবং যথাস্থানে হস্‌চিহ্ন বর্জিত হয়, তাহলে বাংলা সাহিত্যে অরাজকতা দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন না। আফগান, ফোসকা যদি চলে তবে আফরিকা, মসকো-ও চলবে।

আনন্দবাজার প্রবর্তিত বানানের একটি বিষয় তিনি সমর্থন করেন না। আর্ট, 'মার্চ'-এর বদলে আরট বা মারচ লেখা সমীচীন মনে করেন না। কারণ যুক্তবর্ণের হসন্ত উচ্চারণ বাংলার উচ্চারণরীতির বিরুদ্ধ। তাছাড়া ত্রিবর্ণ শব্দের শেষ দুই বর্ণ অ-কারান্ত হলে শেষ বর্ণের অ-কারই লোপ পায়, মধ্যবর্ণের নয়। যেমন—উলট-পালট। তেমনি পোসট কারড লিখলে বাংলা উচ্চারণ পোস্ট্ কার্ড্ হবে না।

১৮.৬। সবশেষে তিনি বলেছেন, বাংলা লিপি থেকে যুক্তাক্ষর পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে। তথাপি বাংলায় প্রচলিত অসংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে তিনি সাধু প্রয়াস বলেই মনে করেন। তবে নানা কারণে সংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষর রক্ষা করাই আবশ্যক বলে মনে করেন।

প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনন্দবাজাব পত্রিকায় যে নতুন বানান চালু করা হয়, তা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ" প্রবন্ধে। এরপর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চলে তর্ক-বিতর্ক। প্রবোধবাবু তাঁর প্রবন্ধে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সেই প্রবণতার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় যুক্তাক্ষর ভাঙা যায় তাও স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আনন্দবাজারের নতুন বানানের কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেন নয়—তা নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখকের যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় মেলে। সুনীতিবাবু ভাষার এত সূক্ষ্মতার মধ্যে গেছেন, যা সাধারণ উচ্চারণে ধরা পড়ে না। আবার, অমিতাভ চৌধুরী বড় বেশি 'প্রগতিশীল'। ফলে তাঁর আলোচনার মধ্যে যুক্তি বা বিজ্ঞানমনস্কতা থাকলেও বাস্তবে তা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন যে, বাংলা লিপি থেকে রাতারাতি সর্বক্ষেত্রে যুক্তাক্ষব বর্জন করা সম্ভব নয়। এতে সংস্কারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তবে আমাদেব অ-সংস্কৃত শব্দে ক্রমশ যুক্তাক্ষর কমিয়ে আনার দিকে লক্ষ দিতে হবে।

১৯। বাংলা বানান ঃ শ্রী মণীন্দ্র কুমার ঘোষ।

কৃত্তিবাস : অগ্রহায়ণ পৌষ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা বানান সমস্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি দেখিয়েছেন এবং বানান সংস্কার সমিতির প্রবর্তিত বিভিন্ন সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি তাঁর 'বাংলা বানান' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৫) সঙ্কলিত হয়।

১৯.১। লেখক দেখিয়েছেন বাংলা বানানে সমস্যা উপস্থিত হয় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঃ উচ্চারণে অ-ও-হসন্ত, ই-ঈ-উ, ঋ-রফলা, হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ, এ-অ্যা, ঐ-অই-ওই, ঔ-অউ-ওউ, ং-ঙ বর্গের পঞ্চম বর্ণ, বিসর্গ, ক্ষ-খ, চ-ছ, জ-য-z, ঞ, ণ-ন, ফ-F, বর্গ্য ব-অন্তঃস্থ ব, ভ-v, শ-ষ, স, ইয়া-ইআ, উয়া-উআ, এয়া-এআ, ওয়া-ওআ।

—এরপর সংস্কার-সমিতির নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে ঃ

১৯.২। **প্রথম নিয়ম** সংস্কৃত শব্দে রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন। এই নিয়মটি লেখক অন্তর থেকে সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন এর পিছনে যা ছিল তা ঠিক বানান-সংস্কার নয়, মুদ্রণ-সৌকর্য। তবু এ নিয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি, যেহেতু দ্বিত্ব বর্জন একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

১৯.৩। সমিতির **দ্বিতীয় নিয়মটি** লেখক সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর অভিমত "যে সমস্ত বানানে স্বেচ্ছাচার তৎকালে বড় একটা দেখা যেত না সেসমস্ত ক্ষেত্রেও নূতন করে বৈকল্পিক নব্য ঢং শুরু হল।"

১৯.৪। **তৃতীয় নিয়মটি নিয়ে** আলোচনা প্রথম নিয়ম সম্পর্কিত আলোচনায় হয়ে গেছে।

১৯.৫। চতুর্থ নিয়মটি হস্ চিহ্ন সম্পর্কে। লেখক হস্ চিহ্ন বর্জনের পক্ষপাতী নন। এ নিয়ে পূর্বে 'দেশ' বা 'শিক্ষা' পত্রিকায আলোচনা হয়ে গেছে। একই প্রসঙ্গে এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

১৯.৬। **পঞ্চম নিয়মটি** গুরুত্বপূর্ণ। হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ সংক্রান্ত। এ নিয়ে বানান সমিতিও দ্বিধাগ্রস্ত। তাই সমিতি বিধান দিলেন, তৎসম শব্দে ঈ বা ঊ থাকলে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে।

লেখক এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা বিকল্পবিধানকে না মানলেও মূল নিয়মকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। বোঝাই যায়, মণীন্দ্রবাবু ব্যুৎপত্তি-অনুসারী বানানই পছন্দ কতেন। বৈদেশিক শব্দের বেলায় বানান সমিতি যে নিয়ম করেছেন তার ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

১৯.৭। **সমিতির ষষ্ঠ নিয়ম ঃ** "জ-য"। সমিতি বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে জ লেখার নির্দেশ দিয়েছেন ; যেমন—কাজ, জাউ, জাঁতা, জুঁই ইত্যাদি।

লেখক এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন "কাজ যখন বর্তমান বাংলায় একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে, একে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করা উচিত হবে না। কিন্তু সংস্কৃত মূলে 'য' আছে এমন যে সমস্ত তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দে 'জ' এখনও দৃঢ়ীভূত হয়নি সে সমস্ত শব্দে 'য' রাখাই সমীচীন। 'জাঁতা, জো, জোড়া' অপেক্ষা 'যাঁতা, যো, যোড়া' অনেক ভাল"।

১৯.৮। সপ্তম নিয়ম—ণ ন ঃ ট-বর্গীয় যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে অসংস্কৃত শব্দে সমিতি 'ন' লেখার প্রস্তাব করেছেন। এ নিয়মটিও মণীন্দ্রবাবু পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন নি। বৈদেশিক শব্দে ণত্ববিধান তিনি মানেন না এবং সমস্ত তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ একই শ্রেণির নয়, কিন্তু মূর্ধন্য-ণ যখন বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে, তখন কিছু কিছু অসংস্কৃত শব্দেও মূর্ধন্য-ণ রাখা সঙ্গত মনে করেছেন। তিনি মনে করেন, "শব্দের বানানে কেবল ধ্বনিগত শুদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না : বানানের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। এজন্য তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম শব্দের বানান হওয়া উচিত যথাসম্ভব সংস্কৃত মূলানুযায়ী।"

১৯.৯। সমিতির অষ্টম নিয়ম ঃ ও-কার উর্ধ্বকমা। সমিতি সুপ্রচলিত শব্দে এগুলি যথাসম্ভব বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অর্থগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হলে ওকার এবং উর্ধ্বকমা বিকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে বলেছেন।

এই সুপ্রচলিত শব্দ এবং বিকল্প-বিধানে লেখকের আপত্তি।

১৯.১০। সমিতির নবম নিয়ম ঃ ঙ্গ ং ঙ। এ সম্পর্কে লেখকের মতামত থেকে মনে হয় নবম নিয়মটির প্রতি লেখকের সমর্থন রয়েছে।

১৯.১১। সমিতির দশম নিয়ম ঃ শ-ষ-স। এখানে সমিতি তদ্ভব শব্দে সংস্কৃত অনুসারে শ, ষ বা স রাখার নির্দেশ করেছেন। লেখক প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন এবং ণ-এর মতো 'ষ' তুলে দেওয়া হয়নি বলে সমিতিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

১৯.১২। সমিতির একাদশ নিয়ম ঃ ক্রিয়াপদ। লেখক মনে করেন সংস্কারের পর ক্রিয়াপদের বানানে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এসেছে কিন্তু ঈপ্সিত স্থিরতা আসেনি। তার কারণ বিকল্প বিধান, আধুনিক লেখকদের ও-কারের প্রতি অত্যাসক্তি। মণীন্দ্রবাবুর অভিমত সমিতি প্রথম সংস্করণে যে বিধান দিয়েছিলেন সেই বিধানে দৃঢ় থাকতে পারলে ক্রিয়াপদের বানানে শৃঙ্খলা আসত। তাছাড়া 'লুম, লেম'—এই সম্পূর্ণ আঞ্চলিক কথ্য বিভক্তি চলিত ভাষায় চিহ্নিত করে ক্রিয়াপদের বানানে বিশৃঙ্খলা এনেছেন। মণীন্দ্রবাবুর মতে অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ ছাড়া আর কোথাও ক্রিয়াপদের বানানে ও-কার অত্যাবশ্যক নয়।

১৯.১৩। সমিতির দ্বাদশ নিয়ম ঃ কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ। এই নিয়মটির উপর নির্ভর করবে চলিত ভাষার প্রকৃতি। সমিতি লৈখিক ভাষায় আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি সমর্থন করছেন না, কিন্তু মধ্য বা শেষ অক্ষরের বিকৃতি গ্রহণ করছেন। লেখকের ধারণায় এ প্রস্তাব অযৌক্তিক। কারণ মৌখিক বিকৃতির কোনো অংশ যদি সাহিত্যিক ভাষায় প্রবেশাধিকাব পায় তবে কালক্রমে সর্ববিধ মৌখিক বিকৃতিই সাহিত্যে প্রবেশ করবে। লেখকের বিবেচনায় "সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপ ছাড়া অন্য কোন পদের সামান্য মৌখিক বিকৃতিকে চলিত ভাষায় প্রশ্রয় দিলে বানানে সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব হবে।"

১৯.১৪। সমিতির ত্রয়োদশ নিয়ম ঃ বিবৃত অ (Cut-এর u)। এক্ষেত্রে সমিতির প্রস্তাবিত বানানগুলি লেখক সর্বত্র সমর্থন করেননি। তাঁর মতে বাংলায় অ-কার সব সময়ে দীর্ঘ নয়, আবার অ-কারও সব সময়ে হ্রস্ব নয়। তাই তিনি সার্কাস, ফোকাস, রেডিয়াম, হিরোডোটাস বানানের পক্ষপাতী—যেহেতু এইভাবেই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়।

১৯.১৫। চতুর্দশ নিয়ম ঃ বক্র আ (বিকৃত এ Cat-এর a)। বানান সমিতি এই বক্র আ বোঝাতে আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা লেখার বিধান দিয়েছেন। মণীন্দ্রবাবু মনে করেন য-ফলা আ-কার এবং 'বিকৃত এ'র ব্যঞ্জনে যোজ্য রূপ একসঙ্গে থাকায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই অবিলম্বে 'বিকৃত এ' ধ্বনির জন্য নূতন বর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে তার যোজ্য রূপ উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

১৯.১৬। সমিতির পঞ্চদশ নিয়ম ঃ বিদেশি শব্দের ঈ, উ উচ্চারণ। এ নিয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়ে গেছে।

১৯.১৭। ষোড়শ নিয়ম ঃ F V স্থানে ফ, ভ। মণীন্দ্রবাবু F স্থানে ফ হওয়াই উচিত মনে করেন, কারণ F-এর বৈদেশিক উচ্চারণ অল্পবিস্তর বাংলায় এসে থাকলেও ফ-বানানে কোনো গোলযোগ দেখা যায় না, তবে V-এর জন্য ভ-এর তলায় সরু রেখা টেনে একটা নতুন হরফ করার প্রস্তাব রেখেছেন।

১৯.১৮। সমিতির সপ্তদশ নিয়মটি অর্থাৎ W স্থানে উ বা ও লেখার বিধানটি তিনিও সমর্থন করেন।

১৯.১৯। অষ্টাদশ নিয়মটির তীব্র সমালোচনা করেছেন মণীন্দ্রবাবু, উ বা ও-এর পরে য়, য়া বা য়ো লেখার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করেন। এ নিয়ম চালু হলে যেখানে বিশৃঙ্খলা নেই, সেখানেও বিশৃঙ্খলা চালু হবে বলে তাঁর অভিমত।

১৯.২০। উনবিংশ ও বিংশ নিয়মটি নিয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়ে গেছে।

১৯.২১। একবিংশ নিয়মটি পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তবে তিনি মনে করেন z ধ্বনির জন্য জ-এ ফুটকি অপেক্ষা জ-এর নীচে সরু দাগ দিয়ে হরফ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী।

১৯.২২। সংস্কার সমিতি ঐ, ঔ সম্বন্ধে কোনো বিধান দেন নি। মণীন্দ্রবাবু ঐ, ঔ বর্জনের বিরোধী। কারণ 'তৈল ঔষধ ছাড়া চলে না'।

প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ কবলে বোঝা যায়, মণীন্দ্রবাবু বাংলা বানানকে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ অনুযায়ী লেখার পক্ষপাতী নন। তিনি মনে করেন, ধ্বনিগত বিশুদ্ধতা বানানের ক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। মূল লক্ষ্য হবে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। এরজন্য তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দের বানান যতদূর সম্ভব মূলানুযায়ী লিখতে চান। এই কারণে তৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বর থাকলেও অধিকাংশ তদ্ভব শব্দের বানানে যেখানে হ্রস্ব, দীর্ঘ দুই চলছে, লেখক সেখানে মূলানুযায়ী দীর্ঘ রাখতে চান। একইভাবে যেখানে একটি বানানে য, জ দুই চলছে, সেখানে মূলানুসারে য রাখতে চান। মণীন্দ্রবাবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাহের বিপরীত মুখে চলেছেন। এই কারণে সংস্কার সমিতির অধিকাংশ বিধিকেই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ফলে বানান সংস্কার সংক্রান্ত তাঁর নীতির ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় জাগে।

২০। **বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব। জগন্নাথ চক্রবর্তী।**

দেশ ঃ ১৯ মার্চ, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, চৈত্র, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

লেখক মনে করেন বাংলা বানানের যে বিড়ম্বনা চালু রয়েছে তার মূল রয়েছে 'তৎসম' ও 'তদ্ভব' এই দুটি পৃথক সংজ্ঞা নিরূপণের মধ্যে। তৎসম, তদ্ভব যে নামই দেওয়া হোক, বাংলা বাংলাই। এর উচ্চারণরীতি যেমন নিজস্ব, বানানেরও তেমনি নিজস্ব রীতি-নিয়ম বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভ্যাসের বশে আমরা পন্ডিতদের দেওয়া সংস্কৃত বানান পরিত্যাগ করতে পারি না। জগন্নাথবাবু মনে করেন বানানের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা না দেখানোই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের প্রধান দুর্বলতা।

"বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে।...." লেখকও মনে করেন "প্রাকৃত বাংলা ভাষাই প্রকৃত বাংলা ভাষা। এই ভাষাটি আজ পর্যন্ত অভিধানে, ব্যাকরণে, বানানে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়নি। এটি করা দরকার।"

লেখকের প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল সূত্রগুলি এইভাবে বিবৃত করা যায় ঃ

২০.১। বাংলা বর্ণমালা থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দেওয়া হবে। দরকার হলে বর্ণমালায় প্রয়োজনীয় বর্ণ যুক্ত হতে পারবে। বর্ণের মোট সংখ্যা যথাসম্ভব কমানো হবে।

২০.২। যুক্তাক্ষর বর্জন করা হবে। যুক্তস্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত আকারে অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে, মিশ্র অক্ষর থাকবে না।

২০.৩। যুক্তাক্ষর বর্জনের জন্য হস্ চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে হস্ চিহ্নের ব্যবহার খুব সীমায়িত রাখা হবে।

২০.৪। বানান হবে বাংলা উচ্চারণের যথাসম্ভব কাছাকাছি। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণভাবে গ্রাহ্য এই নীতি বিসর্জন দেওয়া চলবে না। কিছু কিছু পার্থক্য অভ্যাসের দ্বারা নির্ণীত হবে।

২০.৫। প্রয়োজনীয় স্বর ও ব্যঞ্জনচিহ্ন লাইনো টাইপের ছাঁদে বর্ণের ডান দিক থেকে পৃথকভাবে দেওয়া হবে. যাতে কোনোক্রমেই যুক্তাক্ষর সৃষ্টি হবার সমস্যা না দেখা দিতে পারে!

২০.৬। এই পাঁচটি মূল নীতির ফলশ্রুতিতে বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা দাঁড়াবে সাতটি—অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও। স্বরচিহ্নের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়—া (আ), ্যা (অ্যা), ি (ই), ু (উ), ে (এ), ে া (ও)।

স্বরচিহ্নগুলি লাইনো টাইপের উপযোগী অর্থাৎ মূল বর্ণ থেকে পৃথকভাবে প্রদর্শিত হবে। সর্বত্র হ্রস্ব ই'এবং হ্রস্ব উ ব্যবহৃত হবে। ঋ-কে রি অথবা র-ফলা ও হ্রস্ব ই-কার দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। যেমন—'রিতু', 'আব্রিত' (আবৃত)। বাংলাতে অধিকাংশ অ-ই একটু ও-ভাবাপন্ন। যেমন—'মন্দ' বাংলায় শোনায় 'মোন্দো'। এই স্বরটিকে সর্বদা ও-কারান্ত না লিখে বর্তমানের মতো অ-কারান্তই রাখা যেতে পারে। পদের অন্তে উচ্চারণ অ-কারান্ত বা হসন্ত যাই হোক, শুধু অ-কারান্ত বর্ণই ব্যবহৃত হবে, হস্ চিহ্ন দেওয়া হবে না।

২০.৭। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ চল্লিশটি। সেখানে অপ্রয়োজনীয়গুলি বাদ গেলে সংখ্যা দাঁড়াবে বত্রিশ—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ,
চ, ছ, জ, ঝ ;
ট, ঠ ড, ঢ, ড়, ঢ়
ত থ, দ, ধ, ন ,
প, ফ, ব, ভ, ম ;
য়, র, ল ;
শ, স, হ, ঁ।

লেখক মনে করেন, এই সংখ্যা আরো কমানো যেতে পারে যদি ড় ঢ় কে পৃথক বর্ণ হিসাবে না লিখে বিন্দু যুক্ত ড ঢ (ড •, ঢ •) আকারে লেখা হয়। যেহেতু অন্তস্থ -য বলে কোনো আলাদা বর্ণ থাকছে না, অন্তস্থ - য় কেও শুধু য দিয়ে লেখা যেতে পারে। ইংরেজি জেড (*z*) উচ্চারণের উপযোগী কোনো বর্ণ বাংলায় নেই, বিন্দুযুক্ত জ (জ.) দিয়ে কাজ চলতে পারে।

লেখক যে বর্ণগুলি বাদ দিয়েছেন সেগুলি হল অন্তঃস্থ-ব। বহিরাগত শব্দের এই ধ্বনিটির উচ্চারণ ওয়-দিয়ে প্রকাশ করতে চান, যেমন—ওঅকিল, ওঅর। সর্বত্র 'য' বাদ দিয়ে জ রাখতে চান, যেমন—জম, জখন ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রে দন্ত্য ন দ্বারা কাজ চালাতে চান, যেমন—পন হরন ইত্যাদি। বাংলায় শিস্ ধ্বনির কাজ চালানো হবে প্রধানত তালব্য শ দ্বারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রের জন্য দন্ত্য স বর্ণটি রাখতে চান। যেমন—স্নান। ঞ বর্ণটি বাদ যাবে। যুক্ত বর্ণে এটি ন-দিয়ে প্রকাশিত হবে, অন্যত্র য়ঁ লেখা হবে। যেমন—অন্‌চল ; মিয়াঁ। খন্ডৎ বাদ যাবে। শুধু ত বা হসন্ত-ত্ হলেই কাজ চলবে। যথা—মহত, উত্‌পল। ঙ, ং দুটির কাজই ঙ দিয়ে চালাতে হবে। যেমন—বাঙলা, বাঙালী। বিসর্গ (ঃ) অপ্রয়োজনীয়। লেখা হবে 'দুখ্‌খ', 'বাহ্'।

২০.৮। বাংলায় প্রচলিত যুক্তাক্ষরের সংখ্যা প্রায় শ-দুয়েকের মত। লেখকের প্রস্তাবিত বানানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সব ভেঙে দেওয়া হবে। বর্ণগুলি বিযুক্তভাবে পাশাপাশি অবস্থান করবে। এইজন্য প্রথম প্রথম হস্ চিহ্ন বেশি লাগলেও পরে অভ্যস্ত হলে অনেক ক্ষেত্রেই হস্ চিহ্নের প্রয়োজন হবে না বলে তিনি মনে করেন। রেফ্ (´) পুরো বাদ যাবে। তার পবিবর্তে র বা হসন্ত র্ ব্যবহৃত হবে। যথা—তরক, তর্‌ক। র-ফলাটি লাইনো টাইপের মতো আলাদাভাবে বিযুক্ত ব্যঞ্জনচিহ্ন হিসাবে রাখাব প্রস্তাব রেখেছেন। পদের আদিতে এই র-কাবেব প্রয়োজন বেশি হবে। অন্যত্র একে র বা হসন্ত র (র্) এর বিকল্প হিসাবে রাখা যাবে। যেমন—প ্রতিদিন, পর্‌তিদিন, ব ্রত,—ব্‌রত। ক্রমশ র ফলা সম্পূর্ণ বাদ যাবে। কতকগুলি যুক্তবর্ণ বাংলায় শুধু দ্বিত্ব সূচিত করে। যেমন, য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা। এক্ষেত্রে সংস্কৃত উচ্চারণের দাসত্ব না মেনে বি-যুক্ত আকারেই প্রকাশ করা হবে। ফলে যুক্তাক্ষরগুলি নিম্নলিখিত আকার ধাবণ করবে ঃ

ক + ক = ধিক্‌কার, ক - ত = রক্‌ত, ক + ব = পরিপক্‌ক।
ক + ম = বুক্‌কিনি, ক + য = বাক্‌ক, ক + র = ক্রেতা, ক্‌রেতা ইত্যাদি।

জগন্নাথবাবুর প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায় লেখক একেবারেই চরমপন্থী। তিনি যতদূর সম্ভব ধ্বনিভিত্তিক বানান চালু করার পক্ষে। এরজন্য তিনি এতদিনের বর্ণবিন্যাসের রীতিনীতি ভেঙে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বানানকে ঢেলে সাজানো প্রস্তাব রেখেছেন। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি যে শব্দই বাংলায় আসুক না কেন, তার বর্ণবিন্যাস হবে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী—এটাই লেখকের প্রস্তাব। তাছাড়া বানানের সরলতা আনার জন্য তিনি যুক্তাক্ষর পুরো সরিয়ে ফেলায় আগ্রহী। লেখকের ভাবনার মধ্যে যুক্তি আছে, বিজ্ঞান-মনস্কতা আছে; তাঁর প্রস্তাব বানানের ক্ষেত্রে সরলতা আনবে—সবই সত্য। তবু দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভ্যাসকে রাতারাতি ভেঙে বেরিয়ে আসতে গেলে জটিলতা সৃষ্টি হবে। বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র সমালোচনায় সংস্কাবের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে সকলেই প্রচলিত অভ্যাসের দোহাই দিলে বানান সংস্কার করা সম্ভব হবে কীভাবে? সংস্কার করতে হবে ঠিকই, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সময়। এক্ষুনি তৎসম শব্দের বানান ভেঙে নতুন রূপ দেওয়া যাবে কিনা, বা বাক্য রুক্মিনী—এই ধরনের যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে বাক্‌ক বা রুক্‌কিনী—এভাবে লেখা যাবে কি না তা বিচার্য বিষয়। আসলে এক অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ নতুন অভ্যাসে যেতে গেলে তার মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। জগন্নাথ বাবুর প্রস্তাবগুলিতে এই সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে।

২১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির নতুন প্রস্তাব ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ বহুকাল ধরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু সমকালের সঙ্গে সংগতি রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত নিয়মগুলির কিছু রদবদল করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশের পূর্বে পনেরোটি প্রস্তাব-সম্বলিত প্রচার পুস্তিকা বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠান। এই কার্যে বানান সমিতির সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন কারণে এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হতে পারেনি। এখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও নতুন সমিতির প্রস্তাবগুলি আলোচনাযোগ্য, তবু চূড়ান্ত রূপ না পাওয়ায় এই উদ্যোগের এখানে উল্লেখ করা হল মাত্র। এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল না। [দ্রঃ চিত্র ১৩]

২২। বাংলা বানানের সন্ধানে। জগন্নাথ চক্রবর্তী।

পরিবর্তন ঃ ১২-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ (ভাদ্র, ১৩৯১) বর্ষ-৭ সংখ্যা ১১, পৃঃ ২৫৭।

প্রচলিত বাংলা বানানের বাস্তব ভিত্তি বিশ্লেষণ করে বাস্তবসংগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২২.১। প্রথমেই যুক্তাক্ষর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যুক্তাক্ষর নাকি বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জগন্নাথবাবুর অভিমত, খাঁটি বাংলার ঝোঁক যুক্ত বানানের বিপরীত দিকে অর্থাৎ লিনিয়ারিটির দিকে। এই ঝোঁকটিকে মান্য করতে হবে। প্রথমে অসংস্কৃত শব্দে, পরে বাংলায় গৃহীত শব্দে খাঁটি বাংলা বানান পুরোপুরি গৃহীত হলে রোমান বানানের সব সুবিধাই পাওয়া যাবে অথচ নতুন লিপি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। তবে এই মুহূর্তে সংস্কৃত থেকে আগত শব্দগুলিকে আলাদা রেখে অন্য ক্ষেত্রে সর্বত্র আবশ্যিকভাবে যুক্তবর্ণ পরিহার করার কথা বলেছেন। যে সকল যুক্তবর্ণ সংস্কৃতে নেই অথচ সংস্কৃতের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলিও তিনি বন্ধ করার পক্ষপাতী। যেমন ন্ট, ল্ড সংস্কৃতে নেই, বাংলায় এগুলি প্রবর্তন করা হয়েছে। এগুলি বন্ধ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

২২.২। যুক্তবর্ণের মতো সংস্কৃতে নেই এমন কিছু বাড়তি বর্ণ বাংলায় তৈরি করা হয়েছে। যেমন—ৎ। তিনি দেখিয়েছেন, নিয়মবহির্ভূতভাবে যেখানে সেখানে খেয়াল খুশিমতো ত এবং ৎ-এর ব্যবহার হয়। যেমন—'সুজিত, কিন্তু বিশ্বজিৎ'। তাই তাঁর মতে এর সুষ্ঠু সমাধান খন্ড-ৎ-এর সম্পূর্ণ বর্জন। তবে তিনি বলেছেন, "অভ্যাসের দাপটে যদি সবক্ষেত্রে একদিনেই না পারি, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জন করতে পারি, বাকি অল্প শব্দে পরিবর্তিত অভ্যাসের জন্য সচেষ্ট হতে পারি।"

২২.৩। জগন্নাথবাবুর অভিমত, যুক্তবর্ণে সংস্কৃতের ঙ বাংলার ং (অনুস্বার) ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর অভিমত, বাংলায় গৃহীত সব শব্দকেই বাংলা শব্দ ধরে ক-বর্গে সর্বত্র ঙ বাদ দিয়ে ং লেখা হোক।

২২.৪। বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘস্বর নেই। সেই কারণে সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোথাও দীর্ঘ-ঈ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। এমনকি স্ত্রীবাচক শব্দ এবং ভৌগোলিক নামের বানানেও

নয়। সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের অরাজকতা রয়েছে। উপকারী অথচ উপকারিতা—এই ধরনের ডাবল স্ট্যানডার্ড চলতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। তাঁর অভিমত, বাংলায় সব সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দই হ্রস্ব-ই কারান্ত হিসাবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পাবলে সব অরাজকতা দূর হয়। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কথা মনে রেখে প্রথমার একবচনে আপাতত বিকল্পে দীর্ঘ ঈ-কার রাখা যায় বলে তিনি মনে করেন। সংবাদপত্রে যদি প্রত্যহ হ্রস্ব ই-কারান্ত বানান চোখে পড়তে থাকে তবে সেটিই স্বাভাবিক বলে গৃহীত হবে বলে তিনি মনে করেন।

২২.৫। জগন্নাথবাবুর প্রস্তাব, "সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারশি, পোর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাশি, রুশ যেখান থেকেই শব্দ আসুক না কেন বাংলা হয়েই আসতে হবে, তত্সম হোক বা না হোক তাকে বাংলা-সম হতেই হবে।" যেমন অ্যা-বর্ণ বাংলায় প্রচলিত হয়ে গেছে। নতুন বর্ণের জন্য না ভেবে এটিকে সর্বজনীন করতে হবে। খাঁটি বাংলা অর্থাৎ দেশজ শব্দে এবং বিদেশাগত বক্র আ ধ্বনিযুক্ত শব্দে এই অ্যা এবং অ্যা-কার আবশ্যিক হোক। সংস্কৃত শব্দে আপাতত শুধু এ-কার অথবা বিকল্পে এ এবং এ-কার চালু হোক।

২২.৬। ও এবং অর্ধ-ও ধ্বনি বোঝাতে বানানে বাড়তি ও-কার দেবার রীতি নিয়েও জগন্নাথবাবু আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন এটি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্র থেকে বাড়তি ও-কার বর্জন করা যেতে পারে। প্রেরণার্থক ক্রিয়ায় ও-কার বড়োজোর বিকল্পে চলতে পারে।

জগন্নাথবাবুর প্রস্তাবগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

২৩। **"প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা"**

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০ শে মে ১৯৮৬।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্য উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শক্রমে ১৯৮৫ সালের ১৪ থেকে ১৯ মে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল। সেই আলোচনাচক্রের বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা লিপিসংস্কার, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা অভিধান, লৌকিক কোষ ও উচ্চারণ-কোষ, বাংলা পরিভাষা এবং বাংলা ভাষা প্রচলনের সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা ও নিবন্ধ পাঠ করেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞগণ। এই আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত নিবন্ধগুলি নিয়ে রচিত এই গ্রন্থ হল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রথম প্রকাশন। এখানে এই গ্রন্থের বানান সংক্রান্ত নিবন্ধগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) **বাংলা বানান-সংস্কার ঃ সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা। পবিত্র সরকার।**

এই প্রবন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত হল,বাংলা বানান কোন একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা একমাত্রিকভাবে নিরূপিত হতে পারে না। বাংলা বানান সংস্কারের বিষয়ে যাঁরা ভেবেছেন, তাঁরা মূল তিনটি নীতির কথা বলেছেন ঃ

এক ॥ বাংলা বানান সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী হবে।

দুই ॥ বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটি বিমিশ্র চরিত্র আছে। সেক্ষেত্রে তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রেখে বাকিগুলিকে কমবেশি ধ্বনিসংবাদী করে তুলতে হবে।

তিন ॥ যেমন চলছে তেমনই চলবে।

লেখক মনে করেন, দ্বিতীয় নীতিটি অধিকতর বাস্তব ও ব্যবহারিকতার দিক থেকে সংগত। তবে এই নীতিকে রূপায়িত করতে হলে লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগী হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন :

এক ॥ তৎসম শব্দের একটি অব্যতিক্রমী বানান বাংলায় গ্রহণ করতে হবে।

দুই ॥ অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে তৎসম বানানের অনুসৃতি কতটা থাকবে এবং তা কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে—সেই টেনশনের স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

তিন ॥ দেশি-বিদেশি বানান ধ্বনিসংবাদী করতে হবে। বিদেশি শব্দের ব্যুৎপত্তি-স্মারক বানানে প্রয়োজন নেই—যদি তার উচ্চারণ সরে গিয়ে থাকে।

চার ॥ বানান-পদ্ধতির সরলীকরণের জন্য যেটুকু বর্ণমালার উপাদান ও লিখন পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন—তা করতে হবে।

লেখকের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর প্রস্তাব কার্যকর হলে বাংলা বানানে সমতা আসবে।

(২) শুদ্ধ বানান-প্রচলন : কয়েকটি বাধা। পবিত্র সরকার।

এই নিবন্ধে লেখক সংস্কার-করা নতুন বানান প্রচলনেব ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি আসে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমেব যে দায়িত্ব সে সম্পর্কে সচেতন করেছেন।

(৩) বাংলা বানান-সমস্যা। শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

এই প্রবন্ধে লেখকের মত হল, আদর্শ উচ্চারণ বলে যখন কিছু নেই, তখন উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান দিতে গেলে যথেচ্ছাচার আসবে। ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্প বানান হয়তো অযৌক্তিক নয়, কিন্তু সর্বত্র লেখকের ইচ্ছানুযায়ী শব্দের বানান হলে বানানে সাম্য আনা যাবে না। বানান স্থিতিশীল হবে না। লেখক মনে করেন বানান স্থিতিশীল রাখার একমাত্র উপায় শব্দের উৎস সন্ধান। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানান হলে তবেই শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হয় না।

লেখকের মতামত সম্পর্কে বলা যায়, বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি নীতিকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। কারণ বাংলা শব্দভান্ডারে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ আছে। কেবল ব্যুৎপত্তি অনুসারী বানান হলে বানান কখনই স্থিতীশীল হবে না।

(৪) ভাষালেখা : উদ্দেশ্য, প্রকরণ ও প্রয়োগ। ভূদেব চৌধুরী।

লেখক যথার্থই বলেছেন, বানান সমস্যার আলোচনা, বিচার এবং ঐকমত্য-সাধন বিশেজ্ঞদেরই সাধ্য। তা থেকে পথ ঠিক করবেন ভাষার শিক্ষকেরা। তবে আলোচনাই সব নয়, তাকে ফলাভিমুখী করা চাই।

(৫) বাংলা বানান সংস্কার। রামেশ্বর শ'।

লেখক বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে ধ্বনিভিত্তিক বানান লেখার পক্ষপাতী। কারণ তিনি মনে করেন উচ্চারণই ভাষার আসল স্বরূপ। লিখিত বানানকে উচ্চারণ থেকে দূরে সরিয়ে কৃত্রিম করে রাখা যাবে না। বানান ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক নিয়মেই ধ্বনিভিত্তিক হয়ে যাবে।

লেখকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলা বানানকে কোনো একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে কিনা তা আলোচনার বিষয়।

(৬) বাংলা বানান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব। বকুল চৌধুরী।

বানান শিক্ষার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক এবং মিতব্যয়ী করার জন্য এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে ঃ

(ক) স্বর যখন উচ্চারণে ব্যঞ্জনকে অনুসরণ করে তখন স্বরচিহ্নকে ব্যঞ্জনচিহ্নের পরে লেখাই অধিক যুক্তিসংগত।

(খ) বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য নেই। কেবল হ্রস্ব স্বর পাওয়া যায় এবং এদের আনুষঙ্গিক চিহ্ন i (ি) এবং একটি u (ু)-এর প্রয়োগ যথেষ্ট।

(গ) এ এবং অ্যা—এই দুটি ফনিমের জন্য দুটি স্পষ্ট গ্রাফিম ও অ্যালোগ্রাফ থাকা চাই। তাই নতুন ফনিম অ্যা-র জন্য এ' মৌলিক প্রতীক এবং ে' আনুষঙ্গিক প্রতীক হিসাবে সুপাবিশ করা যেতে পারে। এই আনুষঙ্গিক চিহ্ন ে' সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের ডানদিকে লিখতে হবে।

(ঘ) 'ও'-এর জন্য প্রথাগত আনুষঙ্গিক চিহ্নটি অবৈজ্ঞানিক। 'o' চিহ্নটি ব্যঞ্জনের পরে ব্যবহারের প্রস্তাব রেখেছেন।

(ঙ) ঋ তুলে দেওয়া যায়। কারণ এটি রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(চ) ঐ ঔ তুলে অই এবং ওউ ব্যবহার করা যেতে পারে।

একই ভাবে ব্যঞ্জন গ্রাফিম কমাবার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

(ক) একমাত্র ফনিম t কে নির্দেশ কবার জন্য 'ৎ' তুলে কেবল 'ত' গ্রাফিমটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(খ) 'জ' এবং 'য' এর মধ্যে 'য' গ্রাফিমটি তুলে দেওয়া যায়।

(গ) পাঁচটি নাসিক্য ফনিম ঙ, ঞ, ণ, ন, ম-এর মধ্যে 'ন' এবং 'ম' কে বেখে অন্যগুলি তুলে দেওয়া যায়। (ঙ এ‌ং ং-র মধো যে কোনোটিকে রাখা যায়)।

(ঘ) র, ´, ‸ গ্রাফিম-এর মধ্যে একটি 'র' রেখে অন্য দুটি তুলে দেওয়া যায়।

(ঙ) শ, ষ, স গ্রাফিমের মধ্যে তালব্য 'শ' কে রাখা যেতে পারে। অন্য দুটি অ্যালোফোন মাত্র।

(চ) দুটি গ্রাফিম 'হ' এবং 'ঃ'-র মধ্যে 'হ'-ই যথেষ্ট।

(ঠ) ্ -এর ব্যবহার বজায় থাকবে অনুপস্থিত স্বরকে নির্দেশ করার জন্য।

উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি থেকে বোঝাই যায়, এখানে ধ্বনিসংবাদী বানানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কবা হয়েছে। তাছাড়া এখানে যেভাবে গ্রাফিম সংখ্যা কমাবার যে প্রস্তাব রয়েছে তাতে প্রচলিত অভ্যাসকে খুব বেশি আঘাত করা হয়েছে। এর ফলে সংস্কারের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাছাড়া প্রস্তাবগুলির মধ্যেই স্ববিরোধ রয়েছে। যেমন—স্বরবর্ণের মধ্যে কেবল হ্রস্ব স্বর এবং তার আনুষঙ্গিক চিহ্ন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। আবার, পরেই 'ঋ' এর পরিবর্তে 'রী' লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৭) শিশুপাঠ্যের বানান। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধে লেখক শিশুপাঠ্য বইগুলিতে বানান বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রগুলি দেখিয়েছেন এবং বাংলা বানানের স্ট্যান্ডার্ড রূপের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছেন ঃ

এক ॥ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে মূল বানান অনুসৃত হবে। তবে দ্বিত্ববর্জন, হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্রয়োগের বিকল্প বিধানের নীতি যেখানে রয়েছে, সেখানে কেবল হ্রস্ব-যুক্ত বানান গ্রহণ, সন্ধিতে পূর্বপদের শেষে ম্ এবং পরপদের গোড়ায় ক খ গ ঘ থাকেলে ঙ-র জায়গায় ং ব্যবহার, পদান্তে বিসর্গ লোপ, হস্ চিহ্ন বর্জন—এগুলি বিকল্প-রহিতভাবে গৃহীত হবে।

দুই ॥ খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে বাহুল্যবর্জন ও দীর্ঘত্ব লোপের নীতি গ্রহণীয়। স্ত্রীবাচক, জাতি-ব্যক্তি-ভাষা-বিশেষণবাচক শব্দে ই-প্রত্যয়ান্ত রূপটি স্বীকার্য হবে। য ও জ এর মধ্যে বিকল্পে জ গ্রহণীয়। ণ ও ন এর বিকল্পে ন গ্রহণীয়। ক্ষ ও খ এর বিকল্পে খ গ্রহণীয়। বিকল্পে চন্দ্রবিন্দু লোপ সিদ্ধ হলে সেটিই গ্রাহ্য। ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তাক্ষর ভেঙে ̦লেখা, ঙ্গ-র জায়গায় ঙ স্বীকার, ক্ষেত্রবিশেষে ঐ-কার ঔ-কারের জায়গায় অই এবং অউ ব্যবহার স্বীকার্য হবে।

তিন ॥ শ, ষ, স-র ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বানান রীতি। যেমন—সংস্কৃত থেকে আগত শব্দের প্রচলিত বানান (মশা, পিসি)। বিদেশি শব্দের যথাযম্ভব মূলানুগ বানান (শহর, মুশকিল)। দেশজ শব্দের প্রচলিত বানান।

চার ॥ বক্র এ-কারের নতুন অক্ষর নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অ্যা-দিয়ে লেখা (অ্যাসিড, ঢ্যাঙা)।

পাঁচ ॥ ও কার ও ঊর্ধ্ব-কমার বাহুল্য বর্জন। কেবল ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা এবং নামধাতুর বেলায় ও-কার লাগানো যেতে পাবে।

ছয় ॥ স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতির ফলে যে উচ্চারণভেদ হয় সেই বানান স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে (ওপর, ভেতর, হিসেব ইত্যাদি)।

লেখকের মতে এই বানানরীতি অনুযায়ী একটা শৃঙ্খলা আনা সম্ভব। লেখকের প্রতিটি প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত।

(৮) বাংলা বানান ঃ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ। ক্ষেত্র গুপ্ত।

ক্ষেত্রবাবু মনে করেন, বাংলা বর্ণমালার অকারণ জটিলতা কমিয়ে ফেলা প্রয়োজন। শব্দভান্ডার নিয়ে আলোচনা ব্যাকবণ ও ভাষার ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাক। তার জের বানানে টেনে আনা উচিত নয়। তিনি নিম্নলিখিতভাবে বাংলা বর্ণমালা সাজাতে চান ঃ

স্বরবর্ণ ৬টি—অ, আ, ই উ, এ, ও।

ব্যঞ্জনবর্ণ ২৯ টি—	ক	খ	গ	ঘ	
	চ	ছ	জ	ঝ	
	ট	ঠ	ড	ঢ	
	ত	থ	দ	ধ	ন
	প	ফ	ব	ভ	ম
	য	র	ল	স	হ

যুক্তব্যঞ্জনের যেগুলির উচ্চারণ বাংলায় নেই সেগুলি ত্যাগ করাই সঙ্গত। যেমন—ক্ষ।

লেখক বাংলা বানানকে পুরোপুরি ধ্বনি অনুসারে সাজাতে চান। সেইভাবে বাংলা বর্ণমালাকে সংক্ষেপ করার প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর প্রস্তাবগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

(৯) বাংলা বানান সংস্কার কেন ও কোথায়। স্বপন মজুমদার।

বর্জনপ্রবণ বা রক্ষণবাদী কোনো বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করে লেখক ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন কোনো সংস্কারই চূড়ান্ত নয়। তবু তিনি এমন কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছেন, যার মূল লক্ষ্য তৎসম শব্দের বানানকে মোটামুটি ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি কমবেশি ধ্বনিসংবাদী করা, তবে প্রস্তাবগুলিতে নতুনত্ব কিছু নেই।

(১০) বাঙ্‌লা বানানের সংস্কার। ক্ষুদিরাম দাস।

এই প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়, লেখক ধ্বনিভিত্তিক বানানের পক্ষপাতী নন। তাঁর বক্তব্য, রাজশেখর-সুনীতিকুমার-সমিতির মূল প্রস্তাবগুলি সামনে রেখে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কীজন্য বিশৃঙ্খলা ঘটছে তা নির্ণয় করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর বানান-সংস্কারের সর্বশেষ প্রস্তাব বাঙ্‌লা ব্যাকরণগুলির পরিশিষ্টে জুড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

(১১) বানান সংস্কার। দেবীপদ ভট্টাচার্য।

দেবীপদবাবু উচ্চারণভিত্তিক বানানের পক্ষপাতী নন। বাংলা শব্দভান্ডারের বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের কথা ভেবে সেই অনুসারে বানান লেখার প্রস্তাব রেখেছেন।

(১২) বানান সংস্কার-উপসমিতির সুপারিশ।

১৪ থেকে ১৯ মে-এর ভাষাবিষয়ক সেমিনারের পর বানান সংস্কার উপসমিতির অধিবেশন বসে ৭ আগস্ট ১৯৮৫। উপসমিতির সদস্যরা সেমিনারে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে বাংলা শব্দাবলিকে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, বিদেশি—এই কটি পর্যায়ে বিভক্ত করে কতকগুলি সুপারিশ সাজিয়েছেন।

২৪। **বাংলা বানান সংস্কার। একটি ভিত্তিপত্র।**
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই ভিত্তিপত্র অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), নির্মল দাশ (অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং পবিত্র সরকার (অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মূলত এই তিনজনের আলোচনার উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। তবে এগুলি এঁদের ব্যক্তিগত প্রস্তাব নয়। বিভিন্ন আলোচনায় বুদ্ধিজীবীদেব দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাব অবলম্বনে এটি তৈরি করা হয়েছে।

বাংলা বানান সংস্কার করতে গিয়ে দুই ধরনের প্রস্তাব বিভিন্ন সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে। এক, সমস্ত বানান বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ অনুযায়ী হবে। দুই, তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি অথবা সাধারণভাবে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দে ভাগ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শব্দের জন্য বিভিন্ন বানান রীতি নির্ধারিত হবে। সমস্ত দিক বিচার করে, বিশেষত অর্থ গ্রহণের সুবিধার কথা চিন্তা করে, দ্বিতীয় প্রস্তাবকেই বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত এই ভিত্তিপত্রের মূল উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এই বাংলা বানান সংক্রান্ত ভিত্তিপত্র প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত বিদ্বজ্জন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠায়।

তাঁদের প্রেরিত মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর একটি সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হয়। সুপারিশপত্রটির নাম দেওয়া হয় 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ।' সুপারিশপত্রটি প্রকাশের পর গত ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ আকাদেমি থেকে একটি আলোচনাসভার আয়োজন হয়। এই সভায় বিভিন্ন সুপারিশের উপর যে অভিমতগুলি আসে তা আলোচনার জন্য আকাদেমির বানান সমিতির বেশ কয়েকটি বৈঠক বসে। ঐ সব বৈঠকে সমস্ত মতামত পর্যালোচনা করে আকাদেমি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসে। এই সিদ্ধান্তগুলি 'বাংলা বানানবিধি'নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, ১৯৯৭-তে। পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় জুন, ১৯৯৭-তে।.; তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৭ এবং পরিমার্জিত সংস্করণ মার্চ ২০০১-এ। এই পুস্তিকাটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশে লিপি-বিষয়ক কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বানান-বিষয়ক প্রস্তাব বয়েছে। তৃতীয় অংশে লিখন বীতিবিষয়ক প্রস্তাব রয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অংশটি প্রত্যক্ষভাবে বানানের সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই কারণে বানানবিষযক প্রস্তাবগুলি নিয়েই আলোচনা করা হল। বানানবিষয়ক প্রস্তাবগুলি তিনটি ধারায় সাজানো হযেছে। প্রথম ধারায় তৎসম শব্দের বানান। দ্বিতীয় ধারায় অ-তৎসম শব্দেব বানান , তৃতীয় ধারায় বিদেশি শব্দের বানান।

বাংলা আকাদেমিব বানান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি বানানের একরূপতা রক্ষার ক্ষেত্রে অতান্ত সহাযক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বানান সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধির মধ্যে যে কোনো কাবণেই হোক যে অস্পষ্টতা দেখা যায আকাদেমি তা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত। তাছাড়া বিকল্পেব ব্যবহাবও অনেক কম। এককথায যুগোপযোগী নতুন ভাবনার প্রতিফলন থাকায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিব বানানেব নিয়মগুলি অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে।

গ্রন্থাদির বানান-সংক্রান্ত আলোচনা

বানান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

২৫। **বাংলা বানান ঃ শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।**

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮৫। বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবা হয। বিভিন্ন পত্রিকায প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই পৃথকভাবে এই গ্রন্থ নিয়ে আর আলোচনা কবা হল না।

২৬। **'বাঙলা বানান-বিধি' ঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার।**

সাম্প্রতিক কালে (১৯৭৯ খ্রিঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয পূর্ববর্তী বানান সংস্কার সমিতির প্রবর্তিত নিযমাবলিকে (৩য় সংস্করণ) ভাষার স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংশোধনের অভিপ্রায়ে নতুন সমিতি গঠন করেন। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত এই নতুন সমিতিব সদস্যরূপ অন্তর্ভুক্ত হন ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার। পরবর্তীকালে সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরেশবাবু তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটান তাঁর 'বাঙলা বানানবিধি' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১লা আগস্ট, ১৯৮২)।

এই গ্রন্থে পরেশবাবু বাংলা বানান সমস্যার স্বরূপ, সমাধানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ দিক থেকে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা বানান কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য এখানে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল ঃ

২৬.১। **স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ ঃ ই/ঈ, উ/ঊ**

(ক) সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ স্বীকার্য ; যেমন—দিন/দীন।

(খ) অর্ধতৎসম, তদ্ভব. দেশী, বিদেশী শব্দে হ্রস্ব স্বর হবে ; যেমন—কুমির, পাখি, খিল, খ্রিষ্ট ইত্যাদি।

(গ) সুপ্রচলিত কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে এখনও বিকল্প বানান চলতে পারে। যেমন—হীরা/হিরা, নীলা/নিলা।

(ঘ) অব্যয়সূচক 'কি' এবং প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কী' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য বানানে বজায় থাকবে।

(ঙ) স্ত্রীলিঙ্গবাচক-ঈ/নী প্রত্যয়-দীর্ঘান্ত হবে।

(চ) সাধিত বিশেষণবাচক শব্দ দীর্ঘান্ত হবে।

২৬.২। **ঋ ঃ**

(ক) তৎসম শব্দে এই বর্ণটি স্বীকার্য।

(খ) অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী. বিদেশী শব্দে বর্জনীয়।

২৬.৩। **ঐ এবং ঔ ঃ**

(ক) তৎসম শব্দের বানানে স্বীকার্য : যেমন—তৈল, ঔষধ।

(খ) বাংলা বহু-অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে ঐ/ঔ বজায় থাকবে ; যেমন—পৈঠা, বৌদি।

(গ) বাংলা একাক্ষরী শব্দে অই/অউ প্রযুক্ত হবে, যেমন—দই, খই, মই।

(ঘ) শব্দ বা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তি বা প্রত্যয় নয়, মূল শব্দ বা ধাতুর অক্ষর-সংখ্যাই গণনীয় ; যেমন—বই-লো, সই বে, পৌঁছা-বে, দৌড়া-নো ইত্যাদি।

২৬.৪। **এ/এ্যা/অ্যা ঃ**

অ্যা বর্ণ স্থলে 'এ্যা'বর্ণের প্রয়োগ ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বলে পরেশবাবু মনে করেন।

(ক) বাঙলা অর্ধতৎসম শব্দে, তদ্ভব ধাতুর ক্ষেত্রে এবং বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে এ্যা বর্ণের ব্যবহার আবশ্যিক হবে।

(খ) সর্বনামজাত শব্দে এ্যা বর্ণের ব্যবহার বর্জনীয়। যেমন—কেন, হেন, যেমন—কেন।

(গ) তদ্ভব বিশেষ্য বা অন্যান্য পদে এ্যা-র ব্যবহার বৈকল্পিক ঃ একটা/এ্যাকটা, খেলা/খ্যালা।

২৬.৫। **অ/ও/অ'**

(ক) বাংলা শব্দের পদান্তে অ পরিবর্তিত হয়ে ও হবে। যেমন—ভালো, এগারো ইত্যাদি।

(খ) বাংলা ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ও সম্পন্ন অসমাপিকার ক্ষেত্রে অ স্থানে ও না হয়ে অ' ব্যবহার সংগত হবে। যেমন—চ'লো-চোলো (ঃ বর্তমান অনুজ্ঞায় চলো), ক'রে-কোরে (ঃ করে)।

(গ) শব্দসংক্ষিপ্তি বোঝাতে উর্ধ্বকমার ব্যবহার স্বীকার্য ; যেমন—শ' (শত), ক'টা (কয়টা)

(ঘ) তৎসম শব্দে এবং বাংলা শব্দের পদাদি ও পদমধ্যে অ-এর কোনো পরিবর্তন হবে না ; যেমন—গরম, নরম, গরু, ছবি ইত্যাদি।

২৬.৬। **মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ**

(ক) ক্রিয়াবিভক্তির মহাপ্রাণতা, ধাতুর মহাপ্রাণতা রক্ষণীয় ; যেমন—করছে (করচে/কর্চে নয়), পৌঁছেছি (পৌঁচেচি নয়)।

(খ) পদান্ত মহাপ্রাণতার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রয়োগ স্বীকার্য ; যেমন—শাঁখ, আখ, দুধ। কিন্তু সাঁঝ/সাঁজ ইত্যাদি।

(গ) পদমধ্যে বা যুক্তব্যঞ্জনে বিকল্প প্রয়োগ মানা উচিত ; যেমন—বাঁঝা/বাঁজা, শাঁখালু/শাঁকালু।

(ঘ) অর্ধতৎসম শব্দে বিকল্প প্রয়োগ রক্ষণীয় ; যেমন—আদ্ধেক/আদ্দেক/বাচ্ছা/বাচ্চা ইত্যাদি।

২৬.৭। **ঙ/ং**

(ক) তদ্ভব শব্দে ও বিদেশী শব্দে ং স্থলে একক ব্যঞ্জন হিসেবে ঙ বর্ণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

(খ) পদান্ত অব্যয়-বানানে ং রাখতে হবে ; যেমন—সুতরাং এবং বরং ইত্যাদি।

(গ) নাসিক্যযুক্ত কণ্ঠ্যব্যঞ্জনে ঙ, ং বিকল্পে গ্রহণীয়।

২৬.৮। **য/জ**

(ক) তদ্ভব শব্দে মধ্যবর্তী 'জ' স্বীকার্য।

(খ) সংস্কৃত মূলে 'য' আছে এমন যে সমস্ত শব্দের আদিতে জ দৃঢ়মূল হয়নি. সে সমস্ত শব্দে য রাখাই বাঞ্ছনীয় ; যেমন—যাওয়া, যত, যখন।

(গ) অর্ধতৎসম শব্দে 'য' রাখাই বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বিদেশী শব্দের সর্বত্র 'জ'।

২৬.৯। **ন/ণ**

(ক) সংস্কৃত শব্দে একক অথবা যুক্তাক্ষর বর্ণে ণ থাকবে। যেমন—বাণ, চরণ, কন্টক।

(খ) তদ্ভব বা খাঁটি বাঙলা শব্দে 'ণ' স্থানে 'ন' হবে। যেমন—সোনা, কান।

(গ) অর্ধতৎসম শব্দে ন বাঞ্ছনীয় ; যেমন—নারান (নারায়ণ)। অঘ্রান (অগ্রহায়ণ)।

(ঘ) বিদেশী শব্দে সর্বদাই 'ন'। কর্নেল, কোরান।

২৬.১০। রেফ্ ও দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ঃ বেফের পর ব্যঞ্জনেব দ্বিত্ব প্রয়োগ এখন একেবারেই নির্বাসিত।

২৬.১১। **শ/ষ/স ঃ**

(ক) মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসাবে তদ্ভব শব্দে শ, ষ, স ব্যবহার্য।

(খ) অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত উৎস অনুযায়ী শ, ষ, স হবে ; যেমন—সোয়ামী, শিগ্‌গির, ওষুধ।

(গ) বিদেশী শব্দের একক ব্যঞ্জনের বানান ও বর্ণে শ কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনে স (স্ত, স্ট, স্প ইত্যাদি)।

(ঘ) বিদেশী শব্দে স্ > ছ্ উচ্চারণ যেখানে দৃঢ়মূল, সেখানে তা অপরিবর্তিত ; কেচ্ছা, ছয়লাপ, পছন্দ।

২৬.১২। **বিসর্গ [ঃ]**

(ক) পদান্ত অবস্থানে ঃ

প্রত্যযান্ত 'ঃ' বর্জনীয় ; যেমন—প্রথমত, বস্তুত।

সমাসবদ্ধ দ্বিরুক্ত শব্দের শেষে ঃ বর্জনীয় ; যেমন—অহরহ (= অহঃ + অহঃ), পুনঃপুন।

স্বাধীন মূলের ক্ষেত্রে পদান্ত 'ঃ' বর্জনীয় , যেমন—ছন্দ, স্রোত, মন, শির।

(খ) পদমধ্য অবস্থানে ঃ সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদে অঘোষবর্ণের ও ঘোষবর্ণের পূর্বে 'ঃ' বজায় থাকবে। যেমন—অতঃপর, অন্তঃকরণ, তপোবন, যথোরাশি।

২৬.১৩। হস্ চিহ্ন ঃ

(ক) তুচ্ছার্থ বা সম্ভ্রমার্থ অনুজ্ঞায় হসন্ত বাঞ্ছনীয়। যেমন—কর্, চলুন্, বলিস্ ইত্যাদি।

(খ) বাঙলা অথবা বিদেশী শব্দের থেকে হস্ চিহ্ন বর্জনীয়।

(গ) তৎসম শব্দে হস্ বর্জন অস্বাভাবিক হবে না।

(ঘ) অর্থান্তর ঘটলে হসন্ত বিধেয়। যেমন—বসতি ; বস্‌তি/বস্তি।

২৬.১৪। ত্/ৎ ঃ

(ক) তদ্ভব শব্দে ত স্বীকার্য।

(খ) অব্যয় বানানে ৎ রাখা যায়।

২৬.১৫। **যুক্তব্যঞ্জন ঃ**

(ক) যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট করে লেখা বিদেশী শব্দে অথবা তদ্ভব শব্দে বিকল্পে গ্রহণীয়। যেমন—ট্যাক্‌সি/ট্যাক্সি।

(খ) অনুচ্চারিত বর্ণ ছাপায় মূল ব্যঞ্জনের নীচে পৃথকভাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন—তত্ত্ব, সান্ত্বনা ইত্যাদি।

(গ) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন—কর্ম, সর্ব।

(ঘ) ধাতু বা শব্দমূল যথাসম্ভব বিশ্লিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকবে ; যেমন—করছে, করলুম।

(ঙ) সংস্কৃত ও অর্ধতৎসম শব্দ ছাড়া অন্যত্র ক্ষ প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয় ; যেমন—ক্ষয়, ক্ষমা ইত্যাদি।

(চ) সংস্কৃত যুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট করে বিকল্পে লেখা যাবে কেবল বহির্গত সন্ধির ক্ষেত্রে। যেমন—সম্প্রতি/সম্‌প্রতি ; কিন্তু অর্‌চনা বা অর্‌জন নয়।

২৬.১৬। **স্বরসংগতি ঃ**

আদর্শ কথ্য বাংলাসুলভ স্বরসংগতিজনিত অথবা তদনুরূপ স্বরের পরিবর্তন বাংলা শব্দের বানানে রক্ষিত হবে, যেমন—

(ক) আদি স্বর ঃ পেছন (পিছন), ভেতর (ভিতর) ইত্যাদি।

(খ) পদান্ত স্বর ঃ কুয়ো (কুয়া), কুলো (কুলা) ইত্যাদি।

(গ) ক্রিয়া নয় এমন পদের মধ্য স্বর ঃ উঠোন (উঠান) উনুন (উনান)।

(ঘ) ধাতুর অন্ত্য স্বর ঃ চিবোয়, এগোয়।

(ঙ) 'অ '-অন্তক ধাতুও অবিকৃত থাকবে ঃ হলে, হন্তে।

২৬.১৭। **ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য ঃ** আদর্শ কথ্য বাংলায় বানানে ঔপভাষিক বা বৈভাষিক বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বর্জিত হবে।

২৬.১৮। **অর্ধতৎসম শব্দ ঃ** অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মৌখিক বানান যথাসম্ভব রক্ষিত হবে।

ব্যাকরণগত বিভাগ অনুসারে বাংলা বানানের বিন্যাস কেমন হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা কবেছেন। তাঁব মতামত সূত্রাকারে এখানে উল্লেখিত হল।

২৬ ১৯। হসন্ত চিহ্ন সমস্ত ব্যাকরণগত বিভাগে বর্জনীয়।

২৬.২০। পদান্ত স্বর সর্বদা হ্রস্ব এবং চিহ্নিত। ব্যতিক্রম ঃ স্ত্রীলিঙ্গবাচক এবং সাধিত বিশেষণ শব্দের পদান্ত-ঈ।

২৬.২১। পদান্তে উচ্চারিত স্বর সর্বত্র বানানে প্রদর্শিত হবে। কেবল সর্বনামেব ক্ষেত্রে অ/ও বিকল্প প্রযোগ। ব্যতিক্রম ঃ পদান্ত হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত অ > ও।

২৬ ২২। পদান্ত ঈ যুক্ত বিশেষণমূল শব্দরূপে বজায় থাকবে কিন্তু শব্দগঠনে (অর্থাৎ প্রত্যয় যোগে ও সমাস বন্ধনে) তা হ্রস্ব হবে।

২৬ ২৩। পদাদি/পদমধ্য অ > ও উচ্চারণ সাধাবণত প্রদর্শিত হবে না। ব্যতিক্রম অ > অ' (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা এবং সম্পন্ন অসমাপিকার ক্ষেত্রে)

২৬.২৪। উচ্চারণে এ > এ্যা পরিবর্তন সর্বত্র বানানে চিহ্নিত হওয়া উচিত, বিশেষত ধাতুর ক্ষেত্রে।

পরেশবাবু তাঁর গ্রন্থে বাংলা বানান সমস্যা ও সমাধানে মানদন্ড কী হওয়া উচিত তা নিয়ে দীর্ঘ-আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, তবু কয়েকটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলার থেকে যায়। যেমন ঃ 'হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ' প্রসঙ্গে ২৬.২১/ঙ সূত্রটি সম্পর্কে মনে হয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে ঈ বা নী প্রত্যয়ের পরিবর্তে সর্বত্র হ্রস্ব-ই দিলে একরূপতা রক্ষিত হয়। তাছাড়া দিদি, ঝি, পিসি, মাসি ইত্যাদি বানান প্রচলিত আছে। ২৬.৪ নং সূত্রটি (এ/এ্যা/অ্যা) আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অ্যা সম্পূর্ণ একটি পৃথক ফনিম। সেক্ষেত্রে নতুন বর্ণ উদ্ভাবিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যতদিন না হচ্ছে ততদিন অ্যা বর্ণ দিয়েই কাজ চালানো যুক্তিযুক্তি বলে মনে হয়। ২৬.৫ নং সূত্রটি (অ/ও/অ') থেকে বোঝা যায় লেখক ঊর্ধ্বকমার বিশেষ পক্ষপাতী। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বোঝাতে অযথা ঊর্ধ্বকমা না দিয়ে ও-কার লেখাই বাঞ্ছনীয়। ২৬.১৩ নং সূত্রে (হস্ চিহ্ন) তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞায় (করিস্, বলিস্ চলুন) হস্ চিহ্ন না দিলেও চলে। ২৬.১৫/ঘ

নং সূত্রে উদাহরণ হিসাবে 'করলুম' বানানটি স্বীকার করেছেন। আবার ২৬.১৭ নং সূত্রে ঔপভাষিক বা বৈভাষিক বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বর্জনের কথা বলেছেন। 'লুম' আদর্শ কথ্য বাংলায় গৃহীত হয় না। সুতরাং এটি স্বীকৃত হবে কিনা তাতে প্রশ্ন ওঠে। এরকম কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া লেখকের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। প্রস্তাবগুলির প্রায়োগিক উপযোগিতাও যথেষ্ট।

২৭। **বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ পবিত্র সরকার।**

ড. পবিত্র সরকার বানান-সংক্রান্ত বিস্তর আলোচনা করেছেন তাঁর 'বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৮৭)। এই গ্রন্থের লেখাগুলি প্রবন্ধাকারে বিক্ষিপ্তভাবে ১৯৮২ সাল থেকে 'অনুক্ত' 'প্রমা' 'যুবমানস' 'শারদীয়া বসুমতী' 'শারদীয়া আজকাল', 'অপরাজিত', 'কৌশিকী' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), 'পশ্চিমবঙ্গ' 'পটভূমি' 'সেতুবন্ধন' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়।

এই গ্রন্থে লেখক বানান সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিয়েই যে শুধু আলোচনা করেছেন তা নয়, বানান ভুলের রকমভেদ, বানান ভুলের বিভিন্ন কারণ, বর্ণমালা, লিপিপদ্ধতি—বিভিন্ন দিক নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। তবে আমাদের আলোচনার লক্ষ্য মূলত বাংলা বানান সংস্কাব সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ধারা বিশ্লেষণ। সেইহেতু এখানে লেখকের বানান সংস্কার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ কবা হল।

২৭.১। বাংলা বানান সংস্কার বিষয়ে গ্রহণযোগ্য তিনটি নীতি রয়েছে। এগুলি হল ঃ

(ক) বাংলা বানান সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী হবে।

(খ) যেহেতু বাংলা শব্দভান্ডারের একটি বিমিশ্র চরিত্র রয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী বানান করা সম্ভব হবে না। তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রেখে বাকিগুলিকে কমবেশি ধ্বনিসংবাদী করে তুললেই হবে।

(গ) যেমন চলছে তেমনি চলবে।

লেখক মনে করেন, বাংলা বানান কোনো একটি নীতির দ্বারা একমাত্রিকভাবে নিরূপিত হতে পারে না। বানান-নীতির বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে দ্বিতীয়টি অধিকতর বাস্তব ও ব্যবহারিকতার দিক থেকে সংগত। তবে এ কাজ আরও সুনির্ধারিত করতে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বিষয়গুলি হল ঃ

প্রথমত, তৎসম শব্দের অব্যতিক্রমী বানান বাংলায় গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে তৎসম বানানের অনুসৃতি কতটা থাকবে, বা তা কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে—তার স্থায়ী মীমাংসা করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, দেশি বিদেশি শব্দের বানান মূলত ধ্বনি-সংবাদী করতে হবে ;

চতুর্থত, বানান পদ্ধতির সরলীকরণের জন্য বর্ণমালার উপাদান ও লিপিপদ্ধতির যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তাও করতে হবে।

২৭.২। বানান সংস্কার প্রসঙ্গে তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে লেখক রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রেও কিছু কিছু সমস্যা থেকে গেছে। যেমন ঃ

(ক) **বিকল্প স্বরচিহ্নের সমস্যা ঃ** এ সম্পর্কের লেখকের মত হল, তৎসম শব্দের বানানে যখন হ্রস্ব দীর্ঘ দুরকমের স্বরচিহ্নই রক্ষা করা হচ্ছে, তখন হ্রস্বচিহ্নকে স্বীকার করে নিলে বাংলা বানান বিবর্তনের ঝোঁকটির সঙ্গে সংগতি তৈরি হবে।

(খ) **বিসর্গসন্ধিজাত ও-কার ঃ** পবিত্রবাবুর মতে, যে শব্দগুলি সমাসবদ্ধ শব্দ হিসাবে ও-কার সুদ্ধই বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলির ও-কারকে তোলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরবর্তী যে যে শব্দগুলির সমাস সংস্কৃতে ছিল না, সেগুলির পৃথক পৃথক অংশ যদি বাংলায় থাকে, তবে বাংলা নিয়মে তার ও-কার বাদ দিলেও চলতে পারে। যেমন—মনযোগ লেখা যেতে পারে, কিন্তু মনরম নয়। কারণ 'রম' কথাটি পৃথকভাবে বাংলায় নেই।

(গ) **বিকল্প ব্যঞ্জন সমস্যা ঃ** এ সম্পর্কে প্রচলনকে মেনে চলাই তিনি সংগত মনে করেন।

(ঘ) **অন্ত্য বিসর্গের সমস্যা ঃ** ক্রমশ, অন্তত, বস্তুত ইত্যাদি শব্দে অন্ত্য বিসর্গ দেবার পক্ষপাতী তিনি নন।

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, "তৎসম শব্দের বানানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ খাড়া করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত অভ্যাসের বাইরে যেতে হবে। ... তা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, কাজেই যৌথ অভ্যাসের গতি বুঝেই আমাদের চলতে হবে।" (পৃষ্ঠা—৬১)

২৭.৩। **তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান ঃ** তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-রীতি নির্ধারণে সমস্যা একটাই। তা কতটা ব্যুৎপত্তি-অনুসারী, কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে। লেখক এক্ষেত্রে বানান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ক্রমশ ধ্বনিসংবাদী বানানপন্থীদের অগ্রগতি সূচিহ্নিত হচ্ছে। লেখকও ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, এই প্রবণতা অনিবর্তনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য। ক্রমশ এ জাতীয় সমস্ত শব্দের বানানেই উচ্চারণের অধিকার বিস্তার লাভ করবে। পবিত্রবাবুর অভিমত, "যাঁরা বানান সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হবেন তাঁদের এই প্রতিবর্তনীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। এব বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তা নদীর স্রোতকে তার উৎসের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার হবে এবং সে চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী থাকবে না।" (পৃষ্ঠা—৬৭)

তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানানে কিছু কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি 'বাংলা বানানেব নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয়-সংস্করণে তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্ত্রী প্রত্যয়ে হ্রস্ব ই-কার লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। লেখকও স্ত্রীবাচক শব্দে হ্রস্ব-ই-কার লেখার উচিত বলে মনে করেছেন।

অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের আর একটি সমস্যার ক্ষেত্র ঐ, ঔ। লেখকও এক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের যুক্তিকেই সমর্থন করেন অর্থাৎ বাংলার ছাব্বিশটি যৌগিক স্বরকে যদি সংক্ষিপ্ত না করা যায়, তবে অই/ওই , অউ/ওউ-কেও তা করার প্রয়োজন নেই।

ণ বর্জনেব প্রস্তাবটি লেখকও মেনে নিয়েছেন। তবে য জ-এর ক্ষেত্রে জাতি-জুঁই এই ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শব্দের গোড়ায় য বক্ষা কবার কোনো ন্যায্য ভিত্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ ষ স-এর ক্ষেত্রেও সংস্কার সমিতির নির্দেশ সমর্থন করেন না।

লেখক যুক্তব্যঞ্জন রক্ষার কবার পক্ষপাতী। তবে যেক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনের রূপ অস্বচ্ছ সেক্ষেত্রে তাকে স্বচ্ছ করার প্রস্তাব রেখেছেন।

শেষ পর্যন্ত পবিত্রবাবু সিদ্ধান্ত করেছেন "তদ্ভব শব্দের বানানে ধ্বনিসংবাদী বানান অবশ্যই লেখা উচিত। তাতে যদি য কে জ এবং ষ, স-কে শ দিয়ে উৎখাত করতে হয় সে কথাও ভাবতে হবে।" (পৃষ্ঠা—৭৫)

তবে অর্ধতৎসম শব্দের বানানে নির্দিষ্ট রূপ নেই। তাছাড়া কিছু কিছু অর্ধতৎসম শব্দ স্বরধ্বনির অল্পবিস্তর পরিবর্তনে তৎসম কাছাকাছি থেকে গেছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি তৎসম শব্দের বানানের নৈকট্য বজায় রাখা উচিত বলে মনে করেন।

২৭.৪। **ক্রিয়াপদের বানান ঃ** খুব অল্পসংখ্যক নামধাতুকে বাদ দিলে চলতি বাংলা বা মুখের ভাষায় ব্যবহৃত বাংলা ক্রিয়াপদগুলি মূলত অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দভান্ডারের অন্তর্গত।

এক্ষেত্রে লেখক অর্ধতৎসম ক্রিয়াপদেব বানান ব্যুৎপত্তিসূচক রাখার পক্ষপাতী। আর যে সমস্ত ধাতু দেশি উদ্ভবের, অর্থাৎ যাদের তৎসম শব্দের সঙ্গে ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধ নেই, তাদের উচ্চারণবোধক বানানে তাঁর আপত্তি নেই।

ক্রিয়াপদের বানানে কয়েকটি ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়। যেমন ঃ

(ক) **ঊর্ধ্বকমা ঃ** লেখক ক্রিয়াপদের ধাতু বা কোনো অংশেই ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার সমর্থন করেন না। তার ফলে যদি দুটি পদের মধ্যে সমরূপতা সৃষ্টি হয় তবে সে বিভ্রান্তি প্রতিবেশ থেকেই অপনোদন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়া স্বরসংগতির প্রভাবে ধাতুর পরিবর্তিত রূপের বানান পরিবর্তন ও-কার এবং আ-কাব দিয়ে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই।

(খ) **হসন্ত ব্যবহার ঃ** তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ ছাড়া অন্যত্র হসন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি।

(গ) **বিভক্তির বানান ঃ** সাধারণ অতীতকালের প্রথম পুরুষের-ল, নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রথম পুরুষে-ত এবং সাধারণ ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষের রূপে-ব—এই সব ক্ষেত্রে বিভক্তির উচ্চাবণে ও-কার দেবার পক্ষপাতী তিনি নন।

২৭.৫। **বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ ঃ** বাংলায় বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন ওঠে। এক, বিদেশি শব্দের ইংরেজি মধ্যস্থতায় পাওয়া উচ্চারণ মেনে নেওয়া হবে? দুই, বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ জেনে বাংলায় তা লেখার চেষ্টা করা হবে? তিন, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ও ধ্বনিতত্ত্ব মেনে নিয়ে মূল উচ্চারণ ও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে একটা আপস-রফা তৈরি করা হবে?

লেখকের পক্ষপাত তৃতীয় বিকল্পের দিকে।

২৭.৬। **বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণ ঃ** এক্ষেত্রেও লেখক উচ্চারণ ও বানানরীতির সঙ্গে আপস রক্ষা করে চলার পক্ষে।

২৭.৭। **বাংলা লিপিতত্ত্ব ঃ** বানানের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই লিপির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। লিপিসংস্কার বিষয়ে লেখকের বক্তব্য ঃ

(ক) কার চিহ্নগুলি ব্যঞ্জনের পরে এনে linear করা দরকার।

(খ) ফলা-চিহ্নগুলির অস্বচ্ছতা দূর করে সেগুলিকে স্বচ্ছ করা দরকার।

(গ) বাংলায় বহু ব্যবহৃত স্বরধ্বনি 'অ্যা' র একটি নিজস্ব বর্ণ এবং 'কার' উদ্ভাবিত হওয়া দরকার। লেখক এই 'অ্যা' র মূল বর্ণ হিসাবে এ' এবং কার হিসাবে '৫' চিহ্ন দুটি ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন।

২৭.৮। **বর্ণমালা প্রসঙ্গ ঃ** লেখক বাংলা বর্ণমালার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত বর্ণমালা হল ঃ

অ আ ই ঈ	ক খ গ ঘ ঙ	প ফ ব ভ ম
উ ঊ এ ও	চ ছ জ ঝ ঞ	য র ড় ঢ় ল
ঐ ঔ ঋ	ট ঠ ড ঢ ণ	য় শ ষ স হ
	ত থ দ ধ ন	ৎ ং ঃ ँ

এর সঙ্গে কয়েকটি বর্ণের নতুন নামকরণ হলে শিশুদের উচ্চারণ ধরবার সুবিধা হবে বলে লেখক মনে করেন সেগুলি হল ঃ

য়—'অয়', ৎ—'অৎ', ং—'অং', ঃ—'অঃ', ँ—'অঁ'।

পবিত্রবাবু তাঁর গ্রন্থে বাংলা বানানের বিভিন্ন সমস্যার দিক, সমাধানের নীতি কী হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখকেব প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি রূপায়িত হলে বাংলা বানানের সমতা অনেকটা ফিরে আসবে। কারণ বাংলা শব্দভাণ্ডাবে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ আছে। ধ্বনিভিত্তিক বা ব্যুৎপত্তি-অনুসারী—কোনো নির্দিষ্ট একটি নীতি দ্বারা বাংলা বানান কখনোই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের কথা ভেবেই বাংলা বানানের সংস্কার করতে হবে। তবে কোনো কিছুই চাপিয়ে দেওয়া বা রাতারাতি কবে ফেলা সম্ভব নয়। ভাষার স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বানান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নির্দিষ্ট পথ ধরবে, আবার প্রয়োজনে পবিবর্তিত হবে। লেখকের একটি প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলার থাকে। ২৭.২/খ প্রস্তাবটি সম্পর্কে একটু প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ লেখক সমাসবদ্ধ শব্দ হিসাবে ও-কাব সুদ্ধ যে শব্দ বাংলায় এসেছে সেখানে ও-কার রাখতে চান। কিন্তু যে শব্দের সমাস বাংলায় ছিল না সেখানে ও-কার দেবার পক্ষপাতী নন। যেমন মনোরম কিন্তু মনযোগ। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, কোন্ শব্দ সমাসবদ্ধ হিসাবে এসেছে, কোন্ শব্দ আসেনি তা বিদগ্ধ ব্যক্তি ছাড়া বোঝা কি সম্ভব? তাই সবক্ষেত্রেই যদি ও-কার থাকে তবে বানান অপেক্ষাকৃত সরল হয় বলে আমাদের মনে হয়।

২৮। **বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম। রমেন ভট্টাচার্য।**

সাহিত্য সংসদ থেকে রমেন ভট্টাচার্যের 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম' পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে। এই পুস্তিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত (১৯৩৬-১৯৩৭) বাংলা বানানের নিয়মগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষাবিদ্, পণ্ডিতগণের মতামত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ভিত্তিপত্রের প্রস্তাবগুলি মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিষয়ক নিয়মগুলির মধ্যে যেখানে ফাঁক রয়েছে বা বিশ্ববিদ্যালয যে নিয়মগুলি উল্লেখ করেননি, সংস্কৃত ব্যাকরণের সেইসব নিয়ম উল্লেখ করে রমেনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত নিয়মগুলিকে আরো স্পষ্ট করেছেন। যেমন, তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান সমিতির প্রস্তাব ছিল, যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ হবে। যথা—অহংকার, অহঙ্কার। এক্ষেত্রে অনেকেই সন্ধি

দ্বারা গঠিত নয় এমন পদে ক বর্গের পূর্বস্থিত ঙ স্থানে ং লিখে বানানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেন। তাই রমেনবাবু এই নিয়মের শেষে একটি ধারা যুক্ত করেন যে, সন্ধি দ্বারা গঠিত নয়, এমন তৎসম পদের মধ্যস্থ ঙ স্থানে কখনই অনুস্বার বিধেয় নয়। যেমন—অঙ্ক, অঙ্গ, লঙঘন ইত্যাদি। এই ধারাটির উল্লেখ বানান সমিতির নিয়মটিকে আরো স্বচ্ছ করে। এ প্রসঙ্গে তাই তিনি প্রবোধচন্দ্র সেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী, ক্ষুদিরাম দাস, মুহম্মদ এনামুল হকও বাংলা আকাদেমির 'বানান সংস্কার উপসমিতি'র মতামতগুলি উল্লেখ করেছেন। ফলে বানান সমিতির নিয়মগুলি যে শুধু স্পষ্ট হয়েছে তাই নয়, নিয়মগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াও আমরা একই সঙ্গে জানতে পারি। অ-সংস্কৃত শব্দে হস্ চিহ্ন প্রয়োগ সম্বন্ধে সমিতির জটিল প্রস্তাবকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সরলতা দান করেছেন। ইন্ প্রত্যায়ান্ত শব্দের বানান কী হবে তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে মতভেদ চলছে। রমেনবাবু এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতগুলির উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যতদিন না স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে ততদিন তিনি ইন্ প্রত্যায়ান্ত শব্দের বানানে স্থিতাবস্থা (অর্থাৎ প্রাতিপদিক হিসাবে দীর্ঘ-ঈ কার এবং সমাসে ও প্রত্যয় যোগে হ্রস্ব ই-কার) বজায় রাখতে চান। তাঁর পুস্তিকার ১ থেকে ২২ সংখ্যক নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রিঃ) থেকে গৃহীত। তার মধ্যে উপসংখ্যক নিয়মগুলি এবং ২৩.১ থেকে ২৬.৬ সংখ্যক নিয়মগুলি লেখকের দ্বারা সংযোজিত। তবে যে অংশটি তাঁর নিজস্ব সংযোজন সেটি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিশেষ কোনো নীতি বা পক্ষপাত পরিস্ফুট করেননি। যেখানে করেছেন সেখানেও স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী। যেমন ঃ

২৩.৩। সংস্কৃত ব্যাকরণমতে শস্ ও তস্-প্রত্যযান্ত এবং সমস্ত-র্ এবং স্-অন্ত অব্যয় শব্দ বিসর্গান্ত হওয়া বিধেয়। যেমন—

অন্ততঃ	আপাততঃ	ইতস্ততঃ	ক্রমশঃ
পুনঃপুনঃ	প্রায়শঃ	ফলতঃ	বস্তুতঃ
বিশেষতঃ	ভূয়োভূয়ঃ	মুহুর্মুহুঃ	স্বভাবতঃ

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেই বানান সমিতি এক্ষেত্রে অন্ত্য বিসর্গ বর্জনের সুপাবিশ করেছিলেন, অথচ ১৯৯১-এ রমেনবাবু নতুন করে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দিয়ে বিসর্গ রক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন।

২৯। **বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন ঃ আনন্দবাজার প্রকাশন।**

ইদানীংকালে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী বাংলা বানান নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। তাঁরা মনে করেন বাংলা শব্দের বানানে একাধিক বিধি বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বানানে সমাতাবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা তিরিশটি বিধি লিপিবদ্ধ করেন 'বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন' বইটিতে (প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯১)। তাঁদের প্রস্তাবিত বিধিগুলির উপযোগিতা, অনুপযোগিতা আলোচনার পূর্বে বিধিগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **তৎসম শব্দ**

যে সব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত রূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাদেরই আমরা তৎসম শব্দ বলে থাকি। তিরিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের

নিয়ম' পুস্তিকায় যেমন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের তেমনই তৎসম শব্দের বানানেও কয়েকটি পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করা হয়। যথা—

(ক) 'রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।' (দৃষ্টান্ত ঃ 'অর্জ্জন' নয়, 'অর্জন' ; 'কার্য্য' নয় 'কার্য', 'পূর্ব্ব' নয়, 'পূর্ব' ; 'বর্জ্জন নয়, 'বর্জন')।

(খ) শব্দের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ বর্জনীয়। (দৃষ্টান্ত ঃ 'অন্ততঃ' নয়, 'অন্তত' ; 'অহরহঃ' নয়, 'অহরহ', 'ইতস্ততঃ' নয়, 'ইতস্তত' ; 'ক্রমশঃ' নয়, 'ক্রমশ', 'সদ্যঃ' নয়, 'সদ্য')।

তৎসম শব্দের বানানের ব্যাপারে এই সুপারিশ আমরা মান্য করব। তা ছাড়া—

(গ) যেমন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে, তেমনই তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও বর্জন করব শব্দেব অন্তে অবস্থিত হস্‌চিহ্ন। (দৃষ্টান্ত ঃ 'দিক্', নয় 'দিক' ; 'ধনবান্' নয় 'ধনবান' ; 'বাক্' নয়, 'বাক' ; 'বুদ্ধিমান্' নয়, 'বুদ্ধিমান'।)

(ঘ) তৎসম শব্দের বানানে যে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুই স্বরই শুদ্ধ বলে গণ্য হয়, সে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বর বর্জন করে একমাত্র হ্রস্ব স্বরই আমরা গ্রহণ করব। অর্থাৎ সে সব ক্ষেত্রে 'ঈ' স্থলে 'ই' এবং 'ঈ' কার স্থলে 'ই' কার, সেই সঙ্গে 'ঊ' স্থলে 'উ' এবং 'ঊ'-কার স্থলে 'উ' কার ব্যবহার করব আমরা। (দৃষ্টান্ত ঃ 'ভঙ্গী' নয়, 'ভঙ্গি' ; 'সূচী নয়, 'সূচি' ; 'ঊর্বব' নয় 'উর্বর' ; 'ঊষা' নয, 'উষা'। ফলত 'প্রত্যূষ' নয়, 'প্রত্যুষ' ; 'প্রাগূষা' নয় 'প্রাগুষা'।

২। **অন্যান্য শব্দ ঃ**

বাংলা ভাষায় যেমন তৎসম শব্দ আছে, তেমনই আছে আরও পাঁচ শ্রেণীর শব্দ। এগুলি হল তদ্ভব, অর্ধতৎসম, স্থানীয়, দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত ও বিদেশি শব্দ। শেষোক্ত এই পাঁচ শ্রেণীর শব্দকে আমরা সাধারণভাবে অতৎসম শব্দ বলতে পারি। অতৎসম শব্দগুলির ক্ষেত্রে যে তিনটি সাধারণ নিয়ম আমরা পালন কবব, তা এই যে, এদের কোনওটির বানানেই আমরা—

(ক) দীর্ঘস্বর 'ঈ ঊ' অথবা তাদের প্রতীক-চিহ্ন 'ঈ'-কার 'ঊ-কার' ব্যবহার কবব না।

(খ) 'ঋ' বর্ণ অথবা তার প্রতীক-চিহ্ন 'ঋ-কাব' ব্যবহার করব না। (দৃষ্টান্ত ঃ 'কৃমিয়া' নয়, ক্রিমিয়া' ; 'বৃটেন নয় ব্রিটেন'।)

(গ) 'মূর্ধন্য ণ' ব্যবহার করব না। (এমন কী, 'র', 'র-ফলা', 'রেফ' অথবা 'মূর্ধন্য ষ' এর পরে এলেও 'মূর্ধন্য ণ'-এর পরিবর্তে আমরা 'দন্ত্য ন' ব্যবহার করব। দৃষ্টান্ত ঃ 'ধরণ' নয়, 'ধরন' ; 'ট্রেণ' নয়, 'ট্রেন', 'চার্ণক' নয়, 'চার্নক ; 'কিষেণচাঁদ' নয়, 'কিষেনচাঁদ'।

(ঘ) 'ৎ' বর্ণটি ব্যবহার করব না।

৩। পূর্বোক্ত পাঁচ শ্রেণীর অতৎসম শব্দের মধ্যে যেগুলি বিদেশি শব্দ, তাদের বানানে আরও যে দুটি বর্ণ আমরা বর্জন করব, তা হল 'অন্তঃস্থ য' ও 'মূর্ধন্য ষ'।

৪। অন্য চার শ্রেণীর অতৎসম (অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধতৎসম, স্থানীয়, এবং দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত) শব্দের বানানে 'অন্তঃস্থ য' ও 'মূর্ধন্য ষ' কে সর্ব্বৈ বর্জন করা এখনই সম্ভব নয়। (দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আমাদের উচ্চারণ যা-ই হোক, 'যখন' 'কেষ্ট' ও 'বিষ্টু'-ই আমরা লিখব, 'জখন' 'কেশটো' ও 'বিশটু' লিখব না।)

৫। কিন্তু এই চার শ্রেণীর কয়েকটি শব্দের বানানে 'অন্তঃস্থ য' - এর পাশাপাশি 'বর্গীয় জ' ও যে দিব্য চলছে, সেটাও লক্ষণীয়। (দৃষ্টান্ত ঃ 'যুঁই' ও 'জুঁই', 'যোগাড়' ও 'জোগাড়', 'যাদু' ও 'জাদু', 'যাঁতা' ও 'জাঁতা'। এই সব ক্ষেত্রে একমাত্র 'বর্গীয় জ'ই আমাদের গ্রাহ্য হবে।

৬। ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সময় যে সাধারণ নিয়ম আমরা পালন করব, তা এই যে, বাক্যে যাকে 'তুমি' বা যাদের 'তোমরা' বলা হচ্ছে, তার বা তাদের বেলায় মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' অথবা 'ও-কার' বসবে। ক্ষেত্র তিনটি হল (ক) নিত্য-বর্তমান, (খ) বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞা (বা অনুরোধ) এবং (গ) ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞা (বা অনুরোধ)। অন্য কোথাও ক্রিয়াত্মপদের শেষে 'ও' বর্ণ অথবা 'ও-কার' বসবে না।

৭। নিত্য-বর্তমান ঃ এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও-কার' যোগের দৃষ্টান্ত ঃ 'তোমরা যা করো, তা ভাল কাজ।'

৮। বতমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' বর্ণযোগের দৃষ্টান্ত ঃ 'খাও', 'গাও', 'চাও'. 'দাও', 'নাও'। (একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল। সেটা এই যে, নিত্য-বর্তমানের ক্ষেত্রেও এই সব ক্রিয়াপদ এই একই রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত . তুমি যে গান গাও, তা আমি জানি।)

৯। বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'ও-কাব' যোগেব দৃষ্টান্ত : 'মন দিয়ে কাজ করো'।

১০। ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে যেমন—'ও-কাব' বসবে, তেমনই বসবে ক্রিয়াপদেব প্রথমেও। দৃষ্টান্ত ঃ 'এখন যদি কাজটা করবাব সময় না পাও, তবে পরে কখনও কোরো।

১১। ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধেব) ক্ষেত্রে কয়েকটি ক্রিয়াপদের রূপ অবশ্য পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পালটাবে না। যথা ঃ

(ক) 'ওঠো', 'ছোটো', 'জোটো' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি 'ও-কার'যুক্ত হবে বটে, কিন্তু প্রথম বর্ণ 'ও' অথবা প্রথম বর্ণের 'ও-কার' হয়ে যাবে যথাক্রমে 'উ' অথবা 'উ-কার'। দৃষ্টান্ত ঃ 'উঠো', 'ছুটো', 'জুটো'।

(খ) 'খাওয়া', 'গাওয়া', 'চাওয়া' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি ও-কার যুক্ত হবে বটে, কিন্তু প্রথম বর্ণের 'আ-কার' হয়ে যাবে 'এ-কার'। সেইসঙ্গে লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'ও'। দৃষ্টান্তঃ 'খেয়ো', 'গেয়ো', 'চেয়ো'। ('খেও', 'গেও', কিংবা 'চেও' নয়)।

(গ) 'দেওয়া', 'নেওয়া'। নিত্য-বর্তমানে ও বর্তমানকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) ক্ষেত্রে এদের রূপ ঃ 'দাও', 'নাও'। ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞার (বা অনুরোধের) বেলায় এদের শেষ বর্ণটি 'ও-কার' যুক্ত হবে এবং প্রথম বর্ণের 'এ-কার' হয়ে যাবে 'ই-কার'। সেই সঙ্গে লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'ও'। ফলত এদের চেহারা সে সেক্ষেত্রে হবে ঃ 'দিয়ো', 'নিয়ো'। ('দিও' কিংবা 'নিও' নয়।)

(ঘ) 'লেখা', 'শেখা' ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রেও শেষ বর্ণ 'ও-কার' যুক্ত হবে, এবং প্রথম বর্ণের 'এ-কার' হয়ে যাবে 'ই-কার'। অর্থাৎ এদের চেহারা দাঁড়াবে ঃ 'লিখো', 'শিখো'।

১২। ক্রিয়াপদের অতীত-রূপে এবং (কোনও অনুজ্ঞা/অনুরোধের ব্যাপার না থাকলে) ভবিষ্যৎ-রূপে আমরা 'ও-কার' যোগ করব না। (দৃষ্টান্ত ঃ 'কোরেছিলো' কিংবা 'কোরেছিল'

কিংবা 'করেছিলো' নয়, 'করেছিল'। তেমনই, 'কোরবো' কিংবা 'কোরব' কিংবা 'করবো' নয়, 'করব'।)

১৩। 'কি ও কী' র দ্যোতনা পৃথক, প্রয়োগক্ষেত্রও পৃথক। দুই বানানই অতএব আমরা রক্ষা করব। দুই বানানের কোনটি কোথায় করণীয়, সেটা অবশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

১৪। আমরা 'কোনো' 'আরো' না লিখে 'কোনও' 'আরও' 'আজও' লিখব। সেই রকম 'এখনো' 'কখনো' 'তখনো' না লিখে 'এখনও' 'কখনও' 'তখনও' লিখব।

১৫। 'এছাড়া' 'তাছাড়া' 'তাহলে' 'যাহলে' না লিখে আলাদা করে লিখব 'এ ছাড়া' 'তা ছাড়া 'তা হলে' 'যা হলে'।

১৬। 'চলেনা'। 'বলেনা' 'চলিনা' 'বলিনা' না লিখে আলাদা করে লিখব 'চলে না 'বলে না' 'চলি না' 'বলি না'। কিন্তু

১৭। 'নাই'-এর সংক্ষেপিত রূপ 'নি' কে আলাদা করে লিখব না। তাকে জুড়ে দেব পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে। অর্থাৎ 'চলি নি' 'বলি নি' না লিখে লিখব 'চলিনি' 'বলিনি'।

১৮। আনান আনানো ; করান করানো ; বলান বলানো।

যে তিন জোড়া শব্দ এখানে দেখানো হল, তাদের প্রতিটির ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দের শেষ বর্ণে 'ও-কার' নেই, দ্বিতীয় শব্দের শেষ বর্ণে আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বানান যেমন একরকম নয়, অর্থও তেমন আলাদা। 'ও-কার'-বিহীন অবস্থায় এই শব্দগুলি (এবং এই রকম আরও অনেক শব্দ) ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; আর 'ও কার' যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ হিসাবে।

'আনান' ; 'করান' , 'বলান'। ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে 'আনিয়ে নেন', 'আনিয়েছিলেন' বা 'আনিয়ে নিন' ; 'করিয়ে নেন', 'করিযেছিলেন' বা 'করিয়ে নিন' ; এবং 'বলিয়ে নেন', 'বলিয়েছিলেন' বা 'বলিয়ে নিন'।

'আনানো' ; 'করানো' ; 'বলানো'। বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে 'আনিয়ে নেওয়া' ; 'করিয়ে নেওয়া' ; 'বলিয়ে নেওয়া'। নানা সময়ে বিশেষণ হিসাবেও এই শব্দগুলি (এবং এই রকমের আরও অনেক শব্দ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন, যথাক্রমে, এদের অর্থ দাঁড়ায় , 'আনিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন' (আনানো জিনিস) ; 'করিযে নেওয়া হয়েছে এমন' (করানো কাজ) ; 'বলিয়ে নেওয়া হয়েছে এমন' (বলানো কথা)।

সংক্ষেপে বলি, যখন ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এই ধবনের শব্দের শেষ বর্ণে তখন 'ও-কার' হয় না, কেউ তা দেনও না। কিন্তু বিশেষ্য বা বিশেষণ হিসাবে যখন ব্যবহৃত হয়, ক্রিয়াপদের সঙ্গে পার্থক্য বক্ষা করবার জন্য এই ধরনেব শব্দের শেষ বর্ণে তখন আমরা 'ও-কার' যোগ করব।

১৯। দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে ছিল ; বসেছিল, বসে ছিল ; শুয়েছিল, শুয়ে ছিল কেন যে কোথাও 'দাঁড়িয়েছিল' 'বসেছিল' 'শুয়েছিল' লেখা হয়, আবার কোথাও বা আলাদা করে লেখা হয় 'দাঁড়িয়ে ছিল' 'বসে ছিল' 'শুযে ছিল', তা বোঝা কঠিন নয়।

'দাঁড়িয়েছিল' 'বসেছিল' বা 'শুয়েছিল' লিখলে নিত্য অতীত বা সাধারণ অতীতকালের কথা বোঝানো হয় (এই শব্দ তিনটি হল ইংরেজির stood, sat ও lay)। অন্য দিকে, আলাদা

করে 'দাঁড়িয়ে ছিল' 'বসে ছিল' বা 'শুয়ে ছিল' লিখলে বোঝানো হয় ঘটমান অতীতকালের কথা [ইংরেজিতে এরা (i) was standing, had been standing, remained standing. (ii) was sitting, had been sitting, remained sitting. (iii) was lying, had been lying, remained lying.]

২০। **তাই/তা-ই ঃ** অর্থ যখন 'সুতরাং' বা 'সেই জন্য' বা 'সেই হেতু' বা 'সেই কারণে' বা 'অতএব' তখন আমরা 'তাই' লিখব। (দৃষ্টান্ত ঃ 'মেঘ নেই, তাই বৃষ্টির আশাও নেই।') অন্য দিকে, শব্দটা যখন 'তাহাই-এর সংক্ষেপিত রূপ, তখন আমরা 'তা-ই' লিখব। (দৃষ্টান্তঃ 'যা পাওয়া শক্ত, তা-ই সে চেয়ে বসে।')

২১। **কিনা/কি না ঃ**

(ক) 'কিনা' অনেক ক্ষেত্রেই কথার মাত্রা বা লব্জ (দৃষ্টান্ত ঃ 'বোঝো ব্যাপার, বামন হয়ে কিনা চাঁদ ধরতে চায় !')

(খ) 'যেহেতু' অর্থেও 'কিনা'র ব্যবহার আছে। (দৃষ্টান্ত ঃ 'তিনি কিনা বড্ডই ভালমানুষ, তাই সাতে-পাঁচে থাকেন না।')

এই দুই প্রকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা 'কিনা' লিখব।

(গ) অর্থ যখন 'কিংবা নয়', 'কিংবা না', 'কিংবা নাই', তখন বুঝতে হবে যে, 'কি' আসলে 'কিংবার' সংক্ষেপিত রূপ। (দৃষ্টান্ত ঃ 'মানুষটি ভাল কি না, তা বোঝা শক্ত।' বিশ্লিষ্ট অবস্থায় এই বাক্যের রূপ হবে ঃ মানুষটি ভাল কিংবা ভাল নয়, তা বোঝা শক্ত। 'অর্থাৎ কি না' এখানে 'কিংবা নয়'।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ 'তুমি খেয়েছ কি না, তা বলোনি।' বিশ্লিষ্ট অবস্থায় এই বাক্যের রূপ হবে ঃ 'তুমি খেয়েছ কিংবা খাওনি (খাও নাই) তা বলোনি।'

অর্থাৎ 'কি না' এখানে ('কিংবা নাই'।)

এই সব ক্ষেত্রে আমরা লিখব 'কি না'।

২২। **ডাব্‌ল প্লুরাল ঃ** কোনও কোনও ভাষায় সংখ্যা অনুযায়ী বিশেষ্যপদের বচন পালটে যায় (সেই সঙ্গে পালটায় ক্রিয়াপদও)। দৃষ্টান্ত হিসাবে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার নাম করা যেতে পারে। সংখ্যা ১ হলে প্রথমায় যা 'নরঃ' ২ হলে তা 'নরৌ', আবার ২-এর বেশি হলে তা-ই 'নরাঃ' হয়ে যায়। ইংরেজিতে দ্বিবচনের ঝামেলা নেই আছে শুধুই একবচন ও বহুবচন। সিঙ্গুলার ও প্লুরাল। সংখ্যাটা ১ হলে 'man', ১-এর বেশি হলে 'men'.

বাংলায় কিন্তু সংখ্যা যা-ই হোক, সেই অনুযায়ী বিশেষ্যপদের বচন পালটাবার দরকার হয় না। সেটা রীতিও নয়। তাই ১-এর ক্ষেত্রে যা 'মানুষ', সংখ্যাটা ১-এর বেশি হলেও তা 'মানুষ' ই থেকে যায়, 'দুটি মানুষেরা' বা 'তিনটি মানুষেরা' লিখবার দরকার হয় না বাংলা ভাষায়। এ ভাষায় যেমন 'একটি মানুষ', তেমনই 'দুটি মানুষ', 'তিনটি মানুষ' বা 'অনেক মানুষ' লেখাই রীতি।

এই রীতি মানা করা উচিত। কখনও লেখা উচিত নয় 'সংসদের বহু (বা অনেক) সদস্যরাই বিলটির বিরোধী', বা 'অন্যান্য (বা বিভিন্ন) বিষয়গুলিতে বক্তারা একমত হন', বা 'সব (বা সমস্ত) নদীগুলিতেই জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে', বা 'কতিপয় (বা কিছু/কয়েকজন/কয়েকটি) লোকেরা হাঙ্গামা বাধায়'।

২৩। এক/বেলা/খেলা/চেলা/গেছে ঃ এই পাঁচটি শব্দের (এবং এই রকম আরও অনেক তৎসম অতৎসম শব্দের) গোড়ায় রয়েছ 'অ্যা' ধ্বনি। বলা বাহুল্য, উচ্চারণ আমরা যে যা-ই করি না কেন, তৎসম শব্দের বানান পালটাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমরা 'এক' ও'বেলা'ই লিখব, মুখে যদিও বলব 'অ্যাক' ও (দিনের অংশ বোঝাতে হলে) 'ব্যালা'। 'খেলা', 'চেলা', 'গেছে', 'হেলা', 'ফেলা' ইত্যাদি বানানও এত বেশি প্রচলিত যে, এদের পরিবর্তন করা উচিত হবে না।

২৪। স্যাঁতস্যাঁত, ল্যাগব্যাগ, ক্যাঁটক্যাঁট, প্যাঁচপ্যাঁচ ঃ এই সব শব্দ (এবং এই ধরনের অন্যান্য শব্দ) থেকে যখন আমরা বিশেষণ বানাই, তখন এদের প্রথম 'অ্যা' ধ্বনির কোনও বিকাব ঘটে না, কিন্তু দ্বিতীয় 'অ্যা' ধ্বনি' 'এ' হয়ে যায় (সেই সঙ্গে শেষ বর্ণটিও হয়ে যায় 'এ-কার' যুক্ত)। অর্থাৎ আমবা লিখি ও বলি 'স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া', 'ল্যাগবেগে শরীব', 'ক্যাঁটকেঁটে রং', প্যাঁচপেচে কাদা'। বিশেষণের এই যে রূপ, এটাই আমাদের গ্রাহ্য হবে। আমরা স্যাঁতস্যাঁতে 'ল্যাগব্যাগে' 'ক্যাটক্যাটে' বা 'প্যাঁচপ্যাচে' লিখব না।

২৫। জন্য জন্যে ; দেওয়া দেয়া , নিকাশ নিকেশ ; নেওয়া নেয়া , মধ্য দিয়ে মধ্যে দিযে , সন্ধ্যে সন্ধে ; হিসাব হিসেব ;

অনেক শব্দেবই দুই রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। দুই রূপের কোনওটাই ত্যাজ্য নয়, তবে [কোথায কোন্ রূপ গ্রাহ্য, সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নিযম থাকা দরকাব। আমরা যে নিযম পালন কবব, তা এই ঃ আমরা লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার পার্থক্য মেনে চলব। প্রতিবেদনে, অন্যান্য সংবাদে, সম্পাদকীয নিবন্ধে, অন্যান্য নিবন্ধে ও আমাদেব পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে আমরা গ্রহণ করব এই সব শব্দের (ও এই ধরনের অন্যান্য শব্দের) লেখা রূপটিকেই ('জন্য', 'দেওয়া' 'নিকাশ', 'নেওয়া', 'মধ্য দিয়ে', 'সন্ধ্যা' 'হিসাব')। কথ্য রূপগুলি ('জন্যে', 'দেযা' 'নিকেশ'. 'নেযা', 'মধ্যে', 'সন্ধ্যে' 'হিসেব') একমাত্র সংলাপে কি প্রবাদবাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, অন্যত্র নয়। কারও মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে বা অংশত উদ্ধৃত করাব প্রয়োজনে যদি এই সব শব্দেব (বা এই ধবনেব অন্যান্য শব্দেব) কথ্য রূপ ব্যবহার কবতে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমবা উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার কবব।

২৬। সংস্কৃত 'ঈয' (স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈযা) প্রত্যযের বিকল্প নেই। সুতরাং যেমন 'জাতীয়' 'দেশীয' বা 'ভারতীয়' লিখি, অতৎসম শব্দেব ক্ষেত্রেও তেমনই 'ঈ-কার' চাই। (দৃষ্টান্ত ঃ 'এশীয', 'অষ্ট্রেলীয়' 'ইউরোপীয়'।)

২৭। বাংলায় অবশ্য 'ইয়া' প্রত্যয় রয়েছে। তাই স্বচ্ছন্দে আমবা 'অসমিয়া' 'ওড়িয়া' 'পাহাড়িযা' 'ভাড়াটিযা' ইত্যাদি লিখে থাকি। ভবিষ্যতেও এ সব শব্দ আমরা 'ই-কার' যোগেই লিখব, 'ঈ-কাব' ব্যবহার করব না।

২৮। প্রতিবর্ণীকরণ বা লিপ্যন্তর ঃ

(ক) বাংলা লিপিতে যখন ইংরেজি শব্দ লেখা হবে, তখন প্রতিবর্ণীকরণে আমরা মূলের উচ্চারণ যথাসম্ভব রক্ষা করতে যত্নবান হব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় (সম্ভবত ইংরেজি শব্দের কথা মনে রেখেই) বলা হয়েছিল, 'বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স sh স্থানে

শ হইবে।' 'এখানে মূল উচ্চারণ অনুসারে' বাক্যাংশটি প্রণিধানযোগ্য। কেননা, মূল উচ্চারণ অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্থানে স হয়না, শ হয় (দৃষ্টান্ত ঃ sugar, sure)। sh অবশ্য সর্বত্রই শ। আবার ss স্থানে অনেক ক্ষেত্রে স হয় বটে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে হয় না। (দৃষ্টান্তঃ pressure. এখানে ss স্থানে শ হবে।) ch নিয়েও বিভ্রম ঘটে। কেননা, ch কখনও ক (দৃষ্টান্ত ঃ chameleon, chemical), কখনও চ (দৃষ্টান্ত ঃ chance, much), কখনও শ (দৃষ্টান্ত ঃ chivalry, machine)। ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিপান্তরিত করবার সময়ে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। আমরা 'এটর্নি' 'এডভোকেট' 'এফিডেভিট' 'এভিনিউ' ইত্যাদি বানান লিখব না। শুধু তা-ই নয়, আমরা মনে রাখব যে, 'এ্যাডভোকেট' 'এ্যাটর্নি' 'এ্যাফিডেভিট' 'এ্যাভিনিউ' ইত্যাদি বানানও লেখা চলে না, কেননা 'এ' বর্ণের সঙ্গে য-ফলা আ-কার লাগানোটা নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার। বস্তুত ('অ্যা' ধ্বনির প্রতীক হিসাবে পৃথক কোনও স্বরবর্ণ এবং কার-এর ব্যবস্থা যত দিন পর্যন্ত না হচ্ছে) এই সব বিদেশি শব্দের গোড়ার দিকের 'অ্যা' ধ্বনিকে ধরবার জন্য যে 'য-ফলা' 'আ-কার' লাগানো দরকার, একমাত্র 'অ'-এর সঙ্গেই তা লাগানো সম্ভব। সুতরাং আমরা 'অ্যাটর্নি' 'অ্যাডভোকেট' 'অ্যাফিডেভিট' 'অ্যাভিনিউ' ইত্যাদি বানান লিখব।

যে-সব ইংরেজি শব্দ কিছুটা বিকৃত চেহারায় আমাদের শব্দভান্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, সেগুলিকে অবশ্য সেই চেহারাতেই রক্ষা করা ভাল। যথা—'ইঞ্চি' 'গেলাশ' 'টেবিল' ইত্যাদি।

(খ) ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যতটা যোগ-সম্পর্ক রয়েছে, অ-ভারতীয় অন্যান্য অনেক ভাষার সঙ্গেই তা নেই। (যথা-রুশ, জার্মন, ফরাসি, পোর্তুগিজ, স্পেনীয়, ইতালীয়, চিনা, জাপানি ইত্যাদি)। ফলে, বিভিন্ন দেশের স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতি এই হবে যে, ইংরেজি ভাষায় সে সব নামের উচ্চারণ আমরা পাই বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণের সময়েও সেই উচ্চারণই আমরা অনুসরণ করব।

(গ) অ-বাংলা উত্তর-ভারতীয় স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণ হওয়া উচিত নাগরি লিপিতে সে সব নাম যেভাবে লিখিত হয়, সেই অনুযায়ী। এ নীতি অনুযায়ী প্রতিবর্ণীকরণের কাজ যে এখনই সর্বত্র সম্ভব হবে, তা নয়। ব্যক্তি-নাম নিয়ে অসুবিধার আশঙ্কা নেই। তবে স্থান-নাম নিয়ে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। অন্তত সে ক্ষেত্রে তাই 'ধীরে চলো' নীতিই বাঞ্ছনীয় ; অর্থাৎ একই সঙ্গে না করে এ কাজ পর্যায়ক্রমে করা ভাল।

(ঘ) দক্ষিণ-ভারতীয় স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের প্রতিবর্ণীকরণের সময় অল্পবিস্তর অসুবিধা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ; সে ক্ষেত্রে সমস্যার নিরাকরণের জন্য দক্ষিণ-ভারতীয় সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ সঙ্গত হবে।

২৯। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নানা আরবি ও ফারসি শব্দের বানানে কোথাও আমরা 'শ' ব্যবহার করি, কোথাও 'স'। এই দুটি উষ্ম বর্ণের কোনটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত, তা নির্ণয় করবার ব্যাপারে আমরা নির্ভরযোগ্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করব।

৩০। 'ঙ' ও 'ং' ঃ অনেকে দার্জিলিঙ' লেখেন, 'কালিম্পঙ' লেখেন। 'দার্জিলিং' ও 'কালিম্পং' লেখেন না। যুক্তি এই হতে পারে যে, 'দার্জিলিংয়ের' ও 'কালিম্পংয়ের' তুলনায়

'দার্জিলিঙের' ও 'কালিম্পঙের' লিখতে জায়গা লাগে কম। কিন্তু তা হলে তাঁর 'ঘিসিং' ও 'ক্যানিং' লেখেন কেন? সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি-যোগের দরকার তো হয় এদের (এবং এই ধরনের আরও নানা শব্দের) ক্ষেত্রেও। তখন কেন জায়গার প্রশ্ন ওঠে না? অন্য দিকে বিবেচ্য, 'দার্জিলিং' ও 'কালিম্পং' লিখলেই যে ষষ্ঠী বিভক্তি-যোগে 'দার্জিলিঙের' ও 'কালিম্পঙের' লেখা যাবে না, তাও নয়। বস্তুত, আমরা 'রঙ' 'ঢঙ' বা 'ব্যাঙ' না লিখে 'রং' 'ঢং' বা 'ব্যাং' তো লিখতেই পারি, এবং লিখেও থাকি। সে ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করলে লিখি 'রঙের' 'ঢঙের' 'ব্যাঙের'।

অনুস্বরের অসুবিধা এই যে, তাতে 'কার' যোগ করা যায় না। 'ঙ' বর্ণে সে ক্ষেত্রে অনায়াসেই 'কার' যোগ করতে পারি। (দৃষ্টান্ত ঃ 'বাঙালা', 'রঙিন', 'আঙুল'।) মনে হয়, অতৎসম বিশেষ্যপদে যথাসম্ভব ঙ স্থলে ং লেখাই বাঞ্ছনীয়। বিভক্তির প্রয়োজনে 'কার' যোগ করলে হলে আমরা ং স্থানে ঙ বসাব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার (তৃতীয় সংস্করণে) বাংলা বানানে সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, 'আনন্দবাজার বানান-বিধিতে' প্রায় তারই অনুসরণ রয়েছে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এই ব্যতিক্রমী বিধিগুলি বানানের সমতাবিধানে ও সরলতা সম্পাদনে কতটা সহায়ক হবে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আনন্দবাজার পত্রিকা যে বানান-বিধি অনুসরণের পক্ষপাতী তাতে উচ্চারণকে অনেকটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো পরিবর্তনই বৈপ্লবিক নয়।যেমন—'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা এবং বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে 'ঈ-কার' ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আনন্দবাজার-বানানবিধিতে মূলত বানানে সর্বক্ষেত্রে একরূপতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ সকল ক্ষেত্রে ই-কার প্রয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ প্রস্তাবটি আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান সংস্কার সমিতির হ্রস্ব-দীর্ঘ সংক্রান্ত সূত্রটির বিরোধিতা করে বাংলা শব্দে সর্বত্র ই বা উ লেখার প্রস্তাব করেছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মুহম্মদ আবদুল হাই—উভয়েই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। আধুনিক কালেও ই-বা -নি প্রত্যয়ের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। সুতরাং মনে হয় স্ত্রীলিঙ্গ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই বা উ চালু হলে প্রথমে চক্ষুপীড়াদায়ক হলেও বা অভ্যস্ত সংস্কারে ঘা লাগলেও ক্রমশ তা সয়ে যাবে। তাছাড়া ঝি, দিদি, ইংরেজি ইত্যাদি লিখতে যদি আপত্তি না থাকে তবে ঐ সকল বানান লিখলেও আপত্তি উঠবে না।

তবে ক্রিয়াপদের চলিত রূপের ক্ষেত্রে আনন্দবাজাব যে বানান প্রস্তাব করেছেন, তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দবাজার-বানানবিধিতে (৬, ৭, ৮, ৯, ১০) মধম পুরুষের নিত্য বর্তমানে এবং বর্তমান অনুজ্ঞা পদের অন্তে অ-কারের পরিবর্তে ও-কার ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় পদের আদিতেও ও-কার লেখার প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু অন্যত্র অ-কারান্ত ই থাকছে। যেমন—করো কিন্তু করেছিল। যেহেতু অনুজ্ঞা নয়, সেইহেতু ও-কারান্ত উচ্চারণ হলেও অ-কারই লেখা হচ্ছে। এই বৈষম্য প্রথম শিক্ষার্থীর বানানশিক্ষায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে যদি তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞায় (যেক্ষেত্রে হসন্ত উচ্চারণ হচ্ছে) হসন্ত দেওয়ার নিয়ম করা যায় এবং অন্য সব ক্ষেত্রে তা অনুজ্ঞা হোক, বা না হোক

অ-কারান্ত লেখা হয় (যেমন ঃ কর, লেখ, করেছিল, করব ইত্যাদি) তবে একরূপতা অনেকটাই রক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে কেবলমাত্র ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে সকল ধাতুর রূপের মধ্যে একরূপতা রক্ষার স্বার্থে। যেমন—খেয়ো, গেয়ো, চেয়ো, করো, লিখো ইত্যাদি। ভবিষ্যৎকালে পালনীয় অনুজ্ঞায় আদি ও-কার ঊর্ধ্বকমা (') দ্বারা বোঝানো হতে পরে।

আনন্দবাজার-বানানবিধিতে প্রতিবর্ণীকরণ (২৮ নং) প্রসঙ্গে) ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিপ্যন্তরিত করবার সময় বক্র এ-কার বোঝাতে 'এ্যা' না লিখে 'অ্যা' লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন—'অ্যাটর্নি', 'অ্যাডভোকেট' ইত্যাদি। কারণ তাদের অভিমত 'এ' বর্ণের সঙ্গে 'য-ফলা' আ-কার' লাগানো নিয়মবিরুদ্ধ। এ মত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। বরং আমাদের মনে হয 'এ্যা' লেখাই অধিকতর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। কারণ অ'-ধ্বনি অপেক্ষা, এ ধ্বনির সঙ্গে এ্যা ধ্বনির সম্পর্ক নিকট। কাজেই এ ধ্বনির কাছাকাছি ধ্বনিকে এ বর্ণের ঈষৎ রূপান্তর এ্যা-বর্ণ দিয়ে দেখানোই সংগত। তাছাড়া উভয়েই সম্মুখ তালব্য স্বর। পক্ষান্তরে অ ধ্বনি হল পশ্চাৎ কণ্ঠ্যস্বর। সুতরাং এ্যা লেখাই অধিকতর যুক্তিসংগত। ভাষাতাত্ত্বিক ড. পরেশ চন্দ্র মজুমদারও একই যুক্তিতে এ্যা লেখার পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে-এ-কার বোঝাতে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) লেখার প্রস্তাব করেছিলেন।

এ ধরনের কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া—আনন্দবাজার-বানানবিধির অন্যান্য প্রস্তাব-গুলির প্রায়োগিক উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

৩০। **বানান বানানোর বন্দরে। ড. ক্ষুদিরাম দাস।**

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে ড. ক্ষুদিরাম দাসের 'বানান বানানোর বন্দরে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগে লেখক বানান-বিষয়ক চারটি পুস্তিকা পড়েন। এগুলি হল ঃ (১) বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানান সংস্কার-একটি ভিত্তিপত্র'। (২) সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম'। (৩) আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত—'বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন'। (৪) শিশুসাহিত্য-সংসদ থেকে প্রকাশিত—'হাসতে হাসতে বানান'। লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন 'এ বইগুলির ঠিক কোন সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে নয়, যুক্তিবিচারের পথ ধ'রে প্রদত্ত দফা অনুযায়ী আমাদের মতামত জানাব মাত্র।" এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নয় বললেও, লেখক ঐ সকল পুস্তিকার সকল প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি। বিভিন্ন প্রস্তাবের অসংগতির দিকগুলি দেখিয়ে বানান সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

ইদানীংকালে যাঁরা বানান সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে ক্ষুদিরামবাবুর প্রধান অভিযোগই হল, তাঁরা অ-তৎসম শব্দের বানানের সরলীকরণের প্রস্তাব রাখছেন, কিন্তু পাশাপাশি তৎসম শব্দের 'দুরূহ দুষ্পাচ্য' বানানগুলি অপরিবর্তিত থাকছে। তাঁর মতে 'বানান-পন্থীদের এরকম দ্বিচারীতা হাস্যকরই বটে।' সরলীকরণের নীতিটি সব ধরনের বানানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। যেমন—অধিকাংশ বানান-সংস্কারকই অর্ধতৎসম বা তদ্ভব শব্দের বানানের ঈ-উ তুলে দিতে চান। কারণ এগুলি বাংলা উচ্চারণে আসে না। কিন্তু ক্ষুদিরামবাবুর মতে, "গা-ঘেঁসে-চলা তৎসম শব্দগুলোর তো তাহলে অনুরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন, নইলে এর ঈ ওর ই-কে আক্রমণ করবে, আর ওর ই এর ঈ-কে শায়েস্তা

করবে যে।" লেখকের প্রস্তাবগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি উচ্চারণভিত্তিক বানান লেখার পক্ষপাতী নন। সাম্প্রতিক বানান-সংস্কার-বিষয়ক দফাগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

সংস্কৃত শব্দের বানানের ক্ষেত্রে যেখানে বিকল্পে ই-ঈ বা উ-ঊ রয়েছে সেখানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত বীতির বিপর্যয় না ঘটিয়ে ই বা ঈ লেখার পক্ষপাতী। একই যুক্তির ভিত্তিতে তিনি উ বা ঊ লিখতে চান। অর্থাৎ অটবী, রজনী, শ্রেণী, সূচী, পল্লী প্রভৃতি শব্দে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত রীতির বিপর্যয় না ঘটিয়ে ঈ রাখার পক্ষপাতী। বানানে ং রাখা হবে, না ঙ দিয়ে লেখা হবে এ নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। লেখক প্রথমে সর্বত্র ঙ লেখার কথা বলেছেন। কিন্তু পরে সংসার সংশয় এবং কিংবা প্রভৃতি বানানের কথা চিন্তা করে ং কে পুরোপুরি বর্জন করা যাবে না বলে মনে করেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন সকলে মিলে সাহস করে ঙ চালালে পরে তা অভ্যস্ত হয়ে যেতেও পারে। কেবলমাত্র ঙ বা ং-এর বর্ণসংকেতের স্থানে হিন্দী থেকে উর্ধ্ববিন্দু গ্রহণের প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেন। বিসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক-সরলীকরণেরই পক্ষপাতী। অর্থাৎ আপাতত ক্রমশ, প্রায়শ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ বর্জন করতে চান। কেবল ছন্দবোধ বা ছন্দলিপি নয়, উচ্চৈস্বরে, মনপ্রাণ, বয়ক্রম ইত্যাদি বানান লেখাতেও তাঁর আপত্তি নেই। মনোযোগ, মনোনিবেশ ইত্যাদি বানানের প্রথম ও-কারটা সরিয়ে দেবার পক্ষপাতী। পরিশেষে বিসর্গ বা বিসর্গ-জনিত রূপান্তর ব্যবহারের ক্ষেত্রটা যেহেতু বিচিত্র সেই কারণে সংস্কারকদের কাছে তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রচারের প্রস্তাব রেখেছেন। শব্দান্তে ও শব্দমধ্যে প্রযুক্ত হস্-চিহ্ন সম্বন্ধে বানান সমিতি যে প্রস্তাব রেখেছেন তিনি তার সঙ্গে একমত। তবে সমাসগত সন্ধিতে দিক্, বাক্, প্রাক্ শব্দের ক্ স্থানে গ্ লিখন রোধ করে দিক্দিগন্ত, বাক্ধারা, প্রাক্বঙ্কিম ইত্যাদি বানান চালু করতে চান। তিনি মনে করেন 'সন্ধির ক্ষেত্রে বাঙলার স্বচ্ছন্দতার মানদণ্ডেই এগুলি সিদ্ধ হবে।' ইন্-ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্রেও তিনি 'প্রতিযোগীতা', 'মনস্বীতা', 'বিরোধীতা' ইত্যাদি বানান লেখার পক্ষে। এমনকি কর্তাকারক যোদ্ধাবৃন্দ ইত্যাদি শব্দ চালু করার সাহসিকতা কামনা করেছেন।

সংস্কৃতজ শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও লেখক তাঁর মতামত জানিয়েছেন। যেমন, 'অ' এবং 'ও' সংক্রান্ত বিধি। এখানে কালানুক্রমিক ভিত্তিতে তিনি সংস্কৃতজ শব্দে আদিস্থিত বানান ও উচ্চাবণে অ হরফ এবং ও ধ্বনির অবস্থানগত বৈষম্যের সমস্যাটি চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বানান কমিটি, আনন্দবাজার এবং বাংলা আকাদেমির কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। এছাড়া রবীন্দ্র-প্রদর্শিত বানানবিধিও তিনি বিবেচনা করেছেন। কিন্তু কোনো সুপারিশই তাঁর কাছে ত্রুটিমুক্ত মনে হয় নি। এক্ষেত্রে তিনি সংস্কারের পরিবর্তে প্রচলনের পক্ষপাতী।

সংস্কৃতজ শব্দের বানানে ই-ঈ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষুদিরামবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ রাখতে চান। ঐ - ঔ এর পৃথক কারচিহ্ন দুটি না রেখে অনেকেই অই, অউ দিয়ে কাজ চালাতে চান। লেখকও এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। এ এবং এ্যা সম্পর্কে লেখকের অভিমত বক্র এ-টা বাংলা বর্ণমালায় এ্যা রূপে থাকা উচিত, অ্যা নয়। ণ - ন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে যে নিয়ম নির্ধারণ করে গেছেন ক্ষুদিরামবাবু

তার সঙ্গে একমত। ত ও ৎ প্রসঙ্গে লেখক ৎ এর পরিবর্তে 'ত্' লেখার পক্ষপাতী নন। কাবণ তিনি মনে করেন সংস্কৃতের তৎপর উৎপাত শীৎকার ইত্যাদি বানান আমাদের স্মৃতিতে এতটাই বসে গেছে যে পরিবর্তন সম্ভব কিনা তাতে সংশয় রয়েছে। শ, ষ, স সম্বন্ধে ক্ষুদিবামবাবুর অভিমত 'মহাজনেরা যে পথে গেছেন তাই অবলম্বনীয়।' য ও জ-এর ক্ষেত্রেও আচার্যরা যা বলে গেছেন এবং সংস্কারকেরা যার অনুসরণ করেছেন তার সঙ্গে তাঁর দ্বিমত নেই। তিনি ঊর্ধ্বকমা বর্জনের পক্ষপাতী নন। বলে এবং ব'লে ধরে এবং ধ'রে, করে এবং ক'রে প্রভৃতিতে পার্থক্য রাখার জন্যই ঊর্ধ্বকমার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

বিদেশি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ সংরক্ষণপূর্বক অনুলিখন সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে "বাঙলার সহজ প্রকৃতি রক্ষাপূর্বক কাছাকাছি এনে নেওয়াই সমীচীন পন্থা .....।"

তাঁর বক্তব্যের সারকথাই হল বাংলাভাষায় যেহেতু তৎসমের সঙ্গে অর্ধতৎসম ও তদ্ভবের মিশ্রণ রয়েছে সেহেতু এক পক্ষের বানান পরিবর্তন করব, অন্য পক্ষের অপরিবর্তিত থাকবে-- এ নীতি থাকা উচিত নয়।

তাঁর সুপারিশগুলি হযত বর্তমানেব পবিপ্রেক্ষিতে এখনই গ্রহণ বা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না, তবে তাঁর প্রস্তারেব মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আছে তা অস্বীকার কবার উপায় নেই। তাঁর প্রস্তাবসমূহের অনেকগুলি হযতো কালক্রমে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

৩১। **বানানের অভিধান ঃ অরুণ সেন**

ডিসেম্বব, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অরুণ সেন 'বানানেব অভিধান' প্রকাশ করেন। বানান নিযে যখন নৈবাজ্য চলছে, তখন অরুণ সেন মহাশয়ের এই গ্রন্থেব গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ একই শব্দেব ভিন্ন ভিন্ন বানান মানুষকে সর্বদাই বিভ্রান্ত কবে। কোন্‌টা ঠিক এই সংশয় নিবসনের জন্য একটি বানান অভিধানেব প্রযোজনীযতা সকলেই অনুভব করেছেন। অরুণ সেন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কবেছেন।

তাঁব কাজের মূল উদ্দেশ্যই হল, বাংলা বানানকে বিকল্পহীনভাবে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। লেখক বুঝেছেন উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তির উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে বাংলা বানানে। বাংলা বানানের নিয়মের সামগ্রিক কাঠামোটিও গড়ে উঠতে পারে এইভাবেই কয়েকটি স্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে। এর ফলে কিছু অসুবিধা ঘটলেও এছাড়া পথ নেই। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকটি স্তরে নিয়মের যুক্তি বা পরম্পরা আছে কিনা এবং সব মিলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তবের যুক্তিগুলিকে একটি বহুস্তরিক বহুমাত্রিক কিন্তু সমন্বিত যুক্তিকাঠামোয় দাঁড় করানো সম্ভব কিনা। অর্থাৎ বিরোধের ক্ষেত্র যতদূর কমানো যায়। এই অভিধানের বানান নির্ধাবণের ক্ষেত্রে লেখক কোন্ সূত্রাবলি অবলম্বন করেছেন তা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব ঃ

তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান অপরিবর্তিতই রেখেছেন। তবে যেখানে অভিধানে বিকল্পের নির্দেশ রয়েছে সেখানে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনেছেন ঃ

আ > অ, ঈ > ই, ঊ > উ, ক্ষ > খ, ঙ্গ > ঙ, ড় > র, ণ > ন, ৎ > ত, ষ > স/শ, স > শ, বেশি বর্ণ > কম বর্ণ (জ্জ্ব > জ্জ) ইত্যাদি।

কোনো কোনো শব্দে প্রচলনের কারণে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। যেমন ঃ রজনী, অবনী, বিড়াল।

ং এবং ঙ

পরপদে যদি ক, খ, গ, ঘ থাকে এবং পূর্বপদে ম্ থাকে তবে সংস্কৃত সন্ধিতে ং এবং ঙ দুটোই হয়। তৎসম শব্দে সেক্ষত্রে শুধু ং ব্যবহৃত হবে। যেমন সংগীত। যেখানে সন্ধিতে ং সিদ্ধ নয়, সেখানে ঙ / ঙ্ হবে। যেমন ঃ অঙ্ক। প্রচলনের কারণে কয়েকটি ব্যতিক্রম মানা হল। যেমন, শঙ্খ, পতঙ্গ। পরপদে ক বর্গ ছাড়া অন্যান্য স্পর্শ বর্ণ থাকলে সেখানে ং হবে না, ম বা সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হবে। যেমন সম্ভাব।

ংব এবং ম্ব

তৎসম শব্দে যেখানে ম + অন্তঃস্থ ব আছে সেখানে ং ব হবে। যেমন ঃ অসংবৃত। যেখানে ম + বর্গীয় ব আছে, সেখানে শুধুই ম্ব ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ সম্বোধন।

বিসর্গ

তৎসম শব্দে অন্তের বিসর্গ লোপ পাবে। যেমন, প্রধানত। সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বের শব্দ বিসর্গযুক্ত তৎসম হলে সেখানে বিসর্গ সন্ধির নিয়ম কার্যকর হবে। যেমন ঃ ছন্দোমুক্তি।

যেখানে বিকল্পে মধ্যস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়, সেখানে তাকেই মান্য করা হবে। যেমনঃ দুস্থ।

য - ফলা

যেখানে য ফলা যুক্ত ও য ফলা বিযুক্ত উভয় শব্দই শুদ্ধ, সেখানে য ফলা যুক্ত শব্দই ব্যবহৃত হবে। যেমন, বৈশিষ্ট্য, মর্ত্য। প্রচলনের কারণে ব্যতিক্রম উপলক্ষ।

হসন্ত

মূলে থাকলেও অধিকাংশ তৎসম শব্দে হসন্ত বর্জিত হবে। তবে সমাসে পূর্বের পদ হস যুক্ত হলে সেখানে সন্ধির নিয়ম কার্যকর হবে। যেমন, পৃথগন্ন, দিগ্দর্শন।

তবে যেখানে বাংলায় গৃহীত দুটি স্বতন্ত্র তৎসম শব্দের সমাস ঘটেছে, সেখানে ওপরের নিয়ম কার্যকর হবে না। যেমন, বাক্ প্রতিমা > বাকপ্রতিমা।

দ্বিত্ব বর্জন

রেফের পর দ্বিত্ব বর্জিত হবে। যেমন ঃ অনুর্বর।

ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ

ইন্ প্রত্যযান্ত শব্দ সাধারণত ঈ কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন সহযোগী, দীর্ঘজীবী। তবে ইন্ প্রত্যযান্ত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দ যুক্ত হলে ইন্ প্রত্যযযুক্ত শব্দ ঈ-কার দিয়েই লেখা হবে। যেমন, প্রার্থীপদ।

ই - প্রত্যযযুক্ত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত বিভক্তি বা প্রত্যয যুক্ত হলে তখন ই-কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন, সহযোগিতা।

তৎসম শব্দ + অ - তৎসম প্রত্যয়

তৎসম শব্দের সঙ্গে অ - তৎসম প্রত্যয় যুক্ত হলে মূল তৎসম শব্দের প্রত্যয়যুক্ত বানানই থাকবে। যেমন ঃ স্বদেশীয়ানা, অংশীদার।

যুক্তবর্ণ

কিছু কিছু যুক্তবর্ণ বিযুক্ত করলে লেখার সুবিধা হবে। যেমন ঃ দ্গ > দ্‌গ, দ্ঘ > দ্‌ঘ, দ্গ্রী > দ্‌গ্রী, দ্ভ্র > দ্‌ভ্র, প্প > প্‌প, ল্গ > ল্‌গ, ল্ল > ল্‌ল।

তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলনের কারণে যুক্তব্যঞ্জন থাকবে। যেমন ঃ উদ্বেগ, তদ্ভব। দ ও য ফলার সংযোগে উচ্চারণ অনুসারে ভাঙা হবে। যেমন ঃ উদ্‌যাপন, কিন্তু উদ্যোগ।

আর্ষ প্রয়োগ

ব্যাকরণগত দিক থেকে ভুল হলেও মনীষীদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ ইতিমধ্যে, উপরোক্ত।

অশুদ্ধ বর্জন

বহুল প্রচলিত হলেও ভুল শব্দকে বর্জন করতে হবে। যেমন ঃ অন্তর্ভূক্ত - অন্তর্ভুক্ত।

তদ্ভব ও দেশী শব্দ ঃ

শুধু ই বা উ ঃ সাধারণত সর্বত্র ই /ই-কার অথবা উ /উ-কার হবে। অল্পকয়েকটি ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য বোঝাতে ঈ-কাব ব্যবহৃত হতে পাবে যেমন ঃ প্রশ্নসূচক অব্যয় বোঝাতে কি এবং প্রশ্নসূচক সর্বনাম বোঝাতে কী।

প্রচলনের কারণে কীনা-কিনা, নাকী-নাকি। কোনো কোনো শব্দে অধিক প্রচলেনর কারণে বা তৎসম শব্দেব প্রভাবে ঈ/ঈ কার হবে যেমন ঃ মরমী, নামী।

স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ঈ-কার হবে। তবে কয়েকটি ব্যতিক্রম হল দিদি, ঝি, বিবি।

ঐ এবং উ ঃ এক্ষেত্রে ঐ বা ঐ-কারের বদলে ওই বা অই এবং ঔ এবং ঔ-কারের বদলে অউ ব্যবহারের প্রস্তাবকে মেনেছেন। যেমন ঃ কই, দই। তবে ব্যতিক্রম তৈরি, দৌড়।

অ্যা ঃ অ্যা উচ্চারণ বোঝাতে অ্যা -ই ব্যবহৃত হবে, ে, া নয়। যেমন ঃ প্যাঁচা, ব্যাবসা ইত্যাদি। প্রচলনের কারণে কোনো কোনো ক্রিয়াপদে বা অন্যত্র ব্যতিক্রম আছে। যেমন ঃ গেল, ঘেঁষা ইত্যাদি।

কোথায় ও-কার থাকবে ঃ তো, হয়তো, নয়তো, মতো —এই কটি শব্দে ; সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে, বিশেষ্য, বিশেষণ-জ্ঞাপক শব্দে, এবং ক্রিয়াশব্দের মাঝখানে যেখানে ও উচ্চারণ হয় সেখানে ; এছাড়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণ শব্দে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার থাকবে।

কোথায় ও-কার থাকবে না ঃ এত, তত, যত, কত, অত, বড, ছোট, যেন, কেন-এ কটি শব্দে. শব্দান্তে বা যুক্তবর্ণ থাকলে (দহ, মস্ত), এছাড়া বিভিন্ন ক্রিয়াপদে যেমন ঃ নিত্যবৃত্ত, ঘটমান, পুরাঘটিত বর্তমানের মধ্যম পুরুষে, সাধারণ নিত্যবৃত্ত, ঘটমান, পুরাঘটিত অতীতের প্রথম পুরুষে এবং সাধারণ ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষে ও-কার থাকবে না।

শব্দের সঙ্গে সংলগ্ন ই বা ও ঃ শব্দেব সঙ্গে সংলগ্ন 'ও' সংযুক্ত বর্ণ হিসাবেই ব্যবহৃত হবে। যেমন কোনও কোনো, শব্দেব সঙ্গে সংলগ্ন ই পৃথক বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন আজি-আজই।

চন্দ্রবিন্দু ঃ চন্দ্রবিন্দুব ব্যবহাব যেখানে স্পষ্ট সেখানে ব্যবহৃত হবে। যেখানে ইচ্ছাধীন সেখানে হবে না। যেমন ঃ চিঁডে, ফাঁকি, কিন্তু খোপা, টেকসই।

ক্ষ এবং খ ঃ ক্ষ-এব পবিবর্তে খ ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ ক্ষেত - খেত, ক্ষিদে - খিদে।

ঙ্গ বা ঙ্গা এবং ঙ ঃ ঙ্গ স্থানে উচ্চাবণসিদ্ধ হলে ঙ হবে। যেমন ঃ ভাঙ্গা - ভাঙা।

ঙ্গ - ঙ - ং ঃ ঙ হসন্ত ধ্বনি হলে ং হবে। যথা ঃ বং, আংটি। কিন্তু বঙেব। প্রচলনেব কাবণে অনেক স্থানে ং নয, ঙ বসে। যেমন ঃ দাংগা > দাঙ্গা, পালংক > পালঙ্ক।

বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ বিভিন্ন বিকল্প বর্জন কবে নিম্নলিখিত বানান গৃহীত হবে ঃ ড > ব, ঢ > ড, ণ > ন, ধ্ব > ধ, য ফলা যুক্ত বর্ণ > য ফলা হীন বর্ণ। যেমন ঃ ওঢনা > ওডনা, ধ্বস > ধস ইত্যাদি।

ত এবং ৎ ঃ ৎ এব পবিবর্তে ত বসবে। যেমন ঃ কাৎলা > কাতলা, কাৎ > কাত। প্রচলনেব কাবণে ব্যতিক্রমও বযেছে। যেমন ঃ গত > গৎ, গণতকাব > গণৎকাব।

জ, য ঃ সাধাবণত জ-ই ব্যবহৃত হবে। তবে প্রচলনেব কাবণে কোথাও য হবে। যেমনঃ যুঁই > জুঁই, কায > কাজ। কিন্তু যিনি, যখন, যত।

শ, ষ, স ঃ সাধাবণত উচ্চাবণানুসাবে শ-ই ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ জিনিশ খোলশ। কখনো মূলেব অনুসাবী বানান হবে। যেমন ঃ ষণ্ড > ষাঁড, ভস্ম > ভুসো। কখনো প্রচলনকে মেনে নিতে হবে। যেমন ঃ সাধ < শ্রদ্ধা।

হসন্ত ঃ সাধাবণত উচ্চাবণে থাকলেও হস চিহ্ন দেওযা হবে না। যেমন ঃ টাটকা, শনশন ইত্যাদি। কখনো ব্যতিক্রম হিসাবে, উচ্চাবণেব বা অর্থ বোঝাব জন্য বা তুচ্ছার্থক ক্রিযায হস বসবে। যেমন ঃ পালটি খেলখতম, বলেছিস ইত্যাদি।

ঊর্ধ্বকমাব বিসর্জন ঃ সাধাবণত উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাডা বাংলায ঊর্ধ্বকমাব প্রযোজন নেই।

দ্বিত্ব বর্জন ঃ সাধাবণত বেফেব পব দ্বিত্ব বর্জিত হবে।

তৎসম থেকে তদ্ভব ঃ কোনো কোনো তৎসম শব্দ খাঁটি বাংলা হিসাবে প্রচলিত হযেছে। সেখানে সেই বানানই গৃহীত হবে। যথা, দাঢা > দাডা। তদ্ভব শব্দে সংস্কৃত বানান কোথাও অংশত প্রচলিত হযে গেছে। সেক্ষেত্রে তাই গৃহীত হবে। জালানি > জ্বালানি, বীন > বীণ।

যুক্তবর্ণ ও যুক্তাক্ষব ঃ সাধাবণভাবে যুক্তবর্ণকে ভেঙে লেখা হবে। যেমন উলটো, হালকা। কোথাও প্রচলনেব খাতিবে যুক্তবর্ণ বক্ষিত হবে। যেমন ঃ কক্ষনো, খদ্দব, বর্শা ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দ ও প্রতিবর্ণীকরণ ঃ

উচ্চাবণেব ও লেখাব স্বাভাবিক প্রবণতা ঃ মূল ভাষাব উচ্চাবণকে অনুসবণ কবাব চেষ্টা থাকলেও তা নিযে বেশি মাথা না ঘামিযে বাংলা ভাষাব উচ্চাবণেব স্বাভাবিক ধবনকে অবলম্বন কবাই লক্ষ্য হবে। যেমন ঃ ইনকম্ > ইনকাম্, গুনাহ > গুনাহ।

অ্যা ঃ উচ্চারণ অনুসারে শব্দের আদিতে অ্যা এবং অন্যত্র ্যা-কার বসবে। যেমন ঃ অ্যাসিড, ব্যাপার।

হ্রস্ব স্বর ঃ শুধুই ই এবং উ ঃ বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের সর্বত্র হ্রস্ব স্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ আলমারি, মসনদি।

স্ত্রীলিঙ্গ ঃ শুধু স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার হবে। যেমন, নবাবজাদী, নাচওয়ালী।

ঐ এবং ঔ ঃ ঐ এবং ঔ-এর বদলে যথাক্রমে 'অই' এবং 'অউ', বসবে। যেমন ঃ পৈছা > পইছা। পছন্দসৈ > পছন্দসই।

ও এবং ও-কার ঃ উচ্চারণে ও বা ও-কার থাকলে তা অবশ্যই বানানে বসবে। যেমন ঃ পেট্রোল, গোমস্তা। তবে কোথাও কোথাও প্রচলন মানতে হবে। যেমন, অজুহাত, মকুব।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ নিম্নলিখিত বর্ণগুলির গ্রহণবর্জন এইভাবে ঘটবে। অপ্রয়োজনীয় হলে বিসর্গ-যুক্ত শব্দের বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দের চন্দ্রবিন্দু বাদ দিতে হবে। যেমন ঃ মফঃস্বল, মফস্বল ; খোঁয়ার, খোয়ার।

ঙ্গ > ঙ। যথা—চাঙ্গড় > চাঙড়। ঙ-ং, যথা—জঙ্গল > জংগল।

ড় > র। যথা—জবড়জং > জবরজং। ণ ন, যথা- -পিরণ > পিরন।

য > জ। যথা—-যাদু > জাদু। খৃ > খ্রি। যথা—খৃষ্ট > খ্রিষ্ট।

রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন। যথা—গির্জ্জা > গির্জা।

হসন্ত ঃ উচ্চারণের গোলমাল এড়াতে এবং প্রচলন অনুসারে কোনো কোনো জায়গায় হস্ - চিহ্ন বসবে। যেমন ঃ আলবাৎ, খাক্, খুশ্ মেজাজ। অন্যত্র হস্ বসবে না। যেমন, ইজ্জত, মতলব।

শ, ষ, স ঃ বিদেশী শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হলে যেভাবে উচ্চারিত হয়, তাকেই অনুসরণ করতে হবে; যথা— গেলাশ, বকলশ, গোসল। যেখানে উচ্চারণ অনিশ্চিত এবং মূল উচ্চারণ অজ্ঞাত সেখানে শ হবে। যথা—-আশরফি, গদাইলশকরি। এখানেও ব্যাপক প্রচলনকে মান্য করতে হবে। যেমন ঃ আসমান, খাসা, তোষামোদ।

বিদেশী শব্দ তৎসম প্রত্যয় ঃ এক্ষেত্রে তৎসম প্রত্যয়ের রূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যথা— ইওরোপীয়, ফ্রয়েডীয়।

যুক্তবর্ণ ঃ সাধারণভাবে সম্ভব হলেই বিশ্লিষ্ট হবে। যথা, অক্‌সিজেন, কালেক্‌টর। প্রচলনের কারণে কখনো সংশ্লিষ্ট থাকবে। যথা, খাস্তা, সার্কাস, সর্দার।

Z এবং জ ঃ Z বোঝাতে জ লেখা হবে, শ বা স নয়। যথা, এক্‌জামিনার, ফ্যাসিজম্।

ব্যতিক্রম ঃ বিদেশী শব্দে প্রচলনের কারণে কিছু ব্যতিক্রম ঘটবে। যথা, ঈদ, দরদী, যিশু।

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব বানানই মেনে চলতে হবে। যথা, গান্ধি > গান্ধী, এ.বি.কোম্পানী।

উপরিউক্ত সূত্রাবলির ভিত্তিতে অরুণ সেন তাঁর বানানের অভিধান রচনা করেছেন। তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কারণ প্রতিটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। লেখক বুঝেছিলেন, প্রচলনকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে কোনো নিয়ম প্রতিষ্ঠা করলে তা গৃহীত হবে না। তাই প্রচলনকে

মান্য কবেই বহু ব্যতিক্রম বেখেছেন। তাঁব কোনো প্রস্তাবই অতিবৈপ্লবিক নয়। তবে কযেকটি ক্ষেত্রকে আবো সবল কবা যেতে পাবে। যেমন ঃ তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে ঈ-কাব পবিবর্তে ই-কাব চালু হলে বানান অপেক্ষাকৃত সবল হবে। তাছাড়া দিদি, পিসি, মাসি ইত্যাদি বানান যখন চালু হযেই গেছে, তখন অন্যান্য স্ত্রীবাচক শব্দগুলিও ই-কাব দিযে লেখলে একরূপতা থাকবে। অ্যা উচ্চাবণ বোঝাতে তদ্ভব শব্দে তিনি প্রচলনেব কাবণে যে ব্যতিক্রম বেখেছেন তাব বিশেষ প্রযোজন আছে বলে মনে হয না। 'গেল' বানানটি গ্যাল হিসাবে লেখা যেতেই পাবে। ত এবং ৎ প্রসঙ্গে যে ব্যতিক্রমগুলি লেখক মেনেছেন সেগুলিবও বিশেষ যুক্তি নেই। গত, গণতকাব বানান চালু হলে প্রচলনকে খুব বেশি আঘাত কববে না। তৎসম শব্দে 'যুক্তবর্ণ' প্রসঙ্গে লেখক যখন অতগুলি যুক্তব্যঞ্জন ভাঙলেন তখন 'উদ্বেগ' এবং 'তদ্ভব' বানানটিও উদ্‌বেগ বা তদভব রূপে লেখা যায। তদ্ভব ও দেশি শব্দে 'হসন্ত' প্রসঙ্গে লেখক তুচ্ছার্থক ক্রিযায হস্‌ চিহ্ন বসাতে চান। কিন্তু বলেছিস কবিস ইত্যাদি শব্দে হস চিহ্ন দেওযা নিবর্থক। এগুলিব স্ববান্ত উচ্চাবণেব কোনো সুযোগই নেই। এবকম কযেকটি ক্ষেত্র ছাড়া অরুণবাবুব বিবেচনা প্রশংসাব যোগ্য।

ওপার বাংলার বানান-চিন্তা

শিবোনামেব 'ওপাব বাংলা' শব্দগুচ্ছ দিযে দেশবিভাগোত্তব বাংলা ভাষী বৈদেশিব ভূখন্ডকে বোঝানো হযেছে। এই ভূখন্ড ঐতিহাসিকভাবে দুই পর্যাযেব বাষ্ট্রব্যবস্থাব অধীন হয। প্রথম পর্যায (১৯৪৭ ১৯৭১ খ্রিঃ) হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান পর্ব। দ্বিতীয পর্যাযটি হচ্ছে ১৯৭১ এ অভ্যুদিত নতুন স্বাধীন বাষ্ট্র ' বাংলাদেশ' পর্ব। আমাদেব আলোচনায সাধাবণভাবে এই দুই পর্বেব সমযসীমাব মধ্যে প্রকাশিত বচনাকেই গ্রহণ কবা হযেছে। দেশবিভাগেব পব পঞ্চাশেব দশকেব গোড়া থেকেই বাংলা ধ্বনি, বর্ণমালা ও বানান নিযে চিন্তা-ভাবনাব প্রকাশ ঘটতে থাকে। তবে এইসব বচনায বাংলা বর্ণমালা ও বানান নিযে খুঁটিযে আলোচনা কবা হলেও এখানকাব প্রস্তাবগুলিব প্রযোগিক সার্থকতা বিশেষ লক্ষ কবা যায না। তাই আমাদেব আলোচনায কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধেব মূল বিষযবস্তু খুব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কবা হল। এই বিশ্লেষণে গত কযেব দশকে বাংলাদেশে বাংলা বর্ণ ও বানান সংস্কাবেব প্রবণতাব রূপ-বীতি ধবা পড়েছে।

১। হবফ সমস্যা ঃ ফেবদাউস খান

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ চৈত্র ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ৫৫ ৬৮।

এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা বর্ণেব বিভিন্ন সমস্যাব এলাকাগুলি চিহ্নিত কবেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁব মতামত জানিযেছেন। যেমন ঃ

১। স্ববর্ণেব সংস্কাব ঃ

(ক) লেখক নিম্নলিখিত স্ববর্ণ ও স্ববচিহ্ন বাখাব পক্ষপাতী। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও ৮টি স্ববর্ণ। া ী ী ূ ু ্য া ৃ (ঋ-কাব) ৮টি স্ববচিহ্ন।

(খ) স্ববচিহ্নেব কোনো বিকৃতি চান না। যেমন ঃ রু, শু, রূ হবে বু শূ বূ।

(গ) ও-কাবেব জন্য নতুন চিহ্ন ۲ প্রস্তাব কবা হযেছে।

(ঘ) ই-কার এ-কার, ও-কার চিহ্ন অক্ষরের ডান পাশে বসবে। যেমন ঃ দিন-দীন, দেশ-দ্যাশ, লোক-ল্যাক।

(ঙ) ঐ ঔ বাদ দিয়ে অই, অউ দিয়ে কাজ চালাতে চান। যেমন ঃ কই, বউ।

(চ) তিনি স্বরবর্ণে নতুন অক্ষর অ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, "লিখবার বেলায় যথাযথ ধ্বনিমূলক হতে গেলে একই শব্দের বানান নানাভাবে লিখতে হয়। ফলে ভাষার শিক্ষা অযথা কঠিন হয়ে পড়বে।"

২। **ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্কার ঃ**

(ক) লেখক ব্যঞ্জনবের্ণর ৩৫টি অক্ষর রাখার পক্ষপাতী ঃ

ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ

ত থ দ ধ প ফ ব ভ র ল ড় ঢ়

য় হ স শ ম ন ঙ ঁ ০ ক্ষ জ্ঞ

এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে ঞ ণ য ষ ৎ ং ঃ

(খ) নতুন চিহ্ন যোগ করা হয়েছে "০" (খাঁটি অন্তঃস্থ-ব উচ্চারণ কিংবা ইংরেজি 'w'-এর মতো)। এই হিসাবে বিশ্ব, বিল্ব, ত্বরা বানান লিখতে হবে বিশ০, বিল০, ত০রা।

(গ) ক্ষ, জ্ঞ-কে যুক্ত ব্যঞ্জন না বলে পৃথক অক্ষর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

৩। **যুক্তাক্ষর সংস্কার ঃ** লেখক মনে করেন বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন কোনোমতেই বাদ দেওয়া যায় না। তবে যুক্তাক্ষরের কিছুটা সংস্কার ও সরলীকরণ যে জরুরি তা তিনি স্বীকার করেন। তাঁর প্রস্তাব হল ঃ

(ক) র-ফলা, রেফ্ ও য-ফলা-র সংক্ষিপ্ত সংকেত (্র , র্ , ্য) অপরিবর্তিত থাকবে।

(খ) কয়েকটি যুক্তাক্ষর ভেঙে ফেলতে হবে ঃ

ঞ-সম্বলিত যুক্তাক্ষর ; যেমন ঃ ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ ইত্যাদি (চঞ্চু = চন্‌চু) হ্ম লিখতে হবে ম্ ম' ; যেমন—ব্রহ্মা—ব্রম্‌মা। হ্ন, হ্ন লিখতে হবে ন্‌ন (চিহ্ন = চিন্‌ন) হ্য লিখতে হবে জ্ ঝ (সহ্য = সজ্‌ঝ)

(গ) অন্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলিব পুরো চেহারা বজায় থাকবে। সংযুক্তি বোঝানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোর প্রথমটি অন্যদের তুলনায় আকারে অনেক ছোট হবে এবং মাত্রাহীন থাকবে। এতে মাত্র ১৬ টি মাত্রাবিহীন ছোট অক্ষর রাখলেই চলবে।

(ঘ) ম-ফলা সম্বলিত শব্দগুলোর মধ্যে যেখানে ম-এর উচ্চারণ আনুনাসিক ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে সেগুলি ঁ সহকারে লিখতে হবে। যেমন—শঁশান, আতঁতা, পদ্দঁ।

(৪) লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহের প্রস্তাবিত 'শোজা বাংলা'র বানানরীতি এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার বিরোধিতা করেছেন।

একমাত্র ৪ নং প্রস্তাবটি বাদ দিলে লেখকের সমস্ত প্রস্তাব বিভ্রান্তিকর। লেখক যেভাবে বর্ণমালার সংস্কার করতে চান তা বাংলা বানানের জটিলতা বাড়াবে। এই প্রস্তাবগুলির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

২। বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭।

প্রবন্ধটির দুটি অংশ। প্রথমাংশে প্রাবন্ধিক বাংলা ধ্বনিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে এই আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে (বাঙ্গালা লিপি ও বানান সংস্কার) বাংলা বর্ণ ও বানান সংস্কার সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। প্রস্তাবগুলি খুব সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হল :

(১) বিকৃত অ (ও) উচ্চারণ ঊর্ধ্ব কমা (') দ্বারা প্রকাশের প্রস্তাব রয়েছে। যেমন—ক'রে (করিয়া) গে'ল' (গেল')।

তবে অন্ত্য যুক্তাক্ষর এবং একাক্ষর অযুক্ত ব্যঞ্জন স্থানে অ-কারের বিকৃত (ও) উচ্চারণ না থাকলেও চলবে। হস্ত, শব্দ, বাল্য, বিল্ব, শ (শত)।

(২) বাংলা ভাষায় এ-কারের বিকৃত অ্যা উচ্চারণ-স্থানেও ঊর্ধ্ব-কমা চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব রয়েছে। দে'খ্ কিন্তু দেখি।

(৩) উ, ঊ এবং ঋ কার সর্বত্র একরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। যেমন—গু রু শু, হু রূ হৃ ইত্যাদি।

(৪) তদ্ভব দেশি ও বিদেশি শব্দে ঈ-কার ঊ-কার ঋ-কার এবং বিসর্গ রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। যেমন—পাখি, পানি, চুর, চুন, খ্রিষ্ট, ব্রিটিশ, বাহ্ ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জনবর্ণে ঙ ঞ বাদ দিয়ে সেখানে ং ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—আংউল (আঙুল), মিয়াঁ (মিঞা)।

(৬) তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ণ, ষ বাদ দিতে চান। যেন, কাণ, ষাট, পোষা, আঁষ, ষাঁড় ইত্যাদি স্থলে লিখতে চান কান, শাট, পোশা, আঁশ, শাঁড় ইত্যাদি।

(৭) তদ্ভব ও দেশি শব্দে য স্থানে জ লেখা যায়, কেবল বিদেশি সংজ্ঞা ও পারিভাষিক শব্দের / ধ্বনির জন্য য থাকতে পারে। যেমন জায়গা, জখন, জে, জার , কিন্তু এলিযাবেথ, আলেকযান্ডার। কিন্তু যে সকল বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে সেখানে য না লিখে জ লেখা ভালো মনে করেন। যেমন—জেব্রা, জাহাজ, জুলুম ইত্যাদি।

(৮) তদ্ভব, দেশি এবং কতকগুলি কৃতঋণ শব্দে বর্তমানে স লিখিত হলেও লেখক ধ্বনি অনুসারে শ লেখাই উচিত মনে করেন। যথা, শে (সে), বশে (বসে) ইত্যাদি।

(৯) তৎসম শব্দে যেখানে য-ফলা ও ব-ফলা দ্বারা দ্বিত্ব উচ্চারণ বোঝানো হবে সেখানে তা থাকবে। যেমন—বাক্য সভ্য বিল্ব ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে য-ফলার উচ্চারণ য এবং ব ফলার উচ্চারণ ব সেখানে সেস্থানে তা পৃথকভাবে লিখতে হবে। যেমন—উদযাপন, উদবেগ ইত্যাদি।

(১০) তৎসম শব্দে র-ফলা, রেফ্ ও ল-ফলা থাকবে কিন্তু রেফের পর দ্বিত্ব হবে না। র-ফলার সঙ্গে যুক্তাক্ষর স্পষ্ট লিখতে হবে। যেমন—বক্র, ত্রাণ, ভ্রান্ত।

(১১) যেখানে যুক্তাক্ষরের বিকৃত উচ্চারণ সেখানে যুক্তাক্ষর থাকবে। কিন্তু যেখানে যুক্তাক্ষরের দুটি অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ হচ্ছে সেখানে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লিখতে হবে। হসন্ত স্থানে ক্ষুদ্র অক্ষর লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—সহ্য, পক্ষী, কিন্তু স্থান, কৃষ্ণ ইত্যাদি। তবে হসন্ত ব্যঞ্জন লিখলে কোনো নতুন টাইপের প্রয়োজন হবে না বলে তাঁর অভিমত।

(১২) লেখক অ আ ই ঈ উ ঊ ইত্যাদি না লিখে

অ আ অি অী অু অূ অৃ অে অৈ অো অৌ লেখা ভালো মনে করেন।

(১৩) ৎ (খন্ড ত) নিষ্প্রয়োজন মনে করেন।

(১৪) লেখক সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিমূলক বানান লেখার পক্ষে নন।

শহীদুল্লাহের প্রস্তাবগুলির মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। এ প্রস্তাব অন্যান্যরাও করেছেন। শহীদুল্লাহের অন্যান্য প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই এখনো গৃহীত হয়নি। কয়েকটি প্রস্তাব (যেমন—৫ নং, ৭ নং, ১১ নং, ১২ নং) এত অযৌক্তিক যে তা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে।

৩। বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা। মুহম্মদ আবদুল হাই।

সাহিত্য পত্রিকা ঃ পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। শীত-১৩৬৮।

বাংলায় কোন্ ধ্বনির কী প্রতীক ব্যবহৃত হয়, কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে বাংলা ধ্বনি ও বানানের সঙ্গতি রক্ষা করে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা যেতে পারে, তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ এগারোটি। স্বরচিহ্ন বা কারাদি চিহ্ন দশটি। ব্যঞ্জনবর্ণ চল্লিশটি। দুই বর্ণঘটিত যুক্তাক্ষর, তিনবর্ণ ঘটিত যুক্তাক্ষরও বহুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। চার হরফ ঘটিত যুক্তাক্ষরও রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কাবাদি চিহ্ন যুক্ত হলে হাতের লেখা এবং ছাপার হরফে ৪৩ টি বর্ণ রূপ পরিবর্তন করে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এইরূপ নানাবিধ জটিলতা থেকে উদ্ধারের জন্য লেখক বিভিন্ন ধ্বনির সংস্কার প্রয়োজনীয় মনে করেন।

ঈ, উ-র সংস্কার ঃ ধ্বনির প্রতিলিপি অনুযায়ী স্বরবর্ণের সংস্কার হলে প্রথমেই ঈ এবং ঊ এবং তাদের কার চিহ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

ঐ এবং ঔ-র সংস্কার ঃ বাংলা বর্ণমালার দুটি দ্বিস্বর ধ্বনিসূচক বর্ণ রয়েছে ঐ এবং ঔ। বাংলায় নিয়মিত দ্বিস্বর ধ্বনি উনিশটি। সেখানে বাকি সতেরোটির জন্য যখন লাগে না তখন এই দুই ধ্বনিসূচক বর্ণ রাখাও নিষ্প্রয়োজন। স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে 'এ'-র অস্তিত্ব থাকায় এ্যা ধ্বনিটি রূপায়িত করার জন্য শুধু তার কার-চিহ্ন 'ƒা' রাখাই যথেষ্ট। বাংলায় 'ও'-এর সঙ্গে স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসাবে অভিশ্রুত 'ও'-এর অস্তিত্ব আছে। তবে এক্ষেত্রেও লেখক 'ও' না রেখে শুধু চিহ্ন হিসাবে ঊর্ধ্বকমাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

সুতরাং ধ্বনিভিত্তিক স্বরবর্ণ ও তাদের কার-চিহ্নাদি হল ঃ

ই-ি, এ-ে, ƒা, আ-া, অ, ও-ে া, উ - ু।

য় এবং

বাংলায় য় বর্ণটি গ্রহণ করলে মেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি শব্দের য়-শ্রুতি এবং হাওয়া, খাওয়া প্রভৃতি শব্দের 'ব' শ্রুতি লেখা যাবে। তাই বাংলা বর্ণমালায় 'য়' অবস্থানের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে।

চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনি নেই। তাই স্বরধ্বনিকে অনুনাসিকতার ব্যঞ্জনা দেবার জন্য কারাদি চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

ঋ হরফটি (র + ই) ধ্বনিরই প্রতীক। তাই এর পৃথক অস্তিত্ব নেই।

ঞ-র যথার্থ উচ্চারণ কোথাও পাই না। তাই ধ্বনি অনুসারে শব্দের প্রতিলিপিকরণ দেখাতে ঞ কোথাও টেকে না।

বাংলা ধ্বনিতে দন্তমূলীয় ন ছাড়া মূল ধ্বনি হিসাবে 'ণ'-এর অস্তিত্ব নেই। তাই এটি বাদ দেওয়া যায়।

বাংলায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির বর্তমান প্রতিলিপি খ, ছ ইত্যাদির সংক্ষেপকরণ বা স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির পাশে 'হ' বসিয়ে তাদের ভিন্নভাবে প্রতিবর্ণীকরণ ধ্বনিগত দিক থেকে অচল।

ধ্বনিগত দিক থেকে একটি ব অতিরিক্ত। তাই বর্ণমালা সংস্কারে অন্তঃস্থ ব-টিকে সহজেই বাদ দেওযা যায়। একই কারণে জ-বোধক ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের জন্য য বাদ দিযে 'জ' ব্যবহাব কবা ভালো।

শ স ঃ মূল ধ্বনিব প্রতিধ্বনি হিসাবে একমাত্র শ রাখাই শ্রেয়। স্থান, কষ্ট প্রভৃতি বানান শথান, কশ্‌ট লিখলে অল্পদিনের মধ্যে তা চোখে সহ্য হয়ে যাবে। আশা (Come) আশা (Hope) লিখলে এব পার্থক্য পবিবেশ থেকেই বোঝা যাবে।

ঙ, ং ঃ বাংলার পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি ক বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলোর অনুগামী বলে তাকে ঙ দিযে লেখাই যুক্তিযুক্ত। তাছাডা এই নাসিক্য ধ্বনিটিতে কাব-চিহ্ন বসানো সহজ, তাই লেখক ং এবং ঙ-ব মধ্যে ঙ বাখাব পক্ষপাতী।

ত ৎ ঃ খন্ড ৎ-এ ত-এব অতিবিক্ত কোনো ধ্বনি নেই। তাই বর্ণমালায ৎ বর্জন কবা যেতে পাবে।

ড়, ঢ় ঃ মূলধ্বনি হিসাবে ড ও ঢ ধ্বনিব স্বাতন্ত্র্য ও বৈপবীত্য না মেনে উপায নেই। তাই দুটিই বাখতে চান।

ঃ (বিসর্গ) ঃ এব যথাযথ উচ্চাবণ বাংলায নেই। তাই বিসর্গ না বেখে তাদেব ধ্বনি অনুযাযী বানান দুকখ, মনপপুত লেখাই শ্রেয।

চলতি বাংলায ন, ল, ব, ম-এই মূল ধ্বনিব একটি কবে মহাপ্রাণ রূপ আছে হ্ন, হ্ল, হ্ব, হ্ম। এগুলিকে লেখক ন্‌হ, ল্‌হ, মহ রূপে লিখতে চান। তবে হ্ব বা হ্ন-ব পবিবর্তন না কবে হ্‌-ভাবে লিখতে চান।

লেখক দীর্ঘ আলোচনা কবে বাংলা হবফেব যে চেহারা দিযেছেন তা হল ঃ

স্বরবর্ণ ঃ অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, ও

কারচিহ্ন ঃ া, ি, ু, ে, ্যা, ো, এবং ও'-ব জন্য '।

পান্ডিত্যমূলক উদ্দেশ্যে বিদেশি ধ্বনিব প্রতিবর্ণীকবণেব জন্য ঈ (ী), ঊ (ূ) বাখা যেতে পাবে। কাব চিহ্নেব রূপ ও স্থান বদল না কবে তাদেব প্রচলিত ব্যবহারই বাখতে হবে।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ঃ ক খ গ ঘ

চ ছ জ ঝ

ত থ দ ধ

প ফ ব ভ

য় র ল শ হ

ঙ ন ম ড ঢ় ঋ ্ ঁ

বিদেশি ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের জন্য স এবং য রাখা যায়।

ণ, ´, ƒ এবং ৃ কার ছাড়া কোনো বর্ণের রূপ বিকৃত না করে অন্যান্য ফলার ব্যবহার প্রস্তাব করেছেন। যেমন ঃ ক্ক, স্ক, ষ্ক ইত্যাদি।

ধ্বনির সংযুক্ততা এবং একাত্মতার দিকে লক্ষ রেখে ক্ষেত্রবিশেষে উপর-নীচে বা পাশাপাশি লিখলেই চলবে।

বানান সংস্কার ঃ

বর্তমান কালে চলিত বাংলার ধ্বনি ও হরফ যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে সেভাবে বানান সংস্কার করতে হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত 'নিয়মাবলী'র অতিরিক্ত কিছু নিয়ম গ্রহণ করা যেতে পারে বলে লেখকের অভিমত। যথা ঃ

১। বিদেশী শব্দের ঈ এবং ঊ-র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রতিবর্ণীকরণে ঈ ঊ-র ব্যবহার ছাড়া দেশী বিদেশী তদ্ভব তৎসম যাবতীয় শব্দে ই-ি, এবং উ ু-র ব্যবহার।

২। এ্যা ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে শব্দের প্রথম অক্ষরে বিকল্পে এ্যা-র সীমিত ব্যবহার। শব্দ মধ্যবর্তী এ্যা ধ্বনির রূপায়ণে ্যা-র সীমিত ব্যবহার। যেমন ঃ একা কিন্তু ন্যাকা, দেখা কিন্তু হ্যাট।

৩। 'অ' ধ্বনির প্রতীক অ হরফটির দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে 'অ', 'ও', 'এ' তিনটি ধ্বনিই চিহ্নিত করা হয়।

৪। ঋ এবং ৃ কার থাকতে হবে। তবে বিদেশী শব্দে ৃ কার না দিয়ে, ্রি দিয়ে লেখা হবে যথা—ব্রিটিশ।

৫। ব্যঞ্জনবর্ণে যে কোনো ধরনের স্বরধ্বনি যুক্ত হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ কোনো রকমেই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবে না। যেমন ঃ শু, ত্রু।

৬। অনুস্বর লুপ্ত হবে, সর্বত্র ঙ দিয়ে লিখতে হবে। যথা—রঙ, বঙ্গ।

৭। ঞ লুপ্ত হবে। কিন্তু গ্যঁ ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফের প্রতীক হিসাবে জ্ঞ রাখা যেতে পারে। জ্ঞান, বিজ্ঞ।

৮। ক্ষমা, বক্ষ প্রভৃতি শব্দের জন্য ক্ষ রাখতে হবে।

৯। ণ লুপ্ত হবে। সুতরাং কন্টক, কন্ঠ ইত্যাদি লিখতে হবে।

১০। ষ লুপ্ত হবে। অপ্রচলিত ধর্মীয় এবং বিদেশী শব্দে S ধ্বনির প্রতীক হিসাবে স-র সীমিত ব্যবহার ছাড়া সর্বত্র শ-র ব্যবহার বিধেয়। এ বিধান গৃহীত হলে আরবী, ফার্সী এবং ইংরেজী S-এর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ছ ব্যবহার করতে হবে না।

১১। আরবী, ফারসীর j এবং b ধ্বনি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দের z ধ্বনির প্রতীক হিসাবে য রেখে তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই জ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২। তৎসম শব্দে য ফলা (ƒ) এবং ব-ফলা যেখানে উচ্চারণে দ্বিত্ববোধক সেখানে অব্যাহত থাকবে। যেমন ঃ সভ্য, বিদ্বান।

১৩। উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখানে তাদের উচ্চারণ পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদ্‌বেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে।

১৪। শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব-ফলার উচ্চারণই বাংলায় নেই, সেখানে ব-ফলা ছাড়াই শাপদ, শাশ ইত্যাদি লেখা বিধেয়। তবে স্বত্ব স্বত্বাধিকারী এবং সত্ত্বেও বানান লিখতে হবে শত্ব, শত্বাধিকারী, শত্বেও।

১৫। পুত্র, উজ্জ্বল প্রভৃতি শব্দে ত্র, জ্জ্ব না লিখে শুধু ত্র, জ্ব লেখা বিধেয়।

১৬। উপরে আলোচিত নিয়মগুলি ছাড়া অন্যান্য নিয়ম হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এবং এ যাবৎ প্রচলিত আধুনিক বানানের মতো।

লেখক বাংলা লিপি ও বানান মূলধ্বনির ধর্মানুসারী করবার জন্য 'শ'-এর সহধ্বনি ষ, স-এর কোনো প্রতিলিপি না রেখে শ হরফটি সর্বত্রই রাখতে বলেছেন। ফলে সংযুক্ত হরফগুলি শ্‌ক, শ্‌খ, শ্‌ত এইভাবে লেখার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অনেকে আপত্তি করতে পারেন, তাই লেখক বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেছেন—

আরবী, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী S ধ্বনির প্রতিলিপি হিসাবে স রাখার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হলে বাংলা বর্ণমালায় শ, স দুটো হরফই থাকবে।

এই প্রবন্ধটিতে লেখকের প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞানসম্মত। লেখক যেভাবে হরফ সংস্কার করতে চেয়েছেন তাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বর্ণমালা শেখা খুবই সুবিধাজনক হবে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তবাঞ্জন শিক্ষা শিক্ষার্থীব কাছে বিভীষিকা। তবে বর্তমানে যুক্তব্যঞ্জন লেখার ক্ষেত্রে সবলতা অনেকটাই এসেছে।

তবে হরফ সংস্কাব অংশে কয়েকটি ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে যায়। যেমন ঃ 'ঋ'-এব পৃথক অস্তিত্ব নেই বলেই তাঁর অভিমত। আবাব বাংলা হবফের যে তালিকা দিয়েছেন সেখানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণেব তালিকায় ঋ স্থান পেয়েছে। তিনি বিসর্গ পুরোপুবি তুলে দিতে চান। তাই ধ্বনি-অনুযাযী বানান চালু করাব প্রস্তাব রাখেন, যেমন ঃ দুক্‌খ। কিন্তু বিসর্গ পুরোপুরি তুলে দেওয়া যায কিনা তা ভাববার বিষয। কারণ প্রচুর বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দ বাংলায় রয়েছে।

বানান সংস্কার অংশেও কিছু কিছু প্রস্তাবে অতিমাত্রায় বৈপ্লবিকতা থাকায় তা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তা ভাবনার অপেক্ষা বাখে। যেমন ঃ বানান সংস্কার অংশে ১ সংখ্যক প্রস্তাবে তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি যাবতীয় শব্দে ই (ি), উ (ু) লেখার কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র লেখা গেলেও তৎসম শব্দের ছাঁদকে এলোমেলো করলে যে বিপুল প্রতিক্রিয়া হবে তাতে সংস্কাবের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও স্পষ্ট হয় না। যেখানে এ্যা ধ্বনি আসবে সেখানেই এ্যা লিখতে হবে। কিন্তু লেখক শব্দের প্রথমে এ্যা এবং মধ্যে ্যা-র সীমিত ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা হল, কোন্ শব্দে এ্যা বা ্যা লিখব, কোন্ শব্দে লিখব না। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে অ' হরফটি দিয়ে অ, ও, এ তিনটি ধ্বনি চিহ্নিত করা যাবে। উদাহরণের অভাবে এই প্রস্তাবটিও অস্পষ্ট। সপ্তম প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঞ লুপ্ত হবে। অথচ গ্য ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফ 'জ্ঞ' থেকে যাবে। এই ভাবনার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। চতুর্দশ প্রস্তাবটিও একটু বেশি বৈপ্লবিক। কতটা গৃহীত হবে তা ভাবনার বিষয়।

৪। বাঙলা বানান ও লিপিসংস্কার। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা—৩৩-৭৮।

'বাঙলা বানান ও লিপিসংস্কার' প্রবন্ধটিতে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে ধ্বনিমূলতত্ত্ব অবলম্বন করে বাংলা ধ্বনিমূলরাশি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে লেখক ধ্বনিমূলক বর্ণ ও বানান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি মনে করেন, ধ্বনিবর্গীয় লিপিমালা যে কোনো ভাষার পক্ষে আদর্শলিপি। তাঁর হিসাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিবর্গ সাঁইত্রিশটি ; ব্যঞ্জনধ্বনিমূলক ত্রিশটি, স্বরধ্বনি-মূলক সাতটি। বাংলার জন্য বিজ্ঞানসম্মত লিপি হতে হলে এর প্রত্যেকটিব জন্য একটি করে হরফ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এই হিসাবে রোমান বর্ণমালা, আরবী বর্ণমালাকে বাংলার জন্য অনুপযোগী বলে মনে করেন। বাংলা বর্ণমালাই বাংলা ভাষার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। লেখক মনে করেন বাংলা বানানের জটিলতা ও বৈষম্য দূর হতে পারবে কয়েকটি সংস্কারের মাধ্যমে—

(১) প্রত্যেকটি ধ্বনিবর্গেব জন্য একটি করে চিহ্ন থাকবে ; ধ্বনিবর্গেব প্রতীক বর্ণগুলি ছাড়া অন্য বর্ণগুলি বর্জন হবে।

(২) ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে শুধু ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বলে ধবা হবে। (অর্থাৎ ওদের নিহিত অ স্বরধ্বনি চলে যাবে)।

(৩) বর্তমানে 'ব্যঞ্জনাশ্রিত' অ স্বরধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত কবতে হবে। এই ধ্বনির প্রতীক হিসাবে নাগরী এ-কাব চিহ্ন বা উর্ধ্ব কমা (') ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) যে স্ববচিহ্নগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণেব বাঁ দিকে লেখা হয়, সেগুলি ডান দিকে লেখার বীতি প্রচলিত করতে হবে। যেমন—দ2 শ ব2 শী

(৫) যুক্তাক্ষবগুলিকে ক্রমশ বিযুক্ত কবে লিখতে হবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত হরফগুলি বাদ যাবে ঃ

ঞ, ণ, য, ষ, ক্ষ, ঢ়, ং, ঃ ৎ

ঈ, ঊ, ঋ, ঌ ঐ, ঔ।

চিহ্নের মধ্যে বাদ যাবে ঃ

ি, ূ, ও হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ-ঊ এর নানারূপ, যেমন—(রু রূ) ঃ ্ সম্ভবত ৃ (ঋ-কার) ও বিভিন্ন ফলা (র-ফলা, ন-ফলা ইত্যাদি)।

নতুন হরফের আগমন ঘটবে মাত্র একটি-ৱ (w)। নতুন চিহ্নেব আগমন ঘটবে মাত্র একটি 2 (অ-কার) এবং ে আর ো -এর পরিবর্তে নতুন চিহ্ন আসবে যথাক্রমে 2 এবং ী।

লেখকের প্রস্তাবিত সংস্কার অনুযায়ী লিপির নমুনা—

দারীদর‍্য তুমী মীর2 ক'র2ছ' ম'হান

তুমী মীর2 দানীয়াছ' খরীসট2র স'মমান।

লেখক তাঁর প্রস্তাবগুলিকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবগুলি অতি মাত্রায় বৈপ্লবিক। সেই কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৫। বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার ঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
বাংলা একাডেমী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

এই প্রবন্ধেও দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমাংশে লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাংলা বানান সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। দ্বিতীয়াংশে সংস্কৃত শব্দের বানান পরিবর্তন সম্পর্কে লেখক তাঁর মতামত জানিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে তাঁর মতামত লেখক অন্যান্য প্রবন্ধেও আলোচনা করেছেন। সেই সমস্ত প্রবন্ধ পূর্বেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই এই প্রবন্ধে কেবল প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশটি নিয়েই আলোচনা করা হল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণ-বহির্ভূত বানান সংস্কার করতে চান নি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজেও সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করতে চান নি, তবু কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এখানে তাঁর প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করা হল।

(১) জ ও য স্থানে কেবল জ। কারণ শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে জ-এর ব্যবহার রয়েছে। বাংলার মূল গৌড়ী প্রাকৃতেও জ ছিল বলে অনুমান করেছেন।

(২) ণ ও ন স্থলে কেবল ন। এক্ষেত্রে একই যুক্তি দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যাকরণ-সম্মত বানান চান।

(৩) শ, ষ, স স্থানে সর্বত্র শ।

(৪) ঞ্চ, ঙ্ক, ঞ্জ, ঞ্ঝ স্থানে নচ, ন্ছ, ন্জ, নঝ —লিখলে উচ্চারণসম্মত হয় বলে তিনি মনে করেন। বাংলাতে বিকল্পে ং লেখা যেতে পারে বলেও তিনি মনে করেন।

(৫) অন্ত্য বিসর্গস্থানে হ্ এবং শব্দমধ্যে বিসর্গস্থানে পরবর্ণের দ্বিত্ব প্রস্তাব করেছেন। যেমন—আঃ, দুঃখ স্থানে আহ দুকখ।

লেখক তাঁর প্রস্তাবিত লিপি ও বানান সংস্কারের উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

"অে'কদা, অে'ক সৃগাল দ্রাক্ষা ক্ষেতে প্রবেশ করিল'। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। শুপক্ক ফলশকল দেখিয়া অৈ ফল খাইবার নিমিত্ত সৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল'। কিন্তু ফল শকল অুচ্চে ঝুলিতেছিল, 'শুতরাং অৈ ফল পাওয়া সৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত 'হঅিয়া ফল পাড়িবার জন্য সৃগাল জথেশ্‌ট চেশ্‌টা করিল', কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্জ হঅিতে পারিল' না।"

এই প্রবন্ধে শহীদুল্লাহের প্রস্তাবের মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। এখানে লেখক তৎসম শব্দের বানানের পরিবর্তন সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন। অথচ শহীদুল্লাহ অন্য প্রবন্ধে ('বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার' : বাংলা একাডেমী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা) লিখেছেন ঃ

"যদি কেহ বলেন, বাঙ্গালায় যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলিও ধ্বনিমূলকভাবে লেখা হউক, ইহাতে বর্ণসংস্কার অত্যন্ত বিপ্লবমূলক হইবে এবং সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। যাহা হয়তো সকল সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইবে না।......"

এই পরস্পরবিরোধী ভাবনায় তিনি বানান-সমস্যাকে আরো জটিল করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক তাঁর প্রস্তাবিত বানানের যে নমুনা দিয়েছেন সেখানেও বেশ কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে।

যেমন, লেখক সংস্কৃত বানানেও স, শ, ষ স্থানে শ লেখার প্রস্তাব করেছেন, অথচ উদাহরণ-টিতে একাধিক স্থানে সৃগাল বানানটি রয়েছে। এই ধরনের অসংগতির কারণে শহীদুল্লাহের অধিকাংশ প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের বাংলা বানান সংক্রান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার ধারা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, প্রতিটি প্রস্তাবই অতিমাত্রায় বৈপ্লবিক। এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে বাংলা বানান সংক্রান্ত সমস্যা আরো বাড়বে। নব্য শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। এ সকল কারণে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিক্ষাকমিশন ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের বানানে সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড ১৭.৬.৮৪ তারিখে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ২২.৮.৮৪ তারিখে সুপারিশ পেশ করেন। কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতার জন্য বানান সম্পর্কিত এই নীতিসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এই অবস্থায় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ১৯৮৮ সালের ২১-২৩ অক্টোবর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশিবিরের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

"(১) ১৯৮৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ওটেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বানানের যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে সেটি সহ এ পর্যন্ত বাংলা বানানের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত যে সব উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা।

(২) একই শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ বানান রূপ থেকে কোন্‌টি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ।

(৩) যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপ ব্যবহারের নিয়মনীতি নির্ধারণ।

(৪) বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ।

(৫) উপরিউক্ত ১ থেকে ৪-এর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলা বানানের একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও বানানের নির্দেশিকা প্রণয়ন।"

কর্মশিবিরের এই অধিবেশনে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসৃত হয় ঃ

১.০০ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে ঃ

১.০১ রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন—কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

১.০২ সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন—অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ্ লেখা হবে। যেমন—অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন—রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন—বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

১.০৩ হস্‌চিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন—করব, চট, দুজন।

১.০৪ যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন—পাখি, বাড়ি, হাতি।

১.০৫ ক্ষ-বিশিষ্ট সকল ক্ষ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন—অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

১.০৬ কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন—গাভী, রানী, হরিণী, কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

১.০৭ ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন—ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

১ ০৮ বিশেষণবাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন—বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

১ ০৯ পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই -কাব হবে। যেমন—লোকটি।

১ ১০ অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রযোজন-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন—কি (অব্যয) ঃ কী (সর্বনাম) ঃ তৈরি (ক্রিয়া) ঃ তৈরী (বিশেষণ) ঃ নিচ (নিম্ন অর্থ) ঃ নীচ (হীন অর্থে) ঃ কুল (বংশ অর্থে) ঃ কূল (তীব অর্থে)

১ ১১ বাংলায় প্রচলিত কৃতঋণ বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন—কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কযেকটি ক্ষেত্রে এব ব্যতিক্রম হবে ঃ

(ক) ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে যে, ض (যোযাদ) ও ز •(যাল)-এর জন্য য (ইংবেজি z ধ্বনিব মত) ব্যবহৃত হবে। যেমন—আযান, এযিন. ওযু, কাযা, নামায, যাকাত, যিকিব, যোহব, বমযান, হযরত।

(খ) অনুরূপ শব্দে আববি ص (সোযাদ) ও س (সিন)-এব জন্য স এবং ش (শিন)-এব জন্য শ হবে। যেমন—সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

(গ) ইংবেজি এবং ইংবেজিব মাধ্যমে আগত s ধ্বনির জন্য স ও sh. sion. ssion. tion প্রভৃতি ধ্বনিব জন্য শ এবং st ধ্বনিব জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

(ঘ) ইংবেজি বক্র a ধ্বনির জন্য শব্দেব প্রাবম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন—এলকহল, এসিড।

(ঙ) Christ ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিযমে খ্রিস্টাব্দ হবে।

১.১২ পূর্ববর্তী নিযমের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তাছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসবণ কবা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাসিক্যধ্বনিযুক্ত কবার জন্য চ-বর্গেব পূর্বে কেবল ঞ (যেমন—অঞ্চল, অঞ্জলি, বাঞ্ছা), ট-বর্গেব পূর্বে কেবল ণ (যেমন—কাণ্ড, ঘণ্টা) এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন—পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিস্‌ধ্বনিযুক্ত করাব জন্য চ-বর্গেব অঘোষধ্বনিব পূর্বে কেবল শ (যেমন—নিশ্চয, নিশ্ছিদ্র), ট-বর্গেব অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল ষ (যেমন—কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন—অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১.১৩ পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন—ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১.১৪ ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন—করব, হল ইত্যাদি। এত, কত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন—করো, কোরো, বলো, বোলো।

১.১৫ ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু) ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলি বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন—শুভ, রূপ, হৃদয়।

১.১৬ যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন—অঙ্ক, সঙ্গো, স্পষ্ট।

১.১৭ যে সব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে, যেমন—ক্ষ (ক্ + ষ), জ্ঞ (জ + ঞ), হ্ম বা হ্ম (হ্ + ম্) সেগুলির রূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ্ + চ), ঞ্জ (ঞ্ + জ) ঞ্ছ (ঞ্ + ছ), ট্ট (ট্ + ট), ট্র (ট্ + র), ত্ত (ত্ + ত), ত্থ (ত্ + থ), ত্র (ত্ + র), হ্ণ (হ + ণ), হ্ন (হ্ + ন), ষ্ণ (ষ্ + ণ), ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনের গঠন-রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১.১৮ সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন—জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন—ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন—কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১.১৯ বিশেষণবাচক শব্দ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি-বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন—এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।

১.২০ নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন—ভয়ে নয়, হয় না, আসে নি, হাতে নেই।

১.২১ হযরত মুহম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবীদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

১.২২ লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

১.২৩ বাংলাদেশের টাকার প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওযার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন (৳) ব্যবহার করা হবে।

১.২৪ পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলিতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

চলন্তিকা ঃ রাজশেখর বসু। ব্যবহারিক শব্দকোষ ঃ কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলা ভাষার অভিধান, দুখন্ড ঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী-শব্দ-সংকলন ঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। পারসো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি ঃ গোলাম মকসুদ হিলালী।

বানানের সমতাবিধান বিষয়ে জাতীয় কর্মশিবিরের এই প্রচেষ্টাকে বানান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এঁদের প্রস্তাবগুলিতে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বানান সমিতিব প্রবর্তিত বাংলা বানানেব নিযমাবলিব ছাপ বযেছে। বাংলাদেশেব বানান সংক্রান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাব মধ্যে যে অত্যাধুনিকতা, অবৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিহীনতা লক্ষ কবা যায, জাতীয কর্মশিবিবেব উদ্যোগে গৃহীত বাংলা বানান সম্পর্কিত প্রস্তাব অনেকাংশে সেই ত্রুটিমুক্ত। ববং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বানান সমিতিব প্রবর্তিত নিযমাবলিতে যে বিকল্প-সমস্যা ছিল, এই প্রস্তাবসমূহে তা সচেতনভাবে এড়িযে চলা হযেছে। অবশ্য ১৯৩৬-৩৭ সালে যে প্রযোজনে বিকল্প বাখা হযেছিল, ১৯৮৮ সালে সে প্রযোজনও অনেকটাই ফুবিযেছে। তবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তবকালেও বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা যেভাবে এগিযেছে সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাবসমূহে বক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতাব মধ্যে ভাবসাম্য বক্ষিত হযেছে। সেই কাবণে প্রস্তাবগুলিও গ্রহণযোগ্য হযেছে।

তবে জাতীয শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডেব উদ্যোগে বানান-সংক্রান্ত যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হযেছিল তা প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষাব পর্যাযে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহাবেব জন্য। তাই বাংলা বানানেব নীতিসমূহ প্রবর্তন বিষযে বৃহত্তব জাতীয ভিত্তিক কোনো কার্যকব পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষ জরুবি হযে পড়েছিল। এ ব্যাপাবে বিশেষ উদ্যোগ নিযেছিল ঢাকা বাংলা একাডেমী। বানান সমস্যা, বানানেব একরূপতা বক্ষা ও প্রমিত বানানেব দিক নির্দেশেব জন্য বাংলা একাডেমী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ কবলেন "প্রমিত বাংলা বানানেব নিযম।" এখানে নিযমগুলি তুলে দেওযা হল ঃ

প্রমিত বাংলাবানানেব নিযম ঃ তৎসম শব্দ

১ ০১ তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায ব্যবহৃত অবিকৃত শব্দেব বানান যথাযথ ও অপবিবর্তিত থাকবে। কাবণ এইসব শব্দেব বানান ও ব্যাকবণগত প্রকবণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট বযেছে।

১ ০২ তবে যে সব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তাব কাবচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকাব, ধমনি ধূলি, পঞ্জি পদবি ভঙ্গি, মঞ্জুবি মসি, লহবি, সবণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১ ০৩ বেফ-এব পব ব্যঞ্জনবর্ণেব দ্বিত্ব হবে না। যেমন ঃ অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম কার্য গর্জন মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

১ ০৪ ক খ গ ঘ পবে থাকলে পদেব অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বাব (ং) লেখা যাবে। যেমন ঃ অহংকাব, ভযংকব, সংগীত, শুভংকব, হৃদযংগম, সংঘটন, বিকল্পে ঙ লেখা যাবে। ক্ষ-এব পূর্বে সর্বত্র ঙ হবে। যেমন ঃ আকাঙক্ষা।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

২ ০১ ই ঈ উ ঊ ঃ সকল অ তৎসম অর্থাৎ তদভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদেব-কাব চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দেব ক্ষেত্রেও এই নিযম প্রযোজ্য হবে। যেমন—গাড়ি, চুবি, দাড়ি, বাড়ি, ভাবি, শাড়ি, তবকাবি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি খুশি, হিজবি, আববি, ফাবসি, ফবাসি, বাঙালি, ইংবেজি, জাপানি, জার্মানি, ইবানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিবিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুবি, টুপি, সবকাবি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেবামতি, বেশমি, পশমি, পাখি, ফবিযাদি, আসামি, বে-আইনি,

ছুড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মানি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ।

অনুরূপভাবে-আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন—খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ই-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন—রানী, পরী, গাভী। সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন ঃ কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে ? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি। তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ। কী দুরাশা।

অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন ঃ তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন—ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

২.০২ **ক্ষ ঃ** ক্ষীর। ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হবে।

২.০৩ **মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন ঃ** তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়েব নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি, মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন ঃ অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, সোনা, পরান, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে ণ হয়, যেমন ঃ কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর আগেও কেবল ন হবে। অ-তৎসম শব্দে যুক্তাক্ষরের বানানের জন্য ৪.০১ দ্রষ্টব্য।

২.০৪ **শ, ষ, স ঃ** তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ স-এর নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশী মূল শব্দে শ, স-এর যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন ঃ সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন ঃ বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন ঃ স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় অধীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

২.০৫ আরবি-ফারসি শব্দে 'সে' (ث), 'সিন' (س), 'সোয়াদ' (ص) বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে স, এবং 'শিন' (ش)-এর প্রতিবর্ণ রূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস) বেহেশ্‌ত।

এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে সেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ -এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন ঃ পছন্দ মিছিল, মিছরি, তছনছ।

২.০৬ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং shion-ssion-tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপ। যেমন ঃ কোএস্‌চন্ হতে পারে।

২.০৭ জ, য ঃ বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন ঃ কাগজ, জাহাজ, হুকুম; হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে' (ظ) 'যাল' (ذ) 'যোয়াদ' (ض), 'যোই' (ژ) রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ আযান, এযিন, ওয, কায, নামায, মুযায্‌যিন, যোহর, রমযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন।

জাদু, জোয়াল, জো, ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

২.০৮ এ, অ্যা ঃ বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত বিকৃত নির্বিশেষে এ-বা ে-কার হবে। যেমন— দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন—এন্ড, নেট, বেড, শেড।

বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন—অ্যান্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।

তবে কিছু তদভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল পরিচিতি। যেমন—ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.০৯ ও ঃ বাংলায় অ কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ো-কার ব্যবহার করছেন। যেমন ঃ ছিলো, করলো, বলতো, কোরছে, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য) ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনুরূপ ো-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন ঃ ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

২.১০ ং ঙ ঃ তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুচ্ছেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে।

তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন—রং, সং, পালং, ঢং. রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন—বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.১১ রেফ (´) ও দ্বিত্ব ঃ তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন ঃ কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

২.১২ বিসর্গ ঃ শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন ঃ কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ।

পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন—দুস্থ, নিস্পৃহ।

২.১৩ আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঃ আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ে া-কার যুক্ত করা হবে। যেমন—করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১৪ বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ ঃ বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট কবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চাবণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন—স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন—সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্কস, শেক্‌স্‌পিয়র, ইস্‌রাফিল।

২.১৫ হস-চিহ্ন ঃ হস্‌চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন—কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জড, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক।

তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ঃ উহ্‌ যাহ্‌। যদি অর্থের বিভ্রান্তিব আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন--কর্‌, ধর্‌, মর্‌, বল্‌।

২.১৬ উর্ধ্ব-কমা ঃ উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন—করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।

বিবিধ

৩.০১ যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণেব নিচে বসাতে হবে। যেমন—গু, রু, শু, দ্রু, শ্রু, রু, ভু, হৃ, ত্রু, ভ্রু। তবে ক্ষ-এর পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩.০২ সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা

যায়। যেমন-মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩.০৩ ঃ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন—সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন—কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরন মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন—দুজনা

৩.০৪ ঃ নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন—বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার যা নেই, আমার ভয় নেই।

তবে শব্দের পূর্বে নঞর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন ঃ নারাজ, নাবালক, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট কবার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পরে হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন—না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাখি।

৩.০৫ ঃ উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন বচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত বচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। যদি উদ্ধৃত বচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই উর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ধৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয়, তাহলে উর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহাব কবতে হবে না। তাছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ধৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ধৃতিতে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতিচিহ্ন দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ধৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ উদ্ধৃত করা না হয়, বাদ দেওয়ার স্থানগুলিকে তিনটি বিন্দু বা ডট (অবলোপ-চিহ্ন) দ্বাবা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুচ্ছেদ, স্তবক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার দ্বারা একটি ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।

কোনো পুবাতন বচনাব অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পাঠে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তমান নিয়ম-অনুযাযী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৪.০১ ণত্ব-বিধি সম্পর্কে দুই মত ঃ অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটিব সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি। একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দে যুক্তাক্ষরে ন্ট, ন্ঠ, ন্ড, ন্ঢ হবে। যথা—ঘন্টা, লন্ঠন, গুন্ডা। অন্যমতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ ব্যবহৃত হবে। যথা—ঘণ্টা, প্যাণ্ট, প্রেসিডেণ্ট, লণ্ঠন, গুণ্ডা. পাণ্ডা, ব্যাণ্ড, লণ্ডভণ্ড।

চলতি ভাষায় ক্রিয়াপদের কতকগুলি রূপ ঃ

হ-ধাতু ঃ হয়, হন, হও, হস, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হোক, হোন, হও, হ। হলো, হলে, হলাম। হতো. হচ্ছিল। হয়েছিল। হবো, হবে। হয়ো, হস. হতে, হয়ে, হলে, হবার (হওয়ার), হওয়া।

খা-ধাতু ঃ খায়, খাও, খান, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খা, খা। খেল, খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব, খাবে, খয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার (খাওয়ার) খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিল, দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেবো, দেবে। দিও (দিয়ো), দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার (দেওয়ার), দেওয়া।

নি-ধাতু ঃ নেয়, নেন, নাও, নিস, নিই। নিচ্ছে। নিয়েছে। নিক, নিন, নাও, নে। নিল, নিলে, নিলাম। নিত। নিচ্ছিল। নিয়েছিল। নেব, নেবে। নিও (নিযো), নিস। নিতে, নিয়ে, নিলে, নেবার (নেওয়ার) নেওযা।

শু-ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শান. শোও, শো। শুল, শুলে, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুযেছিল। শোব, শুযো শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার (শোওয়ার) শোয়া।

কর-ধাতু ঃ করে, করেন, করো. কবিস, কবি। কবছে। করেছে। করুক, করুন, কবো. কব। কবল, করলে, করলাম। কবত। কর্বছিল। কবেছিল। কবব, করবে। কোবো, করিস। কবতে, কবে, রলে, করবার (কবাব), করা।

কাট-ধাতু ঃ কাটে, কাটেন, কাটো, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাটো, কাট্। কাটল, কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব, কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার (কাটার) কাটা।

লিখ-ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখো, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখো, লেখ্। লিখল, লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব, লিখবে, লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার (লেখার), লেখা।

শিখ-ধাতু ঃ শেখে, শেখেন, শেখো, শিখিস, শিখি। শিখছে। শিখেছে। শিখুক, শিখুন, শেখো শেখ্। শিখল, শিখলে, শিখলাম। শিখত। শিখছিল। শিখেছিল। শিখব, শিখবে। শিখো, শিখিস। শিখতে, শিখে, শিখলে, শেখবার (শেখার) শেখা।

উঠ-ধাতু ঃ ওঠে, ওঠন, ওঠো, উঠিস, উঠি উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠো, ওঠ। উঠল, উঠলে, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব, উঠবে, ওঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার (ওঠার) ওঠা।

বাংলা একাডেমী বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রণযন করেছেন, তা অনেকটাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়মাবলিব অনুরূপ। নতুনত্ব এখানে বিশেষ কিছু নেই। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে বিকল্পের ব্যবহার কিছু বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রণীত এই নিয়মাবলিতে বিকল্প একেবারে পরিহার করা না গেলেও কমিয়ে আনা হয়েছে। তবু কোথাও কোথাও এমন বিকল্প মানা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেগুলির কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যেমন—১০৪ সংখ্যক নিয়মে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে অন্তস্থিত ম্ স্থান অনুস্বার (ং) বা বিকল্পে ঙ্ লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ং-এর ব্যবহার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আর বিকল্প বজায় রাখা

যুক্তিহীন। অতৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ২.০১ সংখ্যক নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সাধারণত ই-কার দেবার প্রস্তাব থাকলেও রানী, পরী, গাভী বানান ঈ-দিয়ে লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রানি, গাভি—এরূপ বানান এখন অনেক স্থানেই লক্ষ করা যায়। সুতরাং বর্তমানে আর এগুলির জন্য ঈ-কার রাখা নির্দেশ যুক্তিহীন। ২.০৮ সংখ্যক নিয়মে তৎসম ও বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন—দেখে, দেখি, যেমন ইত্যাদি। বক্র এ বোঝাতে একটি নতুন বর্ণ ও তার একটি কাব-চিহ্নের উদ্ভাবন যেখানে এত প্রয়োজনীয় সেখানে একাডেমীর এর সম্পর্কে নীরব থাকার কারণ ঠিক স্পষ্ট হয় না। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের কতকগুলি রূপের মধ্যেও অসংগতি রয়েছে। যেমন—'খা' এবং 'শু' ধাতুর ক্ষেত্রে খেয়ো, শুয়ো বানান লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'দি' 'নি' ধাতুর ক্ষেত্রে দিও (দিয়ো) নিও (নিয়ো) দুরকম লেখাব নির্দেশ রয়েছে। খেয়ো, শুয়ো ইত্যাদির ন্যায় কেবল নিযো নিয়ো রূপ মেনে নিলে একরূপতা রক্ষিত হত। যাইহোক, এই ধরনের কিছু কিছু প্রস্তাব না মেনে নেওয়া গেলেও-মোটামুটি বাংলা একাডেমীর বানান সংক্রান্ত এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য। কাবণ এই প্রস্তাবগুলি খুব রক্ষণশীল নয়, আবাব অতি বৈপ্লবিকও নয়। পূর্ববর্তী সংস্কাবগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই এ প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগোপযোগী নতুন ভাবনাব প্রতিফলন থাকলে এই উদ্যোগ আবও সম্পূর্ণ হত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও ঢাকা বাংলা একাডেমীর গৃহীত বাংলা বানানের নিয়মাবলির তুলনামূলক আলোচনা

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না ঃ** এই বিধিটি সম্পর্কে তিনটি প্রতিষ্ঠানই দ্বিধাহীন ও একমত।

২। **সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার ঃ** এই বিধিটি সম্পর্কে **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে** গৃহীত অভিমতটি অস্পষ্ট। কারণ, তাঁবা ক-বর্গের ক্ষেত্রে অনুস্বার বা বিকল্পে ঙ লেখাব যে বিধান দিয়েছেন তা কোন্ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ পদে না সন্ধিবদ্ধ নয় এমন পদে প্রযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি।

ঢাকা বাংলা একাডেমীর বিধিতেও এরই অনুসরণ লক্ষ কবি। সিদ্ধান্ত এখানেও স্পষ্ট নয়।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গৃহীত বিধিটি ব্যাকবণসিদ্ধ, স্পষ্ট এবং যুগোপযোগী। তাঁবা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, যেখানে ম্-এব সন্ধি-পবিণাম হিসাবে ং আসেনি সেখানে ং লেখা অবৈধ। তাই, ভয়ম্ + কর = ভযংকর ; কিন্তু অংক নয়, অঙ্ক (অন্ক্ + অল্)।

৩। **বিসর্গ চিহ্নে রক্ষা/বর্জন ঃ** এই বিধিটি সম্পর্কে **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কবণে মতামত দিলেও সম্ভবত জনমতের চাপেই তৃতীয় সংস্করণে নীরব থেকেছেন। **ঢাকা একাডেমীও** এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দেখাননি। কিন্তু **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি** এ বিষয়ে তাঁদের প্রস্তাবে মোটামুটি তৎসম শব্দেব বানানে সন্ধিব ক্ষেত্রে পদমধ্যস্থ বিসর্গ ছাড়া অন্যত্র বিসর্গ বর্জনের পক্ষপাতী। আকাদেমি যেখানে বিসর্গযুক্ত শব্দের বিকল্পরূপ প্রচলিত সেখানে বিকল্পই রাখতে চান। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আকাদেমি যে দিকনির্দেশ করেছেন তা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

৪। **হস্‌চিহ্ন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** বানান কমিটি তৎসম শব্দের হস্‌চিহ্ন সম্পর্কে ঠিক বিসর্গের সমস্যার মতোই ৩য় সংস্করণে নীরব থেকেছেন। **ঢাকা একাডেমীও** তাদেরই অনুসরণ করেছেন। তবে **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি** সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্‌চিহ্ন রাখলেও অন্যত্র বাহুল্যবোধে বর্জন করেছেন।

৫। **হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** বানান কমিটি তৎসম শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো বিধান দেননি। **ঢাকা একাডেমী** এই বিধিটি সম্পর্কে বেশি সরলীকরণ করে প্রস্তাব করেছেন, যেখানে বিকল্প থাকবে সেখানে ই/উ বা তাদের কারচিহ্ন গৃহীত হোক। কিন্তু যেখানে বিকল্প নেই বা যেটি সমাসবদ্ধ ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ সেখানে কী করণীয় সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি।

কিন্তু **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি** এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। (ক) যেখানে বিকল্প রয়েছে সেখানে তাঁরা হ্রস্ব-স্বরটিকে রাখতে চান। (খ) যেখানে বিকল্প নেই বা যেটি ইন্ ভাগান্ত শব্দ তা সমাসবদ্ধ হলেও সেখানে দীর্ঘ চিহ্ন রাখতে চান।

৬। **শ-ষ-স ঃ** তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর মধ্যে কোন্‌টি প্রযুক্ত হবে সে ব্যাপারে **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** বানান কমিটি ও **ঢাকা বাংলা একাডেমী** কোনো বিধান দেননি। **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী** বানানের একরূপতা রক্ষার জন্য শ-ষ বা শ-স এই বিকল্প যেখানে আছে সেখানে সর্বত্রই শ রাখার প্রস্তাব করেছেন।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দ

৭। **ই, ঈ, উ, ঊ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** বানান কমিটি মূলে ঈ বা ঊ থাকলে বিকল্প ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম সংস্করণে ই/উ ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও পরবর্তী সংস্করণে মত পবিবর্তিত হয়েছে। স্ত্রী জাতিবাচক বা বিদেশী শব্দে ঈ লেখার প্রস্তাব করেছেন। **ঢাকা বাংলা একাডেমী** সকল অতৎসম শব্দে ই, উ বা তাদের কারচিহ্ন রাখতে চান। তবে এই আওতা থেকে বিশেষ দু-একটি স্ত্রীবাচক শব্দ বাদ পড়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও** যুগের সঙ্গে তাল রাখতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। তাঁরাও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল অ-তৎসম শব্দে ই/উ রাখতে চান। তাঁদের 'মেরুকরণ' 'লঘুকরণ', 'শুদ্ধকরণ' ইত্যাদি নতুন বানান তৈরির প্রস্তাবটি বানানের একরূপতা রক্ষার খাতিরেই ভেবে দেখার মতো। বিদেশি শব্দে সর্বত্র ই বা উ রাখার প্রস্তাবটিও যুক্তিযুক্ত।

৮। **কী আর কি ঃ** এ সম্পর্কে **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** কোনো প্রস্তাব রাখেন নি। তবে **ঢাকা বাংলা আকাদেমী** ও **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির** প্রস্তাবের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। অর্থাৎ যখন প্রশ্নমূলক সর্বনাম বা বিশেষণ তখন 'কী' লেখা হবে। যেক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না-বাচক সেক্ষেত্রে ই-কার দিয়ে লেখা হবে।

৯। **শব্দান্তে ও-কার ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** বানান কমিটি অযথা ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা দেবার বিরোধী। তবে নিতান্ত অর্থগ্রহণের সুবিধা জন্য বিকল্পে ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা দেবার প্রস্তাব করেছেন। যেমন—কাল, কালো। **ঢাকা বাংলা একাডেমী** কলিকাতার মতোই অযথা ও-কার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন—অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অব্যয় এবং অর্থ অনুধাবনে বিভ্রান্তিকর কিছু শব্দে) বিকল্প ছাড়া ও-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোথায কোথায় ও-কাব দেওযা উচিত তাব একটি তালিকা আমাদেব সামনে তুলে ধবেছেন। এব ফলে পূর্ববর্তী দুই প্রতিষ্ঠানেব সিদ্ধান্তেব মধ্যে যে অস্পষ্টতা রযেছে তা দূবীভূত হযেছে।

১০। **ং ঙ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের** কমিটি এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁবা হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং বা ঙ বাখতে চান। স্ববাশ্রিত হলে ঙ। **ঢাকা বাংলা একাডেমীব** প্রস্তাবে দোলাচলতা কম। তাঁবা প্রত্যয ও বিভক্তিহীন শব্দেব শেষে সর্বত্র ং এবং বিভক্তিযুক্ত শব্দেব ক্ষেত্রে ঙ লেখাব প্রস্তাব কবেছেন। **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি** এ ব্যাপাবে উচ্চাবণকে প্রাধান্য দিযেছেন। যেখানে উচ্চাবণে ঙ, ঙ্গ দুই প্রচলিত সেখানে শুধুমাত্র ঙ বাখতে চান। যেখানে উচ্চাবণে ঙ্গ আসছে সেখানে ঙ্গ বাখাব প্রস্তাব কবেছেন।

১১। **জ য ঃ** এক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানই প্রচলনকে বেশি গুরুত্ব দিযেছেন। কোনো বৈপ্লবিক বদ-বদল নেই।

১২। **ন-ণ ঃ** এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে তিনটি প্রতিষ্ঠানেব মধ্যে কোনো মতভেদ লক্ষ কবা যায না। প্রত্যেকেই তৎসম শব্দে ণত্ববিধান মানলেও অ-তৎসম ও বিদেশি শব্দে ন-কেই প্রাধান্য দিযেছেন।

১৩। **শ ষ স ঃ** তিনটি প্রতিষ্ঠানই তদ্ভব শব্দে মূলানুসাবে তিনটি স-ব্যবহাব কবেছেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয বিদেশি উচ্চাবণ অনুসাবে s স্থানে স, sh স্থানে শ লেখাব প্রস্তাব কবেছেন। তবে কিছু ব্যতিক্রম বযেছে। ঢাকা বাংলা একাডেমী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব অনুসবণ কবেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও কোনো নতুন পদক্ষেপ নেননি। উচ্চাবণ ও প্রচলনেব মধ্যে সমঝোতা কবে চলেছেন।

১৪। **বক্র এ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব** বানান কমিটি বক্র এ বোঝাতে বিদেশি শব্দেব আদিতে অ্যা এবং মধ্যে '্যা' লেখাব প্রস্তাব কবেছন। **ঢাকা বাংলা একাডেমী** তৎসম ও বিদেশি শব্দ ছাডা অন্য সকল শব্দে বিকৃত-অবিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কাব ব্যবহাবেব প্রস্তাব বেখেছেন। আবাব '্যা' কাব যুক্ত বহুল প্রচলিত তদ্ভব বা দেশি শব্দে '্যা'-কাব অব্যাহত বেখেছেন। **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিব** প্রস্তাব—বিদেশি শব্দেব ক্ষেত্রে শুধু অ্যা, আব অন্যত্র এ গোটা বর্ণ হিসাবে, এবং চিহ্ন হিসাবে যথাযোগ্য স্থানে ্যা, ্য, এ-কাব চিহ্নই ব্যবহৃত হবে। 'অ্যা' ধ্বনি বোঝাতে এ্যা বা এ্য লেখাব প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বর্জনীয মনে কবেছেন।

এখানে বানানেব সবাধিক বিতর্কিত নিযমাবলি সম্পর্কে তিনটি প্রতিষ্ঠানেব গৃহীত প্রস্তাবেব তুলনামূলক আলোচনা কবা হল। এই আলোচনাব পবিপ্রেক্ষিতে বলা যায আজ একবিংশ শতকে দাডিযে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব গৃহীত বানানবিষযক কিছু কিছু প্রস্তাবেব মধ্যে বক্ষণশীলতাব সঙ্গে আপসেব সুব শোনা গেলেও সেযুগে সেটুকু এডানো অসম্ভব ছিল। কাবণ তাঁবাই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বসম্মত একটি বিধি তৈবিব কথা ভাবেন। সেক্ষেত্রে খুব বেশি বৈপ্লবিক প্রস্তাব বানানবিধি তৈবিব উদ্দেশ্যকে ব্যাহত কবত। সেই তুলনায ঢাকা বাংলা **একাডেমীব** নিযমাবলি পবে গৃহীত হলেও তাতে খুব নতুনত্ব চোখে পডে না। ববং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীব নিযমাবলি অনেক বেশি যুগোপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য।

সূত্রনির্দেশ

১। A Grammar of the Bengal Language Nathaniel Brassey Halhed 1778 পৃষ্ঠা ৩।

২। নর্দামটনেব College Street Baptist Chapel এ সংবক্ষিত পত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশেষে

বানানচিন্তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত : সমস্যা ও সম্ভাবনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন যুগে বাংলা বানানের বিন্যাস এবং বাংলা বানান সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার মোটমুটি একটা কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই সমাপ্তির রেখা টানলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শুরু থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাঁরা বানান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁদের চিন্তাভাবনার মধ্যে স্পষ্ট দুটি প্রবণতা মুখ্যত লক্ষ করা যায়। এক ধরনের লেখা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে রক্ষণশীল মনোভাব প্রকট হয়েছে। এঁরা সনাতন প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র বিরোধী। অন্য আর এক ধরনের লেখায় দেখা যাচ্ছে, যেখানে রক্ষণশীলতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে নতুন কিছু ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। তবে নতুন যাঁরা ভাবছেন বা ভাবতে চাইছেন তাঁদের মধ্যেও আবার দুই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একশ্রেণির প্রবণতায় দেখা যায় বানান সংস্কার করতে গিয়ে প্রথা এবং অভ্যাসকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে নতুন কিছু ভাবনা সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্কারের জন্যই সংস্কার। এই ধরনের প্রবণতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কাজ করেছে। তাই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবে নিজের চিন্তাকেই নিরঙ্কুশভাবে স্থাপন করার চেষ্টা সমস্যাকে সমাধানের পথে নিয়ে যাওয়ার বদলে জটিলতার দিকেই নিয়ে গিয়েছে। ফলে এই প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হঠকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই আর এক ধরনের লেখা পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে কেবল সংস্কারের জন্যই সংস্কার করা হয়নি। একান্তভাবে যুক্তিশীলতার উপর নির্ভর করে সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এমনভাবে সমাধানসূত্র সুপারিশ করা হয়েছে যাতে সামাজিক অভ্যাসে তীব্র আঘাত লাগে না অথচ উপস্থিত সমস্যারও বাস্তবায়িত সমাধান হয়। সেদিক থেকে এই ধরনের ভাবনাকে যথার্থ প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করা যায়।

এই ধরনের প্রবণতাগুলি যে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পরপর এসেছে, তা নয়। একই সময়ে বিভিন্ন প্রবণতার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। আসলে এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতাগুলির পেছনে কাজ করছে সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। যাঁদের লেখায় রক্ষণশীল মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত প্রমুখ পাণ্ডতেরা। এঁরা যে 'বাংলা ব্যাকরণ' রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃতানুসারিতাই লক্ষ করা যায়। ভগবচ্চন্দ্র তাঁর ব্যাকরণ (১৮৪০) সম্পর্কে বলেছেন, 'মুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থূলার্থ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া সাধুভাষায়' এটি রচিত। ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ (১৮৪০) সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত হল 'এটি একপ্রকার সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়াস্বরূপ'। এই সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার বড়ো কারণ ভাষার একটি নির্দিষ্ট মান

তৈবি কবা। ভগবচ্চন্দ্র বিশাবদ তাঁব 'বঙ্গ সাধুভাষায় ব্যাকবণ সাবসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন : "সাধুভাষাব ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক কাবণ সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতীত সাধুভাষা বচনাদি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন।" (ভূমিকা)।

এব পাশাপাশি আব এক ধবনেব লেখা পাওযা যাচ্ছে, যেখানে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতেব ছাযা হিসাবে দেখা হচ্ছে না। বাংলাব নিজস্ব উচ্চাবণ-বৈশিষ্ট্য যাতে বানানে প্রতিফলিত হয সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কবা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ কবতে হয কিছু পূর্ববর্তী ন্যাথানিযেল ব্রাসি হ্যালহেডেব কথা। তিনি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা ব্যাকবণে' বাংলা ধ্বনি ও বর্ণমালাব অসংগতি নিযে আলোচনা কবেছেন। ফবস্টাব তাঁব 'Vocabulary in two parts English and Boangalee' (১৭৯৯) গ্রন্থেও এ বিষযে আলোচনা কবেছেন। উইলিযম কেবিও তাঁব ব্যাকবণেব প্রথম সংস্কবণে (১৮০১) এ প্রসঙ্গে আলোচনা কবেছেন, যদিও পববর্তীকালে তাঁব বচনা সংস্কৃত-ঘেঁষা হযে উঠেছে। এই ধাবায বাঙালিদেব মধ্যে বামমোহন বাযেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁব 'গৌড়ীয ব্যাকবণ' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে[৩] বাংলা ধ্বনি ও বর্ণমালাব অসামঞ্জস্য দৃষ্টান্ত সহযোগে তুলে ধবেছেন। প্রায একই সমযে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল হেবাল্ড' পত্রিকাতেও বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে অত্যাধুনিক প্রস্তাব প্রকাশিত হয। এই পত্রিকাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্বাবকানাথ ঠাকুব (১৭৯৪ ১৮৪৬), বামমোহন বায (১৭৭২ ১৮৩৩), প্রসন্ন কুমাব ঠাকুব (১৮০১-১৮৬৮), নীলবত্ন হালদাব (?-১৮৫৫) প্রমুখ মনীষীবা। বিভিন্ন ব্যক্তিব সামাজিক অবস্থানেব ভিন্নতাব জন্য আমবা একই সমযে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ কবি। সংস্কৃত পবিমন্ডলে পবিবর্ধিত এবং সনাতন ভাবধাবায বিশ্বাসী পণ্ডিতদেব ব্যাকবণে তথা ভাষা বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতানুসবণ ঘটেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যেব অধিবাসী হ্যালহেড, ফবস্টাব প্রমুখ ব্যক্তিবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিব অধিকাবী। তাই সংস্কাবমুক্ত মন নিযে তাঁবা বাংলা বর্ণমালাব অসংগতিগুলি দেখিযেছেন। বামমোহন বায সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত হলেও সমাজ-প্রগতিব পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কাবণে ধর্মীয অবস্থানেব ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত হিন্দুধর্মেব সংস্কাব কবে ব্রাহ্ম ধর্মেব সংগঠন কবেছেন তেমনই ভাষাচিন্তাব ক্ষেত্রেও তিনি বক্ষণশীলতামুক্ত উদাব দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয দিযেছেন। বামমোহন ও তাব সহযোগীদেব 'বেঙ্গল হেবাল্ড পত্রিকায তাই বিজ্ঞাননির্ভব আধুনিকতাব প্রতিফলন লক্ষ কবা যায। তবে যাঁবা চিবাচবিত প্রথা বা ঐতিহ্য ভেঙে বেবিযে আসতে চাইছেন অর্থাৎ সংস্কাব কবতে চাইছেন তাঁদেব চিন্তাব মধ্যেও কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। হ্যালহেড প্রমুখ বিদেশি লেখকবৃন্দ এবং বামমোহন প্রমুখ দেশীয লেখকবৃন্দেব আলোচনাব বৈশিষ্ট্য হল তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয মেলে কিন্তু সমকালেব পবিস্থিতিব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেখে কোন আদর্শ গ্রহণযোগ্য সে বিষযে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ পাওযা যায না।

এদিক থেকে উনবিংশ শতকেব মাঝামাঝি সমযে বিদ্যাসাগব এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন।[৪] তিনি নতুন কিছু ভেবেছেন, তবে তা পুবাতনকে পুবোপুবি নস্যাৎ কবে নয। তিনি বানান সংস্কাবেব প্রযোজনীযতা অনুভব কবে তাব প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণমালা সংস্কাবেব কাজে উদ্যোগী হযেছিলেন। তবে বামমোহন বায প্রমুখ পন্ডিতেবা বাংলা ধ্বনিদ্যোতক নয বলে বাংলা বর্ণমালা থেকে যে সকল বর্ণ বাদ দিতে চেযেছিলেন বিদ্যাসাগব তাঁব সংকলিত বর্ণমালা থেকে সেগুলি বাদ দেন নি। তাই বলে তিনি যে বাংলা ধ্বনিব স্বাধীনতা সম্পর্কে

উদাসীন ছিলেন তা নয়। বাংলা বর্ণমালা থেকে দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ৯-এর বর্জন ঘটানো বিদ্যাসাগরের বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতনতারই পরিচায়ক। বর্ণমালায য়, ড় এবং ঢ়-এর অবতারণা সম্পর্কেও একই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। আসলে বাংলা ভাষায় যে বিপুল পরিমাণ তৎসম শব্দের ব্যবহার রয়েছে, বিদ্যাসাগর সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই কারণে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে, এমন এক বর্ণমালা প্রণয়ন করেন। এইভাবে ঐতিহ্যকে মেনেও নতুন চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বলেই তাঁর প্রবর্তিত বর্ণমালা আজও সমানভাবে গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগরের এই প্রবণতার পেছনে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় বাখা। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতো দুঃসাহসিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিলেও তিনি শাস্ত্রকে অস্বীকার না করে শাস্ত্রের মধ্যেই বিধবাবিবাহের সমর্থন খুঁজে নিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সামাজিক বিচারে আধুনিক কর্মসূচি। কিন্তু সেই কর্মসূচির পেছনে বয়েছে পুবনো শাস্ত্রাদির সমর্থনেব ভিত্তি। বিদ্যাসাগর এইভাবে তাঁর সংস্কাব আন্দোলনে পুরাতন ও নূতনেব মধ্যে সমন্বয ঘটিয়েছেন, তুলে ধরেছেন সামাজিক ভাবসাম্যের বিবল দৃষ্টান্ত। এই ভাবসাম্যই বিদ্যাসাগবের ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাষাচিন্তা তথা বানানচিন্তার মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বের এই ভাবসাম্যপ্রবণতা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরেব পববর্তীকালে বহু লেখা পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে কেবল বর্ণমালা নয়, বাংলা বানানেব গঠন-প্রকৃতি কেমন বা কেমন হওযা অভিপ্রেত সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বযেছে। এই সব লেখায সংস্কৃতঘনিষ্ঠতা যেমন বয়েছে, তেমনি বাংলা বানানকে সংস্কৃতের ছাযা থেকে মুক্ত কবাব প্রবণতাও বযেছে। তবে সংস্কৃতেব ছাযা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হঠকাবী প্রস্তাব রাখা হযেছে যা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যা বা জটিলতা বাডিযেছে। অবশ্য এব মধ্যেও কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তিব প্রস্তাব পাচ্ছি যার প্রয়োগিক উপযোগিতা যথেষ্ট। এঁদেব মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ কবতে হয, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব (১৮৬১-১৯৪১) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২), জ্যোতির্ময ঘোষ (১৮৯৫-১৮৬৫), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৮২) প্রমুখ ব্যক্তিত্বেব কথা। তবে এঁদেব মধ্যে বাংলা বানানকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাবণ সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁব সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং নব নব উন্মেষশীলতা তাঁকে সামাজিকভাবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাব অধিকাবী করেছে। তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রধান আধার বাংলা ভাষাব ক্ষেত্রেও তাঁব বিবিধ প্রবর্তনা বিশেষভাবে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেইসূত্রে তাঁর বানানচিন্তাও বাঙালি সমাজের কাছে বিশেষ প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি বিশেষ সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর অন্তর্গত হলেও মানসিকভাবে তিনি আমাদেব পবিবর্তমান পবিস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। সেই অনুসারে তিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার পক্ষপাতী। তাঁর বানানচিন্তার ক্ষেত্রেও এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাই তাঁব দীর্ঘ দিনের বানানচিন্তার মধ্যে দেখা যায়, তিনি আগাগোড়া ভাষাচর্চার বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বানান সংস্কারের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেছেন এবং সমস্ত বকম পূর্বসংস্কার বর্জন করে বানান সম্পর্কে এমন মত প্রকাশ করেছেন

যা একদিকে স্থিতাবস্থাকে বিচলিত করেছে, অন্যদিকে সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে মনে রেখে বানানকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ বানানচিন্তায় যথার্থই প্রগতিশীল।

এইসব ব্যক্তিগত বানান-চিন্তার বাইরে বাংলা বানান-চিন্তা বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান কমিটির প্রচেষ্টায় তবে এক্ষেত্রেও কমিটির সদস্যদের সামাজিক অবস্থান সক্রিয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার যে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সেখানে প্রচুর বিকল্পের ব্যবহার, অসংগতি, স্ববিরোধ বা সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা রয়েছে। আসলে এই প্রবণতাগুলির বড়ো কারণ কমিটির নিয়ম-প্রণেতাদের মধ্যবিত্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব। দ্বিধাগ্রস্ততা, আপসপ্রবণতা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিভিন্ন ঝোঁক সমিতির প্রবর্তিত প্রায় প্রতিটি বিধিতেই লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পুস্তিকাগুলির সংস্করণগত পরিবর্তন আলোচনা করলেই তা আরও স্পষ্ট হয়।

বানানসমিতির বাইরেও বানান নিয়ে পরবর্তীকালে বহু লেখা পাওয়া গিয়েছে। সব লেখাই যে বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বরা লিখেছেন তা নয়, বহু সাধারণ মানুষও আগ্রহের বশবর্তী হয়ে এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। আসলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব এই বানান-সংস্কার সমাজজীবনে বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল। এর ফলে বানান-চিন্তার পরিসর অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময়কার লেখাগুলি বিশ্লেষণ কবলে তার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠা, বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ বেশি লক্ষ করা যায। তবে রক্ষণশীল লেখা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। এই সময়পবিধিতে (১৮৯৪-১৯৮৫) আছেন দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো লেখক, যিনি সংস্কৃতের ঐতিহ্য থেকে বাংলা বানানকে মুক্ত করতে মোটেই রাজি নন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায, বাংলা বানানকে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে লেখাব প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হযেছে। তবে সংস্কার করতে চাইলেও রাতারাতি জোর করে কিছু সমাজের উপর চাপিয়ে দেওযা সম্ভব নয়, এই বোধও সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে। এ প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সবকারের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

'পুকুরের মধ্যে ঢিল-ছুঁড়ে-জাগানো ঢেউ-এর মত তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে এবং কালক্রমে অভিধানের প্রাথমিক এন্‌ট্রি হয়ে উঠবে। "কুটির" যেমন এর মধ্যেই "কুটীর" কে প্রতিযোগিতায় পরাভূত করতে চলেছে। ভাষার বিশেষ নিয়মেব মতো বানানের নিয়মও এ ভাবেই ছড়ায়। এখানে সংস্কার-সমিতির চাপিয়ে দেওয়া নীতি কতটা কার্যকব হবে তাতে বেশ সন্দেহ আছে।"[৫]

তবে বাংলা বানানচিন্তা যে ক্রমপ্রসারশীল তার বড়ো প্রমাণ বানান-সংক্রান্ত গ্রন্থাদির উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি। এই সংখ্যাবৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই-এর দশকে বিশেষভাবে লক্ষণীয। এই সময়সীমাব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে বানান সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, অভিধান বহু বচিত হয়েছে, যা বানান সমস্যা সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিচায়ক।

এ প্রসঙ্গে শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের "বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান বানান ভুল" (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭২ সন ৯ . ১ পৃঃ ৪৮-৬০) প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। এই প্রবন্ধে লেখক মূলত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ক্রমবর্ধমান বানান ভুলের শতকরা হিসাব দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পশ্চিমবাংলা ও

পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিত বই-পত্রের গড়পড়তা বানানভুলের তুলনামূলক হার দেখিয়েছেন। এখানে পরিসংখ্যানটি তুলে দেওয়া হল ঃ

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম বাংলা
১৯৮৫	.১১%	.০৬%
১৯৫৮	.১২%	.০৮%
১৯৬০	.১৪%	.০৯%
১৯৬২	.১৬%	.১০%
১৯৬৪	.১৭%	.১১%

এই হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার। সাম্প্রতিককালের কোনো শতকরা হিসাব আমাদের জানা নেই। তবে এই পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় বানানভুলের আনুপাতিক হার কম—এটা একদিকে আশার কথা, কিন্তু অন্য দিকে এটা কোনো আত্মশ্লাঘার বিষয়ও নয়। কারণ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রচাব-মাধ্যমে আজও বিচিত্র ধরনের বানানভুল অহরহ চোখে পড়ে এবং সেই ভুলেব মাত্রা ক্রমবর্ধমান বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আসলে বানান-প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হলেও বানান-প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো কেন্দ্রীয় মানদন্ড বা অনুশাসনের প্রতি সামাজিক আনুগত্যের অভাবে বানান-চর্চার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলি এখন অহরহ মানুষকে বিভ্রান্ত কবছে। টেলিভিশন শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। তাই বানানের একরূপতা রক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ হযে উঠতে পারে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু টেলিভিশন সেই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। 'দেবাশিস' বানানটি 'দূরদর্শনের' একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকাবীদের নামের তালিকায় তিনবার ভিন্ন ভিন্ন বানানে (যথা--দেবাশীষ, দেবাশিষ, দেবাশিষ) দেখানো হল। 'ভট্টাচার্য' বানানটি কখনো দ্বিত্বযুক্ত করে লেখা হয (যথা, ভট্টাচার্য্য) ; আবার কখনো দ্বিত্বছাড়া। এই ধরনের অজস্র ভুল বানান বা বিকল্প বানান প্রতিনিয়ত টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনো সচেতনতা বা সক্রিয় উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না।

মুদ্রণ মাধ্যম তথা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। পণ্যদ্রব্যটির সংবাদ জ্ঞাপনই সেখানে মূল লক্ষ্য, শুদ্ধ বানানে তা প্রচার করা নয়। শুধু বিজ্ঞাপন কেন, দোকানের নাম বা সাইনবোর্ডেও যথেচ্ছ বানান লেখা হচ্ছে। পূর্ব রেলপথের বনগাঁ শাখার 'দুর্গানগর' স্টেশনেব দেওযালে 'দুর্গানগব' নামটি লেখা হচ্ছে দীর্ঘ উ-কাব দিয়ে (যথা, দূর্গানগর)। বাস ট্রামের গায়ে যে দু-চারটি বাক্য লেখা তাকে, সেখানেও বানানে অশুদ্ধি লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সল্টলেক দক্ষিণেশ্বর রুটের '৩২এ' বাসের কথা বলা যায়। 'মাল নিজের দায়িত্বে রাখুন'—এই বাক্যটিব 'দায়িত্ব' বানানটি কোথাও লেখা হয়েছে 'দায়ীত্ত, কোথাও বা 'দাইও', কোথাও 'দায়ীত্ব' ইত্যাদি। শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, এরকম উদাহরণ যাতায়াতের পথে অহরহ চোখে পড়ে। সবচেয়ে ভাবনার বিষয়, এর জন্য বিজ্ঞাপন-প্রদর্শক ও বিজ্ঞাপন-দর্শক কোনো পক্ষেরই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সামাজিক স্তরে মানুষের মধ্যে বানান সচেতনতা না এলে নিয়ম করে বানানের একরূপতা রক্ষা করা অসম্ভব। এই কারণেই

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বানান সংস্কাবেব ষাট বছ্ব পবও অধিকাংশ নিযম-পুস্তিকাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে , সাধাবণেব কাছে ব্যাপকভাবে পৌছাযনি।

কিন্তু সাধাবণেব কাছে পৌছানোব দাযিত্ব যাঁদেব অর্থাৎ যাঁবা বানান নিযে চিন্তাভাবনা কবছেন আমাদেব আলোচনাব লক্ষ্যস্থল তাঁবাই। তাঁদেব বানান-প্রযোগ ও বানান-চিন্তাব ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ কবলে তাব মধ্যে দু-ধবনেব প্রবণতা লক্ষ কবা যায ঃ (১) কেন্দ্রাতিগ (২) কেন্দ্রাভিগ। বানান সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কেন্দ্রগত ধাবণাব সাপেক্ষতা না কবে যাঁবা ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন ধাবণাব দ্বাবা চালিত হন তাঁদেব প্রবণতাকে 'কেন্দ্রাতিগ' বলা যায। অন্যদিকে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেব ভাবনায একটি কেন্দ্রীয নীতিব প্রতি আনুগত্য লক্ষ কবা যায তাঁদেব ধাবণাকে কেন্দ্রাভিগ আখ্যা দেওযা যায। এই কেন্দ্রাতিগ প্রবণতাকে সামাজিক স্তবে অন্তত কিছুটা নিযন্ত্রণ কবতে না পাবলে বানানেব প্রযোগক্ষেত্রে এই অনভিপ্রেত নৈবাজ্য দূব কবা সম্ভব হবে না। তাই এই ব্যাপাবে কিছু কার্যকব প্রস্তাব এখানে তুলে ধবা হল ঃ

প্রথমত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয বা এ জাতীয স্তবে পাঠ্যপুস্তকেব বানানশুদ্ধিব দিকে বিশেষভাবে নজব দিতে হবে। বিশেষত, বিদ্যালয স্তবে ছাত্র-ছাত্রীবা যে বিভিন্ন ধবনেব বই পডছে সেগুলিব বানানে যাতে একরূপতা বজায থাকে সেদিকে কর্তৃপক্ষকে কডা নজব বাখতে হবে। সেই কাবণেই একটি বিশেষ বানানবিধি যাতে মানা হয, সে বিষযে কেন্দ্রীয চাপ সৃষ্টি কবা দবকাব। সুখেব বিষয, পশ্চিমবঙ্গেব প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সম্প্রতি এ ব্যাপাবে সক্রিয ভূমিকা নিযেছেন। ২০০৪ সালে যে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হযেছে তাব পাঠ্য বইতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিব বানানবিধি অনুসবণ কবাব নিদেশ দেওযা হযেছে। এতে কিছু বিতর্কেব সূচনা হলেও শিক্ষাজগতেব প্রধান অংশ এই চেষ্টাব প্রযোজনীযতা স্বীকাব কবে নিযেছে।

দ্বিতীযত, শুধু পাঠ্যপুস্তকই নয, অন্যান্য বিষযেব যত বই বা পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা থেকে ছাপা হচ্ছে তাব সর্বত্র যাতে নির্দিষ্ট বানানবিধি অনুসৃত হয সে বিষযে একটি সামাজিক ঐকমত্য সৃষ্টি কবা দবকাব। প্রযোজনে প্রত্যেক প্রকাশন সংস্থাকে উক্ত বানানবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রুফ বিডাব নিযোগে উদ্বুদ্ধ কবতে হবে। লেখকেবা পাণ্ডুলিপিতে যে-বানানই লিখুন না কেন বই ছাপাব সময তাব বানান নির্দিষ্ট বানান-বিধি অনুসাবে প্রুফবিডাবেব দ্বাবা সংশোধিত হবে। তাতে প্রত্যেকটি বইযে একই বানানবীতি অনুসৃত হবে। বিদেশেব পত্র পত্রিকায এই উদ্দেশ্যে লেখকদেব কাছে নির্ধাবিত style-sheet ব্যবহাবেব নিদেশ থাকে। এই বীতি এখানেও চালু কবা যেতে পাবে। নির্ভুল ছাপাব জন্য প্রকাশকদেব বার্ষিক পুবস্কাব দেওযাব ব্যবস্থা কবলে প্রকাশকবা উৎসাহিত হতে পাবেন।

তৃতীযত, বিভিন্ন দৈনিকপত্র প্রত্যহ আমাদেব সমাজেব বৃহত্তব অংশেব কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এব ফলে বাবংবাবতাব দিক থেকে বিশেষ বানানবিধিকে প্রতিষ্ঠিত কবাব ক্ষেত্রে দৈনিকপত্রেব বডো ভূমিকা বযেছে। সেইকাবণেই প্রতিটি দৈনিকপত্রে যাতে একই ধবনেব বানান থাকে এবং সেই বানান যাতে নির্দিষ্ট বানানবিধিকে অনুসবণ কবে সে ব্যাপাবে বিশেষভাবে লক্ষ বাখতে হবে। এব জন্যও চাই সামাজিক ঐকমত্য যা একমাত্র ভাষাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব মাধ্যমেই গডে তোলা সম্ভব।

চতুর্থত, টেলিভিশন প্রসঙ্গ। আধুনিককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী গণমাধ্যম টেলিভিশন। বর্তমানে বৈদ্যুতিক সরবরাহ আছে এরকম যেকোনো গ্রামে পৌঁছে গেছে এই প্রচারমাধ্যমটি। সুতরাং মানুষকে সর্বপ্রকার সচেতনতা দেবার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, সরকারি 'দূরদর্শন' সহ অন্যান্য বেসরকারি টি ভি চ্যানেলগুলি এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন। এই ঔদাসীন্য বিদেশি চ্যানেলে দুর্লক্ষ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষভাবে জনপ্রিয় ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামের যে তালিকা দেখানো হয়, তার বানানে ভুলের আধিক্য সাধারণ সাক্ষর মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন টি. ভি. চ্যানেলের কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। টি.ভি চ্যানেলের সমস্ত অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞপ্তির বানান যাতে নির্দিষ্ট বানানবিধি অনুসারী হয় ়া লক্ষ রাখার জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য গণসংগঠন তৈরি করার কথা ভাবা যেতে পারে। মাতৃভাষাপ্রেম ও শিক্ষানুরাগই হবে এই ধরনের গণসংগঠনের মেরুদণ্ড।

পঞ্চমত, আমাদের চারিদিকে বহু সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞপ্তি আমাদের চোখে পড়ে যেখানে বহু পরিচিত শব্দের অশুদ্ধ বানান (যেমন 'দূর্গা') দেখে নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। শুধু দোকানের সাইনবোর্ডই নয়, বড়ো বড়ো রেলস্টেশনের নাম, বাস বা ট্রামের গায়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তির বানানেও প্রচুব ভুল থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অনুমোদনকারী সংস্থা থেকে ট্রেড লাইসেন্স পাবার সময়ই আবেদনকারী দোকানে প্রদর্শিত সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞপ্তির বানান পরীক্ষা করিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অথবা, দোকানে ভুল বানান প্রদর্শিত হলে পৌরসভা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যথা—লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে। অন্যদিকে বিজ্ঞাপন বা সাইনবোর্ড নির্ভুল হলে শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজ আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হলেও একেবারেই তা নয়। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দদূষণেব মতো অশুদ্ধ বানানেও একধরনের দৃষ্টিগ্রাহ্য শব্দদূষণ ঘটে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক ভারসাম্যহীনতারই পবিচয় বহন করে।

ষষ্ঠত, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার নিয়োগে এখন বাংলা জানা আবশ্যিক হয়েছে। এই সব সংস্থার নিযোগ ও পদোন্নতির পরীক্ষাব প্রশ্নপত্রে বাংলা বানানেব শুদ্ধতাব উপর যদি বিশেষ গুরুত্ব দেওযা হয় তবে বানানের মান্যতা সম্পর্কে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

সপ্তমত, বানান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের উপভোগ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কবা যেতে পাবে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বানান নিয়ে ছোটো ছোটো নাটিকা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, টেলিভিশনে চিত্তাকর্ষক সিরিয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় থাকতে পারে। পাড়ার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, রেডিয়ো ও টি. ভি. চ্যানেলের মাধ্যমে এগুলির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সবশেষে একথা বলতেই হয় যে, বানান নিযে নৈরাজ্য আজ যেখানে পৌঁছেছে তাতে কোনো বানানবিধি তৈরি করে এবং শুধু মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ করে রাখলে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। এরজন্য চাই সর্বস্তরে সামাজিক চাপ। সামাজিক স্তরে ভাষা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা জাগাতে হবে। আমাদের মাতৃভাষার লিখিত

অনুশীলনকে শুদ্ধভাবে রূপদান করা আমাদের কর্তব্য—এই সাংস্কৃতিক বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলন বহাল থাকলে বানান নিয়ে এই অনভিপ্রেত ভারসাম্যহীনতা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। শ্রী ভগবচন্দ্র বিশারদ—বঙ্গ সাধুভাষার ব্যাকরণ সারসংগ্রহ। (প্রথম প্রকাশ-১৮৪০)—শ্রী ব্রজকিশোর গুপ্ত। বঙ্গভাষা ব্যাকরণ। কলিকাতা ১৮৪০।

২। Nathaniel Brassey Halhed : A Grammar of the Bengal Language, 1778.

৩। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার Unitaraian Press থেকে রামমোহন রায়েব ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বই মুদ্রিত হয়। বইটির নাম "Bangalee Grammar in English Language." ১৮৩৩ খিস্টাব্দে প্রকাশিত বামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থটির সঙ্গে এর সূক্ষ্ম তারতম্য থাকলেও 'গৌড়ীয ব্যাকরণ' ঐ ইংবেজিতে রচিত ব্যাকবণখানি অবলম্বনেই রচিত।

৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : "বিদ্যাসাগর" নতুন সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, বিনয় ঘোষ : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ড. নির্মল দাশ : 'বিদ্যাসাগর ও বাংলা ব্যাকরণ'। প্রবন্ধটি লেখকের 'ভাষা পবিচ্ছেদ' (প্রথম প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৫। ড. পবিত্র সরকাব বাংলা বানান সংস্কাব সমস্যা ও সম্ভাবনা। কলিকাতা ১৯৮৭। পৃষ্ঠা-৬১।

পরিশিষ্ট

আকরপঞ্জি

(১) অভিধান

১। A Dictionary in Bengalee and English by Tarachand Chukruburtee. Baptist Mission Press, 1827.

২। A Dictionary in Persian and English by Ramdhun Sen. Calcutta Baptist Mission Press, 1829.

৩। চলন্তিকা। রাজশেখর বসু। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩শ সংস্করণ : ১৯৭৩।

৪। পারসীক অভিধান। শ্রী জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুর, ১২৪৫ সাল।

৫। পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান। সংগ্রাহক নীলকমল মুস্তোফী।

৬। বঙ্গভাষা ব্যাকরণ। শ্রী ব্রজকিশোর গুপ্ত। কলিকাতা-১৮৪০।

৭। বঙ্গভাষাভিধান। শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

৮। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ। রেভারেণ্ড জে-কিথ। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। সেপ্টেম্বর, ১৮৩৯।

৯। বঙ্গ সাধুভাষার ব্যাকরণ সারসংগ্রহ। ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ। ১৮৪০।

১০। বঙ্গাভিধান। শ্রীহলধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুর, ১৮৪৬।

১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম প্রকাশ ১৩৪০-৫৩। সাহিত্য অকাদেমী। ২য় খন্ড, ১৯৬৬। ১৯৬৭।

১২। বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। বাংলা একাডেমী. ঢাকা। ২য় খন্ড ১৯৭৪। ১৯৮৪।

১৩। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ১ম প্রকাশ : ১৩২৩ (১৯১৬-১৭)। ২য় সংস্করণ : ১৩৪৪ (১৯৩৭-৩৮)। পুনর্মুদ্রণ : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯।

১৪। বানানের অভিধান। অরুণ সেন। ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

(২) পুরাতন পুস্তক

১। A grammar of the Bengal Language. Nathaniel Brassey Halhed. Hooghly, 1778.

২। A Dictionary of the Bengalee Language, Vol.1.William Carey. Serampore, 1815.

৩। A vocabulary in two parts : English and Bangalee and Vice Versa. H.P. Forster. Feris and Co. Calcutta. Vol.i.1799. Vol.ii 1802.

৪। Regulation for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adaulut. Jonathan Duncan. Calcutta. At the Honorable Company Press, 1785.

৫। " ইঙ্গরাজি বাঙালি বোকেবিলরি"। এ. আপজন। দি ক্রনিকল প্রেস, কলকাতা। ১৭৯৩।

৬। কথোপকথন। উইলিয়ম কেরি। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ।

৭। কপালকুন্ডলা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ (১ম সংস্করণ), ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ (৪র্থ সংস্করণ)।

৮। কলিকাতা কমলালয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ।

৯। কলিকাতার নুকোচুরি। টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার) ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

১০। কাদম্বরী। তারাশঙ্কর তর্কবত্ন। প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ,১৮৫৮খ্রিস্টাব্দ, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ।

১১। কুলীন কুলসর্বস্ব। রামনারায়ণ তর্করত্ন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

১২। কৃষ্ণচরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ।

১৩। গৌড়ীয় ব্যাকরণ। রামমোহন রায়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৪। চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

১৫। চারুপাঠ। অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৫৩-৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

১৬। তোতা ইতিহাস। মুন্সী চন্ডীচরণ। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ।

১৭। দুর্গেশনন্দিনী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

১৮। দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৯। দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ।

২০। নবীন তপস্বিনী। দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

২১। নীলদর্পণ। দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ।

২২। পথ্য প্রদান। রামমোহন রায়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ।

২৩। প্রবোধ চন্দ্রিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ।

২৪। পারিবারিক প্রবন্ধ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ।

২৫। পাষণ্ড পীড়ন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ।

২৬। পুরুষপবীক্ষা। হবপ্রসাদ বায। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।

২৭। বর্ণপবিচয (১ম ভাগ, ২য ভাগ)। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব। প্রথম প্রকাশ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

২৮। বাহ্যবস্তুব সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচাব। অক্ষযকুমাব দত্ত। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।

২৯। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওযা উচিত কিনা এতদ্বিষযক প্রস্তাব। বিদ্যাসাগব। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

৩০। বিধবাবিবাহেব শাস্ত্রীযতা ও যুক্তিযুক্ততা। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৩১। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩২। বোধোদয। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ।

৩৩। ভ্রান্তিবিলাস। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩৪। মহাভাবত। শ্রীবামপুব মিশন প্রেস, ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ।

৩৫। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাযস্য চবিত্রম। বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩৬। বামাযণ। শ্রীবামপুব মিশন প্রেস, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৩৭। বোমাবতী। বামগতি ন্যাযবত্ন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ।

৩৮। সমাজ সংস্কবণ। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩৯। সহমবণ বিষযক প্রবর্তক নিবর্তকেব দ্বিতীয সম্বাদ। বামমোহন বায। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ।

৪০। সীতাব বনবাস। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

৪১। সুশীলাব উপাখ্যান। মধুসূদন মুখোপাধ্যায। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ।

৪২। হিতোপদেশ। গোলোকনাথ শর্মা। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ।

(৩) পত্রিকা

১। জন্মভূমি ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩, ১৮৪৪, ১৮৪৫, ১৮৪৬, ১৮৫৫, ১৮৭৮, ১৯১৪, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।

৩। দিগদর্শন ১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ।

৪। দেশ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৫। নব্যভাবত ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

৬। পবিবর্তন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

৭। প্রবাসী ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৭, ১৩৬২, ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৪, ১৩৪৬, ১৩৪৯, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৬৩, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

৮। বঙ্গদর্শন ১২৮৫, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

৯। বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা) ১৩৬৪, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯।

১০। বিচিত্রা ১৩৪০, ১৩৪১ ১৩৪২, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

১১। বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

১২। ভাবতবর্ষ ১৩২৮, ১৩২৯ ১৩৩৮ ১৩৩৯ ১৩৪১, ১৩৪২ ১৩৪৩, ১৩৪৪ ১৩৪৬ ১৩৬২, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

১৩। ভাবতী ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

১৪। মানসী ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

১৫। মাসিক বসুমতী ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

১৬। সংবাদ প্রভাকব ১৮৪০ ১৮৫১, ১৮৫৯ ১৮৬০ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ।

১৭। সবুজপত্র ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

১৮। সমাচাব চন্দ্রিকা ১৮৭৭ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

১৯। সমাচাব দর্পণ ১৮১৮ ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ।

২০। সাহিত্য পত্রিকা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

২১। সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩১৮ ১৩১৯ ১৩২০ ১৩২৪ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

২২। সোমপ্রকাশ ১৮৬২ ১৮৬৩

(৪) বই ও প্রবন্ধ

১। Five hundred years of printing S H Steinberg Penguin 1974

২। The Printing Press in India A K Priolkar Bombay, 1956

৩। The origin and development of the Bengali language Suniti Kumar Chatterji 1st pub Calcutta University 1926 New ed 3 Vols Rupa and Co 1985

৪। The Oxford History of India Smith 1928

৫। আনন্দবাজাব পত্রিকা। বানান-বিধি। প্রাথমিক প্রস্তাব (তাবিখ নেই)

৬। চলতি ভাষাব বানান। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

৭। দুই শতকেব বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। চিত্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত। কলিকাতা, জুন ১৯৮১।

৮। ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। মুহম্মদ আবদুল হাই। ঢাকা, ১ম সংস্কবণ, নভেম্বব ১৯৬৪। ২য সংস্কবণ, ডিসেম্বব ১৯৬৭।

৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান সংস্কার প্রস্তাব। বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের অনুলিপি। (১৯৮৮)

১০। প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা। নরেন বিশ্বাস।

১১। প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৬।

১২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। দীনেশচন্দ্র সেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৬ নবম সংস্করণ।

১৩। বাগর্থ। শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৫০।

১৪। বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা। সমতট প্রকাশনী। প্রকাশক : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত। বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৫। বাঙলা ভাষা। হুমায়ুন আজাদ ও অন্যান্য সম্পাদিত। ঢাকা, ১৯৮৪।

১৬। বাঙলা বানানবিধি। পরেশচন্দ্র মজুমদার। কলিকাতা, ১৯৮২।

১৭। বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯১।

১৮। বাংলা গদ্যরীতি। মুনীর চৌধুরী। ঢাকা, ১৯৭০।

১৯। বাংলা বানান। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৩য় সংস্করণ · কলিকাতা ১৯৮৭।

২০। বাংলা বানান সংস্কার। একটি ভিত্তিপত্র। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

২১। বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা। পবিত্র সরকার। কলিকাতা ১৯৮৭।

২২। বাংলা বানানের নিয়ম। মাহবুবুল হক। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

২৩। বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম। রমেন ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৯০।

২৪। বাংলা বানানের নিয়ম : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার সমিতির প্রবর্তিত - বাংলা বানানের নিয়ম সংক্রান্ত পুস্তিকা (১৯৩৬, ১৯৩৭)।

২৫। 'বাংলা বানানের নিয়ম' সমিতির প্রস্তাব। সমিতির সভাপতি অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৯)।

২৬। বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ শরীফ ও অন্যান্য সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৮।

২৭। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। মুহম্মদ সিদ্দিক খান। ঢাকা, ভাদ্র ১৩৭১।

২৮। বাংলা লেখার নিয়মকানুন। হায়াৎ মামুদ। প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯২।

২৯। বাংলা শব্দতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। ১৩৯২ (১৯৮৫)।

৩০। বাংলা সাময়িকপত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৮৫।

৩১। বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক। সবিতা চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭২।

৩২। বাঙ্গলা ভাষা ও বানান। দেবপ্রসাদ ঘোষ। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

৩৩। বানান ও উচ্চারণ। জামিল চৌধুরী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৪। বানান বিতর্ক। নেপাল মজুমদার সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা ১৯৯২।

৩৫। বানান বানানোর বন্দরে। ক্ষুদিরাম দাস। কলিকাতা, ১৯৯৩।

৩৬। বিদ্যাসাগর। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৩৭। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ। পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

৩৮। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান প্রবন্ধ। শ্রী নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

৩৯। ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নতুন মুদ্রণ, রূপা, কলিকাতা ১৯৮৮।

৪০। মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা। যোগেশচন্দ্র বাগল। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৮২।

৪১। যখন ছাপাখানা এলো। শ্রী পান্থ। কলিকাতা, জুলাই, ১৯৭৭।

৪২। শব্দ নিয়ে লেখা। কুন্তক (শঙ্খ ঘোষ)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮১।

৪৩। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবির উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা। স্থান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা। ২১-২৩ অক্টোবর ১৯৮৮।

৪৪। জাতীয় কর্মশিবির সুপারিশমালা (১৯৮৮)।

৪৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণ, ১৩৫৬।

নির্ঘন্ট

অক্ষয়কুমার দত্ত ৭৩
অজরচন্দ্র সবকার ২২১
অনুকূল চন্দ্র বসু ৯২
অবনীমোহন চক্রবর্তী ১০৮
অমলানন্দ ঘোষ ১২৮
অমিতাভ চৌধুরী ১৮৭
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৯৯, ২০০
অরুণ কুমার বসু ৭৯
অরুণ সেন ২২২, ২২৭
অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ৮৭
অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬, ২০২
অ্যাট দি অনারেবল কোম্পানীস প্রেস ৫৮

'আনন্দবাজাব' পত্রিকা ১৩৪, ১৪০, ২১২, ২১৯
আনন্দবাজাব প্রকাশন ২১২
আপজন এ. ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯
আবদুল কাইউম ২১, ২২
আবদুল হাই ২৩০
আশুতোষ ভট্টাচার্য ১২৭, ১৭১
আহমদ শরীফ ২০

'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' ৫৪, ৫৯
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫, ২৫০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ৭৩, ৮২, ২৪৯

উইলকিন্স চার্লস্ ৫৩
উমাদাস গুপ্ত ১৩১

'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ৫৩, ৫৬, ৮১
এনড্রুস ৫৩
এনামুল হক ২০

'কর্ণওয়ালিশ কোড' ৫৯
'কথামালা' ৭৭
'কপালকুণ্ডলা' ৭৫
কমলাকান্ত বসু ১৭৬
কলিকাতা কমলালয় ৬৬, ৭২
কামাখ্যাচরণ বসু ১২৯
কাশীনাথ তর্কপাঞ্চানন ৬৫, ৭২
ক্যালকাটা ক্রনিকাল ৫৮, ৫৯
ক্যালকাটা গেজেট ৫৪, ৫৯
ক্যালিগ্রাফি ২০
কুদরাত এ খুদা-শিক্ষা কমিশন ২৩৬
'কুলীনকুলসর্বস্ব' ৭৩
'কৃত্তিবাস' পত্রিকা ১৯০
'কৃষ্ণচরিত্র' ৭৫
কেরি, উইলিয়াম ৮১, ২৪৯
ক্রনিকল প্রেস ৫৪, ৫৭, ৫৯
ক্ষুদিরাম দাস ২০১, ২২০
ক্ষেত্র গুপ্ত ২০০

গঙ্গকিশোর ভট্টাচার্য ৫৫
গোবর্ধন শাস্ত্রী ১৫৯, ১৬৭, ১৮৩
'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ৮২, ২৪৯

'চন্দ্রশেখর' ৭৫
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৪৩
'চারুপাঠ' ৭৫

জগন্নাথ চক্রবর্তী ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ৬৭, ৬৮
'জন্মভূমি' পত্রিকা ৮৫
জাতীয় শিক্ষাকমিশন ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি ২৩৬
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২৩৬, ২৩৯
জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ ১৩৪
'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' ৬৫, ৬৮, ৬৯

ডানকান, জোনাথন ৫৮

ণ-কার প্রদীপ ৫১

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৪, ১৪২
'তোতা ইতিহাস' ৬৩, ৬৪

'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১
দীনেশচন্দ্র সেন ৬৮
'দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ' ৬৫, ৬৬, ৬৯
দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৭৮, ১৭৯, ১৮১
'দেশ' ১৭৭, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮
'নব্যভারত' পত্রিকা ৮৬
নরেন্দ্র দেব ১৩৬
নিরঞ্জন নিয়োগী ১৩০
নীলকমল মুস্তোফী ৬৮

পঞ্চানন কর্মকাব ৫৩
'পথ্যপ্রদান' ৬৫, ৭২
পবিত্র সরকার ১৯৭, ১৯৮, ২০৭-২১০, ২৫১
'পরিবর্তন' পত্রিকা ১৯৬
পরিভাষা সমিতি ১৪৩, ১৪৪
পরেশচন্দ্র মজুমদাব ২০২-২০৭
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৭, ২০১
'পারসীক অভিধান' ৬৮
'পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান' ৬৮
'পারিবারিক প্রবন্ধ' ৭৬
'পাষন্ডপীড়ন' ৬৫, ৬৬, ৭২
'পুরুষপরীক্ষা' ৬৫, ৭১
পুরুষোত্তমদেব ৫১
প্রবাসী ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১৩০
প্রবোধচন্দ্র সেন ১৮৮
'প্রবোধচন্দ্রিকা' ৬৫, ৬৬, ৭২
প্রমিত বাংলা বানানেব নিয়ম (ঢাকা) ২৩৯
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ৮৩, ১০৯, ২৫০
'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা' ১৯৭

ফরস্টার, এইচ. পি ৫৯, ২৪৯
ফেরদাউস খান ২২৭
ফেরিস কোম্পানী ৫৫
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৫৩, ৫৫, ৬০, ৬২

'বঙ্গদর্শন' ৮৪, ৯০
'বঙ্গদূত' পত্রিকা ৫৪
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৬৮
'বঙ্গভাষা ব্যাকরণ' ৬৮
'বঙ্গভাষাভিধান' ৬৭
'বঙ্গ সাধুভাষায় ব্যাকরণ সারসংগ্রহ' ২৪, ৬৮, ২৪৯
'বঙ্গাভিধান' ৬৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ ৫১. ৬১
'বর্ণপরিচয়' ৮২
'বাঙলা বানান বিধি' ২০২
'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান' ১৮১
বানান সমিতি ১৪৩, ১৪৪, ১৬০, ২১৯, ২৫১
'বানান বানানোব বন্দবে' ২২০
'বানানের অভিধান' ২২২
'বাহ্যবস্তুব সহিত মানবপ্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচাব' ৭৩
বাংলা একাডেমী (ঢাকা) ২৩৯, ২৪৪, ২৪৫
'বাংলা একাডেমী' পত্রিকা ৪০১, ৪০৩, ৪১১, ৪১২
'বাংলা কী লিখবেন—কেন লিখবেন' ২১২
'বাংলা বানান সংস্কার · সমস্যা ও সম্ভাবনা' ২০৭-২১০
'বাংলা বানানের নিয়ম' ১৪৩, ১৪৪, ১৫০, ১৫৫, ২৫১
'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিযম' ২০৭-২১০
'বাংলা ভাষাপরিচয়' ১৯৩
'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ১৮১
'বিচিত্রা' ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৬৫
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১০৪, ২৫০
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৪০, ১৪৩, ২৫০
'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' ৭৬
'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ৭৭
বিধুশেখর ভট্টাচার্য ১০৩, ১০৫

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭৪
বীরেশ্বর সেন ৯৯, ১২৩, ১৩৪
'বেঙ্গল হেবাল্ড' ৮২, ২৪৯
'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ৭৩
'বৈষ্ণব বন্দনা' পুথি ৪৯
ব্রজকিশোর গুপ্ত ৬৮, ২৪৮
ব্রহ্মানন্দ সেন ১৩৯

ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ ৬৮, ২৪৮, ২৪৯
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায ৫৪, ৬৫
ভরতসেন ৫১
'ভাবতবর্ষ' ১১৫, ১১৭, ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৮৩
'ভাবতবর্ষের ইতিহাস' ৬৫, ৬৬, ৬৯
'ভাবতী' ১০৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৭৬
ভূদেব চৌধুবী ১৯৮
ভোলানাথ ঘোষ ১৬৫

মণীন্দ্রকুমাব ঘোষ ১৮৫, ১৯০, ১৯৮, ২০৩
মধুসূদন মুখোপাধ্যায ৭৫
'মহাভারত আদিপর্ব (চতুর্থ বহি)' ৪৪, ৬১
'মহাভাবত (সৌপ্তিক পর্ব)' পুথি ৪৯
'মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্য চরিত্রম্' ৬৩, ৬৪
মারডক সাহেব ১৮৮
'মাসিক বসুমতী' ১৭৬
মিলার, জন ৫৪, ৫৮
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৬৮, ১৭৫, ১৭৭, ১৮১, ২২৯, ২৩৫
মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ২০, ২১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৬৬
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুবী ২৩৪

যোগেশ চন্দ্র রায় ৮৭, ৮৯, ৯১, ১০১, ১১৫, ১১৭, ১২১, ১৮৪

'রজনী' ৭৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০, ১৪৩, ১৪৪, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮, ১৮১, ২৫০
রমেন ভট্টাচার্য ১৬০, ২১০, ২১১
রাইল্যান্ড, জন ৮১
রাজশেখর বসু ১৪৩, ১৫৪, ১৭২, ১৭৪
'রাধারসকারিকা' পুথি ৪৯
রাধারাণী দেব ১৩৬
রামগতি ন্যায়রত্ন ৭৫
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৬৭
বামমোহন রায় ৮২, ২৪৯
বামনারায়ণ শর্ম্মা ৭৩
বামাযণ (অবণ্যকান্ড) পুথি ৫০
বামাযণ (অযোধ্যাকান্ড) পুথি ৬০
'বামায়ণ' ৬০, ৬১, ৬২
বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০২
বামেশ্বব শ ১৯৯
'বেগুলেশন ফব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানী আদালত' ৫৮
'বোমাবতী' ৭৫

লঙ্, জেমস্ ৬৮
'লক্ষ্মীচরিত্রম্' পুথি ৫০
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯, ৯০, ৯৩
'লিপিমালা' ৬৩

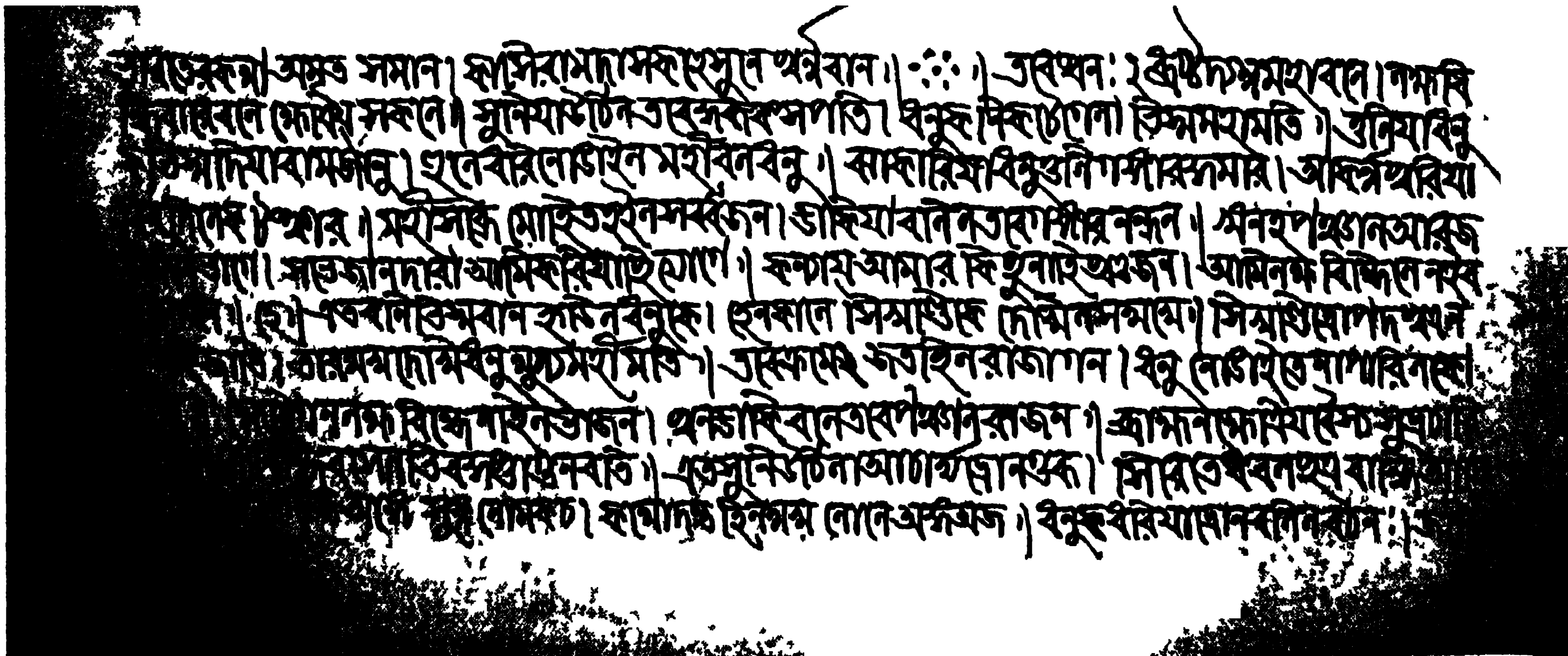
'শ-কার ভেদ' পুথি ৫১
শিস্ ধ্বনি ১৪, ১৬, ৩০, ৫৬
শ্রীপান্থ ৫৪
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ৬০, ৬২
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৪৩, ১৪৪

'ষ-কার ভেদ পুথি' ৫১

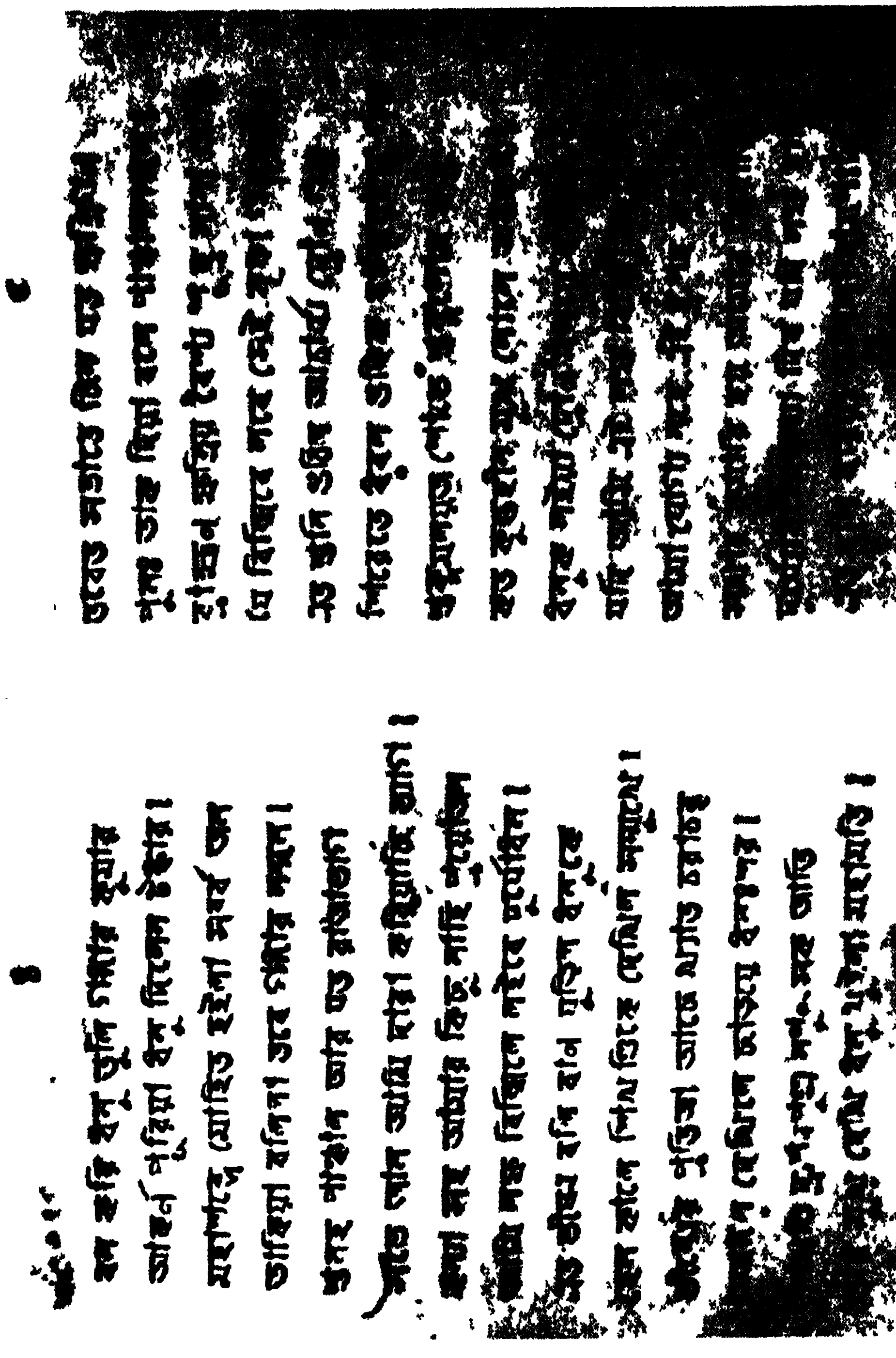
'স-কার ভেদ' পুথি ৫১
সতীশচন্দ্র ঘোষ ৯৫
'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ৬৫, ৭২, ৬৯
'সমাচার চন্দ্রিকা' ৭৭

'সমাচার দর্পণ' ৫৪, ৫৫, ৬৮, ৬৯, ৭১
'সবুজপত্র' ১০৬
'সমাজ সংস্করণ' ৭৫
'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ৬৫, ৬৬
স্বপন মজুমদার ২০১
'সংবাদ প্রভাকর' ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭৭
সারদাকান্ত সেন ৯৮
'সাহিত্য পত্রিকা' (ঢাকা) ৯৫
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ৯৫
'সিক্ষ্যাগুরু' ৫৪, ৫৮
'সুখলেখনম্' ৫১
সুধীর মিত্র ১২৪
সুধীরচন্দ্র আচার্য ১৩০
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৬
'সুশীলার উপাখ্যান' ৭৫
'সোমপ্রকাশ' ৭৬, ৭৭
স্কুল বুক সোসাইটি ৫৪
হরপ্রসাদ রায় ৬৫
'হিতোপদেশ' ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭১
হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১১৭
হেস্টিংস, ওয়ারেন ৫৩
হ্যালহেড, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৮১, ২৪৯

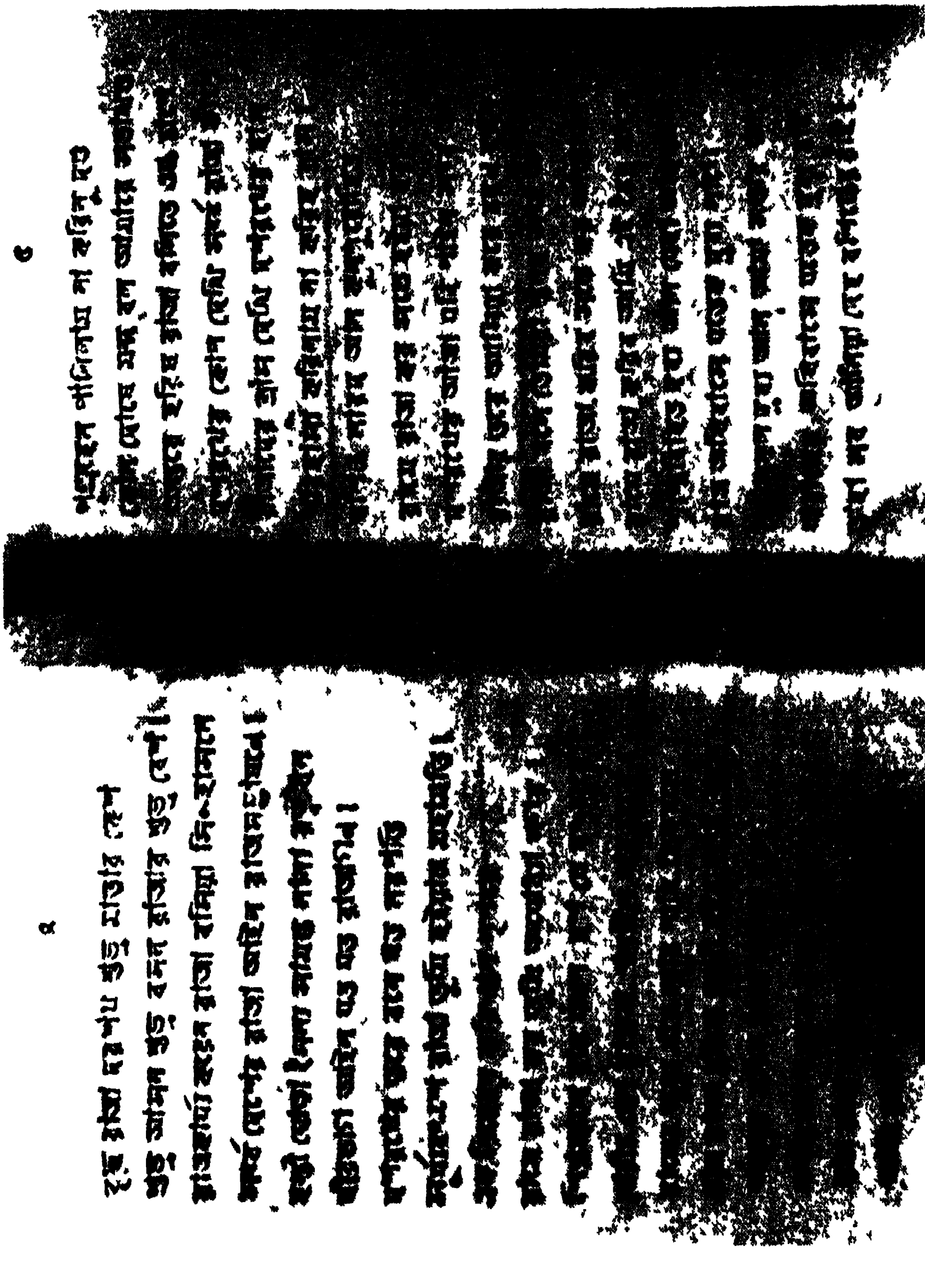
The Tutor ৫৪, ৫৮
Vocabulary in two parts : English and Bongalee ২৪৯



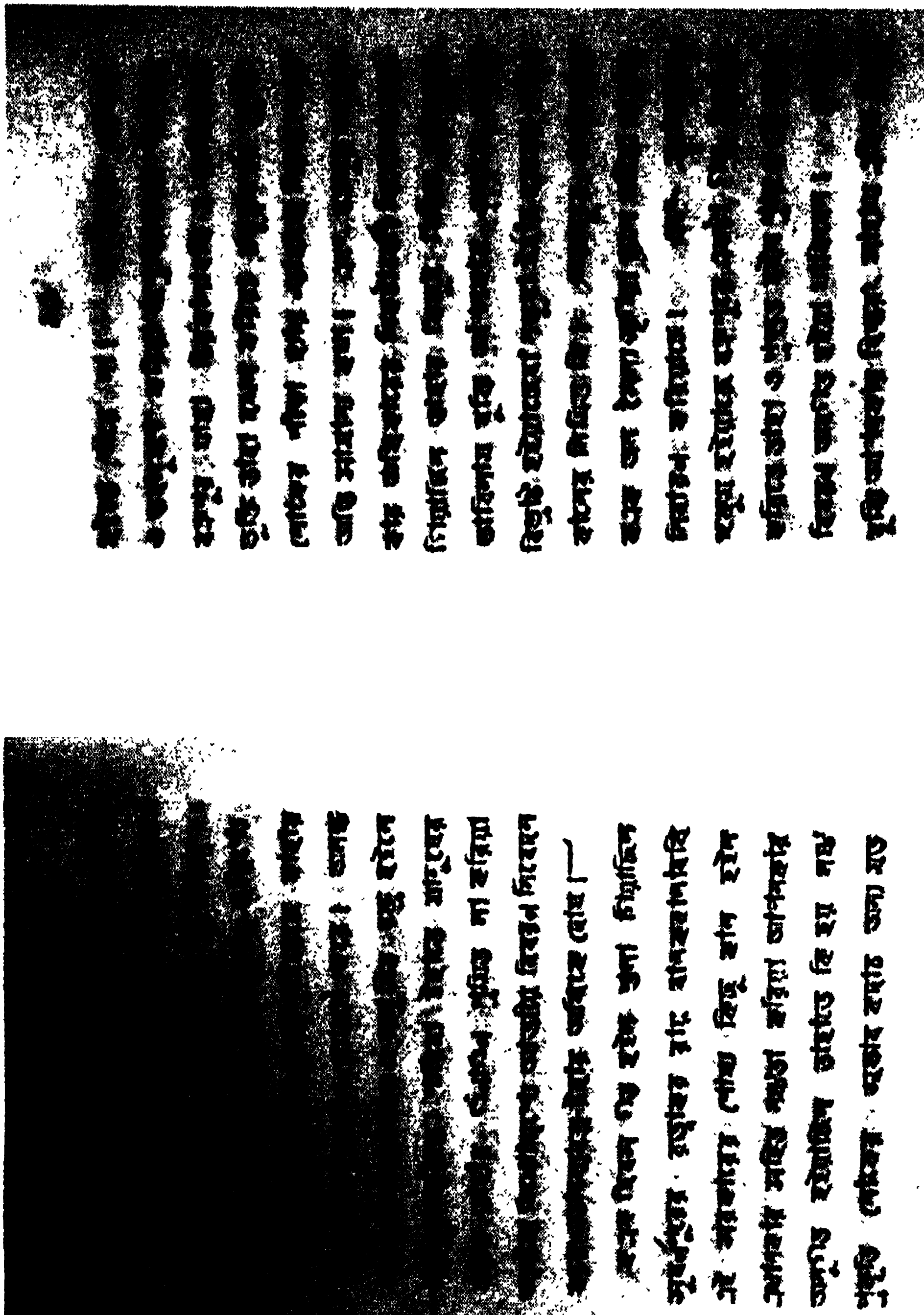
চিত্র ১ : মহাভারত আদিপর্ব (দ্র. পৃ. ৬১)



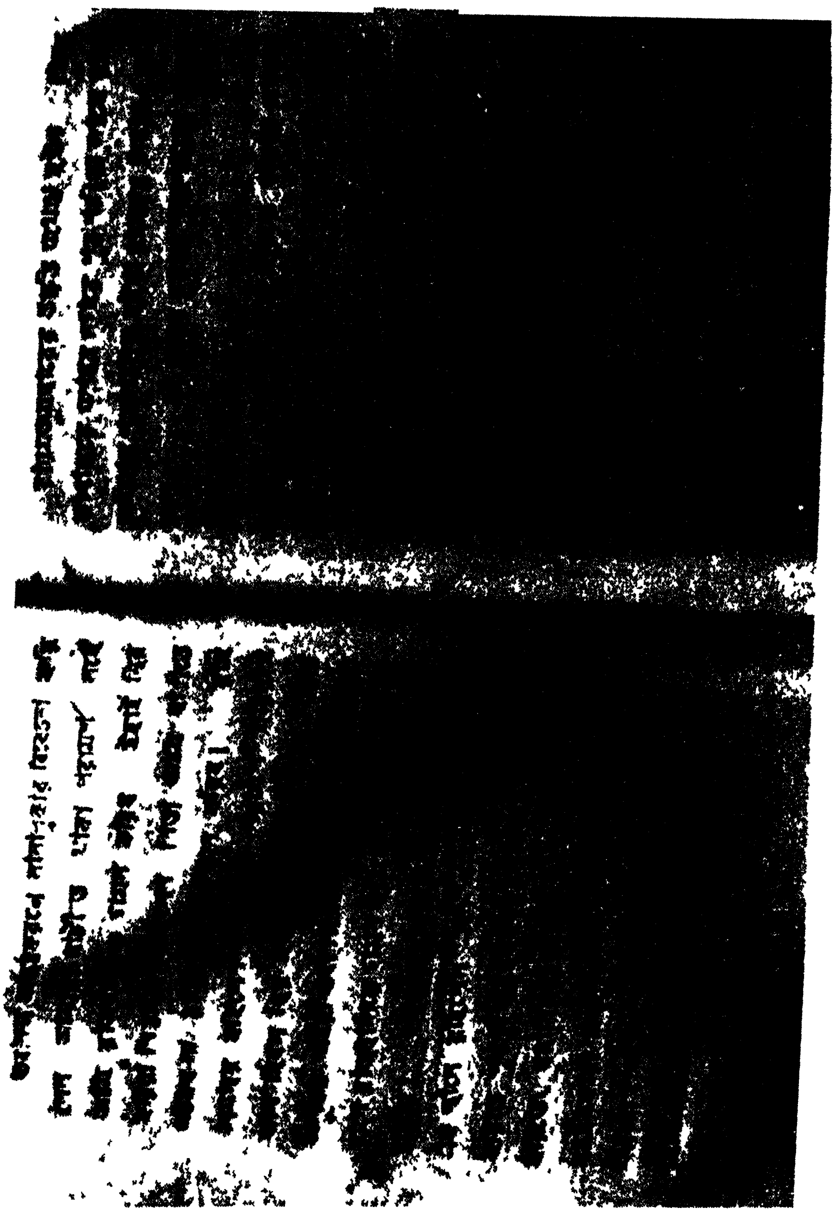
চিত্র ২ : মুদ্রিত মহাভারত —১৮০৩ (দ্র. পৃ. ৬১-৬২)



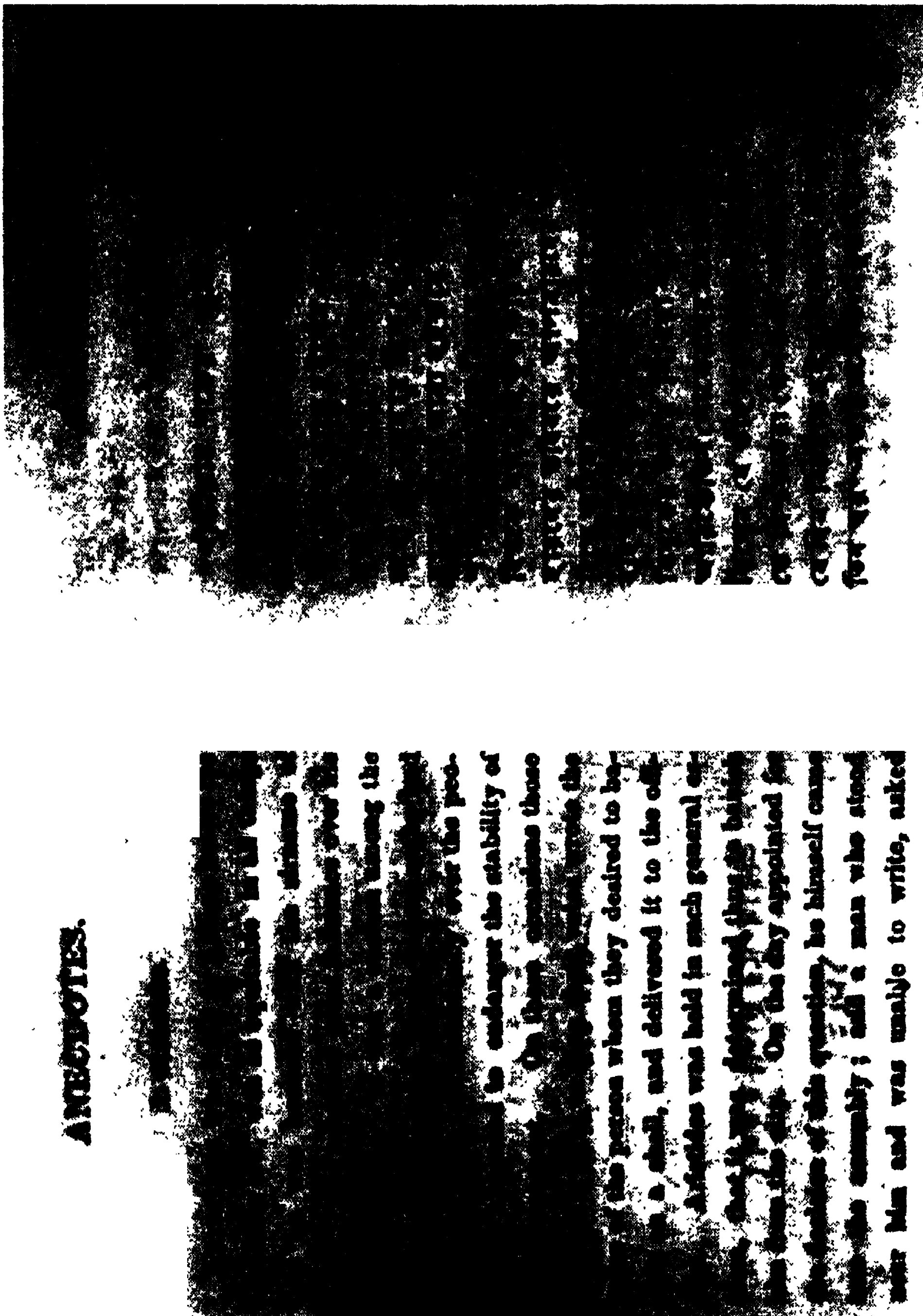
চিত্র ৩ : ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত রামায়ণ (দ্র. পৃ. ৬০)



চিত্র ৪ : লিপিমালা — ১৮০২ (দ্র. পৃ. ৬৩)



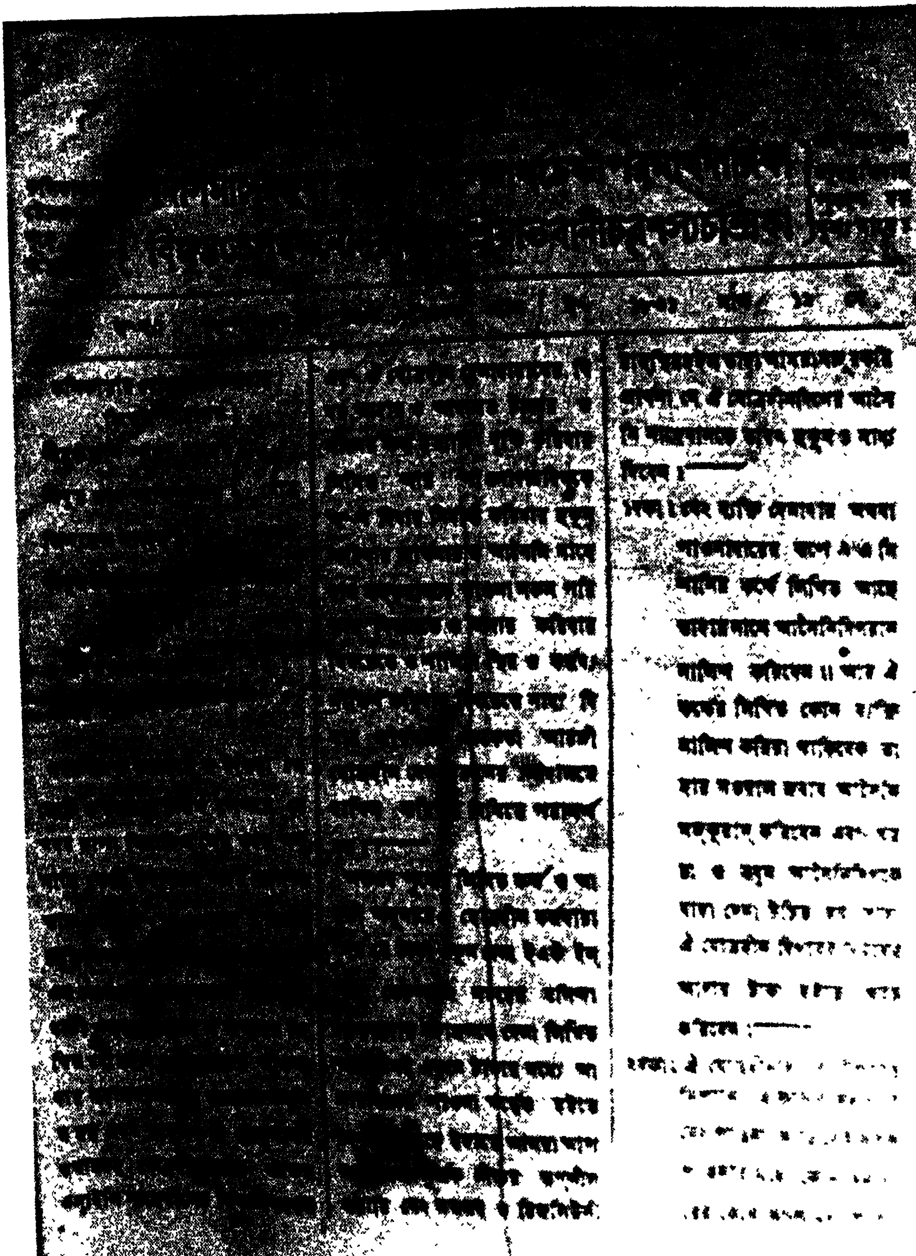
চিত্র ৫ : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ — (দ্র. পৃ. ৬৩)


ANECDOTES.

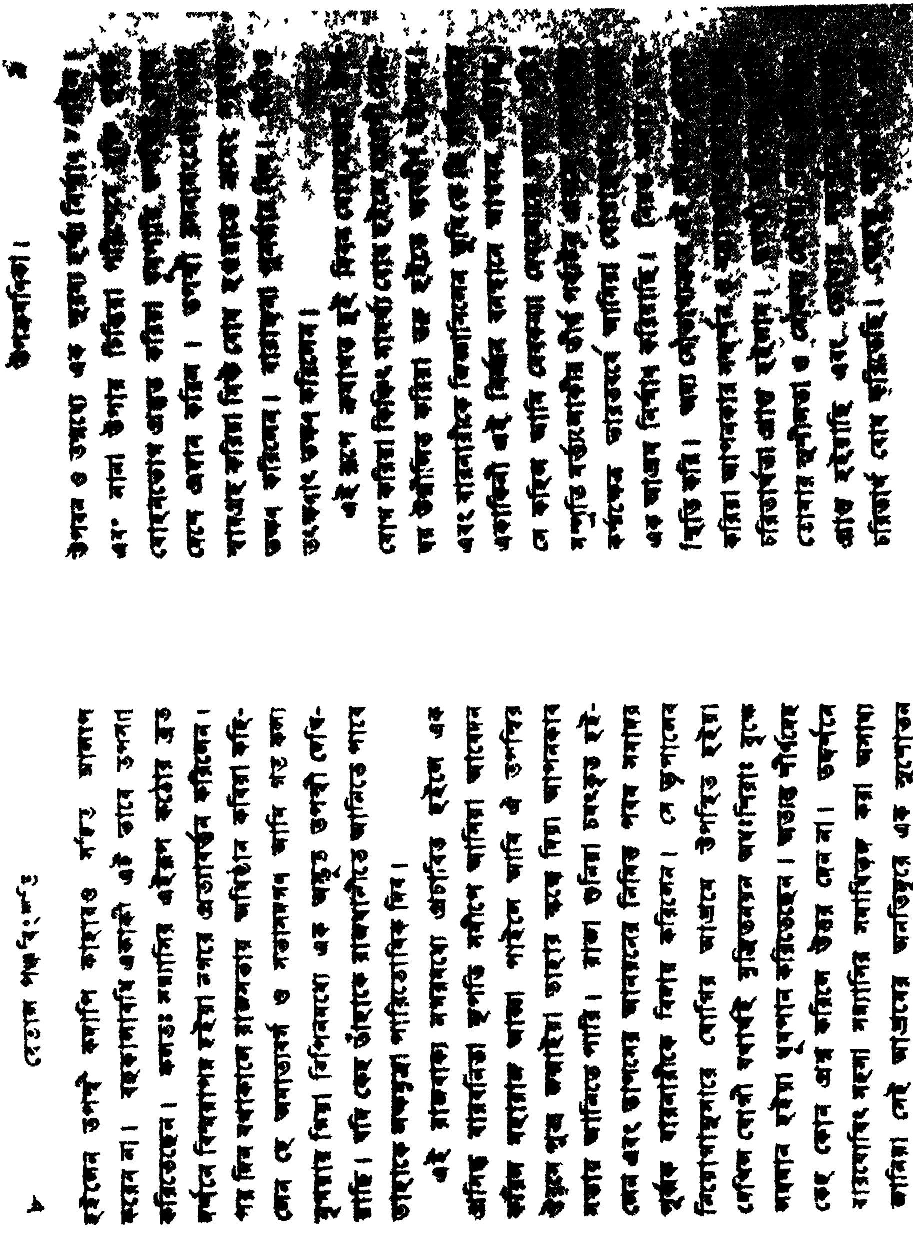
চিত্র ৬ : সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস — (দ্র. পৃ. ৬৬)



চিত্র ৭ : দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ — ১৮৪৩ (দ্র. পৃ. ৬৬)



চিত্র ৮ : সমাচার চন্দ্রিকা — (দ্র. পৃ. ৬৯-৭০)


৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি

হইলেন তপস্বী কদাপি কাহারও সহিত আলাপ করেন না। বহুকালাবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। ফলতঃ সন্ন্যাসির এইরূপ কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিন যথাকালে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন হে অমাত্যবর্গ ও সভাসদগণ আমি গত কল্য মৃগয়ায় গিয়া বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি। যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত পারিতোষিক দিব।

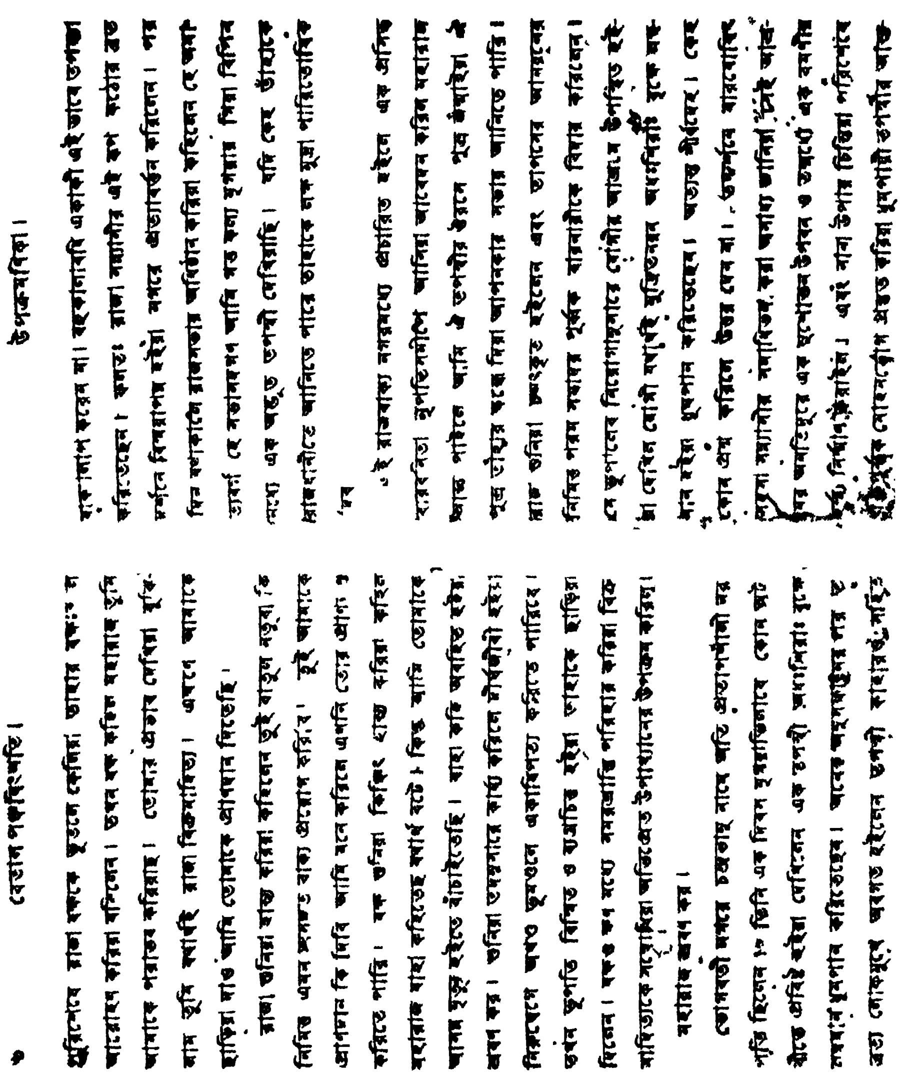
এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা ভূপতি সমীপে আসিয়া আবেদন করিল মহারাজ আজ্ঞা পাইলে আমি ঐ তপস্বির ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া তাহার স্কন্ধে দিয়া আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাপসের আনয়নের নিমিত্ত পরম সমাদর পূর্ব্বক বারনারীকে বিদায় করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগানুসারে যোগির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল যোগী যথার্থই মুদ্রিতনয়ন অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অত্যন্ত শীর্ণদেহ কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ সহসা সন্ন্যাসির সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক সুশোভন

উপক্রমণিকা। ৯

উপবন ও তন্মধ্যে এক সুরম্য কুটীর নির্ম্মাণ [illegible] এবং নানা উপায় চিন্তিয়া পরিশেষে [illegible] মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া [illegible] দেশে প্রদান করিল। তপস্বী [illegible] স্বাদগ্রহ করিয়া মিষ্ট বোধ হওয়াতে [illegible] ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনর্ব্বার দিল। [illegible] তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন।

এই রূপে ক্রমাগত দুই দিবস মোহনভোগ [illegible] যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ সামর্থ্য বোধ হইলে [illegible] নয়ন উন্মীলিত করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ [illegible] এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে [illegible] একাকিনী এই নির্জ্জন বনমধ্যে আগমন [illegible] সে কহিল আমি দেবকন্যা [illegible] সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকীয় তীর্থ পর্য্যটন [illegible] কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া [illegible] এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছি। [illegible] স্থিতি করি। অদ্য [illegible] করিয়া আপনকার [illegible] চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম। [illegible] তোমার সুশীলতা ও [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি এবং [illegible] চরিতার্থ বোধ করিতেছি। [illegible]

চিত্র ৯ বেতাল পঞ্চবিংশতি — ২য় সংস্করণ, ১৮৪৯ (দ্র পৃ ৭৩)



৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি।

পরিশেষে রাজা বককে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তখন বক কহিল মহারাজ তুমি আমাকে পরাভব করিয়াছ। তোমার প্রভাব দেখিয়া বুঝিলাম তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি তোমাকে প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন তুই বাতুল নতুবা কি নিমিত্ত এমন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিবি। তুই আমাকে প্রাণদান কি দিবি আমি মনে করিলে এখনি তোর প্রাণ [illegible] করিতে পারি। বক শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল মহারাজ যাহা কহিতেছ যথার্থ বটে। কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বক ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।

মহারাজ শ্রবণ কর।

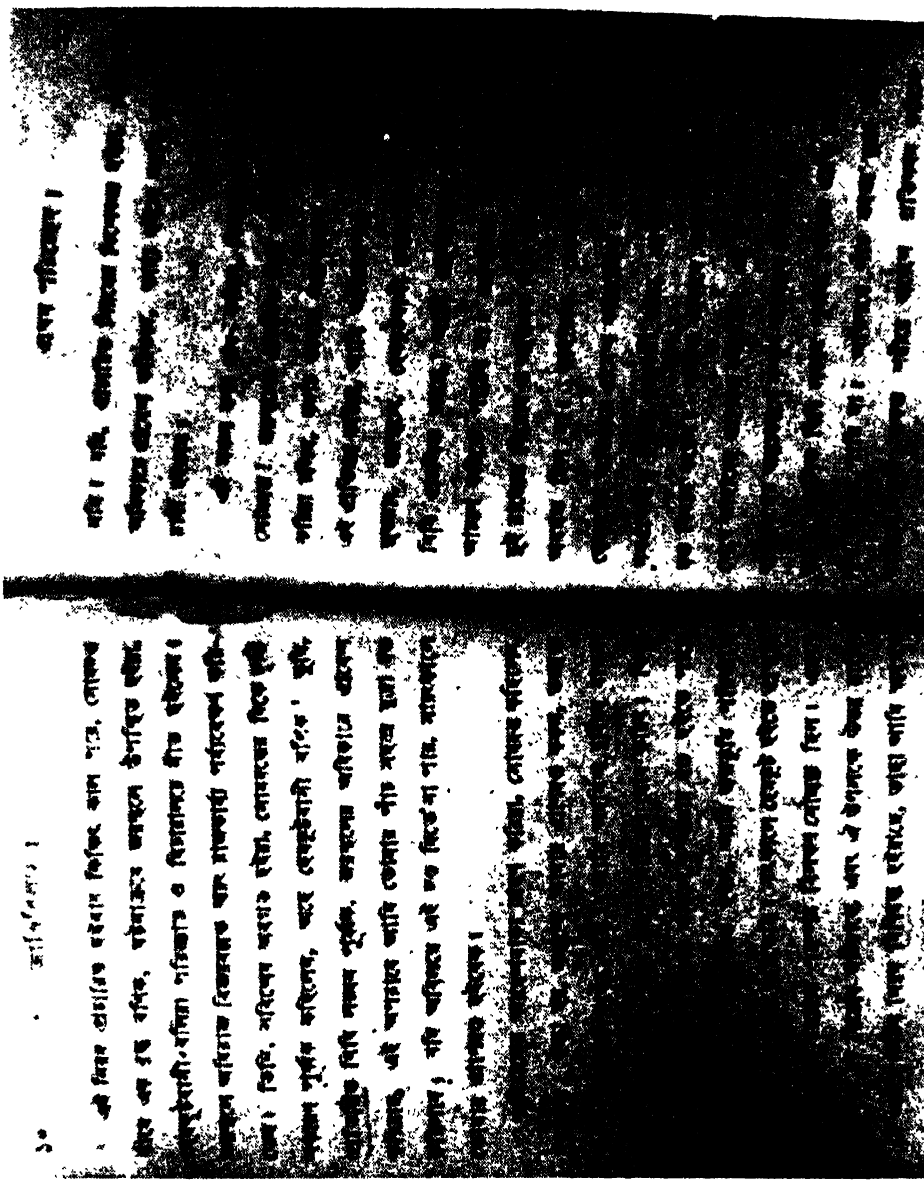
ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়াভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন এক তপস্বী অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমান ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর [illegible] জ্ঞাত লোকমুখে অবগত হইলেন তপস্বী কাহারও সহিত

উপক্রমণিকা।

বাক্যালাপ করেন না। বহুকালাবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। ফলতঃ রাজা সন্ন্যাসীর এই রূপ কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিন সভাকালে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন হে অমাত্যবর্গ হে সভাসদগণ আমি গত কল্য মৃগয়ায় গিয়া বিপিন মধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি। যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা নৃপতিসমীপে আসিয়া আবেদন করিল মহারাজ আজ্ঞা পাইলে আমি ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া ঐ পুত্র তাঁহার স্কন্ধে দিয়া আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাপসের আনয়নের নিমিত্ত পরম সমাদর পূর্ব্বক বারনারীকে বিদায় করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগানুসারে যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল যোগী যথার্থই মুদ্রিতনয়ন অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অত্যন্ত শীর্ণদেহ। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক মনোহর উপবন ও তন্মধ্যে এক রমণীয় কুটীর নির্ম্মাণ করাইল। এবং নানা উপায় চিন্তিয়া পরিশেষে যুক্তিপূর্ব্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধূমপায়ী তপস্বীর আস্ত-

চিত্র ১০ : বেতাল পঞ্চবিংশতি — ৭ম সংস্করণ, ১৮৫৮ (দ্র. পৃ. ৭৫)



চিত্র ১১ : ভ্রান্তিবিলাস — ২য় সংস্করণ, ১৮৭৫ (দ্র. পৃ. ৭৭)

বাংলা বানানের নিয়ম

রাজশেখর বসু

বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতি গঠন করেন। তাহাতে ছিলেন — শ্রীরাজশেখর বসু (সভাপতি), *প্রমথনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক *বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক)।

সমিতিরচিত নিয়মাবলীর সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই অভিমত লিখিয়াছিলেন—

বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

-শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -
১লা আশ্বিন ১৩৪৩.

চিত্র ১২ 'বাংলা বানানের নিয়ম' 'দেশ' ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ (দ্র পৃ ৮৩)

বাংলা বানানের নিয়ম

১। সংস্কৃত শব্দে দীর্ঘস্বরের বিকল্পে হ্রস্বস্বর থাকলে হ্রস্বস্বর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় :

অংগুরি, অংগুলি, অটবি, অন্তরিক্ষ, অবনি, অবন্তি, অম্বুবাচি, অরণি, -আবলি (গ্রন্থাবলি, পত্রাবলি, বংশাবলি, নামাবলি), আবির, ঊর্ণনাভ, ঊর্ণা, উর্বর, উষসী, উষা, ওষধি (মহৌষধি), কটি, করোটি, কল্কি, কাকলি, কাঞ্চি, কাশি, কিংকিণি, কিংবদন্তি, কুজ্ঝটি, কুটির, কুন্তি, কুলিশ, কেলি, কোটি, গাণ্ডিব, চঞ্চু, চণ্ডিদাস, চিৎকার, তনু, তন্ত্রি, তরণি তরি, তুলি, ত্রুটি, দরি (গিরিদরি), দীপালি, দ্যুতি, দম্পতি, দেহলি, ধমনি, ধরণি, নন্দি, নালি (অন্ননালি, কণ্ঠনালি), নাড়ি, নিরস, নীবি, নেমি (চক্রনেমি), পরিক্ষিৎ, পরিপাটি, পল্লি, পাটি (পাটিগণিত), পেশি, পুত্তলি (কুশপুত্তলি), প্লিহা, বর্ণালি, বল্লরি, বল্লি, বসতি, বিপণি, বেণি, বেদি, বৈতরণি, ব্যতিহার, ভংগি, ভৃংগি, ভেরি, ভ্রূ, ভ্রূকুটি, মঞ্জরি, মঞ্জুষা, মহি, মসি, মৌলি, যুবতি, রজনি, রাত্রি, শচি, শমি, শরণি, শারি, শাল্মলি, শেফালি, শ্রেণি, শ্রোণি, সরণি, সারণি, সুরভি, সূচি, সূরি, স্ফটিক, স্বয়ম্ভু, স্বাতি, হাম্বির।

২। ং, ঙ,

সংস্কৃত .

ক-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে পদমধ্যে সর্বত্র অনুস্বার হবে :

অংক, অংকন, অংকিত, অংকুর, অংকুশ, অলংকার, অলংকৃত, অহংকার, আতংক, কংকণ, কংকাল, কলিংগ, কিংকর, কিংকর্তব্য, কিংকিণী, ঝংকার, পংক, পংক্তি, বংকিম, ভয়ংকর, লংকা শংকর, শংকরী, শংকা, শংকিত, শংকু, শুভংকর, সংকট, সংকর, সংকর্ষণ, সংকলন, সংকল্প, সংকাশ, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকুচিত, সংকুল, সংকেত, সংকোচ, সংক্রমণ, সংক্রান্ত, সংক্রান্তি, সংক্রামক, আকাংক্ষা, কাংক্ষিত, সংক্ষেপ।

অনুপুংখ, অসংখ্য, উচ্ছৃংখল, পংখ, পুংখানুপুংখ, শংখ, শৃংখল, শৃংখলা, সংখ্যক, সংখ্যা।

অংগ, অংগদ, অংগন, অংগনা, অংগার, অংগীকার, অংগুরি, অংগুলি, অনংগ, অন্তরংগ, অপাংগ, অবাংগোচর, অমংগল, অসংগত, অসংগতি, আংগিক, ইংগিত, কলিংগ, গংগা, গংগোত্রী, গাংগেয়, জংগম, পুরাংগনা, প্রসংগ, প্রাসংগিক, তরংগ, তুরংগ, তুরংগম, নিঃসংগ, পংগু, পারংগম, পুংগব, বংগ, বিহংগ, বিহংগম, ভংগ, ভংগি, ভংগুর, ভুজংগ, ভৃংগ, ভৃংগার, ভৃংগি, মংগল,

চিত্র ১৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানকমিটির (১৯৭৯) নতুন প্রস্তাবের প্রতিলিপি (দ্র.পৃ. ১৯৬)

মাংগলিক, মৃদংগ, রংগ, রংগালয়, লবংগ, লিংগ, শৃংগ, শৃংগার, সংগ, সংগঠন, সংগত, সংগতি, সংগম, সংগী, সংগীত, সংগৃহীত, সংগোপন, সংগ্রহ, সংগ্রাম, হৃদয়ংগম।

জংঘা, জিঘাংসা, লংঘন, সংঘ, সংঘটন, সংঘর্ষ, সংঘাত।

চ-বর্গীয় বর্ণ (চ, ছ, জ, ঝ) পরে থাকলে ঞ হবে (অনুস্বার হবে না) :

অঞ্চল, আঞ্চলিক, কিঞ্চিৎ, চঞ্চল, পাঞ্চালী, বঞ্চনা, সঞ্চয়, সঞ্চরণ, সঞ্চারিত, উঞ্ছ, বাঞ্ছা, অঞ্জন, খঞ্জন, গঞ্জনা, পঞ্জিকা, ভঞ্জন, ব্যঞ্জন, রঞ্জিত, সঞ্জয়, ঝঞ্ঝা।

কিন্তু সংজ্ঞা, সংজ্ঞাহীন হবে।

ট-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে (ট, ঠ, ড ঢ) ণ হবে (অনুস্বার হবে না)

ঘণ্টা বণ্টন, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, মণ্ড, মুণ্ডন, মণ্ডল, ষণ্ড।

ত-বর্গীয় বর্ণ (ত, থ, দ, ধ ন) পরে থাকলে ন হবে (অনুস্বার হবে না) :

অন্তর, কিন্তু, সন্তাপ, সন্তরণ, সন্তোষ, সন্ত্রস্ত, কন্থা, পন্থা, সন্দিহান, সন্দেশ, সন্দেহ, সন্ধি, সন্ধান, সন্নিকট, সন্নিধান, সন্নিপাত, সন্ন্যাস।

ব ভিন্ন প-বর্গীয় বর্ণ (প, ফ, ভ ম) পরে থাকলে ম হবে (অনুস্বার হবে না)

অনুকম্পা, কম্পিত, চম্পা ঝম্প শম্পা, সম্পদ সম্পাদক, সম্পুট, সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত, সম্প্রদান, সম্প্রদায়, সম্প্রসারণ সম্প্রীতি।

গুম্ফা, লম্ফ।

সম্ভব, সম্ভাবনা।

সম্ভার, সম্ভাষণ, সম্ভূত, সম্ভ্রান্ত।

পরবর্তী বর্ণ ব হলে কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ম' এবং অন্যত্র উচ্চারণ অনুযায়ী অনুস্বার হবে .

অম্বর, অম্বা, অম্বু, সম্বন্ধ, সম্বল, সম্বোধন।

অসংবৃত, কিংবদন্তি, কিংবা, সংবৎ, সংবৎসর, সংবরণ, সংবর্ত, সংবর্ধক, সংবর্ধন, সংবর্ধনা, সংবলিত, সংবাদ, সংবাদিত, সংবাহ, সংবাহন, সংবিধান, সংবৃত, সংবেদন, সংবেদনা, সংমিশ্রণ।

অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে (য, ব, ল, শ, স, হ) অনুস্বার হবে :

অসংযত, সংযম, সংযুক্ত, সংযোগ, সংযোজনা।

সংরক্ষণ, সংরক্ষিত।

অভ্রংলিহ, অসংলগ্ন, বাংলা, সংলগ্ন, সংলাপ।

কিংশুক, পাংশু, বংশ, বংশী।

অংশ অংশু, অপভ্রংশ, ভ্রংশ সংশপ্তক সংশয়, সংশোধন সংশ্রব, সংশ্লিষ্ট, সংশ্লেষ।

অংস, অবতংস, নৃশংস, প্রশংসা, বীতংস, মাংস, রিরংসা, সংসক্ত, সংসদ, সংসর্গ, সংসার, সংস্করণ, সংস্কার, সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্থা, সংস্থান, সংস্থাপন, সংস্থিত, সংস্পর্শ, সংস্রব।

সংহত সংহতি, সংহরণ, সংহার, সংহিতা।

৫। সংস্কৃত ইন্ (ণিনি, ঘিনুণ্, ইনি, বিনি) ভাগান্ত শব্দ প্রত্যয় যুক্ত অথবা সমাসবদ্ধ হলে এদের পদান্তের স্বর হ্রস্ব হয়ে থাকে : উপকারী (উপকারিন্)-উপকারিতা; অনুবর্তী (অনুবর্তিন্)-অনুবর্তিগণ; রক্ষী-রক্ষিগণ; গুণী (গুণিন্)-গুণিবৃন্দ। কিন্তু এইসব শব্দে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলে এই নিয়ম অনুসৃত হয় না : দেহরক্ষী—দেহরক্ষীরা, দেহরক্ষী-বৃন্দ। লক্ষণীয় বাংলায় শব্দগুলি ইন্-ভাগান্ত নয়, এবং বাংলায় সমাসবদ্ধ পদ বহুক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা শব্দ হিসেবে লিখিত হয়ে থাকে। অতএব এই শব্দগুলির বেলায় পদান্তে দীর্ঘস্বরের বদলে হ্রস্বস্বর লেখা যেতে পারে :

অধিকারি, অধিবাসি, অধ্যবসায়ি, অনুকারি, অনুসরণকারি, -গামি (অনুগামি), অনুযায়ি, অনুরাগি, অনুবর্তি, অন্তর্ঘাতি অন্তর্যামি, অন্তর্বর্তি, অন্তর্মুখি, অপকারি, অপঘাতি, অপরাধি, অপরিণামদর্শি, অবশ্যম্ভাবি, অবিবেকি, অবিনাশি, অবিসংবাদি, অভিমানি, অভিমুখি, অভিযাত্রি, অভিলাষি, অভিসারি, অমিতব্যয়ি, অর্থি, অল্পভাষি, অল্পাহারি, অস্তগামি, অস্থায়ি, অহংকারি, অর্থকরি, অনাহারি, অশরীরি, আগামি, আজ্ঞাকারি, আততায়ি, -ঘাতি (আত্মঘাতি), আত্মত্যাগি আমিষাশি আলাপি, আহারার্থি, উত্তরাধিকারি, উৎসাহি, উদাসি, উপকারি, উপবাসি, উপযোগি, একতন্ত্রি, একদেশদর্শি, একাকি একাহারি, ওজস্বি, -কারি, কর্মযোগি, কৃতি, কেশরি, করি, ক্ষণস্থায়ি,

গগনচুম্বি, -গামি (গজেন্দ্রগামি), -গ্রাহি (গুণগ্রাহি), গুণি, গৃহবাসি, গৃহি, গোস্বামি, চক্রবর্তি, চক্রি, -চারি, চিত্তহারি, চিরজীবি, ছত্রি, জটি, জড়বাদি, জয়ি, -জীবি, জ্ঞানি, জ্যোতিষি, তত্ত্বজ্ঞানি, তদনুযায়ি, তপস্বি, তৃণভোজি, তেজস্বি, ত্যাগি, ত্রিবেদি, দণ্ডি, দায়ি, দীর্ঘজীবি, দুঃখি, দ্রুতগামি, দূরবর্তি, দূরদর্শি, দেহি, দোষি, দ্রোহি, দেশদ্রোহি, দেশান্তরি, ধনি, ধর্মদ্রোহি, ধর্ম-ধ্বজি, ধর্মাধিকারি, ধর্মাবলম্বি, নিয়োগি, পক্ষি, পক্ষিরাজ, পয়স্বি, পরিণাম-দর্শি, পরিপন্থি, পরিশ্রমি, পরীক্ষার্থি, পাপি, পাণি, পারদর্শি, পুরবাসি, পুরোগামি, পিতৃঘাতি, পুত্রঘাতি, পূর্বগামি, পূর্ববর্তি, প্রণয়ি, প্রতিদ্বন্দ্বি, প্রতিবাদি, প্রতিবেশি, প্রতিযোগি, প্রতিরোধি, প্রত্যয়ি, প্রত্যাশি, প্রত্যুপকারি, প্রবাসি, প্রবাহি, প্রহরি, প্রাণি, প্রাণিদেহ, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিহিংসা, প্রার্থি, প্রিয়ভাষি, প্রিয়বাদি, ফণি, বর্তি, বাদি, বহুদর্শি, বাগ্মি, বাসি, বিদ্রোহি, বিদ্বেষি, বিদ্রোহি, বিদ্যোৎসাহি, বিধর্মি, বিবাদি, বিনাশি, বিরাগি, বিরোধি, ব্যভিচারি, বিবেকি, বিলাপি, বিলাসি, বিশ্বাসি, বিষয়ি, বুদ্ধিজীবি, বৈরি, ব্যবসায়ি, ব্রহ্মচারি, ব্রহ্মবাদি, ভাবি, ভাগি, ভায়ি, ভোজি, ভূস্বামি, মৎস্যজীবি, মধুবর্ষি, মধ্যবর্তি, মনস্বি, মনীষি, মনোযোগি, মনোহারি, মন্ত্রি, মন্ত্রিত্ব, মাংসাশি, মানি, মায়াবি, মালি, মিতব্যয়ি, মিতভাষি, মিতাহারি, মিথ্যাবাদি, মুখাপেক্ষি, -মুখি, মেধাবি, যন্ত্রি, যশস্বি, যাত্রি, যায়ি, যোগি, রক্ষি, রথি, রাগি, রোগি, লোভি, শশি, শশিশেখর, শিখি, শৃঙ্গি, সংসারি, সঞ্চারি, সংযমি, সংগি, সত্যবাদি, সদাচারি, সদালাপি, সর্বনাশি, সর্বব্যাপি, সহকর্মি, সহকারি, সহগামি, সহধর্মি, সহপাঠি, সহযাত্রি, সহাধ্যায়ি, সাক্ষাৎকারি, সাক্ষি, সুখি, -স্থায়ি, স্নানার্থি, স্বামি, সাহসি, হস্তি, হৃদয়গ্রাহি।

এর ফলে ই (ইন্‌ বি, ক্লী)-ভাগান্ত শব্দের সংগে সাদৃশ্য সহজেই রক্ষিত হইবে :

আধি, আর্জনি, আহুতি, উক্তি, উপলব্ধি, ঋদ্ধি, কার্ষ্ণি, কৃতি, কীর্তি, ক্লান্তি, ক্রান্তি, ক্ষতি, ক্ষান্তি, খ্যাতি, গতি, জলধি, জলনিধি, তুষ্টি, তৃপ্তি, দাশরথি, দীপ্তি, দৃষ্টি, দ্যুতি, দ্রোণি, নতি, নিধি, নীতি, পয়োধি, পয়োনিধি, পুষ্টি, প্রীতি, বারিধি, বারিনিধি, বিধি, বুদ্ধি, বৃত্তি, বৃদ্ধি, বৈয়াসকি, ভক্তি, ভিত্তি, ভীতি, ভ্রান্তি, মতি, মুক্তি, যুক্তি, রতি, রাবণি, শক্তি, শান্তি, শুদ্ধি, শ্রুতি, শৌরি, শ্রান্তি, সিদ্ধি, সুপ্তি, সৌমিত্রি, সৃষ্টি, স্তুতি, স্মিতি, স্মৃতি, স্রুতি।

৪। যুক্ত ব্যঞ্জন বিভক্ত করে লেখার ক্ষেত্র ছাড়া, হস্‌ চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

যেমন ট্যাক্‌সি, বন্‌ধ, মুক্‌তি।

বিযুক্ত আকারে ঞ্‌-স্থানে ন্‌, ণ্‌-স্থানে ন্‌ লেখা চলবে

সন্‌চয়, বান্‌ছা, গন্‌জে, ঝন্‌ঝা
ঘন্‌টা, লন্‌ঠন, মন্‌ডল।

৫। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।

৬। সংস্কৃত ছাড়া অন্য শব্দে হ্রস্ব ই ও হ্রস্ব উ ব্যবহার সাধারণ নিয়ম রূপে গৃহীত হবে।

মূল সংস্কৃত শব্দে এবং [illegible] বা [illegible] বিদেশি শব্দের মূলে দীর্ঘস্বর থাকলেও বাংলায় কেবলমাত্র হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব উ ব্যবহৃত হবে। জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক, এবং মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দ এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তেও কেবল হ্রস্ব ই হবে

অংশীদারি, [illegible], [illegible], অফিস, অবাঙালি, অর্ডারি, অসমিয়া, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যান্টিজেন, [illegible], [illegible], আড়ি, [illegible], আকালি, আংটি, আঙিনা, আংগির, আজগুবি, আটিনা, আত্মসমর্পি, আদমি, আদালতি, আনাড়ি, আপিল, আবগারি, আবদি, [illegible], আমদানি, আমিনা, আমির, আমিরি, আয়েশি, আরদালি, আরবি, আরশি, আলমগির, আলমারি, আলাদিন, আলুনি, আশরফি, আসামি, আহির, ইউরেশিয়, ইংরেজি, ইংলিশ, ইগল, ইথার, ইনজিন, ইয়াংকি, ইরান, ইরানি, ইলিশ, ইস্ট, ইশারা, ইসলামি, ইস্টিমার, ইহুদি, ইদ, ইশা, উচুনিচু, উকিল, উজির, উড়াবি, উড়নি, উনিশ, উমেদারি, উবু, উর্দি, উর্দু, উল্কি, উশখানি, এককলমি, একাশি, এজমালি, এজেন্সি, এলাহি, ওকালতি, ওডিয়া, ওয়াশিং, ওয়াহাবি, কংগ্রেস, কচি, কচুরি, কটকি, কপাটি, কবজি, কবির, কবুলতি, কয়েদি, করাতি, কলমচি, কাওয়ালি, কাঁইবিচি, কাঁচুলি, কাঁঠালি, কাছারি, কাজি, কাটারি, কাঠি, কাতরানি, কাফ্রি, কাবুলি, কায়েমি, কার্নিশ, কালোয়াতি, কাশ্মির, কুঁচকি, কুঁচি, কুচি, কুঠুরি, কুড়ুনি, কুমির, কুলজি, কুলুঙ্গি, কুলি, কুস্তিগির, কুহেলি, কেটলি, কেতাবি, কেয়ারি, কেরানি, কেরামতি, কেলেংকারি, কোনাকুনি, খবরদারি, খয়েরি, খাকি

খাটুনি, খাপ, খালাশি, খাসি, খিলি, খুঁটি, খুকি, খুরি, খুলি, খুশি, খুশকি,
খোঁক, খিচুনি, খোরাশানি, গড়িমশি, গুনতি, গদি, গয়বি, গরিব, গাঁটরি,
গাঁথুনি, গাজি, গাড়ি, গান্ধি, গাভিন, গিন্নি, গিরগিটি, গির্জা, গিলটি,
গুজরাটি, গুনিন, গুনডামি, গুলি, গোপিযন্ত্র, গোলাপি, গ্রিক, ঘটি, ঘুন্টি,
ঘরামি, ঘাগি, ঘাঁটি, ঘানি, ঘুপচি, চকবন্দি, চকমকি, চচ্চড়ি, চড়ুইভাতি,
চরকি, চলতি, চাঁদনি, চাঁদমারি, চাকরি, চাপরাশি, চামেলি, চালানি, চালুনি,
চাষি, চিংড়ি, চিজ, চিত, চিৎকার, চিনেমাটি, চিমনি, চিরুনি, চিন(দেশ)
চুটকি, চুড়ি, চুন, চুপড়ি, চুমকি, চুরি, চুলোচুলি, চুরমার, চোলি, চৈতালি, চৈতি,
চৌহদ্দি, ছাড়, ছিয়াশি, ছুকরি, ছুরি, জগাখিচুড়ি, জটিবুড়ি, জবানবন্দি,
জমিদারি, জরিপাড়, জরিপ, জরুরি, জলদি, জানুয়ারি, জাফরানি, জাফরি,
জামদানি, জামবাটি, জামিন, জারিজুরি, জি, জিউ, জিনিস, জিশু, জিমন্যাস্টিক,
জুড়ি, জুরি, জুলপি, জুয়া, জুয়ো, জুয়াড়ি, জেঠি, ঝাঁপ, ঝিল্লি, ঝুঁটি,
ঝুপড়ি, টুকরি, টুপি, টেংরি, ট্যাপারি, টোড়ি, ঠাঁগ, ঠিকুজি, ঠুলি, ঠুংরি,
ডায়েরি, ডাক্তারি, ডিক্রি, ডিগবাজি, ডিগ্রি, ডিঙি, ডেপুটি, ডুগি, ডুবুরি, ডুলি,
ঢাকি, ঢুলি, তপশিল, তপশিলি, তহবিল, তবলচি, তবিয়ত, তামাদি, তরকারি,
তল্লাশি, তশরিফ, তশবির, তহবিল, তহশিল, তাড়াতাড়ি, তাড়ি, তারিফ,
তেজারতি, তিব্বতি, তিরাশি, তুবড়ি, তোলি, তেলোনি, তৈরি, থলি, থুড়,
দরকারি, দরজি, দরবারি, দারোয়ানি, দাগি, দাদি, দাবি, দামি, দিঘল, দিঘি
দিয়াশলাই, দিল্লি, দেওয়ানি, দেওয়ালি, দোরি, দেশান্তরি, দেশি, দেহাতি,
দোভাষি, ধাড়ি, ধুনুরি, ধুলো, নকশি, নজির, নাড়, নাথ, নবাবি, নবি, নসিব,
নাক, নাগরি, নাদি, নাবি, নামি, নারকেলি, নালিশ, নিচু, নিচে, নিমকি, নেংটি,
নেপালি, নোটিশ, পংখি, পাঞ্জাবি, পড়শি, পদবি, পরদেশি, পশমি, পাইকারি,
পাঁউরুটি, পাঁচালি, পাখি, পাগড়ি, পাগলামি, পাজি, পাটলি, পাটালি,
পাটোয়ারি, -পাড়ানি, পাদরি, পাদানি, পানি, পাপড়ি, পায়চারি, পারশি,
পারশিক, পার্টি, পালকি, পালি, পাশাপাশি, পিকদানি, পিচ, পিচকারি, পুটি,
পুব, পুজো, পুজারি, পুবালি, পুরি, পুলিশ, পুস্তানি, পেশাদারি, পোশাকি,
প্রভাতফেরি, প্রভাতি, প্রাইমারি, প্লিডার, ফরাশি, ফরিয়াদি, ফাঁকিবাজি, ফারশি,
ফাঁড়ি, ফাগুনি, ফি, ফিরিংগি, ফুলদানি, ফুলুরি ফেটি, ফেব্রুয়ারি, ফেরারি,
ফৌজদারি, ফৌজি, ফ্রি, বউনি, বঁড়শি, বগি, বদলি, বুনিয়াদি, বনেদি, বন্ধকি,
বয়েস, বরফি, বরবটি, বর্গি, বসতি, বস্তি, বাউড়ি, বাখারি, বাঁধুনি, বাবুগিরি,
বাঁশি, বাকি, বাগদি, বাঙালি, বাজি, বাটালি, বাড়ি, বাতাবি, বাদশাহি, বাদামি.

বাঁপি, বাবুর্চি, বারোয়ারি, বালতি, বাসি, বাহাদুরি, বিক্রি, বিট, বিড়ি, বিদেশি, বিলাতি, বিলিতি, বিহারি, বিমা, বুককিপিং, বুকনি, বুটি, বুড়ি, বেআইনি, বেইমানি, বেগনি, বেগুনি, বেচারি, বেজি, বেটি, বেড়ি, বেশি, বেসরকারি, বেহিসেবি, বৈঠকি, বৈরাগি, ব্যাঙাচি, ব্যবসায়ি, ভন্ডামি, ভাবি, ভরতি, ভাংচি, ভাটিয়ালি, ভারি, ভিখারি, ভিখিরি, ভিতু, ভিড়, ভিটে, ভিমরুল, ভুতুড়ে, ভুরিভোজ, ভেংচি, ভেলি, ভোজপুরি, ভোজবাজি, ভোজালি, মৌরি, মৌলবি, মজলিশ, মজুরি, মনিপুরি, মনিহারি, মতিহারি, মরজি, মুশুর, মহাজনি, মাগুগ, মাঝি, মাটি, মাড়োয়ারি, মানিক, মাতব্বরি, মাদি, মাদুলি, মাদ্রাজি, মামুলি, মারমুখি, মারাঠি, মাসকাবারি, মাঝি, মিছরি, মিটিং, মিতালি, মিশনারি, মিহি, মুচি, মুৎসুদ্দি, মুডাক, মুদি, মুনসেফি, মুরগি, মুরুব্বি, মুলতুবি, মুলতানি, মুহুরি, মেকি, মেহেদি, মেবামতি, মেশিন, মেহনতি, মৈথিলি, মোক্তারি, মোসাহেবি, মৌলবি, মৌশুমি, রশিদ, রস্তানি, রশিদ, বায়াতি, রাঁধুনি, পাখালি, রাখি, রাজি, রানি, রাবিশ, রিম, বিল, রুগি, রুজি, রুপো, রুপোলি, রুলি, রুপিয়া, রেকাবি, রেজাগি, রেজিস্ট্রারি, রেডি, রেফারি, রেশমি, রোজগারি, লাঠি, লটারি, লাইব্রেরি, লাচাড়ি, লিগ, লেডি, শাটি শয়তানি, শরিক, শহিদ, শাকচুন্নি, শাঁখারি, শাড়ি, শাদি, শামিল, শার্শি শালতি, শিকারি, শিঙি, শিস, শিয়া, শিরগির, শুটকি, শুটি, শুঁড়ি, শুন্তো, শুনানি, শুপুরি, শুরকি, শুয়োর, শেফালি, সবজি, সবেজমিন, সরকারি, সরদারি, সর্দিগর্মি, সবাসরি, সাঁওতালি, সাঁড়াশি সাত্তাশি, সাবধানি, সাবেকি, সাহেবি, সিকি, সিট সিল, সুজি, সুতো, সুফি, সেউতি, সেক্রেটারি, সেতারি, সেলামি, সোজাসুজি, সোনালি, সোয়ামি, স্টিম, স্পিরিট, স্পুল, স্প্রিং, হজমি, হাকিমি, হদিশ, হম্বিতম্বি, হলদি, হাঁড়ি, হাঁসুলি, হাজি, হাতি, হাতুড়ি, হাম্বির হিজরি, হিন্দি, হিরা, হিরে হুঁশিয়ারি, হেঁয়ালি, হোলি।

স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দেও হ্রস্ব-ই ব্যবহৃত হবে :

ঝি, দিদি, বিবি, মাসি, পিসি, কাকি, খুড়ি, জেঠি, মামি, শাশুড়ি, খুকি, বানি, মাদি, মেথরানি।

৭। জ, য

বাংলা শব্দে জ লিখিত হবে, য নয় :

কাজ, জক, জবুথবু, জশোর, জশুরে, জাউ, জাঁকজমক, জাঁতা, জাঁতি,

জাদু, জুঁই, জুগি, জুগ্যি, জংগল, জংলি, জো, জোত, জোড়, জোড়া, জখম, জগঝম্প, জংগি, জংগুলে, জজ, জট, জটলা, জটিবুড়ি, জড়াজড়ি, জড়ানো, জড়োয়া, জবজবে, জবর, জবরদস্তি, জবাই, জবান, জবাব, জব্দ, জমকালো, জমজমাট, জমাদার, জমানা, জমায়েত, জমি, জরদা, জরি, জরিপ জরিমানা, জরুরি, জলজ্যান্ত, জল্লাদ, জহর, জহুরি, জামানত, জায়গির, জাঁকানো, জাঁদরেল, জাঁহাপনা, জাহাবাজ, জাঙাল, জাঙিয়া, জাজিম, জাঠ, জাদুমনি, জাদুকর, জানলা, জেনানা জানুয়ারি, জানোয়ার, (সব)জান্তা, জাপানি জাপটানো, জাফরান, জাফরি, জাব, জাবনা, জাবদা, জাম, জামদানি, জামরুল, জামা, জামাই, জামিন, জামির জায়গা, জায়গির, জারুল, জাল, জারিজুরি, জালিবোট, জালিম, জালিয়াত, জাহাজ, জাহান্নাম, জাহির, জাঁদ জিউ জিওল, জিগির জিজিয়া, জিদ, জিল জিন্দেগি, জিমনাস্টিক, জিয়ানো জিরাফ, জিরে, জিলা, জিলিপি, জুজু, জুতি, জুতো জুৎসই, জুড়ানো, জুড়োনো জুজুৎসু, জুন, জুবিলি, জোব্বা, জেদি, জুলজুল, জুলফি জুলাই, জেটি জেঠা, জের, জেরা, জেমাদা, জেরবার, জেতা, জেনারেল, জেল, জেলা জেল্লা, জেহাদ, জৈন, (মাপ)জোক, জোগান জোগাড়, জোট, জুটি, জোনাকি, জোয়ান, জোয়ার, জোরজুলুম জোলা জোলাপ জোলো জনজাতন, জ্বালানি জ্যাঠা জ্যাঠামি, জ্যান্ত।

৮। ণ, ন

বাংলা বা বাংলায় গৃহীত শব্দে কেবলমাত্র দন্ত্য ন ব্যবহৃত হবে

অঘ্রান, অস্ট্রেলিয়ান, অর্নামেন্ট, আরমানি, আর্মেনিয়ান, আর্নিকা, অ্যাটর্নি, ইরান, উকুন, উনিশ, উনাশি, উনত্রিশ কলিচুন, কর্নাটকারি, কনট্রাকটার, কন্ট্রোলার, কন্‌ঠি, কাতরানি, কান, কানাঘুষো, কারখানা কার্বন, কারেনসি, কুর্নিশ কেরানি, কোনা, কোনাকুনি, কোরান, কার্নেশান, করিনথিয়ান, কর্ন-ফ্লেকস, কর্নিয়া, কর্নেল, কার্নিশ, করোনা, করোনারি, করোনেশন, ক্রেন, ক্রেয়ন, ক্যানবেরা, গনৎকার, গনডা, গভর্নমেন্ট, গভর্নর, গরান, গিন্নি, গিলটি, গুনতি, গুনডা, গুনিন, ঘন্টা, ঘন্ট, গ্রিকোরোমান, গ্র্যানাইট, ঘরানা, ঘরনি (গৃহিণী), চিরুনি, চুন (চূর্ণ), জাফরানি, ঝরনা, টার্নার, টার্মিনাস ঠাকরুন, তার্পিন, দখনে (দক্ষিণ) দারোয়ান, দরুন, দারুন, ধরন, ধরনা, ধরনধারন, নরুন, পরগনা, পরান, পুরোনো, প্যারানইয়া, পরোয়ানা প্যানডেল, পানডা, প্রিনসিপ্যাল, ফার্ন, বামুন, বানিয়া, বানডিল, ব্যারন, বায়রন, বার্নিশ ব্র্যানড ব্র্যানডি, ব্রাউন,

কর্নার হর্ন মিনিস্ট্রি, মনিহারি, ময়দান, মানিক (মাণিক্য) মেরুন বানান রানি, রানওয়ে, বান, রানিং, [illegible] রাউন্ড রোমান সোনা।

ক্রিয়ায় -ন বা -আনো হবে

অসানো উৎপানে করানো খাটানো, গুমরানো ঘুরোনো ঘোরানো, ভুকরানো, চেবানো চেয়ানো ছড়ানো জানানো ঝলানো ঝাঁটানো ঠাওরানো, তবানো, তরানো ধরানো, নিকোনো, পরানো, পানানো পেরানো পোষানো, ফুরানো, ফেরানো বর্তানো ভরানো বাগানো বাঙানো শিউলানো শুধরানো সারানো সাঁতরানো হারানো।

করুন, করান ঘিরুন ঘেরান চলুন চলান, চিনুন চেনান পরুন পরান ফিরুন ফেরান মরুন মারুন ভরুন ভরান।

সংযুক্ত বর্ণ ন্ট(ন্‌+ট) এর মধ্যে ন্‌ ট ন ঠ ন্‌ ড বর্ণ ব্যবহৃত হতে পারবে

শান্টিং শান্‌টিং লন্ঠন লনঠন লন্ডন লন্‌ডন।

বিযুক্ত আকারে ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ কে যথাক্রমে ন্‌ চ ন ছ, ন জ ন্‌ ঝ লেখা চলবে

কিন্‌চিৎ [illegible] [illegible] [illegible] ঝন্‌ঝা।

বিযুক্ত আকারে ণ্ট ণ্ঠ, ণ্ড কে যথাক্রমে ন্‌ট ন ঠ ন্‌ড লেখা চলবে.
বন্‌টন, লুন্‌ঠন, মন্‌ডল।

৯। ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জিত হবে।

১০। অর্থভেদের সমস্যা দেখা না দিলে পদান্তে ও-কার বর্জনীয়

এত, কত, তত, যত।

কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে 'ও' কার হবে

আরো, কখনো, কালো কোনো জোলো (জলুয়া), ঝোড়ো (ঝড়ুয়া), তো, ভালো, মতো, হয়তো, এগারো, বারো। তেরো চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো।

ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপে ও-কার ব্যবহৃত হবে না

খেল, খাব, গিয়েছিল, দিল, দেব, দিয়েছিল, বুঝল।

ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় বর্তমান কালে পদান্তে ও-কার হবে :

করো, গড়ো, চড়ো, চলো, ধরো, নড়ো, পড়ো, পরো, বলো, বসো, ভরো, হটো।

ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালে আদিতেও ও-কার হবে .

কোরো, ধোরো, পোড়ো, বোলো, বোসো, লোড়ো।

ক্রিয়ার সাধারণ ও ণিজন্ত রূপ ও-কারান্ত (আনো) হবে :

আঁচড়ানো, আনানো, ওপড়ানো, কপচানো, করানো, কামড়ানো, খাটানো, গড়ানো, গোছানো, ঘটানো, চবানো, চালানো, ছিটোনো, ছিটানো, জমানো, ঝিমোনো ঝিমানো, ঝোলানো, টলানো, টপকানো, ঠুকরানো, তাতানো ধমকানো নাচানো, নিংড়ানো, পাঠানো, পাতানো, পালটানো, বাঁধানো, বাধানো, বোঝানো, বটানো, লুকোনো, হাসানো।

প্রেরণার্থক ক্রিয়াপদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হলেও ও কারান্ত হবে

দেওয়ালে হেলানো মাথা।

হ ধাতুর কয়েকটি রূপে আদিতে ও-কার হবে

হোক, হোত হোল, হোস।

১১। শ, ষ, স

সংস্কৃতজ শব্দে শ বা স ব্যবহৃত হবে :

আঁশ, মশা মিনসে, শাট, শাঁস, শিশ, শিশা।

কেবলমাত্র ষ ব্যবহৃত হয় এমন ক্ষেত্রেই ষ ব্যবহৃত হবে :

ষাট (বালাই), ষাট, ষাঁড়।

ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থে 'স' ব্যবহৃত হবে :

করিস, বলিস, হোস, ঘুমোস।

বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে না হয়ে, বাংলা ভাষায় গৃহীত উচ্চারণ অনুসারে ছ, শ অথবা স ব্যবহৃত হবে :

আতশ, আদমশুমারি, আরশি, আয়েশ, আরশি, আরশোলা, আশকারা, আশমান, আশান, ইশকাবন, উশুল, উশকানি, উশখুশ, এজলাশ, ওয়াশিল, ক্লাশ, খাশ খাশা, খুশি, চশমা, জিনিশ, তক্তপোশ, পশম, পুলিশ, পেনশন, পোশাক, ফরশা, বালিশ, ব্রাশ, মশাল, মাশুল, শখ, শবজি, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শাদা, শার্দি, শার্ট, শিন্নি, শিরিশ, শিশি, শেকসপিয়র, শৌখিন।

ইস্তফা, ইস্তিরি, ইসতাহার, ইসলাম এজেন্সি, ওস্তাদ, খ্রিস্টান, গোমস্তা, ভিস্তি।

১২। বিদেশাগত শব্দে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে বানান হবে

এডোয়ার্ড, ওয়ার, কাটলেট, ক্লাশ, চেয়ার, জার্মান, থার্ড, ফসফরাস, বাজেট, বাস, ব্রাশ, মেয়র, রেডিয়াম, হেরোডোটাস, হোমার, সার সার্কাস, সোয়েটার।

১৩। অ্যা

বিদেশাগত শব্দের বক্র-আ ধ্বনি বাংলায় অ্যা দিয়ে লেখা হবে

অ্যাকটিং, অ্যাকাউন্ট, অ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যাটাচিকেস, অ্যাডভান্স, অ্যাডভোকেট, অ্যামপ্লিফায়ার, অ্যারসা, অ্যালুমিনিয়াম, ট্যাংক, ব্যাংক, ব্যাংক হ্যাট, হার্ডঅয়্যার।

বিদেশি শব্দের মতো কতকগুলি বাংলা শব্দেও উচ্চারণ অনুসারে অ্যা হবে :

খ্যামটা, দ্যাখো, প্যালা, ব্যাং, ভ্যাঙানো, ন্যাংটো।

১৪। কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ :

অভ্যেস, অসুবিধে, অ্যাগো, আদ্ধেক, ইচ্ছে, উঠোন, উনুন, ওপড়ানো, ওপর, ওলটপালট, ওলটানো, ওস্তাদি, কুয়ো, কুলো, খিদে, গুলো, জন্যে, জিগ্যেস, জড়োনো, জুতো, তুলো, ধুলো, নতুন, নিকেল, নিচে, নিকোনো, নেবানো, নৌকো, পিতোশ, পুজো, পিছোনো, পেছোনো, পেছন, পুরোনো, পেছল, পেতল, বেঁধানো, ভেতর, মধ্যে, মিছে, মিথ্যে, মুক্তো, মুলো, মেটানো, লুকোনো, রুপো, শেকড়, শেয়াল, সত্যি, সিধে, সুতো, হিরে, হিসেব।

১৫। চলিত ক্রিয়াপদের কয়েকটি বিহিত রূপ উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হোল :

হয়, হন, হও, হোস হই। হচ্ছে, হচ্ছেন, হচ্ছ, হচ্ছিস, হচ্ছি। হয়েছে, হয়েছেন, হয়েছো, হয়েছিস, হয়েছি। হোক, হোন, হও, হ। হোল, হোলে, হোলেন, হোলি, হোলাম। হোতে, হোতেন, হোতিস, হোতাম। হচ্ছিল, হচ্ছিলে, হচ্ছিলি, হচ্ছিলেন, হচ্ছিলাম। হয়েছিল, হয়েছিলে, হয়েছিলেন, হয়েছিলি, হয়েছিলাম। হবে, হবি, হবেন, হবো। হোয়ো, হোস। হোতে, হোয়ে, হোলে, হবার, হওয়ার, হওয়া।

বাংলা বানান নিয়ে বহুদিন ধরে লেখালেখি চলছে। এইসব লেখা একত্র তুলে ধরে আলোচনা করলে বোঝা যায় বানানের ব্যাপারে আমরা কতদূর এগিয়েছি, এবং কোথায় আমরা আটকে আছি। এ কাজ যেমন জরুরি তেমনি নিষ্ঠাসাধ্য। 'বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন' বইটিতে সেই জরুরি কাজটিই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন বাংলা ভাষার অধ্যাপিকা ড. মিতালী ভট্টাচার্য।

PARUL PRAKASHANI

পারুল প্রকাশনী

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯